মাক্সিম গোর্কি

তিনজন

...গরিব কারিগর-মিস্ত্রিদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি বিরাট পড় পড় বাড়ি।

দারিদ্র্য। হানাহানি।

এখানেই অতিবাহিত হয় মহান প্রলেতারীয় লেখক মাক্সিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) 'তিনজনা' উপাখ্যানের মূল চরিত্রদের শৈশব ও কৈশোর।

তাদের একজন, ইলিয়া লুনিয়োভ্ বৃথাই যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে উত্তর খোঁজে 'কী ভাবে বাঁচা যায়?' — এই প্রশ্নের। আরেক জন, নিরীহ ও দুর্বল চরিত্রের ইয়াকভ্ ফিলিমোনভ্ — জীবনের অন্যায় দেখতে পেয়ে চিরকালের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেবল তৃতীয় জন — স্বাধীনচেতা, একনিষ্ঠ পাভেল গ্রাচোভ্ই শেষ পর্যন্ত জীবনের সত্য খুঁজে পায়।

মহান শিল্পীর নিপুণ তুলিতে মাক্সিম গোর্কি এঁকেছেন বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার চিত্র, তুলে ধরেছেন মানুষের মনের উপর মালিকানার ধ্বংসাত্মক প্রভাব, নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের ব্যর্থতা, জীবনের যথার্থ পথ।

মাক্সিম গোর্কি

তিনজনা



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

Максим Горький

ТРОЕ

на языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г $\frac{70302-134}{014(01)-80}$ 758—79 4702010200

মুখবন্ধ

মাক্সিম গোর্কি — বিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বাস্তববাদী, মহান রুশ লেখক। তাঁর রচনাবলী রুশ সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্য বিকাশে গোটা একটি যুগের সূচনা করে। গোর্কি যখন তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন তখনও রুশ সাহিত্যে লেভ্ তলস্তয় ও আন্তন চেখভের মতো বিশ্ববিখ্যাত ধ্রুপদী লেখকদের লেখনী ক্ষান্ত হয় নি। তাঁরা দুজনেই তরুণ গোর্কির রচনার উচ্চ মূল্য নিরূপণ করেন। তাঁর সম্পর্কে লেভ্ তলস্তয় লেখেন: 'গোর্কিকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি এবং ভালোবাসি কেবল ইউরোপে সমাদৃত, গুণী লেখক বলে নয়, একজন বুদ্ধিমান, সৎ ও প্রীতিকর মানুষ হিশেবেও বটে।' চেখভের সঙ্গে গোর্কি ছিলেন ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে গোর্কি রুশ ধ্রুপদী ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটান, তিনি হয়ে দাঁড়ান সোভিয়েত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা।

মাক্সিম গোর্কি ছদ্মনামে খ্যাত আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ্ পেশ্‌কভ ১৮৬৮ সনের ২৮ মার্চ তারিখে নিজ্‌নি নোভ্‌গরোদ (বর্তমানে গোর্কি) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন ভাবী লেখকের শৈশব কঠিন পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়। দশ বছর বয়সে তাঁকে রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়তে হয়। তিনি জুতোর দোকানে 'ছোকরার' কাজ করেন, স্টীমারে থালাবাসন ধোয়ার কাজ করেন, ড্রাফ্‌টসম্যানের কাছে এবং আইকন অলঙ্করণের কর্মশালায় চাকরী করেন, ছেঁড়া কাগজ-নেকড়া কুড়িয়ে, পাখি ধরে জীবিকানির্বাহ করেন। তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় অন্যায়-অবিচারের জগৎ, ক্ষুধার জগৎ। জীবনে বহু বার কঠিনতম পরিস্থিতির কবলে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। ভবিষ্যতে 'বিপ্লবের ঝড়ের পাখি' মাক্সিম গোর্কির অন্তরে পরিণতি লাভ করল 'সংসারের প্রবল নীচতার' প্রতি ঘৃণাবোধ, তার শোচনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা। মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ কোন কিছুতেই দমল না। গোর্কি এক সময় যেখানে কাজ করতেন সেই আইকন অলঙ্করণ কর্মশালার এক ছোট মিস্ত্রি একবার তাঁকে বলেছিল, 'তুই যে সকলের আপন হয়ে যেতে পারিস এটা তোর একটা ভালো গুণ বলতে হবে।' গোর্কি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন বলে ঠিক করে

ভোলগা তীরের বড় শহর কাজানে এলেন তখন তাঁর বয়স ষোল। 'আমাকে যদি কেউ বলত, যা পড়াশুনা কর, তবে তার জন্যে রোব্বার-রোব্বার নিকলায়েভ স্কোয়ারে আমরা তোকে ঠ্যাঙানি দেব, তাহলে আমি হয়ত সে শর্ত মেনেই নিতাম,' — গোর্কি তাঁর স্মৃতিকথাতে এই উক্তি করেছেন। তবে ঘরছাড়া এই মানুষটির ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা হয়ে উঠল না। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল অন্য কিছু — শহরতলির বাড়ির ভূগর্ভকক্ষ, জাহাজ ঘাটা — যেখানে তিনি কুলির কাজ করেন, গোপন রাজনৈতিক চক্র — যেখানে তাঁর প্রথম আলাপ হয় বিপ্লবী মার্কসবাদীদের সঙ্গে। 'লোকসমাজ থেকে স্বশিক্ষিত,' — পরবর্তীকালে গোর্কি নিজেকে এই আখ্যায় অভিহিত করেন, তিনি হয়ে দাঁড়ান তাঁর সময়কার ব্যাপক জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষিত লোকজনদের একজন।

১৮৯১ সনে ভাবী লেখক রাশিয়া পর্যটনে নির্গত হন। দেশের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল, ককেশাসের কৃষ্ণ সাগর তীরবর্তী গোটা এলাকা তিনি পরিভ্রমণ করেন। একবার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; 'এভাবে কেন ঘুরছেন?' — মিলিটারি পুলিশের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: 'রাশিয়াকে জানতে চাই!' রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘ পথভ্রমণ গোর্কি শেষ করলেন ককেশাসে, ত্‌বিলিসিতে। এখানে তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম গল্প 'মাকার চুদ্‌রা'। গল্পটি প্রকাশের জন্য গৃহীত হল, কেবল লেখকের স্বাক্ষর চাই। লেখক সম্পাদনালয়ে বসে বসেই ভেবে বার করলেন — মাক্সিম গোর্কি।

নিজের চরিত্রের গঠন ও প্রত্যয়ের দিক থেকে গোর্কি ছিলেন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। 'আমি আপস না করতেই দুনিয়ায় এসেছি' — নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল অবধি সময়ের মধ্যে লিখিত তাঁর বহু রোমান্টিক ও বাস্তবধর্মী উপাখ্যান — 'বুড়ি ইজেরগিল্', 'চেলকাশ', 'কনোভালোভ', 'ঝড়ের পাখির গান' এবং অন্যান্য রচনা উক্ত মানসিকতায় পরিপূর্ণ। এসব রচনা সে সময়ই তাঁকে সমগ্র রুশ দেশে সুপরিচিত করে তোলে। ছোট গল্প ও উপাখ্যান থেকে গোর্কি প্রবেশ করেন বড় ক্যানভাস শিল্পের জগতে। ১৮৯৯ সনে তিনি লিখলেন 'ফোমা গর্দেয়েভ্', বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রচনা করলেন অনেকগুলি বিশিষ্টধর্মী গদ্য ও নাটক — 'তিনজনা' উপাখ্যান, 'পেটি বুর্জোয়া' ও 'নীচের মহল' নাটক।

গোর্কি'র সাহিত্যিক ও সামাজিক কার্যকলাপ জার শাসনকর্তৃপক্ষের রোষোদ্রেক করে। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ সনের মধ্যে তাঁকে বার কয়েক গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯০৫ সনে প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় গোর্কি প্রথম ব্যক্তিগত ভাবে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, পরবর্তীকালে গোর্কি তাঁর সঙ্গে গভীর সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ হন। 'গোর্কি — এক বিপুল শিল্পপ্রতিভা,' 'নিঃসন্দেহে প্রলেতারীয় শিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুখপাত্র,' — একথা লেখেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

প্রথম রুশ বিপ্লবের পরাভবের পর গোর্কি দেশান্তরী হন। ১৯০৬ সনে আমেরিকায় তিনি সমাপ্ত করেন তাঁর বিখ্যাত 'মা' উপন্যাস ও 'দুশমন' নাটক। এই রচনাগুলির মধ্য দিয়েই নূতন সমাজতান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। 'মা' উপন্যাসটি সমগ্র বিশ্বের পাঠক মহলে সুপরিচিত। উপন্যাসটি বিশ্বের প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়, তার সংস্করণের সংখ্যা ৩০০টির কাছাকাছি। গোর্কি'র এই গ্রন্থ বিশ্বের সংগ্রামরত জনগণকে সজ্জিত করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রে — বিজয়ের প্রতি বিশ্বাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিলোভ্না তার উপসংহারে বলছে: 'রক্তের বন্যায় সত্যের জ্যোতি নিভে যায় না।'

ইতালির কাপ্রি দ্বীপে প্রবাস জীবনযাপনকালে গোর্কি লেখেন তাঁর অপরূপ গ্রন্থ 'ইতালির রূপকথা', রুশ জীবন সম্পর্কে আখ্যানমালা, তিনি লিখতে শুরু করেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসত্রয়ী 'ছেলেবেলা', 'পৃথিবীর পাঠশালায়' ও 'পৃথিবীর পথে'।

'রাশিয়া হবে দুনিয়ায় উজ্জ্বলতম গণতন্ত্র,' — এই ভাবে গোর্কি প্রকাশ করেছিলেন রুশ জনগণের ভবিষ্যতের উপর তাঁর আস্থা। ১৯১৭ সনের অক্টোবরে লেখকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলল। দেশে বিপ্লবের সূচনা হল। নূতন শাসনক্ষমতার অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই গোর্কিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল দেশের সাহিত্য জীবন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিণামে সূচিত চরম ধ্বংসের পরিবেশে, অবরোধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের পরিস্থিতিতে গড়ে উঠতে লাগল নূতন সংস্কৃতি। গলা দিয়ে অনবরত রক্ত ওঠার দরুন গোর্কিকে দীর্ঘকাল ইতালিতে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। কিন্তু এই অসুস্থতা সত্ত্বেও নবীন সৃজনী শক্তি সমাবেশের কাজে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। জনগণের জন্য রুশ ও বিদেশী ক্লাসিক প্রকাশের বিপুল কর্মে তিনি হাত দেন,

নূতন নূতন থিয়েটার, পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যচক্র সংগঠন করেন। এই সময়ই তিনি লেখেন লেনিন সম্পর্কে প্রবন্ধ, তলস্তয়, চেখভ, ইয়েসেনিন প্রমুখের প্রতিকৃতি — রুশ সাহিত্যিক ও বিপ্লবীদের বিষয়ে রচনা। 'আর্তামোনভ পরিবার' উপন্যাস তিনি সমাপ্ত করলেন। উপন্যাসটির পরিকল্পনা একসময় তলস্তয় অনুমোদন করেন। গোর্কি চারখণ্ডে সম্পূর্ণ মহাগাথাধর্মী উপন্যাস 'ক্লিম সাম্গিনের জীবন'-এর উপর প্রায় দশ বছর কাজ করেন। তাঁর 'ইয়েগর বুলিচিয়োভ্ ও অন্যেরা' নাটকটি দেশের সেরা থিয়েটারগুলিতে চলতে থাকে। লেখকের সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত রচনাদি সত্যিকারের আন্তর্জাতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তাঁর প্রধান শত্রু — ফ্যাশিবাদ, যাকে লেখক 'পচনশীল বুর্জোয়াতন্ত্রের ক্যান্সারগ্রস্ত ফোড়া' আখ্যা দেন।

মারাত্মক অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও গোর্কি ১৯৩৪ সনে প্রথম সারা ইউনিয়ন লেখক কংগ্রেস পরিচালনা করেন। উক্ত কংগ্রেসে সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল লেখকসম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটে। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

একালের অন্যতম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে তাঁর বিপুল জ্ঞান, সংগ্রামীর সমস্ত উদ্যম, গঠনকর্মীর উদ্যোগ তিনি জনগণকে অর্পণ করেন। গোর্কি লেখেন: 'সারা জীবন আমি সেই সব মানুষকেই খাঁটি বীর বলে গণ্য করে এসেছি যাঁরা কাজ করতে ভালোবাসেন, কাজ করতে পারেন, যাঁরা সৃজনের জন্যে, আমাদের পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার জন্যে, তাতে মানুষের উপযোগী রূপ সংগঠনের জন্যে মানুষের যাবতীয় শক্তির মুক্তিসাধনকে নিজেদের উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করেন।' এধরনের মানুষের প্রথম সারির একজন ছিলেন গোর্কি নিজে।

* * *

১৯০০ সনে গোর্কি লেখেন: 'সবচেয়ে বেশি করে, বেশ ঘনঘনই মানুষের মধ্যে চলে ভালো হওয়ার এবং ভালো ভাবে বেঁচে থাকার প্রয়াসের — পরস্পরবিরোধী দুই প্রয়াসের সংগ্রাম। এই দুই প্রবৃত্তিকে একের মধ্যে সুসংবদ্ধ করা — জীবনের বর্তমান বিশৃঙ্খলায় অসম্ভব।'

'তিনজনা' (১৯০১) উপাখ্যানে গোর্কি পুঁজিবাদী বাস্তবতার এই নিষ্ঠুরতম বিরোধিতা উদ্ঘাটন করেন। তাঁর উপাখ্যানের তিনটি চরিত্রের বাস

দুর্ভাগ্যে পরিষিক্ত এক গৃহে। তারা হল সরাইখানার মালিকের ছেলে নিরীহ প্রকৃতির ও নির্যাতিত ইয়াকভ্ ফিলিমোনভ; সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কামারের ছেলে পাভেল গ্রাচোভ এবং তাদের নূতন বন্ধু, সদ্য গ্রাম থেকে আগত ইলিয়া লুনিয়োভ্। তাদের সকলেরই স্বপ্ন এই ভয়ঙ্কর বাসগৃহের নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে এক নতুন, অর্থপূর্ণ জীবনের সূত্রপাত ঘটানো। মুচির মেয়ে মাশাও মনেপ্রাণে তাদের প্রতি আকৃষ্ট। খুব অল্প বয়সেই জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে পেতে হয়।

চরিত্রগুলির ভাগ্য একেক রকম ভাবে গড়ে উঠছে। ভালোমানুষ, কোমল স্বভাবের ইয়াকভ্ দুনিয়ায় ভয়ঙ্কর অন্যায়ের প্রাবল্য দেখে চিরকাল ভীতসন্ত্রস্ত। ইয়াকভের কথায়, 'এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে গেলে দরকার — লোহার পাঁজরা, লোহার কলজে,' ও স্বপ্ন দেখে মঠের কিন্তু তার বদলে গিয়ে পড়ে সরাইখানায় — তাকে দেখতে হয় পৈতৃক ব্যবসা, দম আটকানো মাতালের আড্ডায় বার কাউন্টারের পেছনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

'কী করে বাঁচা যায়?' এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সকলের চেয়ে বেশি যন্ত্রণা পেয়েছে সম্ভবত ইলিয়া লুনিয়োভ্। তার মধ্যে প্রাণশক্তি ও উদ্যম প্রচুর। তার বিশ্বাস যে মানুষ হওয়ার সুযোগ তার ঘটছে। কিশোর ইলিয়া তার বন্ধু ইয়াকভের কাছে স্বীকার করে বলছে: 'কিন্তু তুই কী নিয়ে প্রার্থনা করতে চাস? আমি প্রার্থনা করতে চাই যেন আমার বিদ্যেবুদ্ধি হয়... আর চাই — আমার যা খুশি সে সবই যেন পাই!..' সে স্বপ্ন দেখে 'ভদ্র', ন্যায়পরায়ণ জীবনের। গোড়ায় সে ভাগ্যবান, ইলিয়া তার কাজে সিদ্ধ ও উদ্যোগী। সে মনে মনে স্বীকার করে, 'ভাগ্যবান, হ্যাঁ... ইসারায় ডেকে নিয়ে যায় ত নিয়েই যায়, দূরে আরও দূরে।' মালিক হওয়ার সাধ তার মনে জাগে। মাঝে মাঝে তাকে আবিষ্ট করে উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন, প্রতিহিংসার স্বপ্ন, প্রভুত্ব খাটানোর সাধ। লুনিয়োভ্ মানুষের লোভের কথা ভাবে, ভাবে 'লোকে কী লোভী হতে পারে, টাকার খাতিরে কত জঘন্য কাজই না করতে পারে! কিন্তু তক্ষুনি সে মনে মনে কল্পনা করল তার নিজের যদি এখন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা থাকত তাহলে সে লোকজনের ওপর এক হাত নিতে পারত! সে তাদের বাধ্য করত তার সামনে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিতে...' ইলিয়ার ওপরে ওঠার পথ, 'ভদ্র' জীবনযাত্রার পথ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় অপরাধের পথ। সে বুড়ো সুদখোরকে খুন করল। এই হত্যাকাণ্ড তার বিবেকের ওপর

ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসে। 'কাউকে খুন করার ইচ্ছে আমার ছিল না, আমার নিয়তিই আমাকে তিলে তিলে মারছে!' — ইলিয়ার মরিয়া আর্তনাদ। ধনসম্পদ তাকে বাঞ্ছিত শান্তি ও তৃপ্তি দিতে পারল না। ওপরে, সমাজের ওপর তলায় সেই একই মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, নৈতিক অধঃপতন। নূতন জীবন শুরু করার, বড় প্রেম খোঁজার যে প্রয়াস ইলিয়া চালিয়েছিল তার পতন ঘটল। কেবল একটা সাধ মিটিয়ে নিতে ইলিয়া বাকি রাখল না — যারা তার জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে, তাদের মুখের ওপর সে উচিত কথা ছুঁড়ে মারল: 'আমি — ভদ্র, পরিচ্ছন্ন জীবন খুঁজেছিলাম... কোথাও তা নেই! খুঁজতে গিয়ে কেবল নিজে নষ্ট হলাম। ভালো লোকের তোমাদের সঙ্গে থাকার জো নেই। তোমরা ভালো লোককে কোণঠাসা করে মেরে ফেল। তোমাদের পিষে মারতে হলে কোন শক্তির দরকার তা যদি আমার জানা থাকত!' এইভাবে দুই বিরোধী প্রয়াস — ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বপ্ন ইলিয়ার হৃদয়কে বিদারণ করে। প্রতিকারহীন, মরিয়া বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ইলিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বন্ধুদের মধ্যে একজন — একমাত্র পাভেল গ্রাচোভ্ই যথার্থ মানবজীবনের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় আসতে সমর্থ হয়, অবশ্য তাকেও এর জন্য কম দুঃখ ভোগ করতে হয় নি। সে কাজের সন্ধানে রাশিয়ায় প্রচুর ভ্রমণ করে, ছাপাখানায় কাজ করে, অগ্রণী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা আছে। 'যার খাওয়া পরার অভাব নেই সে সাধু, যার পেটে বিদ্যে আছে সে ন্যায়ের ধ্বজাধারী — এমন কেন হয়?' অস্তিত্বের বিরোধ উপলব্ধি করার চেষ্টায় সে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে। ইলিয়া লুনিয়োভের পথ পাভেল গ্রহণ করবে না। মালিকানা লাভের পথ তাকে প্রলুব্ধ করে না। পাভেলের আকর্ষণ — শিল্প ও সংস্কৃতি, তার পথ হল প্রেম, যা তার নগণ্য জীবনকে সতেজ করে তুলেছে। তাকে আকর্ষণ করে বিপ্লবী মেজাজের যুবগোষ্ঠীর লোকজন, তারাই অনেক ব্যাপারে ওর চোখ খুলে দেয়। পাভেল গ্রাচোভ্ কেবল সেই পথে পা বাড়ায় যে পথ ধরে পরবর্তীকালে যেতে দেখা যাবে গোর্কির বিখ্যাত 'মা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পাভেল ভ্লাসভ্কে। পাভেলের ভবিষ্যৎ এখনও সামনে পড়ে আছে।

'তিনজনা' উপাখ্যান সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিরাট আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। লেভ্ তলস্তয় ও আন্তন চেখভ তার উচ্চ মূল্য নিরূপণ করেন।

লেনিন নিজেই তাঁর একটি পত্রে জানান যে 'বেশ বড় রকমের আগ্রহ নিয়ে' তিনি 'তিনজনা' পাঠ করেছেন।

স্বয়ং গোর্কি মন্তব্য করেছেন যে 'তিনজনা' উপাখ্যান তাঁর সৃজনী বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দিকস্তম্ভ। ১৯০১ সনে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি লেখেন: 'পড়তে পড়তে আমি বিষণ্ন হয়ে ভাবি, এমন বই যদি আমি আজ থেকে পনেরো বছর আগে পড়তে পারতাম তাহলে যেমন অনাবশ্যক তেমনি গুরুভার কত চিন্তার যাতনা থেকেই না মুক্তি পাওয়া যেত...' উপাখ্যানটিতে লেখক জীবনের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ এমন সব প্রশ্ন রেখেছেন যা সমাধানের জন্য তিনি নিজেই যৌবনে মাথা কুটে মরেছেন: এতে আছে মানুষের মনের উপর মালিকানার ধ্বংসাত্মক প্রভাব, নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের ব্যর্থতা এবং জীবনের যথার্থ পথের সন্ধান। আর সেই কারণেই লেখকের স্বপ্ন ছিল এই গ্রন্থ যেন ব্যাপক পাঠকসমাজের হাতে পৌঁছায়।

কেরজেনেৎসের বনজঙ্গলের মাঝখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আলাদা আলাদা বহু সমাধি। সে সব সমাধির নীচে ক্ষয় পাচ্ছে সনাতন আচারনিষ্ঠ প্রৌঢ় সন্ন্যাসব্রতীদের অস্থিপঞ্জর। এহেন এক প্রৌঢ় — আন্তিপা। কেরজেনেৎস অঞ্চলে গাঁয়ের লোকজন তার সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়ে থাকে তা এই রকম:

আন্তিপা লুনিয়োভ ছিল উগ্র স্বভাবের বড়লোক চাষী। পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি ব্যভিচারে ডুবে পার্থিব জীবন ভোগ করার পর গভীর চিন্তা ও বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসল, শেষে সে সন্ন্যাস নিয়ে বনবাসী হয়ে গেল। সেখানে একটা খাদের উঁচু পার ঘেঁসে এক জায়গায় গাছের গুঁড়ি কেটে সে আশ্রম-কুটির বানাল, তার মধ্যে শীতে ও গ্রীষ্মে পর পর আটটি বছর কাটিয়ে দিল; না কোন চেনা-জানা লোকজন, না নিজের আত্মীয়স্বজন — কাউকেই সে আশ্রম-কুটিরে ঢুকতে দিত না। কখন-সখন লোকে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে দৈবাৎ তার কুটিরের কাছে এসে উপস্থিত হলে দেখতে পেত আন্তিপাকে: সে চৌকাটের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে। তাকে দেখাত ভয়ঙ্কর — উপোস আর সাধন-ভজন করে করে তার চেহারা হয়েছে হাড্ডিসার, সর্বাঙ্গ চুলদাড়িতে ছেয়ে সে দেখতে হয়েছে একটা জানোয়ারের মতো। কোন লোক তার চোখে পড়লে সে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে আভূমি মাথা নোয়াত। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হত বন থেকে কী করে বের হওয়া যায় তাহলে সে কোন কথা না বলে হাত দিয়ে পথ দেখিয়ে দিত, লোকটির উদ্দেশে আরও একবার আভূমি নত হত এবং নিজের কুটিরে ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিত। আট বছরের মধ্যে লোকে তাকে হামেশাই দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তার গলার আওয়াজ কেউ কখনও শোনে নি। বৌ ও ছেলেমেয়েরা তার কাছে আসত; সে তাদের কাছ থেকে খাবার দাবার ও জামাকাপড় নিত, অন্যান্য লোক দেখলে যেমন করত তেমনি তাদের উদ্দেশেও আভূমি মাথা নোয়াত, আবার অন্যদের সঙ্গে যেমন তেমনি তাদের সঙ্গেও একটি কথাও বলত না।

যে বছর সন্ন্যাসীদের আশ্রম ভাঙ্গা হতে থাকে সে বারে সে মারা যায়। তার মৃত্যু হয় এই ভাবে:

জেলা দারোগা দলবল নিয়ে বনে এসে হাজির। সেখানে তারা দেখতে পেল আন্তিপা তার কুটিরের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে নীরবে প্রার্থনা করছে।

'ওহে!' দারোগা হাঁক পাড়লেন। 'বেরিয়ে এসো! তোমার ডেরা ভাঙব!..' কিন্তু আন্‌তিপা তাঁর কথায় কান দিল না।

দারোগা কতই না চিৎকার-চেঁচামেচি করলেন, প্রৌঢ় তার উত্তরে একটি কথাও বলল না। দারোগা আন্‌তিপাকে কুটির থেকে টেনে বার করার জন্য তাঁর লোকজনকে হুকুম দিলেন। কিন্তু প্রৌঢ় তাদের লক্ষ্য না করে আগের মতোই সোৎসাহে ও অক্লান্ত ভাবে প্রার্থনা করে যাচ্ছে দেখে তারা তার মনোবলের সামনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, দারোগার কথা শুনল না। দারোগা তখন কুটির ভাঙার হুকুম দিলেন, প্রার্থনাকারীর গায়ে আঘাত লাগতে পারে এই ভয়ে তারা সন্তর্পণে চাল খসাতে লাগল।

আন্‌তিপার মাথার ওপর কুঠার ঠকঠক করে চলছে, তক্তাগুলো মড়মড় করে মাটিতে পড়ছে, বন জুড়ে আঘাতের ফাঁপা প্রতিধ্বনি উঠছে, আওয়াজে সচকিত পাখির দল কুটিরের চারধারে ইতস্তত উড়ছে, গাছের পাতায় কাঁপন ধরেছে। প্রৌঢ় যেন কিছুই দেখছে না কিছুই শুনছে না — এই ভাবে প্রার্থনা করে চলেছে... ওরা কুটিরের দেয়ালের সারি সারি গুঁড়ি গড়িয়ে ফেলে দিতে লাগল, কিন্তু গৃহকর্তা আগের মতোই এক ঠায় নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল শেষ গুঁড়িগুলো এক পাশে গড়িয়ে ফেলে দেওয়ার পর দারোগা নিজে যখন এগিয়ে এসে আন্‌তিপার চুলের মুঠি ধরলেন তখন সে আকাশের দিকে চোখ তুলে মৃদু স্বরে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলল:

'দয়াময় প্রভু... এদের ক্ষমা করো!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, প্রাণ ত্যাগ করল।

এই ঘটনা যখন ঘটে তখন আন্‌তিপার বড় ছেলে ইয়াকভের বয়স — তেইশ, আর ছোট ছেলে তেরেন্‌তির — আঠারো। সুদর্শন ও বলিষ্ঠ গড়নের ইয়াকভ্ উঠতি বয়সেই গাঁয়ে পাষণ্ড নামে পরিচিত হয়, আর বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় সারা তল্লাটের পয়লা নম্বর উচ্ছৃঙ্খল ও দাঙ্গাবাজ। তার মা, গাঁয়ের মোড়ল, পাড়া-পড়শী — সকলেরই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। ওকে হাজতে পোরা হয়, বেত মারা হয়, বিনা বিচারে অমনি-অমনি মারধোরও করা হয়, কিন্তু ইয়াকভ্ কিছুতেই বশ মানে না। আচারনিষ্ঠ সনাতনপন্থীরা ছিল বিবরবাসী জীবের মতো বিষয়বুদ্ধিতে টনটনে, যাবতীয় পরিবর্তনের তারা বেজায় বিরোধী, সনাতন ধর্মের অনুশাসন তারা অন্ধের মতো মেনে চলত। গাঁয়ে এদের মধ্যে বসবাস করা ইয়াকভের পক্ষে ক্রমেই

দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। ইয়াকভ্ ধূমপান করত, ভোদকা খেত, জার্মান জামাকাপড় পরত, উপাসনায় ও নামসংকীর্তনে যোগ দিত না। রাশভারী লোকেরা বাবার কথা তুলে ওকে উপদেশ দিতে এলে ও টিটকারি দিয়ে বলত:

'ভক্তিভাজন গুরুজনেরা, একটু সবুর করুন। সব কিছুরই সীমা আছে। পাপের ভার পূর্ণ হোক — তখন আমিও অনুতাপ করব! এখনও সে সময় আসে নি। বাপের কথা বলে আমাকে নিন্দা করে কাজ নেই — পঞ্চাশ বছর পাপ করে অনুতাপ করেছে মাত্তর আট বছর!.. আমার পাপ ত এখন পাখির ছানার রোঁয়ার মতো, আগে দাঁড়কাকের গায়ের পালকের মতো গজগজে হয়ে উঠুক তবেই এ শর্মা অনুতাপ করবে।'

'পাপিষ্ঠ!' লোকে ইয়াকভ্ লুনিয়োভ সম্পর্কে বলত। তারা ওকে ঘেন্না করত, ভয় করত। বাবা মারা যাওয়ার বছর দুয়েক পর ইয়াকভ্ বিয়ে করল। তিরিশ বছরের মেহনতে বাবা যে পাকাপোক্ত গেরস্থালি গড়ে তুলেছিল ইয়াকভের উচ্ছৃঙখলতায় তার গোড়াসুদ্ধ ধ্বসে পড়ল, ফলে তার নিজের গাঁয়ের কেউ আর ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। দূরের এক গ্রাম থেকে সে এক সুন্দরী অনাথাকে নিয়ে এলো, বিয়ের উৎসব করতে গিয়ে বাবার মৌমাছি চাষের জায়গাটা বেচে দিল। ভাই তেরেন্তি — কুঁজো, তার হাত দুটো লটপটে। সে গোবেচারি, মুখচোরা স্বভাবের। ইয়াকভের জীবনযাত্রায় সে কোন অন্তরায় ছিল না। অসুস্থ মা চুল্লীর ওপাড় বিছানায় পড়ে থাকত আর সেখান থেকে খনখনে গলায় শাপ-শাপান্ত করত:

'হতভাগা!.. নিজের আত্মাকেই যে কষ্ট দিচ্ছিস!.. ভেবে দ্যাখ কী করছিস!..'

'উতলা হয়ো না, মা!' ইয়াকভ্ উত্তর দিত... 'বাবা আমার হয়ে ভগবানের কাছে বলবেন...'

প্রথম দিকে প্রায় বছর খানেক ইয়াকভ্ শান্তশিষ্ট ভাবে বৌয়ের সঙ্গে ঘর করল, এমনকি কাজ করতেও শুরু করল, কিন্তু তারপর আবার উচ্ছৃঙখলতায় গা ছেড়ে দিল, মাসের পর মাস সে বাড়ি থেকে বেপাত্তা, বৌয়ের কাছে ফিরে আসত শতচ্ছিন্ন বেশে, বিধ্বস্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায়... ইয়াকভের মা মারা গেল; শ্রাদ্ধশান্তির দিনে মার শোকে নেশাগ্রস্ত ইয়াকভ্ তার পুরনো শত্রু মোড়লকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিল, ফলে তার সশ্রম কারাদণ্ড হল। মেয়াদ কাটিয়ে সে থমথমে চেহারা ও চোখে মুখে প্রতিহিংসা নিয়ে ন্যাড়া মাথায়

আবার গ্রামে এসে হাজির হল। গাঁয়ের লোকেরা এবার তাকে আরও বেশি ঘেন্না করতে লাগল, ইয়াকভের পরিবারের লোকজনের ওপরও, বিশেষ করে গোবেচারি কুঁজো তেরেন্তির ওপর তাদের রাগ গিয়ে পড়ল। তেরেন্তি ছোটবেলা থেকেই গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের হাসির খোরাক ছিল। তারা ইয়াকভ্কে দাগী আসামী ও ডাকাত নাম দিল, তেরেন্তিকে বলতে লাগল কদাকার ও নরপিশাচ। তেরেন্তি গালিগালাজ ও হাসিঠাট্টার জবাব না দিয়ে মুখ বুঁজে থাকত। ইয়াকভ্ কিন্তু সকলকে সরাসরি হুমকি দিত এই বলে:

'বটে! সবুর কর!.. তোমাদের মজাটা টের পাওয়াব!'

গ্রামে যখন অগ্নিকাণ্ড হল তখন তার বয়স ছিল বছর চল্লিশেক; আগুন লাগানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন যেতে হল।

অগ্নিকাণ্ডের সময় ইয়াকভের বৌয়ের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ইয়াকভের দশ বছরের ছেলে ইলিয়া শক্তসমর্থ, তার চোখের তারা কালো, ছেলেটা গম্ভীর প্রকৃতির। এদের দেখাশোনার ভার গিয়ে পড়ল তেরেন্তির হাতে। ছেলেটা রাস্তায় বের হলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাকে তাড়া করত, তার দিকে ঢিল ছুঁড়ত আর বড়রা তাকে দেখে বলত:

'উঃ, শয়তানের ছা! দাগীর গুষ্টি!.. মরেও না ছাই!..'

কাজে অপারক তেরেন্তি অগ্নিকাণ্ডের আগে পর্যন্ত আলকাতরা, ছুঁচসুতো আর নানা রকম টুকিটাকি জিনিস ফিরি করে বেড়াত, কিন্তু আগুনে গাঁয়ের অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুনিয়োভদের কুঁড়েঘর এবং তেরেন্তির ব্যবসার মালপত্রও যায়, ফলে অগ্নিকাণ্ডের পর লুনিয়োভদের থাকার মধ্যে কেবল একটা ঘোড়া ও তেতাল্লিশটি রুবল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গ্রামে কোন কিছু অবলম্বন করে কিছুতেই বাঁচা সম্ভব নয় দেখে মাসে আধ রুবলের বিনিময়ে সে তার ভাইয়ের বৌকে এক নিঃসঙ্গ মহিলার হেফাজতে দিল, পুরনো একটা ঘোড়ার গাড়ি কিনে ভাইপোকে তাতে চাপাল। লুনিয়োভদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় পেত্রুখা ফিলিমোনভ জেলার সদরে কোন এক সরাইখানায় কাজ করত। সে ওকে জীবনধারনের জন্য কিছু করে দিতে পারবে এই আশায় তেরেন্তি সদরে যাবে বলে ঠিক করল।

চোরের মতো, চুপিচুপি, রাতের বেলায় তেরেন্তি সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়ার গাড়ি চালাতে চালাতে সে বাছুরের

মতো বড় বড় কালো দুটি চোখ মেলে বার বার পিছু ফিরে তাকাতে লাগল। ঘোড়া পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল, ইলিয়া খড়ের গাদার মধ্যে ডুবে ছিল, গাড়ির ঝাঁকানিতে সে শিশুর গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

মাঝরাতে নেকড়ের আর্তনাদের মতো একটা ভয়ানক ও অদ্ভুত আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। ফুটফুটে রাত, গাড়ি বনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘোড়াটা তার পাশে দাঁড়িয়ে শিশির ভেজা ঘাস চিবুতে চিবুতে নাক ঝাড়া দিচ্ছিল। মাঠের মধ্যে অনেকখানি দূরে বিশাল একটি মাত্র পাইন গাছ এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাকে বন থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেটা সন্ধানী চোখ মেলে উদ্বিগ্ন হয়ে কাকাকে খুঁজতে লাগল, রাতের নীরবতার মাঝখানে থেকে থেকে ঘোড়ার মাটিতে পা ঠোকার ভাঙা ভাঙা আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, ভেসে আসছিল ভারী নিশ্বাস ফেলার মতো তার নাকের ঘোঁৎ-ঘোঁতানি, সেই সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এসে ইলিয়াকে আতঙ্কিত করে তুলছিল বুক ভাঙা দুর্বোধ্য একটা কাঁপা কাঁপা আওয়াজ।

'কা-কা!' সে মৃদু স্বরে ডাকল।

'অ্যাঁ?' তেরেন্তি চটপট সাড়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটাও থেমে গেল।

'কোথায় তুমি?'

'এখানে... ঘুমিয়ে পড়।'

ইলিয়া দেখতে পেল মাটি থেকে উপড়ে ফেলা গুঁড়ির কালো ছায়ার মতো তার কাকা বনের ধারে একটা ঢিবির ওপর বসে আছে।

'আমার ভয় করছে,' ইলিয়া বলল।

'ভয়ের কী আছে?.. এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

'কিসের যেন গোঁগোঁ ডাক শোনা যাচ্ছে...'

'ঘুমের ঘোরে শুনেছিস...'

'ভগবানের দিব্যি, ডাকছে...'

'তা, নেকড়ে-টেকড়ে হবে... দূরে আছে... ঘুমো।'

ইলিয়ার কিন্তু ঘুম এলো না। ভয়াবহ রকমের নীরবতা। কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজতে থাকে সেই করুণ আর্তনাদ। জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করার পর সে দেখতে পেল তার কাকা তাকাচ্ছে সেই দিকে যেখানে পাহাড়ের ওপরে, দূরে বনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ চুড়োওয়ালা সাদা গির্জা আর তার ওপর জ্বলজ্বল করছে বিরাট, গোল চাঁদ। ইলিয়া চিনতে পারল

এটা হল রমদানভ্ গির্জা, এখান থেকে দুভার্স্ট দূরে, বনজঙ্গলের মাঝখানে, খাতের ওপর — তাদের কিতেজ্‌নায়া গ্রাম।

'আমরা বেশি দূর যাই নি,' চিন্তিত ভাবে ও বলল।

'কী?' কাকা জিজ্ঞেস করল।

'বলছি, আরও এগিয়ে গেলে হত... ওখান থেকে আবার কেউ আসে যদি...'

ইলিয়া বিরূপ ভঙ্গিতে গ্রামের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল।

'সবুর কর, যাব'খন!' কাকা বিড়বিড় করে বলল।

আবার চুপচাপ। গাড়ির সামনের দিকে কনুইয়ে ভর দিয়ে ইলিয়াও দেখতে লাগল সেই দিকে, যে দিকে তার কাকা তাকিয়ে ছিল। বনের ঘন, কালো অন্ধকারে গ্রাম দেখা যায় না, কিন্তু তার মনে হল সে যেন গ্রামটাকে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে গ্রামের সবগুলো কুটির ও লোকজন, রাস্তার মাঝখানে, কুয়োর ধারে সেই পুরনো উইলো গাছটা। গাছের শেকড়ের পাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তার বাবা, গায়ের জামা ফালা ফালা, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, আদুল বুক সামনে বেরিয়ে এসেছে, আর মাথাটা যেন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে গেঁথে আছে। সে অনড় হয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে, ভয়ানক জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে চাষীদের দিকে। ওরা সংখ্যায় অনেক, সকলে চেঁচাচ্ছে, গালিগালাজ করছে। এই স্মৃতি ইলিয়ার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল, ওর গলার ভেতরে কেমন একটা দলা ঠেলে উঠতে লাগল। ইলিয়া বুঝতে পারল ও এখনই কেঁদে ফেলবে, কিন্তু কাকাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার ইচ্ছে তার ছিল না, তাই সে ছোট শরীরটাকে শক্ত করে কুঁকড়ে নিজেকে সামলে নিল।

হঠাৎ বাতাসে আবার মৃদু গোঁগোঁ আওয়াজ ভেসে এলো। প্রথমে কে যেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ফুঁপিয়ে উঠল, তারপর আর চাপতে না পেরে করুণ আর্তনাদ করে উঠল:

'উঁ-উঁ-উঁ...'

ইলিয়া আতঙ্কে শিউরে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। শব্দটা সমানে কাঁপতে কাঁপতে তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

'কাকা! তুমি গোঁগোঁ করছ না কি?' ইলিয়া চেঁচিয়ে বলল।

তেরেন্‌তি উত্তর দিল না, নড়ল না। ইলিয়া তখন লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে কাকার কাছে দৌড়ে গেল, তার পায়ের ওপর পড়ল, দুপা আঁকড়ে ধরে

সেও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফোঁপানির মধ্যে সে শুনতে পেল কাকার গলা:

'আমাদের আর কিছু রাখল না... হা ভগবান! আমরা এখন কোথায় যাব?'

ইলিয়া চোখের জল ফেলতে ফেলতে ধরা গলায় বলল:

'দাঁড়াও... বড় হয়ে আমি ওদের দেখে নেব!..'

কাঁদতে কাঁদতে হয়রান হয়ে সে ঝিমুতে লাগল। কাকা ওকে কোলে করে তুলে নিয়ে গাড়িতে রেখে দিল, নিজে ফিরে গিয়ে একটা কুকুর ছানার মতো আবার টেনে টেনে করুণ আর্তনাদ শুরু করে দিল।

কী ভাবে সে শহরে এলো তা ইলিয়ার মনে আছে। খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই সে সামনে দেখতে পেল এক চওড়া, ঘোলাটে নদী, আর তার ওপারে, উঁচু পাহাড়ের ওপর লাল ও সবুজ রঙের চালে ছাওয়া এক গাদা ঘর-বাড়ি এবং ঘন বাগ-বাগিচা। বাড়িগুলো সুন্দর, ঘন দঙ্গল বেঁধে থাকে থাকে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে, পাহাড়ের একেবারে চুড়োয় চলে গেছে সেগুলোর সমান সারি, আর সেখান থেকে যেন তারা গর্বভরে নদীর এপারে তাকাচ্ছে। গির্জার সোনালি ক্রস ও মাথাগুলো ছাদ ছাড়িয়ে আকাশের গহনে এসে বিঁধছে। এই মাত্র সূর্য উঠল; তার তির্যক রশ্মি ঘর-বাড়ির জানলায় প্রতিফলিত হল, গোটা শহর উজ্জ্বল রঙে জ্বলতে লাগল, সোনালি আভায় ঝলমল করতে লাগল।

'ওঃ, কী দারুণ!' বিস্ফারিত দুচোখ মেলে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠল, পরক্ষণেই মৌন হর্ষাবেশে আবিষ্ট হয়ে পড়ল। তারপর একটা ভাবনা ওর মনকে অস্থির করে তুলল: তার মতো বুনো চেহারার, বিতিকিচ্ছিরি রকমের ধোকড়া প্যান্ট পরনে একটি ছেলে আর তার কুঁজো, কদাকার কাকাটি এখানে কোথায় থাকবে? এই ঝকঝকে-তকতকে, ঐশ্বর্যশালী, স্বর্ণোজ্জ্বল, বিশাল শহরে কি ওদের ঢুকতে দেওয়া হবে? ওর মনে হল ওদের ঘোড়ার গাড়িটার এখানে, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকার একমাত্র কারণ এই যে গরিব লোকজনকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কাকা সম্ভবত ঢোকার অনুমতি চাইতে গেল।

ইলিয়া উতলা হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকাকে খুঁজতে লাগল। তাদের গাড়ির চার দিকে দাঁড়িয়ে ছিল আরও বহু গাড়ি; সেগুলোর কোন কোনটাতে উঁকি মারছে দুধের কেঁড়ে বসানো কাঠের খোপ, কোন কোনটায়

হাঁস মুরগীর ঝুড়ি, শশা, পেঁয়াজ, ফলমূলের ঝুড়ি, আলুর বস্তা। গাড়িতে ও গাড়ির পাশে চাষী ও চাষী-বৌরা — কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে — তারা একেবারে বিশেষ ধরনের। তারা কথা বলছিল চেঁচিয়ে, স্পষ্ট করে, নীল রঙের ধোকড়া জামা কাপড়ের বদলে তাদের গায়ে রঙচঙে ছিটের আর লাল টকটকে সুতিকাপড়ের পোশাক। প্রায় সবারই পায়ে বুটজুতো; কোমরের এক পাশে তলোয়ার ঝুলিয়ে একটা লোক ওদের আশে পাশে পায়চারী করা সত্ত্বেও ওরা তাকে ভয় ত করছিলই না, এমনকি মাথা নুইয়ে নমস্কার পর্যন্ত করছিল না। এটা ইলিয়ার খুব ভালো লাগল। গাড়িতে বসে বসে সে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত জীবন্ত ছবি দেখতে লাগল আর মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগল কবে সেও বুটজুতো আর সুতিকাপড়ের জামা পরবে।

দূরে, চাষীদের মধ্যে তেরেন্‌তি কাকাকে দেখা গেল। গভীর বালুর ভেতর দিয়ে গটমট করে পা ঠেলে ঠেলে সে আসছে; তার মাথাটা বেশ উঁচুতে তোলা, মুখে খুশি খুশি ভাব, দূর থেকেই কী যেন দেখাতে দেখাতে ইলিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে সে হাসল।

'ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন ইলিয়া! খুড়োর খোঁজ একেবারে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম রে... নে, এখন এটা চিবো দেখি!..'

এই বলে সে ইলিয়াকে একটা চাকা-বিস্কুট দিল।

ইলিয়া বলতে গেলে গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে সেটাকে নিয়ে জামার ভেতর গুঁজে রাখল, উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না নাকি?'

'এখন ঢুকতে দেবে... খেয়া নৌকো এলেই যাওয়া যাবে।'

'আমরাও যাব?'

'নয়ত কী? আমরাও যাব!'

'উঃ! আর আমি ভাবছিলাম আমাদের ঢুকতে দেবে না... তা ওখানে আমরা কোথায় থাকব?'

'সেটা বলতে পারছি না...'

'ঐ বিরাট, লাল বাড়িটাতে যদি হয়...'

'ওটা ব্যারাক!.. ওখানে সৈন্যরা থাকে...'

'তাহলে ওটাতে নয় — এই এটাতে!'

'ওঃ, বলিস কী! অত উঁচুতে আমাদের উঠতে হচ্ছে না!'

'তাতে কী আছে!' ইলিয়া আস্থার সঙ্গে বলল। 'বয়ে বয়ে উঠে যাব!..'

'বেড়ে বলেছিস!' তেরেন্তি কাকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর আবার যেন কোথায় চলে গেল।

তারা আশ্রয় পেল শহরের প্রান্তে, বাজারের চত্বরের কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড ছাইরঙা বাড়িতে। তার দেয়ালের চার দিক জুড়ে নানা ধরনের ঘর আর চালা গাঁথা, কোন কোনটি — একটু নতুন, বাকিগুলো এই দালানটির মতোই নোংরা, ছাইরঙা। এ বাড়ির দরজা-জানলাগুলো ছিল বাঁকাচোরা, সর্বত্র ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ উঠত। চালা, বেড়া, গেট — সব এ ওর গায়ে এসে পড়ে একাকার হয়ে একটা আধপচা কাঠের স্তূপ গড়ে তুলেছে। জানলার শার্সি এত পুরনো যে ঘসা ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে, দালানের সামনের অংশের কয়েকটি গুঁড়িকাঠ বেরিয়ে এসেছে, আর তাতে বাড়িটা দেখতে হয়েছে তার মালিকের মতো। মালিক বাড়িতে সরাইখানা চালাত। সেও জরাজীর্ণ আর ছাইরঙা। তার লোলচর্ম মুখের ওপর চোখজোড়া — জানলার ঘসা কাচের মতো। সে একটা মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটত; সামনের দিকে বেরিয়ে আসা ভুঁড়িটা বয়ে বেড়ান তার পক্ষে সম্ভবত কঠিন।

এই বাড়িতে জীবনযাত্রার প্রথম দিকে ইলিয়া সর্বত্র উঠে ঘুরে দেখে, বাড়ির ভেতরের সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। বাড়ির অদ্ভুত ধারণক্ষমতায় সে অবাক হয়ে যায়। বাড়িটা লোকজনে এত ঠাসাঠাসি ছিল যে মনে হত গোটা কিতেজ্নায়া গ্রামে যে পরিমাণ লোক আছে এখানে লোকের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। দুটো তলাতেই সরাইখানা, সব সময় লোকে গিজগিজ করছে; চিলেকোঠায় থাকত কোথাকার কয়েকটা মাতাল মেয়েমানুষ। তাদের একজনের ডাক নাম ছিল মাতিৎসা। তার চুল কালো, দেহ বিরাট, গলার আওয়াজ হেঁড়ে। তার রাগী-রাগী কালো চোখজোড়া ইলিয়াকে ভয় পাইয়ে দিত। মাটির নীচের ঘরগুলোতে চলনশক্তিহীন অসুস্থ স্ত্রী আর বছর সাতেকের মেয়ে নিয়ে থাকত মুচি পেরফিশ্কা, ইয়েরেমেই দাদু — তার জীবিকা ছিল রাস্তার ছেঁড়া কাগজ-নেকড়া কুড়ানো; থাকত পলরোতায়া নামে এক হাড় জিরজিরে ভিখিরি বুড়ি — গলাবাজিতে ওস্তাদ; আর মাকার স্তেপানিচ নামে এক গাড়োয়ান — লোকটা মাঝবয়সী, কারও সাতে-পাঁচে নেই, মুখচোরা। উঠোনের এক কোনায় কামারশালা; সকাল থেকে সন্ধে অবধি তাতে আগুন জ্বলত, গাড়ির চাকার বেড় আর ঘোড়ার নাল লাগান হত, হাতুড়ির ঠকঠক

আওয়াজ চলত; দীর্ঘদেহী, পেশল কামার সাভেল গম্ভীর, বিষণ্ণ গলায় গান গাইত। মাঝে মাঝে সাভেলের বৌকেও কামারশালায় দেখা যেত। সে ছিল ছোটখাটো, মোটাসোটা গড়নের মেয়েমানুষ, তার চুল কটা, চোখ নীল। সে সব সময় সাদা রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখত। কামারশালার কালো খোঁড়লে এই সাদা মাথা দেখতে অদ্ভুত লাগত। তার হাসিতে রুপো ঝরে পড়ত, আর সাভেল তার প্রতিধ্বনি করত অট্টহাসিতে, ঠিক যেন হাতুড়ির ঘা মারছে। তবে বেশির ভাগ সময়ই সে তার বৌয়ের হাসির উত্তরে গর্জন করত।

বাড়ির প্রতিটি রন্ধ্রে মানুষের বাস, সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত চিৎকার-চেঁচামেচি আর কোলাহলে বাড়ি কাঁপতে থাকত — তার ভেতরে ঠিক মরচে ধরা পুরনো একটা কড়াইয়ে কী যেন টগবগ করছে, সেদ্ধ হচ্ছে। সন্ধেবেলায় সব লোক তাদের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির গেটের কাছে উঠোনে ও বেঞ্চে জড় হত। মুচি পেরফিশ্‌কা হারমোনিয়াম বাজাত, সাভেল গুনগুন করে গান ভাঁজত, আর মাতিৎসা — পেটে এক আধফোঁটা পড়লে — খুবই করুণ সুরের বিশেষ কী একটা গান গাইত, সে গানের কথা কারও বোঝার সাধ্য ছিল না; সে গাইত আর কী সব বলে অঝোরে কাঁদত।

উঠোনের কোন এক কোণে ইয়েরেমেই দাদুর কাছে এসে জড় হত বাড়ির যত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তার চার ধারে গোল হয়ে বসে ওরা আবদার ধরত:

'ও দাদু! একটা রূপকথা বল না!..'

দাদু ঘায়ে দগদগে লাল লাল চোখ মেলে তাদের দিকে তাকাত, তার দুচোখ থেকে মুখের বলিরেখা বয়ে অবিরাম ঝরতে থাকে ঘোলাটে জলের ধারা; বাদামী রঙের পুরনো টুপিটা মাথার ওপর জুত করে এঁটে সে উঁচু গলায় কাঁপা কাঁপা সুরে বলতে শুরু করত:

'সেই কোন্ এক রাজ্যির, কোন এক দেশের কথা। ভগবান সবই দেখতে পান কিনা! — তাই কোন মা-বাপের পাপের ফলে তিনি তাদের যে সাজা দিলেন তাতে ওদের ঘরে বেজায় পাষণ্ড একটা ছেলে জন্মাল...'

ফোকলা মুখের কালো হাঁ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ইয়েরেমেই দাদুর সাদা লম্বা দাড়িও কাঁপতে থাকে, দুলতে থাকে, সেই সঙ্গে দুলতে থাকে তার মাথা, দুই গালের বলিরেখা বয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

'আর সেই পাষণ্ড ছেলেটার বুকের পাটাও বড় কম ছিল না: প্রভু

খিস্টকে সে মানত না, মা-মেরীকে ভালোবাসত না, গির্জের পাশ দিয়ে চলে যেত — মাথা নোয়াত না, বাপ-মার কথা শুনত না...'

বাচ্চারা বুড়োর মিহি গলা শুনত আর চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকাত।

সকলের চেয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনত বার-কর্মচারী পেত্রুখার ছেলে ইয়াকভ্। ছেলেটা হাড় জিরজিরে, তার মাথার চুল বাদামী, নাক চোখা, তার লিকলিকে ঘাড়ের ওপর বিরাট মাথা। সে যখন দৌড়ুত তখন তার মাথাটা এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে এমন লট্পট্ করত যে মনে হত এই বুঝি ছিঁড়ে পড়ল। তার চোখ দুটিও বড় বড় আর ছটফটে। সেগুলো সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে সব জিনিসের ওপর পিছলে পিছলে যেত, মনে হত বুঝি কোন কিছুর ওপর স্থির হতে ভয় পাচ্ছে, আবার স্থির হলে অদ্ভুত রকম বিস্ফারিত হয়ে যেত — তাতে তার মুখের হাবভাব ভেড়ার মতো নিরীহ নিরীহ দেখাত। বাচ্চাদের মধ্যে তাকে আলাদা করে চেনা যেত তার পাতলা গড়নের রক্তশূন্য মুখ ও টেকসই ধরনের ফিটফাট পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য। তার সঙ্গে ইলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাতির হয়ে গেল। আলাপের প্রথম দিনেই ইয়াকভ্ নতুন বন্ধুটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল:

'তোদের গাঁয়ে কি তুকতাক জানা লোক অনেক?'

'আছে,' ইলিয়া উত্তর দিল। 'আমাদের পড়শী গুনিন ছিল।'

'তার চুল কি লালচে কটা?' ফিসফিস করে সে প্রশ্ন করল।

'সাদা... ওদের সকলেরই চুল সাদা...'

'সাদা চুল হলে কিছু না... যাদের চুল সাদা — তারা ভালো। কিন্তু লালচে কটা — ওরে ব্বাপ্স! ওরা রক্ত খায়...'

উঠোনের সবচেয়ে ভালো ও আরামের একটা কোণে আবর্জনাস্তূপের ওধারে একটা ঝোপের নীচে ওরা বসে ছিল, ঝোপের পাশেই বিরাট একটা পুরনো লিনডেন গাছ। চালাঘর আর বাড়ির মাঝখানের সরু ফাঁক দিয়ে গলে এখানে ঢোকা যায়; জায়গাটা শান্ত, মাথার ওপর আকাশ আর তিনটে জানলাসুদ্ধ বাড়ির দেয়াল — যার দুটোই আবার পেরেক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা — এ ছাড়া কোণটা থেকে আর কিছু চোখে পড়ে না। লিনডেন গাছের ডালে ডালে চড়াই পাখিরা কিচিরমিচির করছে, মাটিতে, গাছের গোড়ায় বসে ছেলে দুটো তাদের খুশিমতো এটা ওটা নিয়ে কথাবার্তা বলে চলছে।

সারা দিন ধরে বিরাট, বিচিত্র বর্ণের কী একটা চিৎকার-চেঁচামেচি আর কোলাহল করতে করতে ইলিয়ার চোখের সামনে ঘুরতে থাকত, তার চোখ ধাঁধিয়ে দিত, কানে তালা ধরিয়ে দিত। এই জীবনের টগবগে হৈ-হট্টগোলে প্রথম প্রথম সে বিহ্বল হয়ে যায়, কেমন যেন বোকা বনে যায়। তেরেন্তি কাকা ঘামতে ঘামতে জবজবে হয়ে সরাইখানার যে টেবিলের ওপর বাসন ধুত তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইলিয়া দেখত লোকজনের আসা-যাওয়া, তাদের পানাহার, চিৎকার-চেঁচামেচি, চুমোচুমি, মারামারি, গান গাওয়া। তাদের চার দিকে ভাসে তামাকের ধোঁয়া আর সে ধোঁয়ার মধ্যে তারা খ্যাপার মতো মেতে ওঠে...

'অ্যাই-অ্যাই!' কাকা তার কুঁজো পিঠ ঝাঁকিয়ে, গেলাসে গেলাসে অবিরাম টুংটাং আওয়াজ তুলতে তুলতে বলল। 'তুই এখানে কী করছিস? গেলি এখান থেকে! মালিক দেখতে পেলে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে!..'

'ওহো — দ্যাখ দেখি কান্ড!' এটা ছিল ইলিয়ার মুখের লবজ। মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করতে করতে সরাইখানার গোলমালে বিহ্বল ইলিয়া উঠোনের দিকে চলল। উঠোনে সাভেল হাতুড়ি পিটাচ্ছিল আর তার কাজের লোকটাকে গালাগাল করছিল, মাটির তলার ঘর থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসছিল মুচি পেরফিশ্‌কার আমুদে গান, ওপর থেকে ঝরে পড়ছিল মাতাল মেয়েমানুষগুলোর গালিগালাজ ও চিৎকার। সাভেলের ছেলে পাভেল দুপায়ের মাঝখানে একটা লাঠি নিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটাতে ছুটাতে তর্জন-গর্জন করছিল:

'হেট্‌, হেট্‌! চল বদমাশ!'

ওর গোলগাল উত্তেজিত মুখটি আগাগোড়া নোংরা ও ঝুলকালিতে মাখা; কপাল ফুলে গেছে; গায়ের জামা ছেঁড়া আর তার অসংখ্য ফুটোফাটা ভেদ করে চোখে পড়ে শক্তসমর্থ শরীর। পাভেল এ বাড়ির সবচেয়ে বড় ডানপিটে ও মারপিটে ওস্তাদ ছেলে। ইতিমধ্যেই সে জড়সড় স্বভাবের ইলিয়াকে দুবার কষে মার দিয়েছে। ইলিয়া কাঁদতে কাঁদতে এসে কাকার কাছে নালিশ করলে কাকা অসহায়ের ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে বলল:

'কী আর করা যাবে? সহ্য করতে হবে!..'

'দাঁড়াও না, আমি ওকে অ্যায়সা ঝাড় দেব না!' চোখের জল ফেলতে ইলিয়া বলল।

'অমন কাজও করিস না!' কাকা কঠিন স্বরে বলল। 'সেটা কোন মতেই ঠিক হবে না!..'

'ও কোথাকার কে এসেছে?'

'ও!.. ও হল এখানকার... নিজেদের... আর তুই হলি গিয়ে বাইরের...'

ইলিয়া পাভেলের উদ্দেশ্যে তর্জন-গর্জন করতে লাগল, তাতে কাকা রেগে ওর ওপর চেঁচামেচি করল। সচরাচর কাকা এমন করে না। ইলিয়া তখন ভাসা ভাসা এটাই অনুভব করল যে 'এখানকার' ছেলেদের সমান হতে চাওয়া তার পক্ষে ঠিক নয়, তাই সে পাভেলের ওপর আক্রোশ চেপে রেখে ইয়াকভের সঙ্গে আরও বেশি করে মেলামেশা শুরু করল।

ইয়াকভের আচার-আচরণ সংযত। সে কখনও কারও সঙ্গে মারামারি করত না, এমনকি ক্বচিৎ গলা চড়াত। সে খেলাধুলা বিশেষ করত না, কিন্তু বড়লোকদের উঠোনে এবং শহরের পার্কে বাচ্চারা কী কী খেলা খেলে তাই নিয়ে কথা বলতে সে ভালোবাসত। বাড়ির সব ছেলেমেয়ের মধ্যে ইলিয়া ছাড়া আর যার সঙ্গে ইয়াকভের ভাব ছিল সে হল মুচি পেরফিশ্‌কার সাত বছরের মেয়ে মাশা। মাশা মেয়েটি ছিপছিপে, তার মুখ কালিঝুলি আর নোংরায় মাখামাখি। এক রাশ কালো কোঁকড়া চুলে ভর্তি তার ছোট্ট মাথাটি সকাল থেকে সন্ধে অবধি উঠোনে উঁকিঝুঁকি মারত। ওর মাও সব সময় মাটির তলার ঘরের দরজার কাছে বসে থাকত। তার গড়ন ছিল দীর্ঘ, পিঠে ঝুলত মোটা বিনুনি। সে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে সব সময় সেলাই করত। যখন মেয়েকে দেখার জন্য মাথা ওঠাত তখন ইলিয়া তার মুখ দেখতে পেত। মুখটা ভারী, নীলচে, মড়ার মতো স্থির, এই অপ্রীতিকর মুখের ওপর ভালোমানুষী কালো চোখ দুটিও স্থির। সে কখনও কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলত না, এমনকি নিজের মেয়েকেও ডাকত ইশারায়, কেবল মাঝে মাঝে — কদাচিৎ — ভাঙা ভাঙা, দম আটকানো গলায় চেঁচাত:

'মাশা!'

এই মহিলার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা প্রথম প্রথম ইলিয়ার ভালো লাগত, কিন্তু যখন জানতে পারল যে আজ তিন বছর হল মহিলার পায়ে কোন শক্তি নেই এবং সে শিগ্‌গিরই মারা যাবে তখন থেকে ইলিয়া তাকে ভয় করতে শুরু করল।

একবার ইলিয়া যখন তার কাছ ঘেঁসে যাচ্ছিল তখন সে হাত বাড়িয়ে তার জামা চেপে ধরল, ভয়ে মরমর ছেলেটিকে কাছে টেনে নিল।

'দোহাই তোর,' সে বলল, 'মাশার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস না!..'

কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল; কেন যেন তার দম আটকে আসছিল।

'লক্ষ্মীটি আমার, খারাপ ব্যবহার করিস না!..'

বলে, করুণ দৃষ্টিতে ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে তাকে ছেড়ে দিল। সে দিন থেকে ইলিয়া আর ইয়াকভ্ মুচির মেয়েটির ভালোমতো যত্ন নিতে লাগল, তাদের চেষ্টা হল জীবনের নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করা। অনুরোধটা যে বয়স্কদের একজনের কাছ থেকে এসেছে এই কথা ভেবে ইলিয়া তার দাম না দিয়ে পারল না, কেননা আর সব বড়রা কেবল হুকুম দিত, ছোটদের মারধোর করত। গাড়োয়ান মাকার যখন তার এক্কাগাড়ি ধুত তখন যদি বাচ্চারা তার কাছাকাছি আসত, তাহলে সে তাদের গায়ে লাথি মারত, ভিজে নেকড়া ছেলেদের মুখে ছুঁড়ে মারত। বিনা কাজে কেউ সাভেলের কামারশালায় উঁকিঝুঁকি মারতে গেলে সাভেল রেগে যেত, বাচ্চাদের গায়ে কয়লার বস্তা ছুঁড়ে দিত। পেরফিশ্কার জানলার সামনে কেউ এসে দাঁড়িয়ে পড়ে তার আলো বন্ধ করে দিলে সে হাতের সামনে যা পেত তাই তার দিকে ছুঁড়ে মারত... কখনও কখনও বড়রা অমনি অমনি, স্রেফ একঘেয়েমি কাটানোর জন্য, বাচ্চাদের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করার ইচ্ছে থেকে তাদের ধরে মারত। কেবল ইয়েরেমেই দাদুই মারধোর করত না।

শিগ্গিরই ইলিয়ার মনে হতে লাগল যে শহরের চেয়ে গাঁয়ের জীবন ভালো। গাঁয়ে যেখানে খুশি বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে, আর এখানে কাকা উঠোনের বাইরে যেতে মানা করে দিয়েছে। সেখানে অনেক খোলামেলা, গোলমাল অনেক কম, লোকে সেখানে একই রকম কাজ করে, সে কাজ সকলের কাছে বোধগম্যও বটে। এখানে প্রত্যেকে যে যার খুশিমতো কাজ করে যাচ্ছে, অথচ সকলেই গরিব, সকলেরই রুজি-রোজগার নির্ভর করছে অন্যের ওপর, লোকে আছে আধপেটা খেয়ে।

এক দিন দুপুরের খাবার খেতে তেরেন্তি কাকা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাইপোকে বলল:

'শরৎকাল আসছে রে ইলিয়া... আমাদের প্যাঁচে ফেলে দেবে দেখছি!.. হা ভগবান!..'

সে ভাবনায় ডুবে গেল, মনমরা হয়ে এক দৃষ্টিতে বাঁধাকপির ঝোলের বাটির দিকে চেয়ে রইল। ইলিয়াও ভাবনায় পড়ে গেল। কুঁজো তেরেন্তি যে টেবিলে বাসন ধুত ওরা সেখানেই খাবার খাচ্ছিল।

'পেত্রুখা বলছে, ইয়াকভের সঙ্গে তোকেও যেন ইস্কুলে পাঠাই। বুঝি, দরকার... লেখাপড়া ছাড়া এখানে কানার মতো অবস্থা!.. কিন্তু ইস্কুলে যেতে হলে ত তোর জামা জুতো দরকার!.. হা ভগবান! তোর ওপরই ভরসা!..'

কাকার দীর্ঘনিশ্বাসে, তার বিষণ্ণ মুখ দেখে ইলিয়ার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে মৃদু স্বরে বলল:

'চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই!..'

'কো-থা-য়?' টেনে টেনে হতাশ সুরে কুঁজো জিজ্ঞেস করল।

'কেন? — বনে!' বলেই ইলিয়া হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'তুমিই ত বলেছ দাদু কত বচ্ছর বনে ছিল — একা! আর আমরা — দুজন! না হয় গাছের বাকল ছাড়াব!.. শেয়াল, কাঠবেড়ালি না হয় শিকার করব... তোমার বন্দুক থাকবে, আর আমার থাকবে ফাঁদ!.. পাখি ধরব। ভগবানের দিব্যি! বনে ফলমূল আছে, ব্যাঙের ছাতা আছে।... চল না, যাই?..'

কাকা সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু নেকড়েবাঘ আছে যে! ভালুক আছে!'

'বন্দুক থাকবে ত!' ইলিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল। 'আর আমি বড় হলে জন্তু-জানোয়ারকে মোটেই ভয় পাব না!.. ওদের খালি হাতে গলা টিপে মেরে ফেলব!.. আমি এখনই কাউকে ডরাই না! এখানে বাস করা শক্ত! আমি ছোট হলেও দেখতে ত পাচ্ছি! এখানে বড্ড মারপিট — গাঁয়ে এতটা ছিল না! কামারটা মুণ্ডুতে এত জোর ঝাড়ে যে তারপর সারা দিন মাথার মধ্যে ভোঁভোঁ করতে থাকে!..'

'ওঃ আমার বোকা অনাথ ছেলে রে!' এই বলে খাবার চামচ ফেলে তেরেন্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

ঐ দিন সন্ধ্যায় উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ইলিয়া এসে তার কাকার টেবিলের কাছে মেঝেতে বসেছিল। ইয়েরেমেই দাদু চা খাওয়ার জন্য সরাইয়ে এসে ঢুকল। ইলিয়া ঝিমুতে ঝিমুতে ইয়েরেমেইয়ের সঙ্গে তেরেন্তির কথাবার্তা শুনতে লাগল। কুঁজোর সঙ্গে ছেঁড়া কাগজ-নেকড়া কুড়ুনে বুড়োর

খুব খাতির, তাই সে চা খেতে এলে সব সময় তেরেন্‌তির টেবিলের কাছাকাছি এসে বসত।

'ভাবনার কিছু নেই!' ইয়েরেমেইয়ের খনখনে গলার আওয়াজ ইলিয়ার কানে এলো। 'কেবল একটা কথা জেনে রাখ — ভগবান! তুমি হলে তাঁর দাস!.. শাস্ত্রে বলা হয়েছে — দাসানুদাস! ভগবান তোমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। তোমার সুখের দিন আসবে, তিনি তাঁর দূতকে বলবেন, 'ওহে স্বর্গীয় দূত, যাও, আমার অনুগত দাস তেরেন্‌তির জীবনের বোঝা হাল্‌কা কর...''

'প্রভুর ওপর আমার বিশ্বাস আছে, দাদু। এর চেয়ে বেশি আর আমি কী করতে পারি?' তেরেন্‌তি মৃদু স্বরে বলল।

বার-কর্মচারী পেত্রুখা রেগে গেলে তার গলার আওয়াজ যেমন হয় অনেকটা সেই রকম স্বরে দাদু তেরেন্‌তিকে বলল:

'ইলিয়াকে ইস্‌কুলে পাঠানোর জন্য যা যা দরকার তার খরচ আমি দেব'খন!.. ঝেড়েঝুড়ে বার করলে যোগাড় হয়ে যাবে... ধার দিচ্ছি। বড়লোক হলে শোধ করে দেবে...'

'দাদু!' তেরেন্‌তি অভিভূত হয়ে মৃদু স্বরে বলল।

'হয়েছে, চুপ কর দেখি! আপাতত তুমি ওকে, ছেলেটাকে আমার কাছে দাও — এখানে ও করবেটা কী?.. তোমাকে সুদ দিতে হবে না — তার বদলে ও আমার কাজ করে দেবে... রাস্তা থেকে ছেঁড়া নেকড়া ওঠাবে, হাড়গোড় তুলে দেবে... বুড়ো বয়সে আমাকে আর পিঠ নোয়াতে হবে না...'

'ওঃ বাঁচালে!.. ভগবান তোমাকে দেবেন!..' কুঁজো ঝনঝনে গলায় চেঁচিয়ে বলল।

'ভগবান আমাকে দেবেন, আমি — তোমাকে, তুমি — ওকে, ও আবার দেবে ভগবানকে — এই ভাবে চাকার মতো ঘুরতে থাকবে, কেউ কারও কাছে ঋণী থাকবে না... সোনা রে! ওঃ সোনা ভাইটি আমার! কী আর বলব! এতটা বচ্ছর ত বাঁচলাম, দুটো চোখে দেখলামও অনেক কিছু — কিন্তু তাঁর মতন আর কে আছে? সবই তাঁর, সবই তাঁকে, সব তাঁর কাছ থেকে আর তাঁরই জন্যে!..'

এই কথা শুনতে শুনতে ইলিয়া ঘুমিয়ে পড়ল। পর দিন খুব ভোরে ইয়েরেমেই দাদু তাকে জাগিয়ে দিল, খুশি খুশি গলায় বলল:

'চল দেখি ইলিয়া, বেড়াতে যাই! চল, চট্‌পট্‌!'

বুড়ো ইয়েরেমেইয়ের যত্নে ইলিয়ার বেশ ভালোই কাটতে লাগল। প্রতি দিন খুব ভোরে দাদু ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিত, ওরা একেবারে সেই সন্ধে অবধি শহরে হেঁটে হেঁটে নেকড়া, হাড়গোড়, ছেঁড়া কাগজ, লোহার ভাঙা টুকরো আর চামড়ার টুকরো যোগাড় করত। বিরাট শহর, শহরে কৌতূহলজনক জিনিস অনেক, তাই প্রথম প্রথম ইলিয়া দাদুকে তেমন সাহায্য করতে পারত না, থেকে থেকে বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে লোকজন, ঘর-বাড়ি দেখত, সব কিছুতেই আশ্চর্য হয়ে যেত, বুড়োকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করত... ইয়েরেমেই ছিল বকিয়ে গোছের। মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াত এবং আগায় লোহা বাঁধান লাঠি ঠকঠক করতে করতে তার ছেঁড়াখোঁড়া জামার হাতায় কিংবা নোংরা বস্তার কানা দিয়ে চোখের জল মুছত আর এক নাগাড়ে একঘেয়ে গুনগুনে সুরে তার সাগরেদটিকে বলে যেত:

'আর এটা হল ব্যবসাদার প্চেলিনের — সাভ্‌ভা পেত্রোভিচ্ প্চেলিনের বাড়ি। ব্যবসাদার প্চেলিন বিরাট বড়লোক!..'

ইলিয়া জিজ্ঞেস করে:

'বড়লোক কী করে হয়, দাদু?'

'তার জন্যে লোকে খাটে, মানে, কাজ করে... দিনরাত কাজ করে, টাকা জমায় আর জমায়। জমিয়ে বাড়ি তৈরি করে, ঘোড়া কেনে, নানা রকমের বাসনপত্র, এটা সেটা আরও অনেক কিছু কেনে। সব নতুন! দোকান-কর্মচারী, চৌকিদার আর নানা ধরনের লোক বহাল করে, নিজেরা আরামে থাকে। হ্যাঁ, তবেই না বলা যায় লোকটা সৎপথে টাকা-পয়সা করেছে!.. কিন্তু এমন লোকও আছে যারা পাপের পথে বড়লোক হয়। ব্যবসাদার প্চেলিন সম্পর্কে লোকে বলে অল্প বয়স থেকেই নাকি সে নষ্ট স্বভাবের। কথাটা হিংসেয় হতে পারে আবার সত্যিও হতে পারে। তবে, এই প্চেলিন লোকটা বদমাশ, তার চাউনি কেমন যেন ভীতু ভীতু... চোখ কেবল ছটফট করছে, আড়াল খুঁজছে... প্চেলিন সম্পর্কে লোকে হয়ত মিথ্যে কথাও বলতে পারে... এমনও হয় যে কোন লোক রাতারাতি বড়লোক বনে গেল... ভাগ্যের ব্যাপার আর কি!.. ভাগ্য তার ওপর মুখ তুলে চাইল... একমাত্র ভগবানই সত্যি জানেন, আমরা হলাম মানুষ! মানুষ হল জীবাত্মা — পরমাত্মার বীজ! প্রভু আমাদের মাটিতে বুনে দিয়েছেন — বেড়ে ওঠ! দেখা যাক তোমাদের থেকে কী রকম কাজের

ফসল পাওয়া যায়?.. ব্যাপারটা হল এই! আর এই — এটা হল সাবানেয়েভের — মিত্রি পাভ্‌লিচ্‌ সাবানেয়েভের বাড়ি... এ আবার প্‌চেলিনের চেয়েও বড়লোক। এ লোকটা সত্যি সত্যিই বদ — আমি জানি... অবশ্য আমি বিচার করার কে? — বিচার করবেন ভগবান — তবে জানি ঠিকই... আমাদের গাঁয়ের মোড়ল ছিল, আমাদের সবার সঙ্গে বেইমানি করেছে, সকলের ওপর লুটতরাজ করেছে! ভগবান অনেক দিন এটা সহ্য করেন, শেষে শোধ তুলতে লাগলেন। প্রথমে মিত্রি পাভ্‌লভ কালা হয়ে গেল, তারপর তার ছেলে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেল... আর এই কিছু দিন আগে মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাল...'

ইলিয়া মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল, বিশাল বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতে মাঝে মাঝে বলতে থাকে:

'একবার যদি ভেতরটা একটু উঁকি মেরে দেখা যেত!..

'দেখবি! পড়াশুনা কর — বুঝলি? বড় হ — সব দেখবি! বলা যায় না, নিজেই হয়ত বড়লোক হবি... বাঁচা নিয়ে কথা, বুঝলি? এই ত আমি, কতটা বছরই না কাটিয়ে দিলাম, চোখ ভরে দেখলাম আর দেখলাম — দেখতে দেখতে নিজের চোখ দুটোই নষ্ট করে বসলাম... এই দ্যাখ না, চোখের জল আমার ঝরছে ত ঝরছেই... তাতেই ত আমি রোগা লিকলিকে হয়ে গেছি... মানে, চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরের সব কিছু বেরিয়ে গেছে!'

ভগবান সম্পর্কে বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে বুড়ো যে সব কথা বলত ইলিয়ার তা শুনতে ভালো লাগত, স্নেহমাখা কথা শুনতে শুনতে সামনে যে ভালো একটা কিছু তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে এ রকম একটা আশার উৎসাহজনক, দৃঢ় অনুভূতি বালকের মনে জেগে উঠত। শহরে জীবনযাত্রার প্রথম দিকে সে যেমন ছিল, এখন ফুর্তির চোটে তার চেয়েও শিশুর মতো হয়ে গেল।

জঞ্জাল ঘাঁটার ব্যাপারে সে উৎসাহের সঙ্গে বুড়োকে সাহায্য করতে লাগল। বিভিন্ন আবর্জনাস্তূপ ঘাঁটার মধ্যে বেশ একটা আকর্ষণ ছিল আর জঞ্জালের মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু একটা পেয়ে গেলে বুড়োর যা আনন্দ হত তা দেখতে বিশেষ ভালো লাগত। এক দিন ইলিয়া বিরাট এক রুপোর চামচ পেয়ে যায় — এর জন্য দাদু ওকে আধপাউন্ড সুগন্ধী পিঠে কিনে দেয়। তারপর সে ঘেঁটে বার করে সবুজ ছাতা পড়া একটা মণিব্যাগ — তাতে এক রুবলেরও

বেশি পয়সা ছিল। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত ছুরি, কাঁটা, নাট বল্টু, তামার ভাঙ্গাচোরা জিনিসপত্র, আর গোটা শহরের জঞ্জাল যেখানে এনে ফেলা হত সেই খাতের মধ্যে হাতড়ে ইলিয়া পেয়ে যায় তামার ভারী পিলসুজ। এই রকম প্রত্যেকটা দামী জিনিস বার করার জন্য দাদু ইলিয়াকে মিঠাইজাতীয় কিছু না কিছু কিনে দিত।

এ রকম কোন আশ্চর্য জিনিস পেয়ে গেলে ইলিয়া উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠত:

'দাদু, এই দেখ! দেখ! দেখ, দেখ — ওঃ হো-হো!'

দাদু বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ওকে বলত:

'আরে তুই চেঁচাস না ত! চেঁচাস না বলছি!.. আঃ ভগবান!..'

অসাধারণ কোন জিনিস মিলে গেলে দাদু সব সময় ভয় পেয়ে যেত, তাড়াতাড়ি ছেলেটার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের বিরাট ঝোলাটার ভেতর লুকিয়ে ফেলত।

'চুপচাপ থাক বলছি, মুখ বুঁজে থাক!..' বুড়ো সস্নেহে বলত, এদিকে তার লাল টকটকে চোখ দুটো থেকে ক্রমাগত জল গড়াত।

সে ইলিয়াকে মাঝারি গোছের একটা ঝোলা আর আগায় লোহা বাঁধান একটা লাঠি দিয়েছিল। এই সরঞ্জাম নিয়ে ইলিয়ার গর্ব ছিল। নিজের ঝোলায় সে সংগ্রহ করে রাখত নানা রকমের বাক্স, ভাঙ্গাচোরা খেলনাপাতি, সুন্দর সুন্দর খাপরা, তার ভালো লাগত কাঁধে এই সব জিনিসের ভার অনুভব করতে, কাঁধের ওপর সেগুলোর ঝনঝন ঠন্‌ঠন্ আওয়াজ শুনতে। ইয়েরেমেই দাদু তাকে এ সব সংগ্রহ করতে শেখায়।

'তুই এই জিনিসগুলো যোগাড় করে রাখ, বাড়ি নিয়ে যা। নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের দিস, ওরা খুশি হবে। লোকজনকে খুশি করতে পারা — ভালো কাজ, ভগবান এটা ভালোবাসেন... সব মানুষ আনন্দ চায়, অথচ দুনিয়ায় আনন্দ কম, এক্কেবারেই কম! এতই কম যে কোন কোন মানুষ সারা জীবনেও তার দেখা পায় না — কখনই পায় না!..'

এ উঠোন সে উঠোন করে বেড়ানোর চেয়ে শহরের আবর্জনাস্তূপ ইলিয়ার বেশি পছন্দ। ইয়েরেমেইয়ের মতা দু-তিন জন বুড়ো ছাড়া আর কেউ ঐ সব আবর্জনাস্তূপ ঘাঁটতে আসত না, চৌকিদার যখন তখন ঝাড়ু হাতে ছুটে এসে যা তা গালিগালাজ করবে এবং মার দিয়ে উঠোন থেকে তাড়িয়ে দেবে — এই আশঙ্কায় এখানে এদিক ওদিক তাকানোর দরকার নেই।

প্রতি দিন ঘণ্টা দুয়েক আবর্জনাস্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করার পর ইয়েরেমেই বলত:

'হয়েছে রে ইলিয়া! চল বিশ্রাম করি, কিছু খাওয়া যাক!'

জামার নীচ থেকে রুটির টুকরো বার করত, ক্রুশ করে সেটাকে ভাঙ্গত, ওরা খেত, খাওয়ার পর খাতের ধারে শুয়ে থেকে আধঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করত। খাত শেষ হয়েছে নদীর মুখে, নদীটা ওদের চোখে পড়ত। রুপোলি নীল রঙের চওড়া নদীটি খাতের পাশ দিয়ে নীরবে ঢেউ খেলে চলে যেত আর তার দিকে তাকাতে তাকাতে ইলিয়ার ইচ্ছে করত তার বুকে ভাসে। নদীর ওপার জুড়ে তৃণভূমি, সেখানে ছাইরঙা মিনারের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে খড়ের গাদা, দূরে, ধরণীর প্রান্তে নীল আকাশের অবরোধ রচনা করছে গভীর বনের খাঁজকাটা দেয়াল। তৃণভূমি — শান্ত ও স্নিগ্ধ, অনুভব করা যেত যে সেখানকার বাতাস নির্মল ও স্বচ্ছ, তাতে আছে মিষ্টি গন্ধ... আর এখানে আবর্জনার পচা গন্ধে দম আটকে আসে; এ গন্ধ বুক চেপে ধরে, নাকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, দাদুর মতো ইলিয়ার চোখ দিয়েও জল ঝরতে থাকে...

চিত হয়ে শুয়ে থেকে ইলিয়া আকাশের দিকে তাকাত — তার সীমা-পরিসীমা দেখতে পেত না। একটা বিষণ্ণতা ও ঝিমুনির ভাব তাকে পেয়ে বসত, তার কল্পনায় জেগে উঠত আবছা আবছা কতকগুলো রূপ। তার মনে হত যে বিরাট, আলোকস্বচ্ছ, স্নেহের উত্তাপ সঞ্চারকারী, উদার অথচ কঠোর কে একজন আকাশে, দৃষ্টির অগোচরে ভেসে চলেছে এবং সে — বালক ইলিয়া, তার দাদু আর গোটা দুনিয়াসুদ্ধ উঠে যাচ্ছে তার দিকে সেখানে, অতলস্পর্শী অন্তরীক্ষে, নীল জ্যোতির মধ্যে, পবিত্রতা ও আলোকের মধ্যে।... একটা প্রশান্ত আনন্দের অনুভূতিতে তার হৃদয় আবিষ্ট হয়ে পড়ত।

সন্ধেবেলায় ঘরে ফেরার সময় ইলিয়া উঠোনে ঢুকত এমন এক ভারিক্কি চাল নিয়ে যেন সে রীতিমতো খাটা-খাটনি করেছে, এখন বিশ্রাম নিতে চায় এবং অন্য সব ছেলেমেয়ের মতো আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করার মতো সময় তার একেবারেই নেই। রাশভারী হাবভাব আর তার পিঠের ঐ ঝোলাটা — যার মধ্যে সব সময়ই থাকত নানা রকমের আকর্ষণীয় জিনিস — বাচ্চাদের সকলের মনে শ্রদ্ধা উদ্রেক করত।

দাদু হাসতে হাসতে বাচ্চাদের উদ্দেশে কোন না কোন মজার কথা বলত...

'এই এলাম আমরা গরিব ভিখিরি দুটি, গোটা শহর চষে বেড়ালাম, সব জায়গায় মজার মজার কতই না কাণ্ডকারখানা করলাম!.. ইলিয়া! মুখটা ধুয়ে আয় দেখি, তারপর সরাইখানায় চলে আয় চা খেতে!..'

ইলিয়া হেলে দুলে মাটির তলার ঘরের দিকে যায় আর ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে তার পিছু নেয়, সাবধানে তার ঝোলায় হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে ভেতরে কী আছে। কেবল পাভেল বেপরোয়া ভাবে পথ আটকে ইলিয়াকে বলে:

'অ্যাই ধাঙড়! দ্যাখা ত কী আনলি...'

'দাঁড়া!' ইলিয়া রুক্ষ স্বরে বলে। 'আগে চা খেয়ে নি, দেখাব...'

সরাইয়ে কাকা ওকে দেখে সস্নেহে হাসত।

'রোজগেরে মানুষ এলো বুঝি? আহা আমার বাছা রে!.. খেটে খেটে হয়রান হয়ে পড়েছিস?'

ওকে যে রোজগেরে বলা হয় এটা শুনতে ইলিয়ার ভালো লাগত, আর এটা সে কেবল কাকার কাছ থেকেই শোনে নি। একবার পাভেল কী একটা নষ্টামি করে; সাভেল ওকে পাকড়াও করে, দুই হাঁটুর মধ্যে ওর মাথাটা চেপে ধরে দড়ি দিয়ে চাবকাতে চাবকাতে বলতে থাকে:

'আর নষ্টামি করবি, হারামজাদা? আর করবি? দ্যাখ কেমন লাগে, দ্যাখ! এই দ্যাখ! তোর বয়সের আর সব ছেলে নিজেরা নিজেদের রুজি রোজগার করে, তুই কিনা কেবল গিলিস আর জামাকাপড় ছিঁড়িস!..'

পাভেল সারা উঠোন মাত করে হাউমাউ করতে লাগল, দুই পা ছুঁড়তে লাগল, এদিকে পিঠের ওপর ঘা পড়ছে ত পড়ছেই। ইলিয়া এক অদ্ভুত তৃপ্তির সঙ্গে তার শত্রুর যন্ত্রণাকাতর ও ভয়ঙ্কর চিৎকার শোনে, কিন্তু কামারের কথায় তার চেতনা হল যে সে পাভেলের ওপরে; তখন ছেলেটার জন্য ওর কষ্ট হল।

'সাভেল কাকা, ছেড়ে দাও!' হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল।

কামার তার ছেলেকে আরও এক ঘা বসিয়ে দিল, তারপর ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে রেগে বলল:

'অ্যাও, থামলি তুই? ওর হয়ে বলতে এয়েচিস!.. দেখাচ্ছি তোকে!..' ছেলেকে ধাক্কা মেরে পাশে ফেলে দিয়ে সে কামারশালায় চলে গেল। পাভেল উঠে দাঁড়াল, অন্ধের মতো হোঁচট খেতে খেতে উঠোনের অন্ধকার কোণের দিকে

এগিয়ে গেল। দরদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ইলিয়া ওকে অনুসরণ করল। কোনায় পাভেল হাঁটু মুড়ে দাঁড়াল, বেড়ায় কপাল ঠেকিয়ে, পাছায় দুহাত লাগিয়ে আরও জোরে ভেউভেউ করতে লাগল। ইলিয়ার ইচ্ছে করছিল আঘাতে জর্জরিত শত্রুকে দু-একটা মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু সে কেবল পাভেলকে জিজ্ঞেস করল:

'ব্যথা করছে?'

'দ্-দূর হ!' পাভেল চেঁচিয়ে উঠল।

এই চিৎকারে ইলিয়ার মনে লাগল, সে গুরুগিরি ফলিয়ে বলতে লাগল:

'তুই সকলকে খোঁচাখুঁচি করতে যাস, এখন দেখলি ত...'

ওর কথা আর শেষ হতে পারল না, পাভেল ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ইলিয়াও খেপে গেল, দুজনেই ঢেলার মতো মাটিতে গাড়িয়ে পড়ল। পাভেল আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল আর ইলিয়া তার চুলের মুঠো ধরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল, যতক্ষণ না পাভেল চেঁচিয়ে উঠল:

'ছেড়ে দে!'

'দেখলি ত!' ইলিয়া নিজের বিজয়ে গর্বিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'দেখলি? আমার গায়ের জোর বেশি! তার মানে — তুই আর আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না!'

আঁচড়ানো মুখের রক্ত জামার হাতায় মুছতে মুছতে সে সরে গেল। উঠোনের মাঝখানে ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখে কামার দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে ইলিয়া ভয়ে কেঁপে উঠল, ছেলের গায়ে হাত তোলার জন্য কামার এখনই তাকে উত্তম মধ্যম দেবে ভেবে ইলিয়া ইতস্তত করে থেমে গেল। কিন্তু কামার কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলল:

'হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলি কেন? আগে কখনও আমাকে দেখিস নি নাকি? কোথায় যাচ্ছিলি, যা!..'

আর সন্ধেবেলায় ইলিয়াকে গেটের বাইরে পাকড়াও করে সাভেল আলতো ভাবে তার মাথার পেছনে টোকা মেরে বিষণ্ন হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল:

'কাজ-কারবার কেমন চলছে রে মেথর?'

ইলিয়া খুশিতে হিহি করে হাসল — ওর ভালো লাগল। এ বাড়ির সবচেয়ে জোয়ান লোক — যাকে সবাই ভয় করে, সেই বদরাগী কামার কিনা তাকে

খাতির করছে, তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে! কামার লোহার মতো শক্ত আঙ্গুল দিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরল, ও আরও খুশি হয়ে উঠল।

'ও হো-হো!' কামার বলল। 'তুই দেখছি শক্তসমর্থ ছেলে! সহজে কাবু হোস না দেখছি ছোঁড়া!.. ঠিক আছে, বড় হ!.. বড় হলে তোকে আমি কামারশালায় নেব!..'

ইলিয়া কামারের বিশাল পায়ের একটা হাঁটু জড়িয়ে ধরল, শক্ত করে হাঁটুটা বুকে চেপে ধরল। ওর আদরে রুদ্ধশ্বাস ছোট্ট হৃৎপিণ্ডের শিহরণ সাভেল হয়ত অনুভব করে থাকবে: সে ইলিয়ার মাথায় ভারী হাতটা রাখল, একটু চুপ করে থেকে গাঢ় স্বরে বলল:

'আহা অনাথ বেচারা!.. ছাড় দেখি, যাই!..'

উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হয়ে ইলিয়া সেই সন্ধ্যায় লেগে যায় তার নিত্যকার কাজে — সারা দিনে যোগাড় করা আজব সব জিনিস বিলির কাজে। বাচ্চারা মাটিতে বসে লোভাতুর দৃষ্টিতে নোংরা ঝোলাটার দিকে তাকাতে থাকে। ইলিয়া ঝোলা থেকে একে একে বার করতে থাকে ছিট কাপড়ের ফালি, বহুকালের ধকলে রংচটা এক কাঠের সেপাই, জুতোর পালিশের খালি কৌটো, মাথার তেলের খালি টিন, হাতল ও কানা ভাঙা চায়ের বাটি।

'এটা আমাকে, আমাকে, আমাকে!' হিংসায় সকলে চেঁচামেচি উঠতে থাকে, ছোট ছোট নোংরা হাত চার দিক থেকে এগিয়ে আসে দুর্লভ জিনিসগুলোর দিকে।

'দাঁড়া! কাড়াকাড়ি করিস না!' ইলিয়া আদেশের সুরে বলল। 'তোরা সঙ্গে সঙ্গে সব হাতিয়ে নিলে খেলাটা কী হবে ছাই? আচ্ছা, দোকান খুলছি। এক টুকরো ছিট কাপড় বিক্রির জন্যে আছে।... সবচেয়ে ভালো ছিট! দাম — আধুলি!.. মাশা, তুই কিনে নে!'

'কিনেছে!' মুচির মেয়ের হয়ে ইয়াকভ্ উত্তর দিল। পকেটে আগে থেকেই খোলামকুচি তৈরি ছিল, সেগুলোর একটা বার করে সে দোকানদারের হাতে গুঁজে দিল। ইলিয়া কিন্তু নিল না।

'এটা কি একটা খেলা হল? কী আশ্চর্য! — তুই দরকষাকষি করবি ত! তুই কখনই দরকষাকষি করিস না!.. এ ভাবে কেউ কেনে নাকি ?' •

'ভুলে গিয়েছিলাম!' ইয়াকভ্ স্বীকার করল।

জোর দরাদরি শুরু হয়ে গেল। দোকানী আর খদ্দেররা যখন তাতে

মেতে আছে সেই অবসরে পাভেল গাদা থেকে নিজের পছন্দমতো জিনিস যত সাফাই করে নিতে থাকে। পরে দৌড়ে তফাতে গিয়ে নাচতে নাচতে মুখ ভেঙচে ওদের বলতে থাকে:

'এই দ্যাখ, আমি মেরে দিয়েছি! তোরা সব হাবাগোবা! বুদ্ধু কোথাকার!'

ওর এই ধরনের আচরণে সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ছোটরা চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করে। ইয়াকভ্ ও ইলিয়া উঠোনে চোরের পেছন পেছন ছোটে, চোরের নাগাল ওরা প্রায় কখনই পায় না। পরে ওর আচরণ সকলের গা সওয়া হয়ে যায়, ওর কাছ থেকে ভালো কিছুই ওরা আর আশা করত না, কেউই দুচক্ষে ওকে দেখতে পারত না, ওর সঙ্গে খেলত না। পাভেল তফাতে থাকত এবং সকলের বিরক্তিকর কিছু না কিছু করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। আর বিশাল মুণ্ডধারী ইয়াকভ্ মুচির কোঁকড়া চুলওয়ালা মেয়েটার পেছন পেছন দাইয়ের মতো ঘুরঘুর করে বেড়াত। মেয়েটা ওর এই যত্ন-আত্তিকে প্রাপ্য বলে মনে করত, ওকে আদর করে ইয়াশেচ্‌কা বলে ডাকত বটে, কিন্তু প্রায়ই আঁচড়ে দিত, মার দিত। ইলিয়ার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল, সে সব সময় বন্ধুকে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ দিত:

'দেখলাম যেন আমার অনেক অনেক টাকা — কেবলই রুবল — বিরাট বস্তা! বনের ভেতর দিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে চলছি। এমন সময় — ডাকাতের দল। ওদের হাতে ছোরা, ভয়ঙ্কর সব চেহারা। আমি দৌড় দিই আর কি! এমন সময় বস্তার ভেতর কী যেন ঝটপট করে উঠল।... আমি ত সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে ফেলে দিই। এদিকে ওর ভেতর থেকে নানা রকমের পাখি ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসে!.. শালিক, নীলকণ্ঠ, বুলবুল — কত রকমের, তা আর কী বলব! ওরা আমাকে খপ্ করে ধরে নিয়ে চলল ওপরে, অনেক ওপরে!'

এই বলে ও গল্পের ছেদ টানে, ওর চোখ দুটো গোল গোল হয়ে ওঠে, মুখটা গোবেচারী-গোবেচারী ভাব ধারণ করে।

'তারপর?' ইলিয়া শেষটা জানার জন্য অধীর হয়ে ওকে খোঁচায়।

'আমি একদম উড়ে গেলাম!..' ইয়াকভ্ অন্যমনস্ক হয়ে শেষ করে।

'কোথায়?'

'একদম!'

'ধুৎ!' ইলিয়া হতাশ হয়ে তাচ্ছিল্য ভরে বলে। 'কিছুই মনে নেই তোর!.'

সরাইখানা থেকে ইয়েরেমেই দাদু বেরিয়ে আসত, হাতের তালু কপালে ঠেকিয়ে চোখ আড়াল করে চেঁচাত:

'ইলিয়া! কোথায় তুই? আয়, ঘুমানোর সময় হয়ে গেল!..'

ইলিয়া বাধ্য ছেলের মতো বুড়োর পেছন পেছন যেত, সে তার বিছানায় — খড়ে ঠাসা বিরাট বস্তার ওপর শুয়ে পড়ত। বস্তাটার ওপর তার ঘুম আরামের হত, বুড়োর সঙ্গে তার জীবন ভালোই কাটছিল, কিন্তু এই মধুর ও স্বচ্ছন্দ জীবন দ্রুত কেটে গেল।

ইয়েরেমেই দাদু ইলিয়াকে বুট-জুতো, বিরাট, ভারী ওভারকোট আর টুপি কিনে দিল, ছেলেটাকে সে স্কুলে ভর্তি করল। ইলিয়া স্কুলে গেল মনের মধ্যে কৌতূহল আর ভয় নিয়ে, ফিরে এলো মনে দুঃখ ও হতাশা নিয়ে, তার চোখে তখন জল: ছেলেরা জেনে ফেলেছে যে ও হল ইয়েরেমেই দাদুর সঙ্গী, তারা সমস্বরে ওকে খেপাতে থাকে:

'আঁস্তাকুড়-ঘাঁটা ছেলে! গায়ে বোটকা গন্ধ রে!'

কেউ কেউ ওকে চিমটি কাটে, কেউ বা ওকে জিভ দেখায়, একজন আবার তার কাছে এসে নাক দিয়ে নিশ্বাস টানল, তারপর মুখভঙ্গি করে দৌড়ে সরে গিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল:

'উঃ, কী গন্ধ!'

'ওরা খেপায় কেন?' বুঝতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে সে কাকাকে জিজ্ঞেস করে। 'কাগজ-নেকড়া কুড়োনোর মধ্যে লজ্জার কী আছে?'

'কিছুই না!' ভাইপোর জিজ্ঞাসু ও উৎসুক দৃষ্টি থেকে নিজের মুখ লুকোতে লুকোতে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তেরেন্‌তি বলল। 'ওরা অমনি ঠাট্টা করছে... অমনি অমনি দুষ্টুমি করছে... ধৈর্য ধর!.. গা সওয়া হয়ে যাবে!'

'আমার জুতো আর ওভারকোট নিয়েও হাসাহাসি করে, বলে, অন্যের জিনিস, আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া!..'

ইয়েরেমেই দাদুও খুশির ভাব বজায় রেখে চোখ মটকে ওকে সান্ত্বনা দেয়:

'সহ্য করে থাক, বুঝলি! ভগবান এর দাম দেবেন!.. তিনি ছাড়া আর কেউ না!'

ভগবানের ন্যায়পরতায় এমন গভীর আনন্দ ও আস্থা নিয়ে বুড়ো তাঁর কথা বলত যে মনে হত ভগবানের সমস্ত ভাবনাচিন্তা সে জানে, তাঁর সমস্ত অভিপ্রায় সে হৃদয়ঙ্গম করেছে। ইয়েরেমেইয়ের কথায় সাময়িক ভাবে বালকের মনের ক্ষোভ নিভে যেত, কিন্তু পর দিনই তা আরও প্রবল হয়ে জ্বলে উঠত। ইলিয়া এর আগে নিজেকে একজন উঁচুদরের মানুষ, কাজের লোক বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সাভেল কামার পর্যন্ত তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলেছে, অথচ স্কুলের ছেলেরা কিনা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, তাকে খেপায়! এটা সে মেনে নিতে পারল না: স্কুলের অপমানজনক ও তিক্ত অভিজ্ঞতা দিনের পর দিন বাড়তে বাড়তে তার বুকের গভীরে কেটে বসতে লাগল। স্কুলে যাওয়া তার ভীষণ দায় হয়ে দেখা দিল। মেধার জন্য সে সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের নজরে পড়ে গেল। মাস্টারমশাই ওকে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত হিশেবে তুলে ধরতে লাগলেন — ফলে ছেলেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে গেল। সামনের ডেস্কে বসে সে অনুভব করত তার পেছনে বসে আছে শত্রুরা, তারা নিজেদের চোখের সামনে অনবরত ওকে দেখতে পেয়ে ওর যা যা নিয়ে হাসা যায় তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করত আর হাসত। ইয়াকভ্‌ও এই একই স্কুলে পড়ত, তাকেও সহপাঠীরা কুনজরে দেখত। ওরা তার নাম দিয়েছিল ভেড়া। পড়াশুনায় অমনোযোগী আর কাঁচা হওয়ার দরুন ইয়াকভ্‌ সব সময় শাস্তি পেত, কিন্তু তা গায়ে মাখত না। ওর চার ধারে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সব ও মোটেই তেমন লক্ষ্য করত না। স্কুলে এবং বাড়িতেও তার নিজস্ব একটা জীবন ছিল, আর প্রায় প্রতি দিনই উদ্ভট প্রশ্ন করে সে ইলিয়াকে তাক লাগিয়ে দিত।

'ইলিয়া! এটা কী ব্যাপার বল ত — মানুষের চোখ ছোট, অথচ দেখতে পায় সব!.. গোটা শহর দেখতে পায়। দ্যাখ না — সমস্ত রাস্তাটা চোখে পড়ছে... এত বড় একটা জিনিস চোখে ধরে কী করে রে?'

এই সব কথাবার্তা প্রথম প্রথম ইলিয়াকে ভাবিয়ে তুলত, কিন্তু এতে তার ব্যাঘাত ঘটতে লাগল — যে সব ঘটনা তাকে পীড়া দিত সেখান থেকে ভাবনা-চিন্তা বিচ্ছিন্ন করে কোথায় যেন সরিয়ে নিয়ে যেত। অথচ সে ধরনের ঘটনা ছিল অনেক, আর ইলিয়া ইতিমধ্যেই সেগুলো সূক্ষ্ম ভাবে নজর করতে শিখেছে।

একবার সে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে এসে দাঁত বার করে ইয়েরেমেইকে বলল:

'মাস্টারমশাই? হুঃ, বলব কী!.. কী বুদ্ধি!.. গতকাল দোকানদার মালাফেয়েভের ছেলে জানলার কাচ ভাঙল, উনি তাকে সামান্য বকাঝকা করলেন মাত্র, আজ নিজের পয়সায় কাচ লাগালেন...'

'দেখলি ত কেমন ভালো মানুষ!' ইয়েরেমেই গলে গিয়ে বলল।

'ভালো মানুষ না ছাই! ভান্‌কা ক্লুচারেভ্ যখন কাচ ভাঙল তখন উনি তাকে দুপুরের খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, কেবল তাই নয়, ভান্‌কার বাবাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, কাচের জন্য চল্লিশ কোপেক দিতে হবে। ভান্‌কা তার বাবার কাছে জোর ধোলাই খেল!..'

'তুই এতে নজর দিস না, ইলিয়া!' দাদু অস্বস্তির সঙ্গে চোখ টিপে পরামর্শ দিল। 'তুই এমন ভাবে নে, যেন এটা তোর ব্যাপার নয়। ভালো-মন্দের বিচার করবেন ভগবান — আমরা করার কে? আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সব কিছুর মাত্রা জানেন!.. এই দ্যাখ না, আমার বয়স কত হল, কত কিছুই না চেয়ে চেয়ে দেখলাম — এত অন্যায় দেখলাম যে গুনে বলা যায় না! ন্যায় কিন্তু দেখতে পাই নি!.. অথচ আমার বয়স হতে চলল চার কুড়ি... এমন ত হতে পারে না যে এতকালের মধ্যে আমার ধারে কাছে, পৃথিবীতে ন্যায় বলে কিছু ছিল না... কিন্তু আমি দেখতে পাই নি, আমি জানি না!..'

'তাতে কী হল?' ইলিয়া অবিশ্বাসের সুরে বলল। 'এখানে জানার কী আছে? একজনের কাছ থেকে চল্লিশ নিয়েছ, ত অন্য জনের কাছ থেকেও চল্লিশ নাও: এটাই ত হওয়া উচিত!..'

বুড়ো তা মানে না। মানুষের অন্ধতা সম্পর্কে এবং লোকে যে একে অন্যকে ঠিকমতো বিচার করতে পারে না, একমাত্র ভগবানের বিচারই যে ন্যায়সঙ্গত — সে সম্পর্কে সে আরও অনেক কথা বলল। ইলিয়া মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে যায়, কিন্তু তার মুখ ক্রমেই আরও গম্ভীর আকার ধারণ করে, চোখ আরও বিষণ্ণ হতে থাকে।

'ভগবান কখন বিচার করবেন?' সে ফস্ করে দাদুকে জিজ্ঞেস করে বসল।

'সেটা কারও জানা নেই... এমন এক সময় আসবে যখন তিনি দয়া করে মেঘ থেকে নেমে এসে জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন; কিন্তু কখন, তা কেউ জানে না... শোন তাহলে, সন্ধেবেলার প্রার্থনায় আমার সঙ্গে চল দেখি!'

শনিবার দিন ইলিয়া বুড়োর সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ঢোকার মুখে দুই দরজার মাঝখানে বারান্দায় ভিখারীদের দলের সঙ্গে দাঁড়াল। বাইরের দরজা থেকে থেকে খুলে যেতে রাস্তা থেকে কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা ইলিয়ার গায়ে লাগে, পা জমে যায়, তাই ও ধীরে ধীরে পাথর বাঁধানো মেঝের ওপর পা ঠুকতে থাকে। দরজার কাচের মধ্য দিয়ে সে দেখতে পেল মোমবাতির শিখা সোনার সুন্দর সুন্দর আল্‌পনার রূপ নিচ্ছে, কাঁপা কাঁপা বিন্দুর মতো তাতে আলোকিত হয়ে উঠছে পাদ্রির পোশাকের ওপর পাতলা ধাতুর কাজ, লোকজনের কালো কালো মাথা, আইকনের মুখ, আইকন ঢাকা ভিত্তির অপূর্ব খোদাই কাজ।

রাস্তার থেকে গির্জায় লোকজনকে বেশি ভালো ও শান্তশিষ্ট বলে মনে হল। সোনালি রঙের ঝকঝকে আলোয় উদ্ভাসিত নীরবে ও শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কালো কালো মূর্তিতে তাদের আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গির্জার দরজা যখন খুলে যাচ্ছিল তখন বারান্দায় ভেসে আসছিল গানের সুগন্ধ ও ঈষদুষ্ণ ঢেউ। সে ঢেউ সস্নেহে ইলিয়ার সর্বাঙ্গ ধুয়ে দেয়, ইলিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে তা উপভোগ করে। ইয়েরেমেই দাদু ফিসফিস করে প্রার্থনা উচ্চারণ করে — তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ইলিয়ার ভালো লাগে। সে শুনতে থাকে গির্জা জুড়ে সুন্দর ধ্বনির অনুরণন, অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন দরজা খুলে যাবে আর সে ধ্বনি তার ওপর ঝরে পড়বে, তার মুখের ওপর বুলিয়ে দেবে গন্ধমাখা উত্তাপ। সে জানত যে কয়ারে যারা গান গাইছে তাদের মধ্যে আছে স্কুলের সবচেয়ে নিষ্ঠুর উপহাসকারীদের একজন — গ্রিশা বুবনভ্‌, আর মারপিটে ওস্তাদ তাগড়াই চেহারার ফেদিয়া দল্‌গানভ। এখন কিন্তু তাদের ওপর ও কোন রাগ বা বিদ্বেষ অনুভব করল না, ওর কেবল কিছুটা ঈর্ষা হল। তার নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল কয়ারে গান গায়, সেখান থেকে লোকজনকে দেখে। সকলের মাথা ছাড়িয়ে গির্জার মাঝখানের সোনালি দ্বারের সামনে গান গাওয়ার মধ্যে বেশ মজা আছে বলে মনে হয়। গির্জা ছাড়ার পর সে মনে মনে প্রসন্নতা বোধ করল, এখন সে বুবনভ্‌ ও দল্‌গানভের সঙ্গে, সব ছাত্রের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সোমবার দিন যখন সে স্কুল থেকে ফিরে এলো তখন তাকে আগের মতোই বিষণ্ণ ও আহত দেখাচ্ছিল।

প্রত্যেক ভিড়ের মধ্যেই এমন একজন থাকে যে সেখানে অস্বস্তি বোধ করে, তবে তার জন্য সব সময়ই যে অন্যের চেয়ে ভালো বা মন্দ হতে হবে

এমন নয়। বুদ্ধিতে বিশিষ্ট এবং হাস্যকর নাকের অধিকারী না হয়েও জনতার কুনজরে পড়া যায়। নেহাৎই মজা করার মতলবে জনতা কৌতুকের মানুষ বেছে নেয়। এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে ইলিয়া লুনিয়োভকে। ইলিয়ার পক্ষে এর পরিণতি হয়ত খারাপ হত, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তার জীবনে এমন ঘটনা ঘটল যার ফলে স্কুল তার কাছে একেবারেই আকর্ষণ হারাল এবং সেই সঙ্গে সে নিজেকে স্কুলের ঊর্ধ্বে বলে বোধ করল।

একদিন ইয়াকভের সঙ্গে বাড়ির কাছাকাছি আসতে গেটের সামনে সে একটা জটলা দেখতে পেল — সেখান থেকেই এর সূত্রপাত।

'দ্যাখ!' সে বন্ধুকে বলল। 'আবার মারপিট বেধেছে বলে মনে হচ্ছে?.. দৌড়ে চল!'

ওরা তীরবেগে সামনের দিকে ছুটল, দৌড়ে এসে দেখতে পেল উঠোন জুড়ে অচেনা লোকজন ভয়ে এদিক ওদিক ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে:

'পুলিশ ডাক! ওকে বাঁধা দরকার!'

কামারশালার সামনে বিরাট চাপ বেঁধে লোকজন জমেছে। ছেলেরা ধাক্কাধাক্কি করে ভিড়ের মাঝখানে এগিয়ে গিয়েই আবার পিছিয়ে এলো। তাদের পায়ের কাছে বরফের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি মেয়েলোক, তার মাথার পেছন দিকটা রক্তাক্ত ও লেইয়ের মতো কী একটা পদার্থে মাখামাখি, মাথার চারধারের বরফ ঘন লাল। তার পাশে পড়ে ছিল মাথা ঢাকার কোঁচকানো সাদা রুমাল আর কামারের বিরাট সাঁড়াশী। কামারশালার দরজার ওপারে যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে বসে ছিল সাভেল, সে মেয়েটির হাত দুটোর দিকে তাকাচ্ছিল। হাত দুটো সামনের দিকে ছড়ান, বরফ আঁকড়ে ধরার দরুন কব্জি বহুদূর পর্যন্ত গেঁথে আছে। কামার ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে আছে, তার মুখটা দেখাচ্ছে কেমন রোগা লম্বাটে। দেখা যাচ্ছে সে দাঁত কড়মড় করছে — তার চোয়ালের দুপাশ ফুলে বিরাট বিরাট দুটো ঢিবি জেগে উঠেছে। ডান হাতে সে দরজার চৌকাট ধরে ঠেস দিয়ে আছে। তার কালো কালো আঙ্গুল কেঁপে কেঁপে উঠছে, কিন্তু আঙ্গুলগুলো ছাড়া তার গোটা শরীরটা নিথর।

লোকে চুপচাপ তার দিকে তাকাচ্ছিল। সকলের মুখ কঠিন। উঠোনে হৈচৈ ও ছুটোছুটি পড়ে গেলে কী হবে, এখানে, কামারশালার সামনে কোন গোলমাল নেই। দেখতে দেখতে ভিড়ের মাঝখান থেকে বিধ্বস্ত ও ঘর্মাক্ত

অবস্থায় বেরিয়ে এলো ইয়েরেমেই দাদু। সে কাঁপা কাঁপা হাতে কামারের দিকে একপাত্র জল এগিয়ে দিল:

'নাও, খেয়ে ফেল দেখি...'

'এই ডাকাতটাকে জল দিয়ে কাজ নেই, ওর গলায় ফাঁস পরানো দরকার,' কে যেন বিড়বিড় করে বলল।

সাভেল পাত্রটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল খেল। সবটা জল খাওয়া হয়ে গেলে সে খালি পাত্রটার দিকে চেয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল:

'আমি ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, থামা হারামজাদী! বলেছিলাম, খুন করব! ওকে মাফ করেছি, বহু বার মাফ করেছি... কানেই তুলল না... এই হল তার ফল!.. পাভেল ত এখন অনাথ হয়ে পড়ল... ওকে দেখো দাদু... ভগবান তোমার ভালো করবেন...'

'ইস, কী করলি বল ত!' বিষণ্ণ সুরে একথা বলে দাদু তার কাঁপা কাঁপা হাত কামারের কাঁধের ওপর রাখল। ভিড়ের মধ্য থেকে আবার শোনা গেল:

'বদমাশ!.. আবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করছে!..'

কামার তখন ভুরু তুলে হিংস্র জানোয়ারের মতো গর্জন করে উঠল:

'এখানে কী চাই? ভাগো সব এখান থেকে!'

তার চিৎকার কশাঘাতের মতো জনতার ওপর আঘাত করল। লোকজন অস্ফুট বিড়বিড় করতে করতে পিছু হটে গেল। কামার উঠে দাঁড়িয়ে বৌয়ের দেহটার দিকে পা বাড়িয়েই ঝট্ করে পিছু হটে গেল, বিশাল টানটান তার মূর্তিটা কামারশালার ভেতরে চলে গেল। সকলে দেখতে পেল সেখানে ঢুকে সে নেহাইয়ের ওপর বসে পড়ল, দুহাতে মাথাটা এমন ভাবে আঁকড়ে ধরল যেন হঠাৎ তার অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয়েছে, সে সামনে পিছে দুলতে লাগল। কামারের জন্য ইলিয়ার দুঃখ হল। কামারশালার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো উঠোনে জমায়েত লোকজনের এক দঙ্গল থেকে আরেক দঙ্গলের কাছে গিয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না।

পুলিশ এসে উঠোনের লোকজন খেদাতে লাগল, তারপর কামারকে ধরে নিয়ে চলল।

'চললাম, দাদু!' ফটকের বাইরে যেতে যেতে সাভেল চেঁচিয়ে বলল।

'বিদায়, সাভেল ইভানিচ্, বিদায়, বাছা আমার!' তার পেছন

পেছন ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি, মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল ইয়েরেমেই।

সে ছাড়া আর কেউ কামারকে বিদায় জানাল না...

ছোট ছোট দঙ্গল বেঁধে উঠোনে দাঁড়িয়ে লোকজন কথাবার্তা বলছিল, তারা মরা মেয়েলোকটার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, একজন কয়লার একটা বস্তা দিয়ে তার মাথা একটু ঢেকে দিল। সাভেল যেখানে বসেছিল, কামারশালার দরজার ওপাশে সেই জায়গাটাতে পাইপ দাঁতে চেপে এসে বসল এক সেপাই। পাইপ টানতে টানতে সে থুতু ফেলছিল আর ঘোলাটে চোখে ইয়েরেমেই দাদুর দিকে তাকাতে তাকাতে তার কথা শুনছিল।

'খুন কি আর ও করেছে?' রহস্যের সুরে, নীচু গলায় বুড়ো বলল। 'এটা ওর গ্রহের ফের, দুষ্টগ্রহের কাজ! মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে না... শোন গো ভালো মানুষেরা, মানুষ খুন করে না!'

ঘটনার রহস্য লোকের কাছে ব্যাখ্যা করতে করতে ইয়েরেমেই নিজের বুকের ওপর হাত রাখল, হাত নাড়িয়ে নিজের সামনে থেকে কী যেন তাড়ানোর ভঙ্গি করল, কাশতে লাগল।

'তাই বলে সাঁড়াশী ছুঁড়ে ওকে ত আর শয়তান মারে নি, মেরেছে কামারই,' এই বলে পুলিশের লোকটা থুতু ফেলল।

'তা নয় ত কে তাকে দিয়ে করিয়েছে?' দাদু চেঁচিয়ে উঠল। 'ভালো করে দেখে বল, কে করিয়েছে?'

'থাম দেখি!' সেপাই বলল। 'এই কামার তোমার কে হয়? ছেলে না কি?'

'না, ছেলে হতে যাবে কেন!..'

'ও! আত্মীয় বুঝি?'

'না। আমার কোন আত্মীয় নেই...'

'তাহলে তোমার উতলা হওয়ার কী আছে?'

'আমি? হা ভগবান!'

'তাহলে আমি তোমাকে বলি,' সেপাইটি কঠোর স্বরে বলল, 'তোমার এ সব হল বুড়োর বকবকানি... সরে যাও এখান থেকে!'

সেপাই তার ঠোঁটের কোনা দিয়ে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বার করে বুড়োর কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ইয়েরেমেই সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাত ঝট্‌কা দিয়ে তড়বড় করে খনখন গলায় আবার কথা বলে চলল।

ইলিয়া ফ্যাকাসে হয়ে বিস্ফারিত চোখে কামারশালা থেকে সরে গেল,

সে গিয়ে দাঁড়াল সেই দলটার পাশে যেখানে ছিল গাড়োয়ান মাকার, পেরফিশ্‌কা, মাতিৎসা এবং চিলেকোঠার অন্যান্য মেয়েলোক।

'আরে বাপ্‌রে, বিয়ের আগেও ও মেয়ে মজা লুটে বেড়িয়েছে!' মেয়েদের মধ্যে একজন বলল। 'পাভেল হয়ত কামারের ছেলেই নয় — দোকানদার মালাফেয়েভের ওখানে যে মাস্টার থাকত তার হবে...'

'যে লোকটা গুলি করে আত্মহত্যা করল তার কথা বলছ না কি?' পেরফিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! তাকে দিয়েই ত শুরু...'

পেরফিশ্‌কার পঙ্গু বৌটাও উঠোনে বেরিয়ে এসেছে, ছেঁড়াখোঁড়া কী একটা গায়ে জড়িয়ে সে মাটির তলার ঘরের দোরগোড়ায় তার নিজস্ব জায়গাটাতে বসে ছিল। তার হাত দুটো অনড় হয়ে কোলের ওপর পড়ে ছিল, সে মাথা তুলে কালো কালো দুটি চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। তার ঠোঁটজোড়া শক্ত করে আঁটা, ঠোঁটের কোনা দুটো দুপাশে নেমে এসেছে। ইলিয়াও কখনও মেয়েদের দিকে, কখনও বা আকাশের গহনে দৃষ্টিপাত করে, তার মনে হয় পেরফিশ্‌কার বৌ বুঝি ভগবানকে দেখতে পাচ্ছে এবং তাঁর কাছে নীরবে কোন প্রার্থনা জানাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সব ছেলেমেয়েও ঘন দঙ্গল বেঁধে নীচের তলার ঢোকার মুখে এসে জুটল। শীতে কুঁকড়ে গিয়ে জামাকাপড় জড়িয়ে তারা সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল এবং ভয়াবহ কৌতূহলে দম বন্ধ করে সাভেলের ছেলের মুখ থেকে বিবরণ শুনছিল। পাভেলের মুখটা দেখাচ্ছিল লম্বাটে, তার ধূর্ত চোখজোড়া অস্থির ও বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সকলের দিকে তাকাচ্ছিল। সে কিন্তু নিজেকে বীরপুরুষ বলে ভাবছিল — আজকের মতো আর কোন দিন লোকে তার দিকে এমন নজর দেয় নি। সে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নির্বিকার ভাবে এই নিয়ে দশ বার একই বর্ণনা দিতে দিতে বলল:

'তিন দিন আগে মা যখন চলে গেল তখনই বাবা দাঁত কড়মড় করতে লাগল আর তখন থেকেই বেজায় রেগে ছিল, গর্জাত। আমাকে থেকে থেকে চুলের মুঠি ধরত... আমি তখনই দেখে টের পাই! তারপর ত মা এলো। ফ্ল্যাট ছিল বন্ধ — আমরা কামারশালায় ছিলাম। আমি হাপরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম মা এগিয়ে এলো, দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে বলল: 'চাবিটা দাও দেখি!' বাবাও সাঁড়াশী তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যায়...

এগোতে থাকে এমন চুপচাপ যেন গুড়ি মেরে যাচ্ছে... ভয় পেয়ে আমি প্রায় চোখই বন্ধ করে ফেললাম! ইচ্ছে হল মাকে চেঁচিয়ে বলি: 'পালিয়ে যাও, মা!' চেঁচাতে পারলাম না... চোখ খুললাম, বাবা তখনও এগিয়ে যাচ্ছে! চোখ দুটো জ্বলছে! তখন মা পিছু হটতে লাগল... তারপর উল্‌টো দিকে মুখ ফিরিয়ে দৌড়াতে গেল...'

পাভেলের মুখ থরথর করে উঠল, তার বেঢপ রোগাটে শরীরটা কাঁপতে লাগল। গভীর শ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে বাতাস নিয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে বলল:

'সঙ্গে সঙ্গে বাবা দড়াম্‌ করে সাঁড়াশীর ঘা বসিয়ে দিল!'

বাচ্চারা নিশ্চল হয়ে বসে ছিল, এবারে তারা নড়েচড়ে উঠল।

'মা দুদিকে দুহাত ঝাপটে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মতো করে পড়ে গেল...'

সে একটা কুটো হাতে নিয়ে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে দেখল, তারপর বাচ্চাদের মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল। ওরা সকলে অনড় হয়ে বসে থাকল, মনে হচ্ছিল যেন পাভেলের কাছ থেকে আরও কিছু আশা করছে। কিন্তু সে চুপ্‌চাপ মাথা নীচু করে রইল।

'একেবারেই মেরে ফেলল?' রিনরিনে, কাঁপা কাঁপা গলায় মাশা জিজ্ঞেস করল।

'বোকা কোথাকার!' মাথা না তুলেই পাভেল বলল।

ইয়াকভ্‌ মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের আরও কাছে টেনে আনল, আর ইলিয়া পাভেলের কাছাকাছি সরে এসে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল:

'ওর জন্যে তোর কষ্ট হচ্ছে না?'

'তোর তাতে কী?' পাভেল রেগে গিয়ে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিঃশব্দে তার দিকে তাকাল।

'চরে বেড়ানের ফলটা টের পেল ত!' মাশার রিনরিনে গলা শোনা গেল, কিন্তু ইয়াকভ্‌ তাড়াতাড়ি অস্থির হয়ে ওর কথায় বাধা দিয়ে বলল:

'চরে বেড়াবে না ত কী! কামারটা কী রকম ছিল দেখতে হবে ত! সব সময় কালিঝুলি মাখা, দেখলে ভয় হয়, গজগজ করছে!.. বৌটা ছিল হাসিখুশি, পেরফিশ্‌কার মতো...'

পাভেল ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বড়দের মতো ভারিক্কি চালে বলল:

'আমি ওকে বলেছি, 'দেখো মা! ও তোমাকে খুন করবে!..' আমার কথা শুনল না... কেবল বলে আমি যেন ওকে কিছু না বলি... তার জন্যে এটা ওটা কিনে দিত। আর সার্জেণ্ট সাহেব সব সময় আমাকে পাঁচ কোপেক করে দিত। আমি তাকে চিরকুট পেঁাছে দিলেই সে পাঁচ কোপেক দিত... লোকটা ভালো!.. খুব গায়ের জোর... আর যা গোঁফ...'

'তলোয়ার আছে?' মাশা জিজ্ঞেস করল।

'তা আর বলতে!' পাভেল উত্তর দিল, তারপর গর্বের সঙ্গে যোগ করল, 'আমি ওটা একবার খাপ থেকে খুলেছিলাম — কী ভারী, ওরে বাব্বা!'

ইয়াকভ্ অন্যমনস্ক ভাবে বলল:

'তা তুই যে এখন ইলিয়ার মতোই অনাথ হয়ে গেলি...'

'তা যা-ই হই না কেন,' অনাথ পাভেল ক্ষুণ্ণ হয়ে জবাব দিল। 'তোর ধারণা আমিও ইলিয়ার মতো কাগজ-নেকড়া কুড়োতে বেরোব? আরে ছিছোঃ!'

'আমি তা বলছি না...'

'আমি এখন যা প্রাণ চায় তাই করব!..' মাথা তুলে রাগে চোখ পাকাতে পাকাতে পাভেল সগর্বে বলল। 'আমি অনাথ নই, কেবল... কেবল... আমি একা থাকব আর কি। বাবা ত আমাকে স্কুলেই দিতে চাইল না, এখন ওকে জেলে পচে মরতে হবে... আর আমি যাব স্কুলে, পড়াশুনা করব, তোদের চেয়ে ভালো করে লেখাপড়া শিখব!'

'জামাকাপড় কোথায় পাবি?' ইলিয়া বিজয়ীর হাসি হেসে বলল। 'স্কুলে ঐ সব ছেঁড়া জামাকাপড়ে নেবে কি না!..'

'জামাকাপড়? আমি কামারশালা বেচে দেব!'

সকলে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে পাভেলের দিকে তাকাল আর ইলিয়ার মনে হল সে হেরে গেছে। ভাবটা লক্ষ্য করে পাভেল আরও ফুলে উঠল।

'আমি ঘোড়াও কিনব — জ্যান্ত, সত্যিকারের ঘোড়া! ঘোড়ায় চেপে স্কুলে যাব!..'

এই ভাবনা ভেবে সে এত আনন্দ পেল যে হেসেই ফেলল, যদিও হাসিটা হল কেমন যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট — ঝলক দিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তোকে এখন আর কেউ মারবে না,' পাভেলের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মাশা ফস্ করে বলে বসল।

'সে রকম লোকজন ঠিকই মিলবে!' ইলিয়া জোরের সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল।

পাভেল তার দিকে তাকিয়ে নিজেকে জাহির করার জন্য ইলিয়ার উদ্দেশে এক পাশে থুতু ফেলে জিজ্ঞেস করল:

'তুই নাকি? লেগে দ্যাখ দেখি!'

এবারেও ইয়াকভ্ হস্তক্ষেপ করল।

'দ্যাখ্ ভাই কী অদ্ভুত!.. মানুষটা ছিল, হাঁটত, কথা বলত আর সব কিছুই... সকলের মতো — জ্যান্ত ছিল, মাথায় সাঁড়াশীর ঘা খেল — ব্যস্, খতম!..'

যে তিনটি ছেলে এখানে ছিল তারা সকলেই মনোযোগ দিয়ে ইয়াকভের দিকে তাকাল, ইয়াকভের চোখ কপালে উঠে এমন ভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আছে যে দেখলে হাসি পায়।

'হ্যাঁ!' ইলিয়া বলল। 'আমিও সে কথাই ভাবছি...'

'লোকে বলে — মরে গেছে,' নীচু গলায় রহস্য করে ইয়াকভ্ বলে চলল, 'কিন্তু মরে গেছে ব্যাপারটা কী?'

'আত্মা চলে গেছে,' বিষণ্ণ সুরে পাভেল ব্যাখ্যা করে বলল।

'স্বর্গে,' মাশা যোগ করল, ইয়াকভের কাছে ঘেঁসে সে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে ততক্ষণে তারা উঠেছে। সেগুলোর মধ্যে একটা আবার বিরাট, জ্বলজ্বলে, সেটা মিটমিট করছে না, মনে হচ্ছে যেন আর সব তারার চেয়ে মাটির অনেক কাছাকাছি, তার দিকে তাকাচ্ছে নিষ্প্রাণ, নিষ্পলক চোখে। মাশাকে লক্ষ্য করে ছেলে তিনটিও ওপরের দিকে মাথা তুলল। পাভেল এক পলক দেখেই দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল। ইলিয়া অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে, চোখে আতঙ্কের ভাব নিয়ে দেখতে লাগল, আর ইয়াকভের বড় বড় চোখ দুটো আকাশের নীলিমার মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল, বুঝি বা সে ওখানে কিছুর খোঁজ করছে।

'ইয়াকভ্!' ইয়াকভের বন্ধু মাথা নামিয়ে ওকে ডাকল।

'অ্যাঁ?'

'আমি কেবলই ভাবছি...' ইলিয়ার কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

'কি ভাবছিস?' ইয়াকভ্ মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি, ওরা কী রকম... একটা মানুষ খুন হয়ে গেল, ওরা কিন্তু দিব্যি

ঘোরাঘুরি করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, এটা ওটা নিয়ে কথা বলছে... কেউ কাঁদল না, কারও দুঃখ হল না...'

'ইয়েরেমেই কেঁদেছিল...'

'ও ঐ রকমই... কিন্তু পাভেল? ঠিক যেন রূপকথার গপ্প বলল...'

'ওটা ওর চাল... ওর কষ্ট হয়েছে ঠিকই, কেবল স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে। এই যে এখন দৌড়ে চলে গেল, আমার ত মনে হয় হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে!'

ওরা সকলে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে ঘন হয়ে চুপচাপ কয়েক মিনিট বসে থাকল।

মাশা ইয়াকভের কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল, তার মুখ তখনও আকাশের দিকে।

'তোর ভয় লাগছে?' ইয়াকভ্ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'লাগছে,' ইলিয়াও উত্তর দিল।

'এখন ওর ভূত এখানে আনাগোনা করতে থাকবে...'

'হ্যাঁ... মাশা ত ঘুমুচ্ছে...'

'ওকে ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার... নড়তে ভয় ভয় করছে...'

'চল্, একসঙ্গে যাই।'

ইয়াকভ্ ঘুমন্ত মেয়েটার মাথা নিজের কাঁধের ওপর রাখল, তার ছোট্ট রোগা শরীরটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, ফিসফিস করে বলল:

'দাঁড়া, ইলিয়া আমি আগে আগে যাই...'

ইয়াকভ্ বোঝার ভারে টলতে টলতে চলল আর ইলিয়া প্রায় তার বন্ধুর মাথার পেছনে নাক ঠেকিয়ে পিছু পিছু চলল। তার মনে হতে লাগল অদৃশ্য কে একজন যেন তার পেছন পেছন আসছে, তার ঘাড়ের ওপর ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলছে, এই বুঝি তাকে ধরে ফেলল। ইলিয়া বন্ধুর পিঠে ধাক্কা দিয়ে শোনা যায় কি যায় না এমনি স্বরে ফিসফিস করে তাকে বলল:

'জলদি চল!..'

এই ঘটনার পর ইয়েরেমেই দাদুর শরীরটা খারাপ যেতে লাগল। সে এখন একেবারেই কালে-ভদ্রে কাগজ-নেকড়া কুড়োতে যায়, ঘরে থাকে, মনমরা

হয়ে উঠোনে পায়চারি করে কিংবা তার অন্ধকার খোঁড়লে পড়ে থাকে। বসন্ত এসে গেল, যে দিন যে দিন আকাশে ঈষদুষ্ণ সূর্যের কোমল দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সেই দিনগুলোতে দাদু কোথাও বসে বসে রোদ পোহায়, চিন্তাগ্রস্ত মনে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে আঙ্গুলে কী যেন গোনে। বাচ্চাদের কাছে রূপকথা এখন সে কদাচিৎ বলে আর বলেও আগের চেয়ে খারাপ। বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ কাশতে থাকে। বুকের মধ্যে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়, যেন কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাশা রূপকথা সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসত, কিন্তু তাকেও বলতে হত:

'থাক গে!..'

'দাঁড়া!..' হাঁসফাঁস করতে করতে বুড়ো বলত। 'এক্ষুনি... এই চলে গেল বলে...'

কিন্তু কাশি আর যায় না, বরং বুড়োর শুকনো শরীর ধরে ক্রমেই আরও জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। কখনও কখনও ছেলেমেয়েরা রূপকথা শেষ হওয়ার জন্য আর অপেক্ষা না করেই এদিক ওদিক চলে যেত, ওরা যখন চলে যেত তখন দাদু রীতিমতো করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাত।

ইলিয়া লক্ষ্য করল যে দাদুর রোগ বার-কর্মচারী পেত্রুখা আর তেরেন্‌তি কাকাকে বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলছে। পেত্রুখা দিনের মধ্যে কয়েক বার করে সরাইখানার খিড়কির সামনে হাজির হয়ে তার ছাইরঙা উৎফুল্ল দুই চোখ মেলে বুড়োকে খুঁজত, দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করত:

'কী খবর দাদু? এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে কি?'

লোকটা শক্ত গোছের, গোলাপী রঙের ছিটের জামা গায়ে দিয়ে সে বনাতের তৈরি চওড়া প্যান্টের পকেটে দুহাত গুঁজে ঘুরে বেড়াত। প্যান্টের নীচের দিক ছোট ছোট কুঁচি দিয়ে তার চকচকে হাইবুটের মধ্যে গোঁজা থাকত। পকেটে সব সময় টাকা-পয়সার ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ হত। তার গোল মাথাটার কপালের দিক থেকে ইতিমধ্যে টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু মাথায় এখনও বেশ কিছু বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল আছে, মাথার সেই চুলগুলোকে সে সবেগে নাড়াত। ইলিয়া ওকে আগেও পছন্দ করত না, এখন কিন্তু তার বিতৃষ্ণা বেড়েই গেল। ইলিয়া জানত যে পেত্রুখা ইয়েরেমেই দাদুকে পছন্দ করে না। এক দিন সে শুনতে পায় বার-কর্মচারীটি তেরেন্‌তি কাকাকে শেখাচ্ছে:

'তুই, তেরেন্‌তি, ওর দিকে নজর রাখবি। লোকটা — কিপ্টে!.. ওর বালিশের খোলের মধ্যে বেশ কিছু টাকা-পয়সা জমা থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। নজর রাখিস! বুড়ো ছুঁচোটার আর বেশি দিন আয়ু নেই। ওর সঙ্গে তোর খাতির আছে, ওর তিনকুলে কেউ নেই!.. মাথা খাটিয়ে কিছু কর বাবা মদন!..

ইয়েরেমেই দাদু আগের মতোই সরাইখানায় তেরেন্‌তির কাছে সন্ধে কাটায়, কুঁজোর সঙ্গে ভগবান প্রসঙ্গে ও ঐহলৌকিক বিষয় সম্পর্কে কথাবার্তা বলে। শহরে থেকে থেকে কুঁজো দেখতে আরও কদাকার হয়েছে। কাজের চাপে সে যেন কেমন মিইয়ে গেছে। তার চোখ দুটো হয়েছে ঘোলাটে, ভীতু ভীতু, শরীরটা যেন সরাইখানার গরমে গলেই গেছে। ময়লা জামা বার বার কুঁজের ওপর উঠে যাওয়ায় কোমরের দিকটা খালি দেখায়। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে তেরেন্‌তি সব সময় হাত দুটো পিঠের দিকে রাখে, চটপট হাত বুলিয়ে গায়ের জামা ঠিকঠাক করে নেয় — দেখে মনে হয় সে তার কুঁজের মধ্যে বুঝি কিছু লুকোচ্ছে।

ইয়েরেমেই দাদু যখন উঠোনে বসে থাকত তখন তেরেন্‌তি দেউড়িতে বেরিয়ে আসত, কপালে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে, চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাত। তার ছুঁচালো মুখের ওপর হলদেটে দাড়ির গোছা কেঁপে উঠত, সে অপরাধী অপরাধী গলায় জিজ্ঞেস করত:

'ইয়েরেমেই দাদু! কিছু লাগবে কি?'

'ধন্যবাদ!.. লাগবে না... কিছু লাগবে না...' বুড়ো উত্তর দিত।

কুঁজো ধীরে ধীরে লিকলিকে ঠ্যাঙে উল্‌টো দিকে ফিরে চলে যেত।

'আমার আর ভালো হওয়ার আশা নেই,' ইয়েরেমেই প্রায়ই বলত। 'মরার সময় হয়েছে দেখা যাচ্ছে!'

এক দিন নিজের খোঁড়লে শুতে যেতে যেতে কাশির দমকের পর সে বিড়বিড় করে উঠল:

'বড় তাড়াতাড়ি ডাক পড়ল, ভগবান! আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি!.. কত বছর ধরেই না টাকা জমালাম... গির্জার জন্যে। আমাদের গাঁয়ে। লোকের দরকার দেবতার মন্দির, আমাদের আশ্রয়... সামান্যই জমাতে পেরেছি... হা ভগবান! গন্ধ পেয়ে শকুন উড়ছে!.. ইলিয়া, তুই জানলি, আমার টাকা আছে... কাউকে বলিস না! বুঝলি?..'

বুড়োর প্রলাপ শোনার পর ইলিয়ার মনে হল সে যেন এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, শকুনটা যে কে তা আর তার বুঝতে বাকি রইল না।

কয়েক দিন বাদে স্কুল থেকে ফিরে এসে নিজের জায়গায় জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে ইলিয়া শুনতে পেল ইয়েরেমেই ফোঁসফোঁস আর ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে — যেন কেউ তার গলা টিপে ধরেছে:

'হু-শ্-শ্... সরে যা!..'

ইলিয়া ভয়ে দাদুর দরজায় ঘা মারল — দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল দ্রুত গলার ফিসফিস আওয়াজ:

'হুশ্! ভগবান... রক্ষা কর... রক্ষা কর...'

ইলিয়া দরজার জোড়ের ফাঁকে মুখ ঠেকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল, ভালোমতো লক্ষ্য করে দেখতে পেল বুড়ো চিত্ হয়ে তার বিছানার ওপর পড়ে দুহাত ঝাপ্টাচ্ছে।

'দাদু!' ইলিয়া ব্যাকুল হয়ে চেঁচিয়ে ডাকল।

বুড়ো কেঁপে উঠে মাথাটা একটু উঁচু করে জোরে জোরে বিড়বিড় করতে লাগল:

'পেত্রুখা... দ্যাখ্... এটা ভগবানের জন্যে! তাঁর জন্যে রাখা! এটা — মন্দিরের জন্যে... হুশ্... তুই একটা শকুন... ভগবান... তোমার জিনিস... তুমিই দেখো... দয়া কর... দয়া কর...'

ইলিয়া ভয়ে কাঁপতে লাগল, কিন্তু অসহায় ভাবে শূন্যে দুলতে দুলতে ইয়েরেমেইয়ের কালো শুকনো হাত বঁড়শীর মতো আঙুল তুলে শাসাচ্ছে দেখতে পেয়ে সে আর যেতে পারল না।

'দ্যাখ — দেব্তার জিনিস!.. অমন কাজ করিস নে!..'

তারপর দাদু একেবারে গুটিসুটি মেরে গেল — হঠাৎ খাটের ওপর উঠে বসল। উড়ন্ত পায়রার ডানার মতো তার সাদা দাড়ি ঝটপট করতে লাগল। সে সামনের দিকে হাত বাড়াল, হাত দিয়ে কাকে যেন সজোরে ঠেলে ফেলে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠে ছুট দিল। তার পেছন পেছন ধাওয়া করে কানের মধ্যে শোঁশোঁ বাজতে থাকে:

'হু-শ্-শ্...'

ইলিয়া দৌড়ে সরাইখানায় এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচাল:

'মারা গেছে...'

তেরেন্‌তি আঁতকে উঠল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে লাগল। পেত্রুখা দাঁড়িয়ে ছিল কাউণ্টারের ওপাশে, তার দিকে তাকিয়ে তেরেন্‌তি থতমত খেয়ে জামাটা টেনে ঠিক করতে লাগল।

'বটে!' পেত্রুখা ক্রুশ করে গম্ভীর স্বরে বলল। 'ওর আত্মার সদ্‌গতি হোক! বুড়ো লোকটা ভালো ছিল বটে, ভালো কথা... একবার গিয়ে দেখে আসি... ইলিয়া, তুই একটু এখানে থাক। কোন কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকিস — বুঝলি? ইয়াকভ্‌, তুই কাউণ্টারে দাঁড়া...'

হিলের ভয়ানক খটখট আওয়াজ তুলে পেত্রুখা ধীরেসুস্থে এগিয়ে গেল... ছেলে দুটি শুনতে পেল দরজার ওপাশ থেকে সে কুঁজোকে বলল:

'চলে আয়, চলে আয় — বুদ্ধির ঢেঁকি!..'

ইলিয়া খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চার দিকে যা ঘটছিল তা লক্ষ্য করার মতো বুদ্ধি সে তার ফলে হারায় নি।

'ও কী ভাবে মরল তুই দেখেছিস?' ইয়াকভ্‌ কাউণ্টারের ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে উত্তরে পাল্‌টা প্রশ্ন করল:

'ওরা ওখানে গেল কেন?..'

'দেখতে!.. তুই ওদের ডাকলি যে!..'

ইলিয়া শক্ত করে চোখ বুঁজে বলল:

'ওঃ, কী ধাক্কাটাই না ওকে দিল!..'

'কাকে?' কৌতূহলবশে গলা বাড়িয়ে ইয়াকভ্‌ জিজ্ঞেস করল।

'শয়তানকে!' ইলিয়া একটু থেমে উত্তর দিল।

'তুই শয়তানকে দেখেছিস?' ওর দিকে ছুটে এসে চাপা গলায় চিৎকার করে ইয়াকভ্‌ বলল। ওর বন্ধু কিন্তু উত্তর না দিয়ে চোখ বুঁজল।

'ভয় পেয়েছিস?' ওর আস্তিনে টান দিয়ে ইয়াকভ্‌ জিজ্ঞেস করল।

'দাঁড়া!' ইলিয়া হঠাৎ বলে উঠল। 'আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি... তুই তোর বাবাকে বলিস না — বুঝলি?'

একটা কিছু আঁচ করতে পারার তাড়নায় সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গিয়ে পেঁাছুল মাটির নীচের তলায়, ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে গুড়ি মেরে সে দরজার ফাটলের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার দরজার সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়াল। দাদু

তখনও বেঁচে আছে — ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে। কালো কালো দুটি মূর্তির পায়ের কাছে তার দেহটা গড়াগড়ি যাচ্ছে।

অন্ধকারে দুটো মূর্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা বিশাল কদাকার মূর্তি ধারণ করেছে। ইলিয়া নিরীক্ষণ করে দেখতে পেল বুড়োর বিছানার ওপর হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে কাকা চটপট বালিশ সেলাই করছে। কাপড়ে সুতো ফোঁড় দেওয়ার খস্খস্ শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। তেরেন্তির পেছনে দাঁড়িয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে পেত্রুখা ফিসফিস করে বলছে:

'চটপট! পইপই করে বললাম আগে থেকে ছুঁচসুতো তৈরি করে হাতে রাখ... তা না, এখানে এসে সুতো পরাতে হল... ওঃ, কী বলব!'

পেত্রুখার ফিসফিসানি, মুমূর্ষুর দীর্ঘশ্বাস, সুতোর খস্খস্ আওয়াজ, জানলার সামনে চৌবাচ্চায় বিন্দু বিন্দু জল পড়ার করুণ একঘেয়ে শব্দ — সব মিলে এমন একটা চাপা কোলাহল উঠল যে তাতে ছেলেটির বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা হল। সে ধীরে ধীরে দেয়াল থেকে সরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। বিশাল এক কালো বিন্দু চাকার মতো তার চোখের সামনে ঘুরতে ঘুরতে হুস্হুস্ আওয়াজ করতে লাগল। ও জোর করে রেলিং আঁকড়ে ধরে সিঁড়ি বেয়ে চলল, অতি কষ্টে পা ফেলে ফেলে দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, নীরবে কাঁদতে লাগল। ইয়াকভ্ তার সামনে ছটফট করে ঘুরছিল আর তাকে কী সব বলছিল। তারপর সে পিঠে একটা ধাক্কা অনুভব করল, শুনতে পেল পেরফিশ্কার গলা:

'কে — কাকে? কী দিয়ে — কেন? মরে গেছে? ওঃ, কী সাঙ্ঘাতিক!..' বলেই ইলিয়াকে আবার ঠেলা দিয়ে মুচি এমন বেগে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে লাগল যে তার পায়ের চাপে সিঁড়ি মড়মড় করে উঠল। কিন্তু নীচে পৌঁছুতে সে গলা ছেড়ে করুণ আর্তনাদ জুড়ে দিল:

'ওঃ-হো-হো!'

ইলিয়া শুনতে পেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে কাকা ও পেত্রুখা, ওদের সামনে কাঁদার ইচ্ছে তার ছিল না, কিন্তু সে চোখের জল সামলাতে পারল না।

'বটে!..' পেরফিশ্কা অবাক হয়ে বলল। 'তার মানে এর মধ্যেই তোমরা ওখানে হানা দিয়ে এসেছ?'

তেরেন্তি ভাইপোর দিকে না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পেত্রুখা ইলিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল:

'কাঁদছিস? তা ভালো... তার মানে, তুই ছেলেটা উপকারীর কদর দিতে জানিস, কিসে তোর ভালো হয় তা বুঝতে পারিস। বুড়ো তোর খু-উ-ব ভালো চাইত রে!..'

তারপর ইলিয়াকে আস্তে করে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল:

'তা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকিস না কিন্তু...'

ইলিয়া তার জামার আস্তিনে মুখ মুছে সকলের দিকে তাকাল। পেত্রুখা ততক্ষণে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে মাথার কোঁকড়া চুল ঝাঁকাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে পেরফিশ্‌কা ধূর্তের মতো হাসছে। কিন্তু হাসি সত্ত্বেও তার মুখের ভাবটা এমন যেন এইমাত্র সে জুয়ায় তার শেষ পাঁচ কোপেকটিও হারিয়েছে।

'তা তোর কী চাই রে পেরফিশ্‌কা?' ভুরু কুঁচকে কঠিন স্বরে পেত্রুখা জিজ্ঞেস করল।

'বখশিশ মিলবে না?' পেরফিশ্‌কা বলল।

'কোন সুবাদে শুনি?' টেনে টেনে ধমকের সুরে পেত্রুখা জিজ্ঞেস করল।

'ওঃ!' মেঝের ওপর পা ঠুকে মুচি চেঁচিয়ে উঠল। 'তা ত বটেই। বেল পাকলে কাকের আশা কী? যাক গে — আপনার মঙ্গল হোক পিওত্‌র ইয়াকিমিচ্‌!'

'কী বকবক করছিস?' আপসের সুরে পেত্রুখা জিজ্ঞেস করল।

'আমি — এই অমনি, সাদা মন নিয়ে বলেছিলাম আর কি!'

'দাঁড়াচ্ছে এই, তোকে এক গেলাস মদ দিই — তাই বলতে চাস বুঝি? হে-হে!'

'হা, হা, হা!' মুচির হাসির রোলে গোটা সরাইখানা গমগম করে উঠল।

ইলিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। সে এমন ভাবে মাথা ঝাঁকাল যে মনে হল মাথা থেকে বুঝি কিছু ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সে নিজের কুঠুরিতে না শুয়ে সরাইখানায়, যে টেবিলে তেরেন্‌তি বাসন ধুত, তার নীচে শুয়ে পড়ল। কুঁজো তার ভাইপোকে শুইয়ে নিজে টেবিল মুছতে লাগল। বারের ওপর আলোটা জ্বলছিল, তাতে তাকের ওপরের পেটমোটা টী-পট আর বোতলগুলোর একেকটি পাশ চকচক করছে। সরাইখানায় অন্ধকার, জানলায় টপ্‌টপ্‌ করে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির জল পড়ছে, হুহু হাওয়া বইছে... তেরেন্‌তি ভারী নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে টেবিলগুলো সরাচ্ছিল — তাকে দেখাচ্ছিল এক বিরাট সজারুর মতো। সে যখন বাতির

কাছাকাছি চলে আসছিল তখন মেঝের ওপর তার ঘন কালো ছায়া পড়ছিল — ইলিয়ার মনে হচ্ছিল যেন ইয়েরেমেই দাদুর ভূত বেরিয়ে এসে ফোঁসফোঁস করে কাকাকে বলছে:

'হুশ্-শ্!..'

ইলিয়ার ঠান্ডা লাগছিল, ভয় ভয় করছিল। সোঁদা সোঁদা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল — দিনটা ছিল শনিবার, মেঝে সবে ধোয়া হয়েছে, সেখান থেকে মাটির গন্ধ উঠছিল। তার ইচ্ছে করছিল কাকাকে বলে তাড়াতাড়ি করে টেবিলের নীচে তার পাশে শুয়ে পড়তে, কিন্তু বেদনাদায়ক ও খারাপ ধরনের একটা অনুভূতিবশত সে কাকার সঙ্গে কথাই বলতে পারল না। কল্পনায় সে দেখতে পেল ইয়েরেমেই দাদুর কোলকুঁজো চেহারা, তার সাদা দাড়ি, মনে মনে শুনতে পেল দাদুর ভাঙা ভাঙা কোমল কণ্ঠস্বর:

'প্রভুই বিচার করবেন!.. ভাবনার কিছু নেই!..'

'শুয়ে পড়লেই ত পার!' আর সহ্য করতে না পেরে ইলিয়া আর্ত স্বরে বলল।

কুঁজো চমকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর মিনমিন করে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল:

'এই শুচ্ছি! এক্ষুনি!..' বলে সে টেবিলগুলোর আশেপাশে তড়বড় করে লাটিমের মতো ঘুরতে লাগল। কাকারও ভয় লাগছে বুঝতে পেরে ইলিয়া মনে মনে বলল:

'ঠিক হয়েছে!..'

টপটপ করে বৃষ্টির ফোঁটা আওয়াজ তুলছে। আলোর শিখাটা কাঁপছে এবং টী-পট আর বোতলগুলো নিঃশব্দে হাসছে। কাকার লোমের কোটটা দিয়ে মাথা ঢেকে ইলিয়া নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। কিন্তু তার পাশে কে যেন ঘুরঘুর করছে মনে হল। ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল, মাথা বাড়িয়ে দেখল তেরেন্তি নতজানু হয়ে বসে আছে, তার মাথাটা এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে চিবুক বুকের ওপর এসে ঠেকেছে; সে ফিসফিস করে বলছে:

'হে প্রভু!.. দয়াময়!'

ফিসফিসানিটা শোনাচ্ছিল ইয়েরেমেই দাদুর গলার ঘড়ঘড় আওয়াজের মতো। ঘরের অন্ধকার কেমন যেন নড়ে উঠল, সেই সঙ্গে মেঝেটা দুলতে লাগল, চিমনির মধ্যে শোনা গেল বাতাসের হুহু আর্তনাদ।

'ভগবানের নাম করতে হবে না!' ইলিয়া তীক্ষ্ন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

'বলিস কী রে?' কুঁজো অস্ফুট স্বরে বলল। 'ঘুমো, খ্রীস্টের দোহাই!'

'ভগবানের নাম করতে হবে না!' ইলিয়া জোর দিয়ে আবার বলল।

'আচ্ছা আচ্ছা, করব না!..'

অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে ভাব আরও ভারী হয়ে ইলিয়ার ওপর চেপে বসল, ওর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, বুকের ভেতরে টগবগ করছিল আতঙ্ক, দাদুর জন্য দুঃখ, কাকার প্রতি ক্রোধ। সে মেঝের ওপর ছটফট করতে লাগল, উঠে বসে গোঙাতে লাগল।

'কী হল? কী হল রে তোর!..' কাকা দুহাতে ওকে চেপে ধরে ভয় পেয়ে ফিসফিস করে বলল। ইলিয়া তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, হতাশা ও আতঙ্কের সুরে কাঁদ কাঁদ গলায় সে বলল:

'ভগবান! কোথাও গিয়ে যদি লুকিয়েও পড়তে পারতাম... হা ভগবান!'

কান্নায় তার গলা বুজে এলো। সে কষ্ট করে ভ্যাপসা বাতাস টেনে নিল, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এই ঘটনার পর ছেলেটার স্বভাব একেবারে পাল্‌টে গেল। আগে সে কেবল স্কুলের ছেলেদেরই এড়িয়ে যেত, তাদের কাছে হার মানার এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ারও কোন ইচ্ছে তার ছিল না। তবে বাড়িতে সে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করত; বড়দের মনোযোগে সে সন্তুষ্ট হত। এখন সে সকলের সঙ্গে একই রকম আচরণ করতে লাগল, বয়সের তুলনায় গম্ভীর হয়ে পড়ল। তার মুখের আর লালিত্য নেই, ঠোঁট দুটি আঁট হয়ে চেপে বসেছে, সে বড়দের ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখে এবং তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে চাপা উত্তেজনায় তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইয়েরেমেই দাদু যে দিন মারা যায় সে দিন ও যা দেখেছিল তা স্মরণ করে ওর মন ভার হয়ে যায়, পেত্রুখা আর কাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বুড়োর কাছে অপরাধী বলে মনে হয়। মারা যাওয়ার সময় দাদুর ওপর যে ডাকাতি করা হয়েছিল তা দেখে হয়ত বা দাদুর ধারণা হয় যে ইলিয়াই পেত্রুখাকে টাকার কথা বলে দিয়েছে। ইলিয়ার অলক্ষ্যে এ রকম একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে বাসা বাঁধল, শোকের ভারে বালকের মন আছন্ন হয়ে পড়ল আর লোকজনের প্রতি সন্দিগ্ধ মনোভাব ক্রমেই বাড়তে লাগল। লোকের মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পেলে তার মন

হালকা হয়ে যেত — যেন দাদুর সামনে ওর নিজের অপরাধের ভার তাতে লাঘব হল।

। খারাপ অনেকই সে দেখতে পেত। এ বাড়ির সকলে বার কাউণ্টারের কর্মচারী পেত্রুখাকে চোরাই মালের দালাল ও ঠক নাম দিয়েছে কিন্তু তার সামনে সকলেই গদগদ, শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নোয়ায়, সম্বোধন করে পুরো নাম ধরে — পিওত্র ইয়াকিমিচ্ বলে। মাতিৎসা মাগীকে লোকে যা-তা বলে গালাগালি দেয়; মদে চুর হয়ে থাকলে তাকে ধাক্কা দেয়, প্রহার করে। একবার ত মাতাল অবস্থায় সে রান্নাঘরের জানলার নীচে বসলে রাঁধুনী এক গাদা বাসনধোয়া জল তার গায়ের ওপর ঢেলে দেয়। সকলেই সব সময় তার সাহায্য নিচ্ছে অথচ গালিগালাজ ও মারধোর ছাড়া আর কোন পুরস্কার তার কপালে জুটছে না। পেরফিশ্‌কার অসুস্থ স্ত্রীকে ধোয়ানো-মোছানোর জন্য তার ডাক পড়ে, পেত্রুখা তাকে দিয়ে উৎসবের আগে বিনা পয়সায় সরাইখানা সাফ করিয়ে নেয়, তেরেন্‌তির জন্য সে জামা সেলাই করে দেয়। সে সকলের কাজ করে, মুখ বুঁজে এবং ভালোভাবে কাজ করে, রোগীর সেবা করতে ভালোবাসে, বাচ্চাদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসে...

ইলিয়া দেখল এই বাড়ির সবচেয়ে কাজের লোক — মুচি পেরফিশ্‌কা — সকলের হাসির পাত্র, তার ওপর লোকের নজর পড়ে একমাত্র তখনই, যখন সে অ্যাকর্ডিয়ান হাতে সরাইখানায় বসে কিংবা আমুদে হাসির গান বাজিয়ে ও গেয়ে উঠোনময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কিন্তু এই পেরফিশ্‌কা যে কত যত্নে তার পঙ্গু স্ত্রীকে দেউড়িতে বার করে আনে, মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর সময় চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে, তার সঙ্গে কৌতুক করে, মজার মজার মুখভঙ্গি করে — সে খোঁজ কেউ রাখতে চায় না। কেউই মুচির দিকে নজর দিত না যখন সে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে মাশাকে রান্না করতে ও ঘর পরিষ্কার করতে শেখায়, তারপর কাজ করতে বসে, গভীর রাত অবধি ঘাড় মাথা গুঁজে তোবড়ানো, নোংরা জুতো সেলাই করে।

কামারকে যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হল তখন মুচি ছাড়া আর কেউ তার ছেলেকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সে তৎক্ষণাৎ পাভেলের ভার নিল, পাভেল মোম দিয়ে সুতো পাকাত, ঘর ধুত, জল আনত, রুটি, পানীয় ও পেঁয়াজ কেনার জন্য দোকানে যেত। সকলেই মুচিকে উৎসবের দিনে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পেত, কিন্তু কেউই শুনত না পর দিন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে যখন

তার বৌকে বলত:

'তোর কাছে আমি মাফ চাইছি দুনিয়া, আমি একটা হদ্দ মাতাল বলে মদ খাই না কিন্তু, খাই — খেটে খেটে হয়রান হয়ে পড়ি বলে। সারাটা হপ্তা কাজ করি — খারাপ লাগে! তাই — কী আর করি।'

'তোমাকে কি আমি দোষ দিচ্ছি? হা ভগবান! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়!' ভাঙা ভাঙা গলায় বৌ বলে, তার গলার ভেতরটা কেমন জড়িয়ে আসে। 'তুমি কি ভাব তোমার খাটুনি আমি দেখতে পারছি না? ভগবান তোমার কাঁধের ওপর বোঝা জুটিয়েছেন আমাকে! মরণও হয় না!.. মরলে তোমার ভার হাল্কা হত!..'

'এমন কথা বলিস না! তোর এই সব কথা আমি পছন্দ করি না। তুই আমাকে মনে কষ্ট দিস নি, আমিই তোকে দিয়েছি!.. তবে সেটা আমি তোর ওপর রাগ করে দিই নি, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি বলে। দাঁড়া না, এক দিন আমরা অন্য রাস্তায় উঠে যাব, তখন সব কিছু অন্য রকম হতে থাকবে — জানলা, দরজা — সব হবে! জানলাগুলো হবে রাস্তার মুখোমুখি। কাগজ কেটে জুতো বানিয়ে কাচের ওপর এঁটে দেব। সাইনবোর্ড হবে! আমাদের ওখানে লোক ভেঙে পড়বে! জোর কাজ চলবে! হুঁ হুঁ! ফুঁ দাও, পেটাও — কয়লা যোগাও! কাটছে তোফা, বনছে টাকা!'

পেরফিশ্কার জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ইলিয়ার জানা ছিল, সে দেখতে পেত লোকটা কেমন মাথা কুটে মরছে এবং পেরফিশ্কা যে সব সময় সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছে, অপূর্ব সুন্দর অ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছে তার জন্য ইলিয়া ওকে শ্রদ্ধা করত।

এদিকে পেত্রুখা বারের পেছনে বসে থাকত, ঘুঁটি খেলত, সকাল থেকে সন্ধে অবধি চা খেত, ওয়েটারদের ওপর চোটপাট করত। ইয়েরেমেই মারা যাওয়ার কিছু পর পরই সে তেরেন্তিকে বার কাউন্টারে বসানো অভ্যাস করাতে শুরু করল, আর নিজে চার দিক থেকে বাড়ি নিরীক্ষণ করতে করতে, দেয়ালে ঘুষি মেরে শিস দিতে দিতে উঠোনে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

ইলিয়া অনেক কিছুই লক্ষ্য করল, কিন্তু সবই ছিল খারাপ, মন খারাপ করার মতো, লোকের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার মতো। কখনও কখনও নানা ঘটনার ছাপ তার মনের মধ্যে জমা হত, অদম্য ইচ্ছে জাগত কারও না কারও সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু কাকার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি আর হত না:

ইয়েরেমেই মারা যাওয়ার পর ইলিয়া ও কাকার মাঝখানে অদৃশ্য অথচ দুস্তর এক ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেল যার ফলে সে আগের মতো স্বচ্ছন্দে ও ঘনিষ্ঠ ভাবে কুঁজোর কাছে ঘেঁসতে পারত না। ইয়াকভ্‌ও তাকে কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে না, সে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব ধরনে চলতে থাকে।

বুড়োর মৃত্যুতে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। বুড়োর কথা মনে করে প্রায়ই তার চেহারায় ও সুরে বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে।

'কেমন একঘেয়ে লাগে!.. ইয়েরেমেই দাদু বেঁচে থাকলে আমাদের রূপকথা শোনাত। রূপকথার চেয়ে ভালো আর কী আছে!'

একদিন ইয়াকভ্‌ রহস্য করে বন্ধুকে বলল:

'দেখবি, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব? কেবল, আগে দিব্যি কর — বল, ভগবানের দিব্যি!'

ইলিয়া দিব্যি করল, তখন ইয়াকভ্‌ তাকে নিয়ে গেল উঠোনের কোনায়, বুড়ো লিণ্ডেন গাছটার কাছে। সেখানে গুঁড়ির গায়ে কায়দা করে এক টুকরো বাকল লাগানো ছিল, ও সেটাকে খসিয়ে নিতে তার নীচে গাছের মধ্যে একটা বড় ফোকর দেখা দিল। দেখা গেল গাছের কোটরকে ছুরি দিয়ে বড় করা হয়েছে; নানা রঙের কাপড়ের টুকরো, কাগজ, চায়ের মোড়ক আর রাংতা দিয়ে ভেতরটা পরিপাটি সাজানো। গর্তটার গভীরে ছিল তামায় ঢালাই করা ছোট্ট একটি মূর্তি আর তার সামনে শক্ত করে বসানো মোমবাতির পোড়া টুকরো।

'দেখলি?' ইয়াকভ্‌ জিজ্ঞেস করল। আবার সে বাকলের টুকরোটা ওপরে লাগিয়ে রাখল।

'এটা কী জন্যে?'

'গির্জা-ঘর!' ইয়াকভ্‌ বুঝিয়ে বলল। 'রাতে এখানে চুপিচুপি এসে ভগবানের নাম করব... বেশ হবে, তাই না?'

বন্ধুর আইডিয়াটা ইলিয়ার মনে ধরল, কিন্তু তক্ষুনি সে এ খেয়ালের বিপদও টের পেল।

'কিন্তু কেউ যদি আলো দেখে ফেলে? তোর বাবা তখন তোকে ধোলাই দেবে!..'

'রাতে — কে আর দেখতে পাবে? রাতে সকলে ঘুমোয়; দুনিয়ার কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। আমি — ছোট: দিনের বেলায় আমার প্রার্থনা ভগবানের কানে যায় না... কিন্তু রাতে শোনা যাবে ত!.. যাবে?'

'জানি না!.. ভগবান শুনলেও শুনতে পারেন!..' বন্ধুর বড় বড় চোখ আর ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে সে বলল।

'তুই আমার সঙ্গে প্রার্থনা করবি?' ইয়াকভ্ জিজ্ঞেস করল।

'কিন্তু তুই কী নিয়ে প্রার্থনা করতে চাস? আমি প্রার্থনা করতে চাই যেন আমার বিদ্যেবুদ্ধি হয়... আর চাই — আমার যা খুশি সে সবই যেন পাই!.. কিন্তু তুই?'

'আমিও...'

তারপর একটু ভেবে ইয়াকভ্ বলল:

'আমি অবশ্য সে রকম কোন কিছুর জন্যে নয় — অমনি অমনি... স্রেফ ভগবানকে ডাকা আর কি — আর কিছু না!.. তারপর তিনি যা করার করবেন!.. যা দেওয়ার দেবেন...'

তারা ঠিক করল সেই রাত থেকেই প্রার্থনা করবে। দুজনেই মাঝরাতে জেগে উঠবে এমন একটা দৃঢ় বাসনা নিয়ে ঘুমুতে গেল। কিন্তু সে রাতে ত তারা জাগলই না, পরের রাতেও না এবং এই ভাবে প্রতিটি রাতই তারা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। পরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ইলিয়ার মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে গির্জা-ঘরের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

যে গাছটায় ইয়াকভ্ গির্জা-ঘর বানিয়েছিল তারই ডালে পাভেল দোয়েল ও নীলকণ্ঠ পাখি ধরার ফাঁদ ঝুলিয়েছিল। তার জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সে রোগা, হাড্ডিসার হয়ে পড়ে। উঠোনে ছুটোছুটি করার ফুরসৎ তার ছিল না — সারা দিন সে পেরফিশ্কার কাছে কাজ করত, কেবল পালপার্বণের দিনে মুচি মাতাল হয়ে গেলে বন্ধুবান্ধবরা তার দেখা পেত। পাভেল তাদের জিজ্ঞেস করত স্কুলে তারা কী পড়াশুনা করে। বন্ধুরা যখন তার ওপর নিজেদের পুরোপুরি শ্রেষ্ঠতা জাহির করে গল্প করত তখন পাভেল হিংসেয় ভুরু কোঁচকাত।

'অত চাল মারতে হবে না — আমিও লেখাপড়া শিখব!..'

'পেরফিশ্কা ত তোকে ছাড়বে না!..'

'আমি পালাব,' দৃঢ়তার সঙ্গে পাভেল বলত।

সত্যি সত্যিই, এর কিছু পর পরই একদিন মুচি মৃদু হেসে বলল:

'আমার সাকরেদ, বিচ্ছুটা ত ভেগেছে!..'

বাদলা দিন। ইলিয়া উস্কোখুস্কো পেরফিশ্কার দিকে, থমথমে ধূসর

আকাশের দিকে তাকাল। বন্ধুর জন্য তার দুঃখ হল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে সরাইয়ের বাইরে চালার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল, বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল — তার মনে হচ্ছিল বাড়িটা যেন ক্রমে নীচু হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বুড়োর হাড়পাঁজরগুলো ক্রমেই এমন ভাবে বেরিয়ে আসছে যেন তার ভেতরে এতকালের জমা ধুলোমাটি বাড়িটাকে চৌচির করে দিচ্ছে, সে আর তা ধরে রাখতে পারছে না। সারা জীবন মাতালের হল্লা, মাতালের গানের হা-হুতাশ শুষতে শুষতে আগাগোড়া দুঃখবেদনায় টস্‌টসে, মেঝের তক্তায় বহু পদাঘাতের ফলে জর্জরিত টলটলায়মান এই বাড়ির আর জীবনধারণের ক্ষমতা নেই — জানলার ঘোলাটে কাচ দিয়ে বিষণ্ন দৃষ্টিতে এই সাধের ধরণীর দিকে তাকাতে তাকাতে সে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিল।

'হুম্‌!' মুচি বলল। 'খোসাটা ফেটে পড়ল বলে, শিগ্‌গিরই ফুটির বীচি ছড়িয়ে পড়বে। আমরা, বাসিন্দারা, যে যে দিকে পারি ছড়িয়ে পড়ব... অন্যান্য জায়গায় নিজেদের ঠাঁই খুঁজব!.. খুঁজে নেব, আমাদের জীবনটা হবে অন্য রকম... সবই অন্য রকম হবে — জানলা-দরজা, এমনকি যে ছারপোকা আমাদের কামরায় তাও!.. যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো! এ জায়গাটা বিরক্তি ধরিয়ে দিল...'

মুচি বৃথাই স্বপ্ন দেখছিল: বাড়ি ফেটে চৌচির হল না, বাড়িটা কিনে নিল বার কাউণ্টারের কর্মচারী পেত্রুখা। কিনে নিয়ে সে দুদিন ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে এই পুরনো কাঠের গাদাটা নাড়াচাড়া করল, খোঁড়াখুঁড়ি করল। তারপর এলো ইঁট, তক্তা, বাড়ির চার দিকে ভারা উঠল এবং মাস দুয়েক ধরে কুঠারের আঘাতে বাড়িটা কাতরাতে লাগল, কাঁপতে লাগল। তার ওপর করাত চলল, তাকে কাটা হল, তার গায়ে পেরেক বেঁধানো হল, তার পচা হাড়পাঁজর মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ে চার দিকে ধুলোবালি উড়তে লাগল, তার জায়গায় নতুন নতুন লাগানো হতে লাগল এবং অবশেষে নতুন কোঠাবাড়ি দিয়ে বাড়িটাকে চওড়ায় বড় করার পর তার চার পাশে এক প্রস্থ তক্তা আঁটা হল। শক্ত গড়নের, চওড়া বাড়িটা এখন মাটিতে দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে, দেখে মনে হয় মাটির ভেতরে সে নতুন শিকড় ছড়িয়েছে। বাড়ির সামনের দেয়ালে পেত্রুখা এক বিরাট সাইনবোর্ড ঝোলাল — নীল জমিনের ওপর সোনালি অক্ষরে লেখা:

'পি. ইয়া. ফিলিমোনভের — বান্ধব আনন্দধাম'।

'ভেতরে কিন্তু সেই পচা!' পেরফিশ্‌কা বলল।

কথাটা শুনে ইলিয়া সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল। নতুন করে গড়া এই বাড়ি তার কাছে প্রবঞ্চনা বলে মনে হল। তার মনে পড়ল পাভেলের কথা — সে এখন অন্য জায়গায় বাস করছে, সে যা দেখছে তা সম্পূর্ণ অন্য রকম। মুচির মতো ইলিয়াও স্বপ্ন দেখত অন্য দরজা জানলার, অন্য লোকজনের। এখন বাড়িতে থাকা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। পুরনো লিন্ডেন গাছটাকে কেটে ফেলা হয়েছে, তার পাশে যে নিরিবিলি কোণটা ছিল তা গেছে, সেখানে জায়গা নিয়েছে দালান কোঠা। আরও যে সব জায়গায় ছেলেরা বসে বসে কথাবার্তা বলতে ভালোবাসত সেগুলোও গেছে। কেবল কামার-শালার জায়গায়, কাঠের টুকরো ও পচা কাঠের বিরাট গাদার পেছনে গড়ে উঠেছে একটা নিরালা জায়গা, কিন্তু সেখানে বসতে ভয় করে — সব সময় মনে হয় যে এই গাদার নীচে মাথা গুঁড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে সাভেলের বৌ।

পেত্রুখা তেরেন্‌তি কাকাকে নতুন ঘর দিল — বারের পেছনে একটা ছোট্ট কামরায় তার থাকার জায়গা হল। সবুজ ওয়াল পেপার মোড়া পাতলা পার্টিশন ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করত সরাইখানার যাবতীয় শব্দ, ভোদকার গন্ধ আর তামাকের ধোঁয়া। ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো হলে কী হবে মাটির তলার ঘরের চেয়েও খারাপ। কোঠাবাড়ির ছাইরঙা দেয়াল জানলার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আকাশ, সূর্য ও তারা আড়াল করে রেখেছে দেয়াল, অথচ মাটির তলার ঘরের জানলার সামনে হাঁটু মুড়ে দাঁড়ালে সেখান থেকে এ সবই দেখা যেত।

তেরেন্‌তি কাকার গায়ে চড়েছে বেগুনী রঙের জামা, তার ওপরে কোট। তার গায়ে কোটটা দেখে মনে হত যেন একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর ঝুলছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে বার কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন সে লোকজনের সঙ্গে 'আপনি আপনি' করে কথা বলে, কেমন যেন থেমে থেমে কর্কশ ও নীরস গলায় — ঠিক যেন ঘেট ঘেউ করছে। কাউন্টারের ওপার থেকে সে লোকজনের দিকে এমন চোখে তাকাত যে দেখে মনে হত কোন কুকুর প্রভুর সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে। ইলিয়াকে সে কিনে দিয়েছে ছাইরঙ্গা বনাতের কোর্তা, হাইবুট, ওভারকোট আর টুপি। এই জিনিসগুলো গায়ে দিলে বুড়োর কথা ওর মনে পড়ে যেত। কাকার সঙ্গে সে প্রায় কথাই বলে না, তার জীবন একঘেয়ে ভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল। অতি ঘন ঘন তার

মনে পড়ে যেতে লাগল গাঁয়ের কথা; এখন তার বেশ স্পষ্ট মনে হল যে ওখানে থাকা বরং ভালো ছিল: ওখানে জীবন অনেক শান্ত, অনেক বোধগম্য, অনেক সহজ-সরল। মনে পড়ল কেরজেনেৎসের ঘন বনের কথা, সংসারত্যাগী আন্তিপা সম্পর্কে তেরেন্তি কাকার মুখে শোনা বিবরণ আর আন্তিপাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার মাথায় খেলল অন্য চিন্তা — পাভেলকে নিয়ে চিন্তা। ও কোথায় আছে? হয়ত সেও বনে পালিয়ে গেছে, সেখানে গুহার মতো কিছু খুঁড়ে টুরে তার মধ্যে আছে। বনে বরফের ঝড় হুহু আওয়াজ তুলছে, নেকড়ের দল গর্জন করছে। শুনতে ভয় লাগে, আবার মধুরও বটে। আর শীতকালে, আবহাওয়া ভালো থাকলে, সেখানে সব কিছু রুপোর মতো ঝকঝক করে এবং এমন নিঝুম হয়ে পড়ে যে পায়ের নীচে বরফ ভাঙার মচমচ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে শোনা যায় কেবল নিজের হৃৎস্পন্দন।

শহরে সব সময় হৈ-হট্টগোল, ব্যাপার-স্যাপার বোঝা যায় না, এমনকি রাতেও শব্দের কামাই নেই। লোকে গান গায়, চেঁচায়, কাতরায়, গাড়োয়ানরা গাড়ি চালায়, তাদের ছেক্ড়া, ফিটন ও এক্কার খট্খট্ আওয়াজে জানলার শার্সি কাঁপতে থাকে। ছেলেরা স্কুলে নষ্টামি করে, বড়রা মুখ খারাপ করে, মারামারি করে, মাতলামি করে। সব লোক কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের — কেউ পেত্রুখার মতো জোচ্চোর, কেউ সাভেলের মতো নিষ্ঠুর কিংবা পেরফিশ্কা, তেরেন্তি কাকা ও মাতিৎসার মতো — গণনার মধ্যেই নয়। মুচির জীবনযাত্রার জন্য তাকে দেখে ইলিয়ার সবচেয়ে বেশি অবাক লাগত।

এক দিন সকালে ইলিয়া স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে, এমন সময় আলুথালু বেশে সরাইখানায় ঢুকে পেরফিশ্কা বার কাউণ্টারের সামনে দাঁড়াল, তেরেন্তির দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে অনিদ্রার ছাপ। বাঁ চোখটা কাঁপছে, সামান্য কোঁচকাচ্ছে, নীচের ঠোঁটটা হাস্যকর ভাবে ঝুলে পড়েছে। তেরেন্তি কাকা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মুচিকে তার রোজকার সকালের মাত্রা — তিন কোপেকের পানীয় গ্লাসে ভরে দিল। পেরফিশ্কা কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে নিয়ে সেটাকে মুখের মধ্যে উপুড় করে দিল, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো গাঁকগাঁক করল না, মুখ খারাপ করল না। সে আবার তার অদ্ভুত রকম কাঁপা কাঁপা বাঁ চোখে তেরেন্তির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তার ডান চোখটা ঘোলাটে, স্থির — যেন সে চোখে কোন দৃষ্টি নেই।

'আপনার চোখে কী হল?' তেরেন্‌তি জিজ্ঞেস করল।

পেরফিশ্‌কা হাত দিয়ে চোখ কচলে আঙ্গুলের দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ জোরে পরিষ্কার বলল:

'আমার স্ত্রী আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভ্‌না মারা গেছে...'

তেরেন্‌তি আইকনের দিকে তাকিয়ে ক্রুশ করল।

'তাঁর আত্মার শান্তি হোক!'

'অ্যাঁ?' স্থির দৃষ্টিতে তেরেন্‌তির মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে পেরফিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'বলছি, তাঁর আত্মার শান্তি হোক!'

'হুম্‌... মারা গেল!..' এই বলে মুচি ঝট্‌ করে উল্‌টো দিকে ঘুরে চলে গেল।

'আজব লোক!' দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে তেরেন্‌তি বলল। ইলিয়ারও মুচিকে আজব বলে মনে হল... স্কুলে যাওয়ার পথে সে শবদেহ দেখার উদ্দেশ্যে এক মিনিটের জন্য মাটির তলার ঘরে ঢুকল। সেখানে অন্ধকার আর লোকের গাদাগাদি। ওপর থেকে মেয়েরা এসে যেখানে বিছানাটা আছে সেই কোনায় ভিড় করে জমা হয়েছে, তারা নীচু গলায় কথাবার্তা বলছে। মাতিৎসা মাশার জন্য কী একটা ফ্রকের মাপ নিচ্ছিল, জিজ্ঞেস করছিল:

'বগলের নীচে আঁট লাগছে?'

মাশা দুহাত ছড়িয়ে রেখেছে, আদুরে গলায় টেনে টেনে বলছে:

'লা-গ্‌-ছে!..'

মুচি ঘাড় গুঁজে টেবিলের ওপর বসে বসে মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে, তার বাঁ চোখ তখনও পিটপিট করছে। ইলিয়া মৃতের ফুলো ফুলো মুখের দিকে তাকাল, ওর মনে পড়ল তার কালো চোখজোড়া — এখন চিরকালের জন্য বুজে গেছে। ইলিয়া ভারাক্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত অনুভূতি নিয়ে ঘর ছাড়ল।

স্কুল থেকে ফিরে এসে সরাইখানায় ঢুকতে ইলিয়া শুনতে পেল পেরফিশ্‌কা অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে গলা ফাটিয়ে গাইছে:

উপাড়িলে পিয়া,
তুমি মোর হিয়া।
কেন উপাড়িলে,
কোথা ফেলে দিলে?

'হুঃ!.. মাগীরা কিনা আমাকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিল! খেঁকিয়ে উঠে বলল, ভাগ এখান থেকে হাড়-জ্বালানো বিটলে! বলল, মুখপোড়া মাতাল... আমি রাগ করছি না... আমার সহ্যশক্তি আছে... আমাকে বক, মার! কেবল একটু বাঁচতে দে!.. দোহাই তোদের! হুম্, তা ভাই বাঁচতে সবাই চায় — এখানেই ত মজা! ভাসিয়া বল আর ইয়াকভ্ই বল — আসলে আমরা সকলেই এক!..'

কেঁদে কে ভাসায় হোথা?
আশা তার আছে কোথা?
ঘ্যানঘেনি থামা ওরে,
চিবো ভাজা কড়মড়ে!

পেরফিশ্কা খুশিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইলিয়া বিতৃষ্ণা ও আতঙ্ক নিয়ে তার দিকে তাকাল। ওর মনে হল, স্ত্রী মারা যাওয়ার দিনে এই রকম আচরণের জন্য ভগবান মুচিকে দারুণ শাস্তি দেবেন। পর দিনও পেরফিশ্কা মাতাল হয়ে ছিল, স্ত্রীর কফিনের পেছন পেছন সে টলতে টলতে চলছিল, চোখ পিটপিট করছিল, এমনকি হাসছিল। সকলেই তাকে গালাগাল করছিল, কে একজন তার ঘাড়ে এক ঘা বসিয়েও দিল।

'ওহো, দ্যাখ দেখি কান্ড!..' কবর দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর সন্ধেবেলা ইলিয়া তার বন্ধুকে বলল। 'পেরফিশ্কাটা সত্যি সত্যিই পাষন্ড রে!'

'মরুক গে!' ইয়াকভ্ কোন গা না দিয়ে বলল।

ইলিয়া এর আগেও লক্ষ্য করেছে যে কিছু দিন হল ইয়াকভ্ বদলে গেছে। সে বাইরে বেড়াতে বেরোয় না বললেই চলে, সব সময় ঘরে বসে থাকে, এমনকি ইলিয়াকে কেমন যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায়। প্রথম প্রথম ইলিয়ার মনে হয়েছিল যে স্কুলে পড়াশুনায় ওর সাফল্য দেখে ঈর্ষা করে ইয়াকভ্ বুঝি বাড়ির পড়া তৈরি করছে। কিন্তু পড়াশুনা সে আগের চেয়েও খারাপ করতে লাগল; অন্যমনস্কতা আর অত্যন্ত সাদাসিধে ব্যাপারও বুঝতে না পারার জন্য মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে সে অনবরত বকুনি খায়। পেরফিশ্কার প্রতি ইয়াকভের মনোভাবে ইলিয়া অবাক হল না: বাড়ির জীবনযাত্রার দিকে ইয়াকভ্ কোন মনোযোগ দিত না বললেই হয়, কিন্তু ইলিয়ার জানতে ইচ্ছে করল বন্ধুর কী হয়েছে, তাই সে ওকে জিজ্ঞেস করল:

'তুই এরকম হয়ে গেছিস কেন বল ত? আমার সঙ্গে আর ভাব রাখতে চাস না বুঝি?'

'আমি? কী যা-তা বলছিস?' ইয়াকভ্ অবাক হয়ে বলে উঠল, তারপর হঠাৎ তড়বড় করে বলতে লাগল: 'শোন তুই -- বাড়ি যা!.. যা, আমিও এক্ষুনি আসছি... তোকে একটা যা জিনিস দেখাব না!'

ও জায়গা ছেড়ে দৌড়ে চলে গেল, ইলিয়াও কৌতূহলবশে নিজের ঘরে চলল। ইয়াকভ্ ছুটে এসে ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল, জানলার কাছে এগিয়ে এসে সে জামার ভেতর থেকে একটা লাল বই টেনে বার করল।

'এদিকে আয়!' তেরেন্তি কাকার বিছানার ওপর বসে নিজের পাশে ইলিয়াকে বসতে ইঙ্গিত করে নীচু গলায় সে বলল। তারপর বইটাকে খুলে নিজের কোলের ওপর রাখল, তার ওপর ঝুঁকে পড়ে পড়তে লাগল:

'দূরে বীরপুরুষ দেখতে পেলেন একটা পাহাড় — আকাশ ছোঁয়া উঁচু, মাঝখানে লোহার কপাট। তাঁর বীরহৃদয়ে তেজের আগুন জ্বলে উঠল, তিনি বর্শা বাগিয়ে ধরে হাঁক দিয়ে সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটল, বীরপুরুষ তাঁর বিপুল শক্তিতে ফটকের ওপর ঘা মারলেন। ভয়ঙ্কর আওয়াজ উঠল, ফটকের লোহা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল; ঠিক সেই সময় পাহাড়ের ভেতর থেকে গলগল করে বেরিয়ে এলো ধোঁয়া আর আগুনের হল্কা, বাজের মতো কণ্ঠস্বর বেজে উঠল — সে আওয়াজে পৃথিবী কেঁপে উঠল, পাহাড় থেকে বীরপুরুষের ঘোড়ার পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল পাথরের টুকরো। 'বটে, তোর এত বড় আস্পর্ধা যে এখানে হানা দিয়েছিস! আমি আর তোর যম — আমরা অনেক দিন তোর অপেক্ষায় আছি!..' ধোঁয়ায় বীরপুরুষ চোখেমুখে অন্ধকার দেখেন...'.

'বীরপুরুষটা কে?' বন্ধুর উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে ইলিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'অ্যাঁ?' বই থেকে ফ্যাকাসে মুখ তুলে ইয়াকভ্ সাড়া দিল।

'বলি এই বীরপুরুষটা কে?'

'এক ঘোড়সওয়ার, হাতে তার বর্শা... সাহসী রাউল। তার কনে... সুন্দরী লুইজাকে ড্রাগন চুরি করেছে — তুই চুপ্ করে শোনই না বাপু!..' ইয়াকভ্ অধীর হয়ে চেঁচিয়ে বলল।

'আচ্ছা, বলে যা! বলে যা!.. দাঁড়া — ড্রাগনটা কী ব্যাপার?'

'ডানাওয়ালা সাপ... পা আছে... নখগুলো লোহার... আর তিনটে মাথা... নিশ্বাসের সঙ্গে আগুন বেরোয় — বুঝলি?'

'চমৎ-কা-র!' ইলিয়া চোখ বড়বড় করে বলল। 'তাহলে ত বীরপুরুষ ওটাকে একচোট দেখে নেবে!..'

দুই বন্ধুতে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে ঘন হয়ে বসে ছিল। মনের মধ্যে রোমহর্ষক কৌতূহল আর অদ্ভুত উত্তেজনাকর আনন্দের অনুভূতি নিয়ে তারা প্রবেশ করছিল এমন এক নতুন মায়াজগতে যেখানে নির্ভীক বীরপুরুষদের প্রবল আঘাতে নৃশংস দানবদের বিনাশ ঘটে, যেখানে সবই গরিমান্বিত, সুন্দর ও অপূর্ব, যেখানে কোন কিছুই এই ধূসর, একঘেয়ে জীবনের মতো নয়। নেই মাতাল লোকজন, নেই ছেঁড়া জামাকাপড় পরা ছোটলোক, আধাপচা কাঠের ঘর-বাড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সোনায় ঝলমলে রাজপুরী, আকাশ-ছোঁয়া দুর্ভেদ্য লোহার গড়। ছেলেরা খেয়ালি কল্পনার দেশে প্রবেশ করছিল, আর ওদিকে তাদের ধারে কাছে বাজছিল অ্যাকর্ডিয়ান, বেপরোয়া মুচি পেরফিশ্‌কা পরিষ্কার গলায় গেয়ে চলছে:

মরার পরে থোড়াই
শয়তানেরে ডরাই!
জ্যান্ত সটান জাহান্নামে যাব,
যখন আমি বেহেড মাতাল হব!

'চালাও ফুর্তি! ভগবান ফুর্তিবাজদের ভালোবাসেন!'

মুচির ঝনঝনে গলার সঙ্গে উঠে পড়ে পাল্লা দিতে গিয়ে অ্যাকর্ডিয়ানের আওয়াজে যেন নাভিশ্বাস ওঠে, পেরফিশ্‌কাও তার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে নাচের সুর ধরে:

চিরকাল-হায় হায়!
শীতে বুঝি প্রাণ যা-য়!
টেঁসে যাবি নরকে,
খাক্‌ হবি আগুনের ঝলকে!

চুট্‌কি গানের প্রতিটি স্তবকে সমঝদারদের বিপুল তারিফ ও হাসির হুল্লোড় ওঠে।

এই গমগমে আওয়াজ থেকে পলকা কাঠের পার্টিশন দিয়ে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট খোঁড়লটাতে দুটো ছোট ছেলে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তাদের একজন মৃদু স্বরে ফিস্‌ফিস করে পড়ে:

'বীরপুরুষ তখন লৌহ আলিঙ্গনে দানবটাকে চেপে ধরলেন, দানব যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে বজ্রগর্জন করে উঠল...'

বীরপুরুষ ও ড্র্যাগনের কাহিনীর পর হাতে পড়ল 'গুয়াক ও তার প্রবল অনুরাগ,' 'সাহসী রাজকুমার ফ্রান্‌ৎসিল ভেনেৎসিয়ান ও সুন্দরী রাজকন্যা রেন্‌ৎসিভেনার কাহিনী'। ইলিয়ার মনে এত দিন যে বাস্তবতার ছাপ ছিল তা উঠে গিয়ে বাসা বাঁধল বীরপুরুষ আর রাজকন্যারা। দুই বন্ধুতে পালা করে ক্যাশ কাউণ্টার থেকে বিশ কোপেক করে সরাতে লাগল — বইয়ের আর অভাব থাকল না। ওরা 'ইয়াশ্‌কা স্মের্তেন্‌স্কি'র অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে পরিচিত হল, 'তাতার ঘোড়সওয়ার ইয়াপান্‌চা'র কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হল এবং ক্রমেই কদাকার জীবন থেকে দূরে এমন এক জগতে সরে যেতে লাগল যেখানে মানুষ সব সময় ভাগ্যের নিষ্ঠুর বেড়ি ভাঙে, সব সময় সুখের সন্ধান পায়।

এক দিন পুলিশ এসে পেরফিশ্‌কাকে ডেকে নিয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে সে থানায় গেল, কিন্তু ফিরে এলো খুশি মনে, শক্ত মুঠোয় হাত ধরে সে সঙ্গে নিয়ে এলো পাভেল গ্রাচোভকে। পাভেলের চোখ দুটো আগের মতোই তীক্ষ্ম, কেবল সে দরুণ রোগা আর হলদেটে হয়ে গেছে, তার মুখে আর উত্তেজনার ভাব নেই। মুচি ওকে সরাইখানায় টেনে নিয়ে এলো, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চোখ টিপে সেখানে বলতে লাগল:

'এই যে ভালোমানুষেরা, খোদ পাভেল গ্রাচোভ হাজির! বন্দীদের দলের সঙ্গে চালান হয়ে সবে পেন্‌জা শহর থেকে এসেছে... লোকজন আজকাল কেমন হয়েছে দেখুন, সুখের আশায় ঘরের মধ্যে আরামে বসে না থেকে পেছনের দুপায়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই ভাগ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে!'

পাভেল ছেঁড়া প্যাণ্টের পকেটে একটা হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল, অন্য হাতটা সে বার বার মুচির মুঠো থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল, মুখ গোমড়া করে আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিল। কে যেন পাভেলকে ধোলাই দেওয়ার পরামর্শ দিল মুচিকে, কিন্তু পেরফিশ্‌কা গম্ভীর ভাবে আপত্তি করে বলল:

'কী দরকার? ঘুরে টুরে দেখুক না, সুখের খোঁজ পেলেও পেতে পারে।'

'ওর হয়ত খিদে পেয়েছে!' তেরেন্তি আন্দাজ করে বলল, সে এক টুকরো রুটি ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলল:

'নে, পাভেল!'

পাভেল ধীরেসুস্থে রুটিটা নিয়ে চটপট সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

'শ্-শ্-শ্!' পেছন পেছন মুচি শিস দিয়ে বলল। 'এসো তাহলে, মানিক আমার!'

ইলিয়া নিজের ঘরের দরজা থেকে এই দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিল, সে পাভেলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। কিন্তু তার কাছে যাওয়ার আগে পাভেল ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল, শেষে সন্দেহের দৃষ্টিতে ঘরের চার দিক নিরীক্ষণ করতে করতে ভেতরে ঢুকল, রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল:

'কী চাই?'

'কী খবর?..'

'এই ত!..'

'বস!..'

'কেন?'

'এই এমনি!.. কথা বলব!..'

পাভেলের রাগী রাগী জবাবে ও তার গলার খসখসে আওয়াজে ইলিয়া ঘাবড়ে গেল। ইলিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল পাভেলের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় সে কোথায় ছিল, কী দেখেছে। কিন্তু পাভেল চেয়ারের ওপর বসে গুরুগম্ভীর চালে রুটি কামড়াতে কামড়াতে উল্‌টে ইলিয়াকেই প্রশ্ন করতে লাগল:

'পড়াশুনা শেষ করেছিস বুঝি?'

'বসন্তকালে শেষ করব!'

'আমি কিন্তু করে ফেলেছি!..'

'সত্যিই?' অবিশ্বাসের সুরে ইলিয়া বলল।

'আমি চটপট সেরে ফেলেছি!'

'কোথায় পড়াশুনা করলি?'

'জেলখানায়, কয়েদীদের কাছে!..'

ইলিয়া আরও কাছে এগিয়ে এলো, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তার রোগাটে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'ওখানে ভয় করে?'

'ভয়ের কিছুই নেই!.. আমি বহু জেলে, নানা শহরে থেকেছি... আমি, ভাই, ভদ্রলোকদের সঙ্গে থেকেছি ওখানে... বড় ঘরের মেয়েরাও ছিল — সত্যিকারের বড় ঘরের! নানা ভাষায় কথাবার্তা বলে। আমি ওদের কামরা সাফ করতাম! ওঃ যা ফুর্তিবাজ! মনেই হয় না যে কয়েদী!..'

'ডাকাত?'

'একেবারে খাঁটি চোর-ডাকাত যাকে বলে!' পাভেল বুক ফুলিয়ে বলল।

ইলিয়া চোখ টিপল, পাভেলের প্রতি ওর ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

'ওরা কি রুশী?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কেউ কেউ ইহুদী... বাছা বাছা লোকজন!.. ওঃ সে কী বলব, ভাই! সকলের ওপর ইচ্ছেমতো চুরি-বাটপারি করেছে!.. তারপর ধরা পড়তেই — আর যায় কোথায়? — একেবারে সাইবেরিয়ায় চালান!'

'তা তুই পড়াশুনা শিখলি কী করে?'

'ও আর এমন কী?.. বললাম, আমাকে লেখাপড়া শেখাও — ওরা শেখাল...'

'পড়তে আর লিখতেও?'

'লিখতে ভালো পারি না!.. তবে পড়ার কথা যদি বলিস — কত চাস! আমি বহু বই পড়ে ফেলেছি!..'

বইয়ের কথা উঠতে ইলিয়া উৎসাহ বোধ করল।

'আমি আর ইয়াকভ্ একসঙ্গে বই পড়ি!'

ওরা দুজনেই যে যা বই পড়েছে পাল্লা দিয়ে সেগুলোর নাম বলে যেতে লাগল। শিগ্‌গিরই পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'হ্যাঁ, তোরা দেখছি আমার থেকে বেশি পড়ে ফেলেছিস! আর আমি — বেশির ভাগই কবিতা... ওখানে নানা রকম, বহু বইই ছিল, কিন্তু ভালো বই বলতে, কেবল কবিতার...'

ইয়াকভ্ এলো; অবাক হয়ে চোখ দুটো গোল গোল করে হাসতে লাগল।

'ভেড়া কোথাকার!' পাভেল ওকে বলল। 'হিহি করে হাসছিস কেন?'

'কোথায় ছিলি?'

'ওখানে আর তোকে যেতে হচ্ছে না!..'

'জানিস,' ইলিয়া তার বন্ধুকে বলল, 'পাভেলও বই পড়েছে...'

'অ, তাই নাকি?' ইয়াকভ্ উল্লসিত হয়ে উঠল, পাভেলের সঙ্গে কথাবার্তা তৎক্ষণাৎ আগের চেয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ল। ওরা তিন জনে পাশাপাশি বসল, ওদের মধ্যে কথাবার্তা জমে উঠল, ওরা তড়বড় করে আশ্চর্য রকম কৌতূহলজনক এটা ওটা নিয়ে ছাড়া-ছাড়া কথাবার্তা বলতে লাগল।

'আমি এমন সব জিনিস দেখেছি যা বলে বোঝানো যায় না!' বুক ফুলিয়ে উৎসাহের সঙ্গে পাভেল বলল। 'একবার ত দুদিন কিছুই খাই নি — স্রেফ না খেয়ে কাটিয়েছি! বনে রাত কাটিয়েছি... একা।'

'ভয় করল না?' ইয়াকভ্ জিজ্ঞেস করল।

'একবার রাত কাটিয়ে দ্যাখ না — টের পাবি! একদল কুকুর ত আমাকে প্রায় চিবিয়ে খেয়ে ফেলে... কাজান শহরে ছিলাম... সেখানে একজনের মূর্তি আছে — কবিতা লিখত বলে তার মূর্তি তৈরি করা হয়। লোকটা বিরাট চেহারার!.. পা দুটো কী! হাতের এককেটা মুঠো তোর মাথার সমান হবে রে ইয়াকভ্! আমিও কবিতা লিখব ভাই, আমি এখনই একটু আধটু পারি!..'

হঠাৎ সে কুঁকড়ে গিয়ে পা দুটো গুটিয়ে বসল, ভুরু কুঁচকে ভারিক্কি চালে স্থির দৃষ্টিতে এক দিকে চেয়ে হড়বড় করে বলল:

পথে চলে লোকজন,
সকলের পেটে ভাত, পরনে কাপড়,
যদি বল, খেতে দাও,
বলে — কেটে পড়্!

শেষ করার পর সে ওদের দুজনের দিকে তাকাল, ধীরে ধীরে মাথা নামাল। মিনিটখানেকের একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। শেষকালে ইলিয়া সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল:

'এটা কি কবিতা নাকি?'

'কানে শুনতে পাস না?' পাভেল রেগে চেঁচিয়ে উঠল। 'দেখছিস না, কাপড় — কেটে পড়্ — তার মানে, এটা কবিতা!..'

'ঠিকই ত, কবিতা!' ইয়াকভ্ তাড়াতাড়ি বলল। 'তুই সব সময় খুঁত ধরিস, ইলিয়া!'

'আমি আরও কবিতা লিখেছি,' পাভেল সোৎসাহে ইয়াকভের উদ্দেশে বলল এবং তৎক্ষণাৎ ছড়রা ছুটিয়ে দিল:

মেঘ ঘন কালো, মাটি স্যাঁতসেঁতে,
দফা মোর রফা এবারে শরতে।
চালচুলো ছাড়া, নেই ঘর-বাড়ি,
জীর্ণ বসন, হায় কী যে করি!

'ওঃ-হো-হো!' ইয়াকভ্ চোখ বড় বড় করে টেনে টেনে বলল।

'হ্যাঁ, এটা হল রীতিমতো কবিতা!' ইয়াকভ্‌কে সায় দিয়ে ইলিয়া বলল।

পাভেলের মুখের ওপর হালকা গোলাপী আভা খেলে গেল, তার চোখ দুটো এমন কুঁচকে গেল যেন কোথা থেকে ধোঁয়া এসে লেগেছে।

'আমি লম্বা লম্বা কবিতাও লিখব!' ও বড়াই করে বলল। 'কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়! চলতে চলতে দেখলি — বন — মন, আকাশ — বাতাস, মাঠ — ঘাট!.. আপনা-আপনিই এসে যায়!'

'এখন তুই কী করবি?' ইলিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল।

পাভেল চোখ টিপে চার দিক দেখে নিল, একটু চুপ করে থেকে শেষকালে ইতস্তত করে মৃদু স্বরে বলল:

'যা হোক একটা কিছু!..'

কিন্তু তক্ষুনি আবার দৃঢ় কণ্ঠে জানাল:

'তারপর ফের পালাব!..'

সে মুচির কাছেই বাস করতে লাগল, প্রতি দিন সন্ধ্যায় ছেলের দল তার কাছে এসে জুটত। তেরেন্‌তির কামরার চেয়ে মাটির তলার ঘরটায় গোলমাল কম, জায়গাটা ভালোও। পেরফিশ্‌কা বাড়িতে কদাচিৎ থাকে — মদ খেয়ে যা কিছু উড়িয়ে দেওয়ার সে উড়িয়ে দিয়েছে, এখন সে অন্য মুচির কাছে দিন মজুরীতে কাজ করে আর কাজ না থাকলে — সরাইখানায় বসে থাকে। সে আধা-উলঙ্গ অবস্থায় খালি পায়ে ঘোরে, তার বগলের নীচে সব সময় দেখা যায় পুরনো অ্যাকর্ডিয়ান যন্ত্রটি। ওটা যেন তার দেহেরই একটা অংশ, ওর মধ্যে সে পুরে রেখেছে নিজের আমুদে মনের একাংশ আর দুজনেই দেখতে হয়েছে এক রকম — ভাঙ্গাচোরা, বেঢপ, সাড়া জাগানো গানে আর সুরের ঝঙ্কারে টৈটম্বুর। পেরফিশ্‌কা যে এনতার বেপরোয়া ধরনের মজার চুটকি গান বানাতে পারত একথা শহরের গোটা কারিগর সমাজ জানত। প্রতিটি

কারিগরের দোকানেই মুচি ছিল সমাদৃত অতিথি। সে যে তার গান দিয়ে এবং গুছিয়ে এটা ওটা নানা বিষয়ের মজার মজার গল্প বলে শ্রমিকদের কঠিন ও একঘেয়ে জীবনে রং-রসের সঞ্চার করত তার জন্য ওরা ওকে ভালোবাসত।

কয়েকটা কোপেক রোজগার করতে পারলে সে তার অর্ধেক মেয়েকে দিত — মেয়ের প্রতি তার যত্ন বলতে এইটুকুই ছিল। মেয়েটি ছিল যেন নিজের ভাগ্যের পুরোপুরি কর্ত্রী। সে বড়সড় হয়ে উঠেছে, তার কালো কোঁকড়ানো চুল ঘাড় পর্যন্ত এসে পড়েছে, গভীর কালো চোখ দুটি এখন আরও গম্ভীর, আরও বড় বড়; পাতলা গড়নের, নরম এই মেয়েটি নিজের খোঁড়লে গিন্নির ভূমিকা দিব্যি পালন করত। এখান ওখান থেকে সে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনত, এটা ওটা দিয়ে ঝোল জাতীয় কিছু একটা রান্না করার চেষ্টা করত, দুপুর পর্যন্ত আঁচল জড়িয়ে রেখে ঘোরাফেরা করত, তার সর্বাঙ্গ ঝুলকালিমাখা, ভিজে; তাকে দেখাত উদ্বিগ্ন। দুপুরের খাবার রান্না করার পর সে ঘরদোর সাফ করত, সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার পোশাক পরে জানলার পাশে টেবিলের ধারে বসত, কোন না কোন একটা পোশাক রিফু করত।

তার কাছে প্রায়ই আসে মাতিৎসা, সঙ্গে করে আনে মিষ্টি রুটি, চা, চিনি। একদিন সে মাশাকে একটা নীল রঙের স্কার্ট পর্যন্ত উপহার দেয়। মাশা এই মহিলার সঙ্গে আচরণ করত বড়দের মতো, যেন বাড়ির গিন্নি। সে টিনের ছোট সামোভারটি গরম করে, গরম, সুস্বাদু চা পান করতে করতে তারা নানা রকম কাজকর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে, পেরফিশ্‌কাকে গালাগাল করে। মাতিৎসা রেখে ঢেকে গালাগাল করত না, মাশাও উঁচু গলায় তাতে সায় দিত, তবে তাতে তেমন ঝাঁজ থাকত না — নেহাৎই ভদ্রতার খাতিরে। বাবার সম্পর্কে সে যা কিছু বলত তার মধ্যে প্রশ্রয়ের আভাস পাওয়া যেত।

'ওর লিভারটা শুকিয়েও যায় না!' ভুরু কপালে তুলে মাতিৎসা রাগে গরগর করতে থাকে। 'মাতালটার কি খেয়াল নেই যে একটা ছোট মেয়ের ভার তার ওপর আছে? মুখপোড়াটার মরণও হয় না!'

'বাবা ত জানে যে আমি এখন বড় হয়ে গেছি, নিজেই সব কিছু করতে পারি...' মাশা বলে।

'হা ভগবান, ভগবান!' মাতিৎসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। 'দুনিয়ায় কী যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে? মেয়েটার কী দশা হবে? তোর মতো একটা মেয়ে আমারও ছিল!.. রেখে এলাম তাকে ঘরে, খোরোল শহরে... খোরোল শহর এতই দূর যে আমাকে সেখানে যেতে দেওয়া হলেও আমি তার পথ খুঁজে পেতাম না... এমনই ত হয় মানুষের দশা!.. কত কালই না জগতে বেঁচে আছে অথচ তার জন্মভূমিটা কোথায় তাই ভুলে যায়...'

মাতিৎসার চোখ দুটো গোরুর চোখের মতো বিরাট বিরাট। তার ভারী গলার স্বর মাশার ভালো লাগত। মাতিৎসার মুখ থেকে সব সময়ই ভোদকার গন্ধ আসত, তবু তার কোলে চেপে বসার ব্যাপারে মাশার কোন আপত্তি হত না, মাশা ওর ঢিবির মতো বেরিয়ে আসা বুক ঘেঁসে বসে থাকত, ওর সুন্দর গড়নের পুরুষ্টু ঠোঁটে চুমু দিত। মাতিৎসা সকালবেলায় আসত, সন্ধেবেলায় ছেলের দল মাশার কাছে এসে জুটত। বই না থাকলে ওরা তাস খেলত, তবে তেমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটত। মাশাও খুব উৎসাহের সঙ্গে পাঠ শুনত, বিশেষ করে ভয়ের জায়গাগুলোতে সে অস্ফুটে চেঁচিয়ে পর্যন্ত উঠত।

ইয়াকভ্ মেয়েটার প্রতি আগের চেয়েও বেশি যত্ন নিতে লাগল। সে অনবরত তাকে বাড়ি থেকে রুটি ও মাংসের টুকরো, চা, চিনি আর বীয়ারের বোতল করে কেরোসিন এনে দিত, মাঝে মাঝে বই কেনার পর যে পয়সা বেঁচে যেত তাও ওকে দিত। এ সব করা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই এর প্রকাশ ঘটত, মাশাও তার এই সেবাযত্নকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিল এবং সেও এগুলো লক্ষ্য করত না।

'ইয়াকভ্!' মাশা বলত, 'কয়লা নেই!'

কিছুক্ষণের মধ্যে সে হয় কয়লা এনে হাজির করত কিংবা পয়সা দিয়ে বলত:

'যা, কিনে আন গে!.. চুরি করা গেল না!'

ইলিয়াও ওদের এই সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া বাড়ির আর সকলেও এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। মাঝে মাঝে ইলিয়া নিজেই তার বন্ধুর নির্দেশে রান্নাঘর কিংবা বার থেকে এটা ওটা চুরি করে মুচির ঘরে নিয়ে আসত। তারই মতো অনাথ এই তামাটে রঙের ছিপছিপে ছোট মেয়েটিকে তার ভালো লাগত, বিশেষ করে ভালো লাগত এই জন্য যে মেয়েটি একা জীবন

কাটাতে পারে এবং বড়দের মতো সব কাজ করতে পারে। তার ভালো লাগত ওর হাসি দেখতে, সে সব সময় চেষ্টা করত মাশাকে হাসাতে। এ কাজে যখন সে সফল হত না তখন ইলিয়া রেগে গিয়ে মেয়েটাকে খেপাত:

'মুখপুড়ী বাঁদরী!'

মাশা চোখ কুঁচকে বলত:

'মুখপোড়া হনুমান!..'

কথার পিঠে কথা হতে হতে ওদের মধ্যে দারুণ ঝগড়া বেধে যেত: মাশা চট্ করে ভয়ানক খেপে উঠে আঁচড়ানোর উদ্দেশ্যে ইলিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু ইলিয়া মজা পেয়ে হাসতে হাসতে পালিয়ে যেত।

এক দিন তাস খেলতে খেলতে খেলার মধ্যে মাশার জোচ্চোরি ধরতে পেরে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, চেঁচিয়ে মাশাকে উদ্দেশ্য করে বলল:

'ইয়াকভের সোহাগী!'

তারপর আরও এমন একটা নোংরা কথা যোগ করল যার অর্থ তার বেশ জানা ছিল। ইয়াকভ্‌ও সেখানে ছিল। প্রথমে সে হেসে উঠল, কিন্তু যখন দেখতে পেল তার বান্ধবীর মুখ অপমানে বিকৃত হয়ে গেছে, চোখের কোনায় জল চিকচিক্ করছে তখন সে চুপ করে গেল, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে আচমকা লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ইলিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইলিয়ার নাকের ওপর ঘুষি বসিয়ে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে ইয়াকভ্ তাকে মেঝের ওপর ফেলে দিল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে ইলিয়া আত্মরক্ষার কোন অবকাশই পেল না। যখন ব্যথায় ও অপমানে অন্ধ হয়ে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো ঘাড় গুঁজে সে 'তবে রে!..' বলে ইয়াকভের দিকে তেড়ে গেল তখন দেখতে পেল ইয়াকভ্ টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে করুণ সুরে কাঁদছে, পাশে মাশা দাঁড়িয়ে, কান্নায় তারও গলা বুঁজে এসেছে, সে বলছে:

'ওর সঙ্গে মিশিস না। ও একটা জঘন্য, পাজী ছেলে!.. ওরা সকলেই পাজী — ওর বাপ জেলে ঘানি টানছে, কাকাটা — কুঁজো! ওরও পিঠে কুঁজ হবে! তুই একটা ত্যাঁদড়!' ইলিয়ার দিকে সাহস করে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলল। 'নোংরা কোথাকার!.. ছোট মন তোর! এদিকে এসে দ্যাখ একবার, তোর মুখ আর আস্ত রাখছি না! কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

ইলিয়া এগোল না। ইয়াকভ্‌কে অপমান করার ইচ্ছে তার ছিল না, ওকে কাঁদতে দেখে ইলিয়ার যেন কেমন লাগল, তা ছাড়া একটা মেয়ের সঙ্গে মারামারি করা তার কাছে লজ্জার বলে মনে হল। মাশা যে মারামারির জন্য তৈরি হয়েই ছিল এটা অবশ্য সে দেখেছে। ইলিয়া একটা কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বুকের মধ্যে ভারী ও অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি নিয়ে সে অনেকক্ষণ উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। শেষে পেরফিশ্‌কার ঘরের জানলার কাছে গিয়ে সাবধানে ওপর থেকে নীচে, ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। ইয়াকভ্‌ বান্ধবীর সঙ্গে আবার তাস খেলতে বসেছে। মাশা সাজানো তাসের আড়ালে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে — হাসছে বলেই মনে হচ্ছে; ইয়াকভ্‌ নিজের তাসের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কোনটা দেবে ঠিক করে উঠতে না পেরে একবার এটা আরেকবার ওটা ধরছে। ইলিয়া মনমরা হয়ে পড়ল। সে আরও কিছুক্ষণ উঠোনে পায়চারি করল, তারপর সাহস করে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'আমাকে তোরা খেলায় নে!' টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ও বলল।

ওর বুক তখন ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে, মুখ টকটকে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো নামানো। ইয়াকভ্‌ ও মাশা চুপ করে রইল।

'আমি গালাগালি করব না! মাইরি বলছি, করব না!' ওদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ইলিয়া বলল।

'তাহলে বস! কী ছেলে রে তুই!' মাশা বলল।

ইয়াকভ্‌ কঠোর স্বরে বলল:

'হাঁদারাম! কচি খোকা নাকি? — কিছু বলার আগে ভেবে দেখতে হয়!..'

'আর তুই যে আমাকে অমন মারলি?' ইলিয়া ধমকের সুরে ইয়াকভ্‌কে বলল।

'যেমন কর্ম, তেমনি ফল হয়েছে!' মাশা যুক্তি দিয়ে ভারিক্কি চালে বলল।

'যেতে দে! আমি ত আর রাগ করছি না!.. আমারই দোষ!..' ইলিয়া স্বীকার করল, ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় হাসি হাসল। 'তুইও রাগ করিস না — বুঝলি?'

'ঠিক আছে! তাস ধর...'

'গোঁয়ার কোথাকার!' মাশা বলল। এখানেই সব মিটে গেল।

এক মিনিটের মধ্যেই ইলিয়া ভুরু কুঁচকে খেলার মধ্যে ডুবে গেল। সে সব সময় এমন ভাবে বসত যাতে মাশার আগে তাকে চাল দিতে হয়: ওর

খুব ভালো লাগত যখন মাশা হেরে যেত এবং খেলার মধ্যে সব সময়ই ইলিয়া প্রাণপণে সে চেষ্টা চালাত। কিন্তু মাশা হুঁশিয়ার হয়ে খেলত আর বেশির ভাগ সময়ই ইয়াকভের হার হত।

'ওঃ তুই, ড্যাবরা চোখো!' দরদ দেখিয়ে আক্ষেপ করে মাশা বলত। 'আবার বুদ্ধু বনেছিস!'

'মরুক গে, তাস-টাস থাক এখন! আর ভালো লাগছে না! আয়, পড়া যাক!'

ওরা ছেঁড়াখোঁড়া, নোংরা বই বার করে এনে ভালোবাসার দুঃখকষ্ট ও কীর্তির কথা পড়তে থাকে।

ওদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে পাভেল মুরুব্বির চালে বলল:

'তোমরা খাশা আছ দেখছি হে!'

তারপর ইয়াকভ্ ও মাশার দিকে নজর বুলিয়ে একটু হেসে গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে যোগ করল:

'আর তুই ইয়াকভ্, পরে মাশাকে বে' করে ফেল!'

'বুদ্ধু!..' মাশা হাসতে হাসতে বলল। ওরা চার জনেই হো হো করে হাসতে লাগল।

বই পড়া শেষ হয়ে গেলে কিংবা পড়তে পড়তে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে পাভেল নিজের অ্যাডভেঞ্চার বর্ণনা করত — সে সব কাহিনী বইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম আকর্ষণীয় হত না।

'বলব কী ভাই, যেই বুঝতে পারলাম যে পাসপোর্ট ছাড়া গতি নেই, তখনই আমি চালাকি খাটাতে লাগলাম। পাহারাওয়ালা সেপাই দেখতে পেলেই তাড়াতাড়ি পা চালাই, যেন আমাকে কেউ কোন কাজে পাঠিয়েছে, কখনও চলতে থাকি কারও একজনের পাশে পাশে, যেন লোকটা আমার মনিব কিংবা বাবা বা আর কেউ... পাহারাওয়ালা সেপাই এক ঝলক তাকিয়ে দেখে, কিছু বলে না — ধরে না... গাঁয়ে ভালো, সেখানে পাহারাদার-টাহারাদার নেই — কেবল বুড়োবুড়ি আর বাচ্চাকাচ্চাদের দল, জোয়ান মদ্দরা মাঠে কাজ করে। জিজ্ঞেস করে: 'কে তুই?' — 'ভিখিরী...' — 'কার ছেলে?' — 'কেউ নেই...' — 'কোথা থেকে?' — 'শহর থেকে।' ব্যস্ — ঢুকে গেল! ভালো মতো খাওয়া-দাওয়া দেয়। যেখানে খুশি... যেমন খুশি যাও: দৌড়ঝাঁপ দাও, পেটে ভর দিয়ে চার হাতপায়ে চল... চার দিকে মাঠ আর মাঠ, বন... পাখিরা

গান গায়... ইচ্ছে করে ওদের কাছে উড়ে যাই! পেট ভরা থাকলেই হল — আর কিছু চাই না, হাঁটতে হাঁটতে দুনিয়ার একেবারে শেষ সীমা অবধি চলে যাওয়া যায়। যেন কেউ সামনে টেনে নিয়ে চলছে... যেমন মা কোলে করে নিয়ে যায়। তবে খিদের কষ্টও মাঝে মাঝে পেয়েছি — উঃ! এমন হত যেন নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় আর কি — ভুঁড়ি শুকিয়ে পিঠের সঙ্গে মিশে যাওয়া যাকে বলে! মনে হয় মাটিই গিলি! মাথা ঝিমঝিম করত... কিন্তু রুটির টুকরো পাওয়া মাত্র সেটাতে দাঁত বসিয়ে দিতে তখন যা লাগে। মনে হয় দিন রাত খাই আর খাই। চমৎকার লাগত!.. তা যাই বলিস না কেন জেলখানায় আনন্দ পেলাম... প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, পরে অবশ্য বেড়ে লাগত! সেপাইদের আমি খুব ডরাতাম। ভাবতাম একবার আমাকে ধরলে ধোলাই দিতে দিতে আমার আর কিছু রাখবে না! কিন্তু সেপাইটা আমাকে অল্পের ওপর রেহাই দিল — পেছন দিক থেকে এসে ঘ্যাঁক করে ঘাড় চেপে ধরল! আমি তখন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছিলাম... নানা রকমের ঘড়ি — সোনার ঘড়ি, ঘড়ির একেবারে মেলা। পড়ল রন্দা! আমি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। এদিকে সেপাইটা আমাকে আদর করে জিজ্ঞেস করে: 'তুই কে, কোথা থেকেই বা এসেছিস?' আমিও বললাম — আর না বললেও ওরা জানতে পারতই। ওরা সব জানে। ও আমাকে থানায় নিয়ে গেল... সেখানে নানা রকমের ভদ্রলোক... বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস?' আমি বললাম, 'ঘুরতে বেরিয়েছি...' হাসির ধুম পড়ে যায়... তারপর জেলখানায়... সেখানেও সকলে হো হো করে হাসে। পরে ঐ ভদ্রলোকেরা আমার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল... সে আর কী বলব! ওঃ!'

ভদ্রলোকদের প্রসঙ্গ উঠলে বেশির ভাগ সময়ই তার মধ্যে উৎসাহের ভাব লক্ষ্য করা যেত — স্পষ্টই বোঝা যেত তারা ওর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, কিন্তু তাদের চেহারাগুলো ওর স্মৃতিতে কেমন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা বিরাট ঘোলাটে ছোপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুচির কাছে মাসখানেক থাকার পর পাভেল আবার কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। পরে পেরফিশ্‌কা জানতে পারল যে ও ছাপাখানায় ঢুকেছে এবং শহরে, দূরে কোথাও থাকে। একথা শোনার পর ইলিয়া ঈর্ষাবশত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়াকভ্‌কে বলল:

'দেখা যাচ্ছে, আমি আর তুই এখানেই পচে মরব...'

পাভেল উধাও হওয়ার পর ইলিয়া কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করল, কিন্তু দেখতে দেখতে সে আবার অপরূপ কল্পনার জগতে আশ্রয় নিল। আবার শুরু হল বই পড়া, ইলিয়ার মন মধুর জাগর-স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল।

বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তনটা হল রূঢ় ও আকস্মিক। এক দিন সকালবেলা কাকা ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল:

'চটপট হাতমুখ ধুয়ে সাফসুতরা হয়ে নে।'

'কেন? কোথায় যেতে হবে?' ঘুম জড়ানো গলায় ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কাজের জায়গায়! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন! কাজ জুটেছে!.. মাছের আড়তে কাজ করবি।'

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতিতে ইলিয়ার মন ভার হয়ে গেল। এই যে বাড়িটা, যেখানকার সব কিছু তার জানা, সব কিছুতে সে অভ্যস্ত, তা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওর হঠাৎ উবে গেল, যে ঘরটাকে সে ভালোবাসত না তা এখন তার কাছে রীতিমতো পরিষ্কার ও ঝকঝকে বলে মনে হতে লাগল। খাটের ওপর বসে বসে সে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল, জামাকাপড় পরার ইচ্ছে তার ছিল না। ইয়াকভ্ এলো, তার মাথায় তখনও চিরুনীর আঁচড় পড়ে নি। সে ভুরু কুঁচকে, ঘাড় কাত করে বন্ধুর দিকে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল:

'শিগ্‌গির কর, বাবা অপেক্ষা করছে... তুই এখানে মাঝে মাঝে আসবি ত?'

'আসব...'

'আসবি কিন্তু... যাওয়ার আগে মাশার সঙ্গে একবার দেখা করে যাস।'

'আমি ত আর একেবারে চলে যাচ্ছি না,' ইলিয়া রেগে গিয়ে বলল।

মাশা নিজেই এলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে ও বিষণ্ণ সুরে বলল:

'তুই তাহলে চললি!'

ইলিয়া কোর্তা গায়ে পরছিল, রাগের মাথায় সে ওটা ধরে হেঁচকা টান মারল, গালাগাল দিল। মাশা আর ইয়াকভ্ — দুজনেই একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আসিস তাহলে!' ইয়াকভ্ বলল।

'রাখ দেখি!' ইলিয়া রূঢ় ভাবে উত্তর দিল।

'ওঃ, তেজ দ্যাখ দোকানী বাবুর!..' মাশা মন্তব্য করল।

'হাঁদা কোথাকার!' ইলিয়া নীচু গলায় ধমক দিয়ে বলল।

কয়েক মিনিট বাদেই সে পেত্রুখার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পেত্রুখার সাজ দেখার মতো — বড় ঝুলের ফ্রক-কোট, পায়ে মস্‌মস্‌ করছে জুতো। সে জাঁক করে ইলিয়াকে বলতে লাগল:

'আমি তোকে কাজে বহাল করতে নিয়ে যাচ্ছি কিরিল ইভানিচ্‌ স্ত্রোগানির কাছে — গণ্যিমান্যি লোক, সারা শহরে তাঁর খুব নামডাক... ভালো কাজ আর দানধ্যানের জন্যে উনি সোনার মেডেল পেয়েছেন — চাট্টিখানি কথা নয়! শহরের কাউন্সিল মেম্বার, হয়ত এই ইলেক্‌শনে মেয়রই হয়ে যাবেন। সৎপথে থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে ওর সেবা করিস, আর বলতে গেলে কি উনি তোকে মানুষ করে দেবেন... তুই ছেলেটা সিরিয়াস আছিস, বখাটে নোস... কোন মানুষের উপকার করা তাঁর কাছে মুখের থুতু ফেলারই সামিল...'

ইলিয়া শুনতে শুনতে ব্যবসাদার স্ত্রোগানির চেহারাটি মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল এই ব্যবসাদারটা নিশ্চয়ই হবে ইয়েরেমেই দাদুর মতো — ঐ রকমই রোগা চেহারার, অমায়িক, ভালো মানুষ। কিন্তু দোকানে ঢুকতে ও দেখতে পেল কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ভুঁড়িওয়ালা দীর্ঘকায় একটি লোক। লোকটার মাথায় এক গাছাও চুল নেই, কিন্তু চোখের কাছ থেকে ঘাড় অবধি তার সারা মুখ কটা রঙের ঘন দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা। ভুরুজোড়াও ঘন আর কটা, সেগুলোর নীচে কটমট করে ঘুরছে সব্‌জেটে একজোড়া কুতকুতে চোখ।

'নমস্কার কর!' চোখের ইসারায় কটা চেহারার লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে পেত্রুখা ফিসফিস করে ইলিয়াকে বলল। ইলিয়া বিমূঢ় হয়ে মাথা নোয়াল।

'কী নাম?' জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে দোকানঘরটা গমগম করে উঠল। 'শোন্‌ তাহলে ইলিয়া, খোলা রাখবি দুচোখ, কিন্তু দেখতে হলে চাই তিন! এখন তোর মনিব ছাড়া আর কেউ নেই! আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব — কেউ নেই, বুঝলি? আমি·তোর মা-বাপ — এই হল আমার শেষ কথা...'

ইলিয়া আড়চোখে দোকানটা নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। ঝুড়িতে পড়ে আছে বরফ দেওয়া বিরাট বিরাট শীট আর স্টার্জন মাছ, তাকে থরে থরে সাজানো — শুঁটকি পাইক আর রুইমাছ, সর্বত্র চকচক করছে টিনের কৌটো। মাছ জারানো নুনের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, দোকানঘরটা

চাপা, দম বন্ধ আসে। মেঝেতে বিশাল বিশাল গামলার মধ্যে ছটফট করছে জ্যান্ত মাছ — স্টার্লেট, বাণমাছ, পার্চ, ঘলামাছ। একটা মাঝারি গোছের পাইক মাছ জলের মধ্যে ভয়ানক ছটফট করছিল, অন্য মাছগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল, লেজের জোরাল ঝাপ্টায় মাটিতে জল ছিটাচ্ছিল। ওটার জন্য ইলিয়ার দুঃখ হল।

দোকানের কর্মচারীদের মধ্যে একজন ছোটখাটো, নাদুসনুদুস গড়নের লোক ছিল, তার চোখ দুটো গোল গোল, নাকটা বঁড়শীর মতো, প্যাঁচার সঙ্গে চেহারায় বেশ মিল আছে। সে ইলিয়াকে গামলা থেকে সদ্যমরা মাছগুলো বেছে বেছে তোলার ভার দিল। ইলিয়া আস্তিন গুটিয়ে যেমন খুশি তেমনি মাছ ধরতে লাগল।

'মাথা ধর, গোমুখ্যু!' অস্ফুট স্বরে লোকটা বলল।

ইলিয়া মাঝে মাঝে ভুল করে নিস্তেজ জ্যান্ত মাছ ধরে ফেলছিল; মাছ তার হাত থেকে পিছলে পড়ে ভয়ানক ছটফট করতে করতে গামলার গায়ে মাথা ঠুকতে থাকে।

ইলিয়ার আঙুলে একবার মাছের পাখনার কাঁটা ফুটল, সে আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে লাগল।

'আঙুল বার কর!' মনিব গম্ভীর গলায় গর্জে উঠল।

তারপর ওকে একটা ভারী কুড়ুল দিয়ে বলা হল মাটির তলার কুঠুরিতে গিয়ে বরফ ভাঙ্গতে — এমন ভাবে ভাঙ্গতে যাতে সমান করে ফেলা যায়। বরফের ভাঙ্গা টুকরোগুলো তার মুখে এসে উড়ে পড়তে লাগল, জামার কলারের ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে লাগল। কুঠুরিতে ঠান্ডা, অন্ধকার; সাবধান হয়ে না তুললেই কুড়ুল ছাদে এসে লাগে। কয়েক মিনিট বাদে ভিজে সপসপে হয়ে কুঠুরি থেকে উঠে এসে ইলিয়া মনিবকে জানাল:

'ওখানে আমি একটা বয়াম ভেঙ্গে ফেলেছি...'

মনিব তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল:

'এই প্রথম বলে মাফ করে দিচ্ছি। নিজে বলেছিস — তাই মাফ করলাম... পরের বার হলে — কান ছিঁড়ে ফেলব...'

বিরাট ঘর্ঘরে এক যন্ত্রের স্ক্রুর মতো ইলিয়া অলক্ষিতে ঘানিতে একঘেয়ে পাক খেয়ে চলল। সকাল পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে সে মনিবের, তার পরিবারের সকলের আর কর্মচারীদের জুতো পালিশ করত, তারপর দোকানে

গিয়ে দোকানঘর ধোয়ামোছা করত, টেবিল আর দাঁড়িপাল্লা ধুত। খরিদ্দাররা আসতে থাকত — সে মাল বয়ে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিত, তারপর দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি যেত। খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু করার থাকত না, ওকে যদি কোথাও পাঠান না হত তাহলে ও দোকানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজারে লোকজনের ছুটোছুটি দেখত, ভাবত দুনিয়ায় কত লোকই না আছে আর তারা কতই না মাছ, মাংস, শাকসব্জি খায়। এক দিন সে প্যাঁচার মতো চেহারার কর্মচারীটাকে বলল:

'মিখাইল ইগ্‌নাতিচ্‌!'

'কী ব্যাপার?'

'সব মাছ ধরা হয়ে গেলে, সব গোরু-ভেড়া কেটে ফেললে লোকে পরে কী খাবে?'

'বুদ্ধু!' উত্তরে কর্মচারীটা ওকে বলল।

আরেকবার দোকানের কাউণ্টার থেকে খবরের কাগজ তুলে নিয়ে সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। কর্মচারী ওর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিল, নাকের ওপর আঙ্গুল দিয়ে টুসকি মেরে ধমক দিয়ে বলল:

'কার হুকুমে তুই পড়ছিস, অ্যাঁ? গাধা...'

লোকটাকে ইলিয়া দেখতে পারত না। মনিবের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার প্রায় প্রতিটি কথায় সঙ্গে সঙ্গে তোষামোদের সুর ঝরে পড়ত আর আড়ালে ব্যাপারী স্ত্রোগানিকে ঠগ ও কটা শয়তান বলত। প্রত্যেক শনিবার ও উৎসবের আগে আগে মনিব দোকান ছেড়ে সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিতে যেত, তখন কর্মচারীর বৌ কিংবা বোন তার কাছে আসত, তাদের দিয়ে সে মোড়কে করে মাছ, মাছের ডিম ও টিনের মাছ নিজের বাড়িতে পাচার করত। ভিখিরীদের নিয়ে মজা করতে সে ভালোবাসত। ঐ সব ভিখিরীর মধ্যে এমন অনেক বুড়ো থাকত যাদের দেখলে ইলিয়ার মনে পড়ে যেত ইয়েরেমেই দাদুকে। দোকানের দোরগোড়ায় কোন বুড়ো এসে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে নীচু গলায় ভিক্ষে চাইলে কর্মচারীটা ছোট মাছের মাথা ধরে সেই ভিখিরীর হাতে লেজের দিকটা এমন ভাবে গুঁজে দিত যে পাখনার কাঁটাগুলো ভিখিরীর তালুর নরম জায়গায় ফুটে যেত। ভিখিরী যন্ত্রণায় কাতরে উঠে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিলে কর্মচারী রাগে ঠাট্টার সুরে চেঁচিয়ে বলত:

'চাস নে? কম হল বুঝি? ভাগ বলছি...'

একবার এক ভিখিরী বুড়ি আস্তে আস্তে একটা শুঁটকি মাছ নিয়ে তার ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল। কর্মচারী তা দেখতে পেয়ে বুড়ির ঘাড় ধরে চোরাই মাছটা কেড়ে নিল, তারপর বুড়ির মাথা চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে তার মুখের ওপর এক প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিল। বুড়ি টুঁ শব্দটি না করে মাথা নীচু করে চুপচাপ সরে পড়ল। ইলিয়া দেখতে পেল তার ভাঙা নাক থেকে ফিনকি দিয়ে গাঢ় রক্ত ঝরে পড়ছে।

'কেমন মজা?' কর্মচারী বুড়ির পেছন পেছন চিৎকার করে বলল।

পরে কার্প নামে অন্য এক কর্মচারীর দিকে ফিরে বলল:

'এই ভিখিরীগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারি না!.. কুঁড়ের হদ্দ! দোরে দোরে হাত পাতে — পেট পুরে খাওয়া জুটে গেল! দিব্যি আছে... লোকে বলে এরা নাকি খ্রীস্টের জীব। আমি তাহলে খ্রীস্টের কে? পর হলাম বুঝি? সারা জীবন আলোর নীচে একটা পোকার মতো ছটফট করে মরছি, কোন স্বস্তি নেই, কারও কাছ থেকে কোন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই...'

অন্য কর্মচারীটি — কার্প, সাত্ত্বিক গোছের মানুষ, তার মুখে কেবল গির্জা, ভজন আর আর্চবিশপের মন্ত্রোচ্চারণের কথা; শনিবার শনিবার তার আশঙ্কা হত এই বুঝি সান্ধ্য উপাসনায় হাজিরা দিতে দেরি করে ফেলে। তার আরও একটি আকর্ষণ ছিল যাদু। শহরে কোন যাদুকর ও বাজিকর এলে কার্প তার খেলা দেখতে যাবেই যাবে... লোকটা ছিল লম্বা, রোগা আর খুব চটপটে; দোকানে যখন অনেক খদ্দেরের ভিড় জমে যেত তখন সে সাপের মতো এঁকেবেঁকে তাদের ভেতর দিয়ে যেত, সকলের দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকাত, সকলের সঙ্গে কথা বলত আর কাজ করতে সে যে বড় ওস্তাদ, মনিবের সামনে ঠিক এই রকম একটা বাহাদুরীর ভাব নিয়েই যেন বার বার তার বিপুল চেহারাটার দিকে তাকাত। এ লোকটাও ইলিয়াকে অবজ্ঞা করত, ওকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত। ইলিয়াও তাকে পছন্দ করত না। তবে মনিবকে তার ভালোই লাগত। সকাল থেকে সন্ধে অবধি ব্যাপারী কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, ক্যাশ বাক্স খুলে তার মধ্যে ঝনাৎ ঝনাৎ টাকা-পয়সা ফেলত। ইলিয়া দেখত যে মনিব কাজটা করছে নির্বিকার ভাবে, কোন রকম লোভের ভাব না দেখিয়ে — এটা কেন যেন তার ভালো লাগত। তা ছাড়া আর সব কর্মচারীর তুলনায় মনিব যে তার সঙ্গে বেশি ঘন ঘন এবং বেশ স্নেহের সুরে কথা বলে এ ব্যাপারটাও তার ভালো লাগত। ঝঞ্ঝাট

ঢুকে গেলে, কোন খদ্দেরের ঝামেলা না থাকাতে ইলিয়া যখন ঝিম মেরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত তখন ব্যাপারী মাঝে মাঝে তাকে ডাকত:

'অ্যাই, ইলিয়া, ঝিমুচ্ছিস নাকি?'

'না...'

'তুই সব সময় অমন গুম্ মেরে থাকিস কেন রে?'

'জানি না...'

'একঘেয়েমিতে মন খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ...'

'তা, মন খারাপ করিস নে! এক সময় আমারও একঘেয়ে লাগত... নয় বছর থেকে বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অন্যের জন্যে খেটে খেটে একঘেয়ে লাগত... আর এখন — আজ তেইশ বছর হল দেখে আসছি অন্যদের কেমন একঘেয়ে লাগে...'

সে মাথা নাড়িয়ে কথাটার জের টেনেই যেন বলত:

'কী আর করার আছে, বল!'

দু-তিন বার এ রকম কথাবার্তার পর ইলিয়ার মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে লাগল: এই ধনী-মানী লোকটা নিজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট ঘর-বাড়ি থাকতে সারা দিন নোংরা দোকানঘরে নোনা মাছের টক, ঝাঁজাল গন্ধের মধ্যে কেন পড়ে থাকে? বাড়িটা ছিল অদ্ভুত ধরনের: সেখানে কড়া নিয়ম, টুঁ শব্দটি নেই, সবই হয়ে থাকে ধরা-বাঁধা নিয়মমাফিক। বাড়িটাকে কেমন ঘিঞ্জি মনে হত, যদিও দুটো তলা নিয়ে প্রাণী বলতে কর্তা গিন্নি আর তাদের তিন মেয়ে ছাড়া সেখানে থাকত কেবল রাঁধুনী, ঝি আর দারোয়ান — সেই দারোয়ানই আবার গাড়োয়ানের কাজও করত। বাড়িতে সকলে নীচু গলায় কথা বলত এবং ঝাড়ামোছা বিরাট উঠোনটা পার হওয়ার সময় এমন ভাবে এক পাশ ঘেঁষে যেত যেন খোলা কোন জায়গায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। পেত্রুখার বাড়ির সঙ্গে এই মজবুত গড়নের শান্ত বাড়িটার তুলনা করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবেই ইলিয়ার মনে হল যে পেত্রুখার বাড়িতে দারিদ্র্য, হৈ-হট্টগোল ও নোংরা পরিবেশ থাকলে কী হবে সেখানে বাস করা এর চেয়ে ভালো। ওর ভয়ানক ইচ্ছে হত ব্যাপারীকে জিজ্ঞেস করে কেন সে বাড়ির নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্ত পরিবেশ ছেড়ে সারা দিন বাজারে, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কাটিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

এক দিন কার্প যেন কোথায় চলে গেছে, মিখাইল মাটির তলার ঘরে গিয়ে লঙ্গরখানার জন্য পচা মাছ বাছছে, মনিব ইলিয়ার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে — এমন সময় ইলিয়া তাকে বলল:

'কিরিল ইভানভিচ্, আপনি দোকানদারী ছেড়ে দিলেই ত পারেন... আপনি এখন বড়লোক, আপনার বাড়ি চমৎকার, আর এখানে কী বোট্কা গন্ধ, কী একঘেয়ে!..'

স্ত্রোগানি ডেস্কের ওপর কনুই ভর দিয়ে খুঁটিয়ে ওর দিকে তাকাল, ব্যাপারীর কটা ভুরুজোড়া কাঁপতে লাগল।

'তারপর?' ইলিয়া চুপ করে যেতে সে জিজ্ঞেস করল। 'আর কিছু বলার আছে তোর?'

'না...' বিমূঢ় হয়ে ভয়ে ভয়ে ইলিয়া উত্তর দিল।

'এদিকে আয় দেখি!'

ইলিয়া এগিয়ে আসতে ব্যাপারী থুতনি ধরে ওর মাথাটা ওপরের দিকে ওঠাল, চোখ কুঁচকে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'এটা তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে না তোর নিজের কথা?'

'ভগবানের দিব্যি, নিজের কথা।'

'হুম্, তা নিজের যদি হয়ে থাকে — ঠিক আছে! তবে তোকে যা বলছি শোন, এই ভাবে আমার সঙ্গে — মনিবের সঙ্গে কথা বলার আস্পর্ধা যেন তোর আর না হয় — বুঝলি? আমি হলাম তোর মনিব! মনে রাখবি! নিজের জায়গায় যা...'

কার্প আসতে মনিব কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই, ইলিয়া যাতে দেখতে পায় সেই ভাবে আড়চোখে তার দিকে তাকাতে তাকাতে কর্মচারীকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠল:

'মানুষের উচিত সারা জীবন কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকা — সারা জীবন!.. এটা যে বোঝে না, সে একটা আহাম্মক। কিছু না করে অমনি অমনি কী করে থাকা যায়? নিজের কাজে যার ভক্তি নেই সে একটা অপদার্থ...'

'একেবারে খাঁটি কথা, কিরিল ইভানভিচ্!' এই বলে কর্মচারী করার মতো কাজ খুঁজতে মনোযোগ দিয়ে দোকানের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ইলিয়া মনিবের দিকে তাকাল, ভাবনায় ডুবে গেল। এই সব লোকের মাঝখানে ওর ক্রমেই বড় একঘেয়ে লাগতে লাগল। কোন একটা অদৃশ্য সুতোর গোলা

থেকে ছাড়া ছাই রঙের লম্বা লম্বা সুতোর মতো দিনগুলো একের পর এক টানা চলে যায়, ওর মনে হল বুঝি এই দিনগুলোর আর শেষ নেই, সারা জীবন সে এই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজারের কোলাহল শুনতে থাকবে। কিন্তু এর আগের অভিজ্ঞতায় এবং পড়া বই থেকে তার মনের মধ্যে যে ভাবনা-চিন্তার আলোড়ন ঘটেছে তা এই একঘেয়ে ঘুমপাড়ানি জীবনের প্রভাব মেনে নিল না, ধীরে ধীরে হলেও অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলল। মাঝে মাঝে চুপচাপ ও গম্ভীর স্বভাবের এই ছেলেটির লোকজনের দিকে তাকাতে এত খারাপ লাগত যে ইচ্ছে হত চোখ বোঁজে, দূরে কোথাও চলে যায় — পাভেল গ্রাচোভ যেখানে গিয়েছিল তার চেয়েও দূরে — আর যেন যেখান থেকে ফিরে আসতে না হয় এই বিবর্ণ একঘেয়েমির মধ্যে, লোকজনের অর্থহীন হৈ-হট্টগোলের মধ্যে।

পরবের দিনে তাকে গির্জায় যেতে দেওয়া হত। সেখান থেকে ও ফিরে আসত এমন অনুভূতি নিয়ে যেন তার বুকের ভেতরটাকে কেউ ধুইয়ে দিয়েছে সুগন্ধী, ঈষদুষ্ণ জলীয় বাষ্পে। চাকরির ছয় মাসের মধ্যে দুবার ওকে কাকার কাছে ছাড়া হয়েছিল। সেখানে সবই আগের মতো চলছিল। কুঁজো দিন দিন রোগা হচ্ছে, আর পেত্রুখার শিসের আওয়াজ আরও বাড়ছে, তার মুখে গোলাপী থেকে লালের আভা পড়ছে। ইয়াকভ্ নালিশ করে যে বাবা ওর ওপর অত্যাচার করছে।

'খালি বকাবকি করে, বলে, 'কাজের কাজ কর... ওসব পড়ুয়া-টড়ুয়া আমি চাই না...' বার কাউণ্টারে দাঁড়াতে যদি আমার খারাপ লাগে তাহলে আমি কী করতে পারি? হৈ-হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি, নিজের কথা নিজেই শোনা যায় না!.. আমি বলি, যেখানে আইকন বিক্রি করে সেই রকম কোন দোকানের কর্মচারী করে আমাকে ঢুকিয়ে দাও... সেখানে খদ্দের-টদ্দের কম, তা ছাড়া আইকন আমি ভালোও বাসি...'

ইয়াকভের চোখ দুটো বিষণ্ণ ভাবে মিটমিট করতে লাগল, কপালের চামড়া কেন যেন হলদেটে হয়ে গেছে, ওর বাবার মাথার টাকের মতো চকচক করছে।

'তা বই পড়িস ত?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'পড়ি না আবার! ওটাই ত একমাত্র আনন্দ... পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অন্য কোন শহরে আছি... আর শেষ হতেই — একেবারে চুড়ো থেকে মাটিতে পড়ার মতো...'

ইলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে বলল:

'তুই কেমন বুড়োটে হয়ে গেছিস!.. মাশা কোথায় রে?'

'লঙ্গরখানায় গেছে ভিক্ষে করতে। এখন আমি ওকে কমই সাহায্য করতে পারি — বাবা নজর রাখে... আর পেরফিশ্কা ভুগছে ত ভুগছেই... মাশা তাই ভিক্ষে করতে নেমেছে। ওখানে ওকে স্যুপ আর অন্যান্য খাবার-টাবার দেয়... মাতিৎসা এখনও সাহায্য করে... মাশার বড় খারাপ সময় যাচ্ছে...'

'তোদের এখানেও দেখছি খারাপ,' ইলিয়া চিন্তিত হয়ে বলল।

'তোর কি বড় খারাপ লাগে?'

'ওঃ মরার হাল!.. তোদের অন্তত বই আছে... আমাদের গোটা বাড়িতে বই বলতে আছে 'হালের যাদুকর ও বাজিকর' — সেটা আছে এক কর্মচারীর সিন্দুকের ভেতর, সেও পড়ার উপায় নেই... জোচ্চোরটা পড়তে দেয় না। আমাদের জীবনটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল রে ইয়াকভ্...'

'যা বলেছিস ভাই...'

ওরা আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল, বিদায় নিল, দুজনেই বিষণ্ণ।

আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, হঠাৎ ভাগ্য ইলিয়ার ওপর বিরূপ হল — এক হিশেবে প্রসন্নই হল বলা যেতে পারে। এক দিন সকালে কারবার যখন পুরোদমে চলছে তখন কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনিব হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে সেখানকার সব কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তার কপাল লাল টকটকে হয়ে উঠল — যেন গাঢ় রক্তে ছেয়ে গেছে, ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে টনটন করছে।

'ইলিয়া!' মনিব হাঁক দিল। 'দ্যাখ দেখি, মেঝেতে দশ রুবলের কোন নোট পড়ে আছে কি না...'

ইলিয়া ব্যাপারীর দিকে এক নজর তাকাল, তারপর দ্রুত মেঝের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বলল:

'নেই...'

'যা বলছি শোন, ভালো করে চেয়ে দ্যাখ!..' মনিব ভারী গলায় গর্জে উঠল।

'ও আমি দেখেছি...'

'কথা শুনলি, হারামজাদা, গোঁয়ার!' মনিব হুঙ্কার ছাড়ল।

খদ্দেররা চলে গেলে মনিব ইলিয়াকে ডাকল, শক্ত ও মোটা মোটা আঙ্গুল দিয়ে তার কান ধরে এপাশে ওপাশে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গর্জন করে বলতে লাগল:

'তোকে দেখতে বলা হচ্ছে— দ্যাখ, বলা হচ্ছে দেখতে — দ্যাখ...'

ইলিয়া দুই হাতে মনিবের ভুঁড়ি ঠেলে দিল, জোরে ধাক্কা দিল, তার হাত থেকে ঝটকা মেরে কান ছাড়িয়ে নিয়ে রাগে, অপমানে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

'আমাকে ঝাঁকুনি মারছেন কেন? টাকা সরিয়েছে মিখাইল ইগ্‌নাতিচ্। ওর ভেতরের জামার বাঁ পকেটে আছে...'

কর্মচারীর প্যাঁচার মতো মুখটা অদ্ভুত রকম লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল, কেঁপে উঠল, পরক্ষণেই আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে সে ইলিয়ার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। ইলিয়া কাতরাতে কাতরাতে পড়ে গেল, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সে মেঝের ওপর গড়াতে গড়াতে দোকানের এক কোণে সরে গেল। অনেকটা যেন ঘুমের ঘোরে সে শুনতে পেল মনিবের হিংস্র গর্জন:

'দাঁড়া! চললি কোথায়? টাকা দে...'

'ও মিথ্যে কথা বলছে...' কর্মচারীর মিনমিনে গলা শোনা গেল।

'মাথায় বাটখারা ছুঁড়ে মারব!'

'কিরিল ইভানিচ্... এটা আমার... আমাকে মেরে কেটে ফেলুন...'

'চোপ্‌রও!..'

সব চুপচাপ। মনিব নিজের ঘরে চলে গেল, সেখান থেকে টাকা-পয়সা গোনার কাঠের ঘুঁটির খটখট আওয়াজ ভেসে এলো। ইলিয়া দুহাতে মাথা চেপে ধরে মেঝের ওপর বসে ছিল, সে বিষদৃষ্টিতে কর্মচারীর দিকে তাকাতে লাগল, কর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল দোকানের অন্য কোনায়, সেও ছেলেটার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল।

'কী রে শুয়ার, কেমন মারটা খেলি?' দাঁত বার করে সে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া কাঁধ ঝাঁকাল, কিছু বলল না।

'এবারে তোকে আরও একটা উচিত শিক্ষা দেব!'

সে ধীরেসুস্থে ইলিয়ার দিকে এগিয়ে গেল, তার গোল গোল হিংস্র চোখজোড়া ইলিয়ার মুখের ওপর নিবদ্ধ। ইলিয়া এবারে উঠে দাঁড়াল, দ্রুত

গতিতে কাউণ্টার থেকে লম্বা ও ফিনফিনে একটা ছুরি উঠিয়ে নিয়ে বলল:

'চলে আয়!'

কর্মচারীটি তখন থমকে গেল, এক দৃষ্টিতে ছুরি হাতে গাঁট্টাগোঁট্টা শক্তসমর্থ মূর্তিটা নিরীক্ষণ করতে লাগল, থেমে গিয়ে ঘৃণাভরে টেনে টেনে বলল:

'হুঁ, দাগীর গুষ্টি...'

'কী হল, চলে আয়, চলে আয়!' ইলিয়া তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আবার বলল। চোখের সামনে সব তখনও কাঁপছিল, ঘুরছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে সে অনুভব করছিল এমন এক বিপুল শক্তি যা তাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছিল।

'ছুরি ফেলে দে!' মনিবের গলা শোনা গেল।

ইলিয়া চমকে উঠল, সে মনিবের কটা দাড়ি আর রক্ত টগবগে মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু জায়গা ছাড়ল না।

'ছুরি রাখ বলছি!' মনিব আরও শান্ত গলায় বলল।

ইলিয়া ছুরিটা কাউণ্টারে রেখে, ডুকরে কেঁদে উঠে আবার মেঝেতে বসে পড়ল। ওর মাথা ঘুরছিল, মাথায় ব্যথা করছিল, কান জ্বালা করতে লাগল, বুকের মধ্যে কেমন একটা ভার ভার বোধ হওয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ভারটা তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দনে বাধা সৃষ্টি করছিল, ধীরে ধীরে গলার কাছাকাছি উঠে এসে কথা বলাও দুঃসাধ্য করে তুলছিল। মনিবের কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে তার কাছে ভেসে এলো:

'পাওনা বুঝে নিয়ে বিদেয় হ, মিখাইল...'

'আজ্ঞে, কিন্তু...'

'ভাগ! নইলে পুলিশ ডাকব কিন্তু...'

'ঠিক আছে! আমি যাচ্ছি... তবে এই ছেলেটার ওপরে একটু নজর রাখবেন... ছুরি হাতে কিনা... হে-হে!'

'ভাগ!'

দোকানঘরে আবার সব চুপচাপ। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ইলিয়া কেঁপে উঠল: তার মনে হল মুখের ওপর কী যেন একটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। ও গালে হাত বুলালো, চোখের জল মুছতে দেখতে পেল মনিব

এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন এখনই ছিঁড়ে ফেলবে। ইলিয়া তখন উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে দরজার দিকে, নিজের জায়গায় এগিয়ে গেল।

'দাঁড়া, থাম দেখি!' মনিব বলল। 'তুই কি পারলে ওকে ছুরি মেরে বসাতিস নাকি?'

'নির্ঘাৎ মারতাম!' শান্ত অথচ কঠিন স্বরে ইলিয়া বলল।

'বটে! তোর বাপের জেল হয়েছে কেন? — খুন করেছিল?'

'আগুন লাগিয়েছিল...'

'এটাও খাসা কাজ...'

কার্প এসে চুপচাপ দোরগোড়ায় টুলের ওপর বসে রাস্তা দেখতে লাগল।

'ওরে কার্প!' বাঁকা হাসি হেসে তার দিকে চেয়ে মনিব বলল। 'মিখাইলকে ত ভাগিয়ে দিলাম!..'

'আপনার ইচ্ছে, কিরিল ইভানভিচ্!'

'চুরি করতে লাগল, বোঝ ব্যাপার!'

'কী কান্ড!' কার্প শিউরে উঠে নীচু গলায় বলল। 'তাই নাকি? অ্যাঁ?'

মনিবের কটা দাড়ি বিদ্রুপের হাসিতে কেঁপে উঠল, কাউণ্টারের ওপাশে সে এদিক ওদিক দুলে হিহি করে হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি।

'ওঃ কার্প, তুই আমাদের ম্যাজিসিয়ান রে...'

তারপর আচমকা হাসি থামিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিন্তিত ভাবে কঠিন স্বরে বলল:

'ওঃ লোকজন, কত রকমেরই না লোকজন! বাঁচার ইচ্ছে ত তোমাদের সকলের আছে, সবারই গেলা চাই! আচ্-ছা, ইলিয়া, বল দেখি, মিখাইল যে চুরি করে তা তুই আগে লক্ষ্য করেছিস?'

'করেছি...'

'তাহলে তুই আমাকে আগে একথা বলিস নি কেন? ওর ভয়ে নাকি?'

'না, ভয়ে নয়...'

'তার মানে তুই এখন রাগে আমাকে বলে ফেললি...'

'হ্যাঁ,' ইলিয়া দৃঢ় স্বরে বলল।

'ইশ্, কী ছেলে রে!' মনিব বলে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ নিজের কটা দাড়িতে হাত বুলাল, চুপচাপ গম্ভীর ভাবে ইলিয়াকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

'আচ্ছা, ইলিয়া, নিজে তুই চুরি করেছিস?'

'না...'

'তোর কথা বিশ্বাস করি... তুই চুরি করিস নি... আচ্ছা, কার্প — এই যে এই কার্প — লোকটা কেমন? চুরি করে?'

'করে!' ইলিয়া বলল।

কার্প অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল, চোখ পিটপিট করল, শেষে শান্ত ভাবে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনিব মুখ গোমড়া করে ভুরু কপালে তুলল, আবার দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল। ইলিয়া অনুভব করল অদ্ভুত কিছু একটা ঘটতে চলেছে, সে অধীর আগ্রহে এর শেষ দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। দোকানঘরের গন্ধমাখা বাতাসে মাছি ভনভন করছিল, জ্যান্ত মাছের গামলায় মাছের নিস্তেজ ঝাপ্‌টানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

'কার্প! অ কার্প!' ব্যাপারী কর্মচারীর উদ্দেশে হাঁক পাড়ল। কার্প তখন মনোযোগ দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে রাস্তা দেখছিল।

'আজ্ঞে, বলুন?' কার্প সাড়া দিল, মনিবের দিকে এগিয়ে এসে বিনীত ও নম্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোর সম্পর্কে কী বলা হল শুনলি?' বাঁকা হাসি হেসে স্ত্রোগানি জিজ্ঞেস করল।

'শুনেছি...'

'তা, তুই কী বলিস?'

'কিছুই না!..' না বোঝার ভান করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কার্প বলল।

'কিছু না মানে?'

'মানে খুবই সোজা, কিরিল ইভানভিচ্। কিরিল ইভানভিচ্, আমার নিজের একটা মান-মর্যাদা আছে, মানুষ হিসেবে আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, তাই একটা ছোট ছেলের ওপর রাগ করা আমার শোভা পায় না। তা ছাড়া আপনি নিজেই ত দেখছেন ছেলেটা ডাহা মুখ্যু, ওর কোন জ্ঞানগম্যি নেই...'

'ওসব ছেঁদো কথা রাখ! ও সত্যি বলছে কিনা বল।'

'সত্যির কী আছে কিরিল ইভানভিচ্?' কার্প বলে উঠল, আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথাটা কাত করল। 'ওর কথা আপনি সত্যি বলে নেবেন এমন নিশ্চয়ই হতে পারে না... বিশ্বাস করা না করা আপনার হাতে!..'

কার্প দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায়ের ভঙ্গিতে দুহাত ছড়াল।

'তা ঠিকই, এখানে সবই আমার হাতে,' মনিব স্বীকার করল। 'তাহলে তোর মতে, ছেলেটা মূর্খ!'

'ডাহা মূর্খ,' বেশ জোর দিয়েই কার্প বলল।

'কিন্তু তুই মিথ্যে বলছিস বলেই মনে হয়,' স্ত্রোগানির সুরে অনিশ্চয়তা, কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠল।

'না, কেমন সরাসরি তোর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল — হো-হো! 'কার্প চুরি করে?' — 'করে!' হো-হো-হো!'

মনিব যখন হেসে উঠল, ইলিয়া অনুভব করল যে তার বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছে প্রতিহিংসার আনন্দ, সে বিজয়ীর ভাব নিয়ে কার্পের দিকে তাকাল, মনিবের দিকে তাকাল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে। কার্প তার মনিবের হাসি কান পেতে শুনল, সে নিজেও গলা থেকে সন্তর্পণে হাসির আওয়াজ বার করল:

'হে-হে-হে!'

এই চাপা হাসির আওয়াজ শুনে স্ত্রোগানি কঠিন স্বরে হুকুম দিল:

'দোকানের ঝাঁপ বন্ধ কর!..'

ইলিয়া যখন বাড়ি যাচ্ছিল তখন কার্প মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ওকে বলল:

'বুদ্ধু তুই, বুদ্ধু! এই ঝামেলাটা পাকাতে গেলি কেন বল দেখি? এই করে তুই কর্তার সুনজরে পড়বি ভাবছিস? আকাট! তুই ভাবছিস আমি আর মিখাইল যে চুরি করতাম তা ওর জানা ছিল না? আরে ও নিজেই ত এ ভাবে জীবন শুরু করে... মিখাইলকে যে তাড়িয়ে দিয়েছে তার জন্যে, বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে, তোকে ধন্যবাদ! কিন্তু আমার সম্পর্কে তুই যা বলেছিস তার জন্যে তোকে কখনই ক্ষমা করব না! একে মূর্খের আস্পর্ধা ছাড়া আর কী বলব! আমার সামনে আমারই সম্পর্কে কিনা এমন কথা বলা! এর শোধ আমি তুলব!.. তার মানে আমার ওপর তোর কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই...'

ইলিয়া তার কথা শুনে গেল, কিন্তু ভালোমতো বুঝতে পারল না। কার্পের রাগের প্রকাশটা যে এ ধরনের হবে তা ও ভাবতে পারে নি: ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দোকানের এই কর্মচারীটি পথে তার ওপর মারধোর করবে, বাড়ি যেতে পর্যন্ত তার ভয় ভয় করছিল... কিন্তু কার্পের কথায় ক্রোধের বদলে

প্রকাশ পাচ্ছিল কেবল উপহাস, তার হুমকিতে ইলিয়া ভয় পেল না। সন্ধ্যাবেলায় মনিব ইলিয়াকে বাড়ির ওপরতলায় তলব করল।

'হুঁ হুঁ! আচ্ছা, যা যা!' কার্প রাগে গরগর করতে করতে ওকে পেঁছে দিল।

ওপরতলায় এসে ইলিয়া বিরাট এক ঘরের দোরগোড়ায় এসে থামল, ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে ঝুলছে ভারী আলোর ঝাড়, তারই নীচে একটা গোল টেবিলের ওপর মস্ত এক সামোভার। টেবিলের চারপাশে বসে ছিল কর্তাগিন্নী আর মেয়েরা — তিনটি মেয়ে মাথায় এক-এক ধাপ করে খাটো, প্রত্যেকেরই চুল কটা, তাদের লম্বাটে মুখ মেছেতার ছোপে ভর্তি। ইলিয়া ঢোকা মাত্র ওরা এ-ওর গা ঘেঁসে সরে বসল এবং আতঙ্কে তিনজোড়া নীল চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

'এই যে!' মনিব বলল।

'বোঝ, কী চিজ্!' মনিব-গিন্নী শিউরে উঠে বলল, ইলিয়ার দিকে সে এমন ভাবে তাকাল যেন এর আগে আর কখনও ওকে দেখে নি। স্ত্রোগানি একটু হাসল, দাড়িতে হাত বুলাল, টেবিলের ওপর আঙ্গুলগুলো ঠুকল, তারপর গম্ভীর ভাবে বলতে শুরু করল:

'ইলিয়া, তোকে ডেকে পাঠিয়েছি এই কথা বলতে যে তোকে আর আমার দরকার নেই, মোদ্দা কথা, তোর পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়...'

ইলিয়া চম্‌কে উঠল, বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, সে তখনই উল্‌টো দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হল।

'দাঁড়া!' ওর দিকে হাত বাড়িয়ে কর্তা বলল, সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর হাতের চাপড় মেরে গলাটা আরেকটু খাটো করে আবার বলল: 'দাঁড়া!'

তারপর তর্জনী ওপরের দিকে তুলে ধীরে ধীরে গুরুগম্ভীর চালে বলতে লাগল:

'একমাত্র এই কারণেই তোকে ডেকে পাঠাই নি... না, না!.. তোর শিক্ষা হওয়া দরকার... তোকে বুঝিয়ে বলতে চাই তুই আমার পক্ষে ক্ষতিকর কেন। খারাপ তুই আমার করিস নি — লেখাপড়া জানা ছোকরা, কুঁড়ে নোস, সৎ ছেলে, স্বাস্থ্যও ভালো... এ সবই তোর হাতের তুরুপ। তবে তা সত্ত্বেও তোকে আমার দরকার নেই... তোকে দিয়ে আমার চলবে না... কেন? —

এটাই ত প্রশ্ন!..'

ইলিয়ার অবাক হওয়ার পালা: ওকে প্রশংসা করা সত্ত্বেও খেদিয়ে দিচ্ছে। দুটো ব্যাপারকে সে মেলাতে পারল না, তার মনের মধ্যে পরিতৃপ্তি ও অপমানের এক মিশ্র অনুভূতি জেগে উঠল। তার মনে হতে লাগল, মনিব নিজেই বুঝতে পারছে না যে সে কী করছে... ইলিয়া সামনে এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল:

'আমি ছুরি হাতে নিয়েছিলাম বলে কি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?..'

'হা ভগবান!' মনিবগিন্নী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। 'কী দুঃসাহস! হা ভগবান!..'

'ঠিক কথা!' মনিব সন্তুষ্ট হয়ে ইলিয়াকে লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল। 'তোর দুঃসাহস আছে! কথাটা এখানেই! তোর দুঃসাহস আছে... যে ছোকরা অন্যের চাকর তার থাকা চাই বিনয় — বিনয়জ্ঞান, যেমন বলা হয়েছে শাস্ত্রে... তার জীবনে প্রভু ছাড়া আর কোন ধ্যানজ্ঞান নেই — তার আহার, বুদ্ধি, এমন কি সততা — তাও প্রভু... অথচ তোর — সবই নিজের... যেমন তুই লোকের মুখের ওপর বলে দিস — চোর! এটা ঠিক নয়, এটা দুঃসাহস... তুই যদি সৎই হোস ত আমার কাছে এসে চুপিচুপি বল না... আমি নিজেই তখন যা করার করব, আমি হলাম মনিব!.. অথচ তুই কিনা চেঁচিয়ে বলে উঠলি — চোর!.. উঁহু, সবুর কর... তিন জনের মধ্যে তুই একা যদি সৎ হোস তাতে আমার কিছুই আসে যায় না... এখানে বিশেষ ধরনের হিসাব করা দরকার... একজন সৎ লোক হয়ে নয় জন যদি বদ থাকে তাতে কারও কোন লাভ নেই... সৎ লোকটা কিন্তু নষ্টই হয়। আর সাত জন সৎ-এর সঙ্গে তিন জন যদি বদ থাকে — তাহলে তোর দলের জিত... বুঝলি? যারা দলে ভারী, তারাই ঠিক... সততার বিচারও এই ভাবেই করতে হয়...'

স্ত্রোগানি হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলে চলল:

'তায় আবার তুই ছুরি ধরিস...'

'হায় প্রভু যীশু!' আতঙ্কে মনিবগিন্নী চেঁচিয়ে উঠল, মেয়েরাও আরও জড়সড় হয়ে এ-ওর গায়ে ঘেঁসে বসল।

'শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ছুরি যে হাতে নেয়, ছুরিতেই তার বিনাশ... সুতরাং

তুই হলি বাড়তি লোক... এই হল কথা... এই আধুলিটা ধর, চলে যা, নিজের পথ দ্যাখ... মনে রাখবি, তুই আমার খারাপ কিছু করিস নি, আমিও তোর খারাপ করি নি... এমনকি এই দ্যাখ না, নে! একটা আধুলিই দিয়ে দিচ্ছি... আর তোর মতো একটা ছোট ছেলের সঙ্গে আমি কথাও বলেছি বড়দের মতো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে... তোর জন্যে আমার হয়ত দুঃখও হচ্ছে... কিন্তু তুই বাপু এখানে মানাস না! কথায় বলে গোঁজ চাকায় না লাগলে ফেলে দেওয়া উচিত... এবারে যেতে পারিস...'

মনিবের কথা ইলিয়া সহজ ভাবে বুঝে নিল — ব্যাপারী ওকে তাড়িয়ে দিল এই কারণে যে সে কার্পকে তাড়াতে পারল না, কেননা তাহলে তার দোকানে কর্মচারী বলতে কেউ থাকে না। এটা বোঝার পর ইলিয়ার মন হাল্‌কা হয়ে গেল, সে খুশি হল। মনিবকেও সাদাসিধে ধরনের ভালো মানুষ বলে তার মনে হল।

'চলি তাহলে!' ইলিয়া রুপোর মুদ্রাটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে বলল। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!'

'ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই,' স্ত্রোগানি তার দিকে মাথা নেড়ে উত্তর দিল।

'ওঃ-হো-হো! এক ফোঁটা চোখের জলও পড়ল না গা!..' ইলিয়া যেতে যেতে মনিবগিন্নীর ভর্ৎসনাপূর্ণ নিনাদ শুনতে পেল।

ইলিয়া যখন পোঁটলা কাঁধে নিয়ে ব্যাপারীর বাড়ির মজবুত গেট থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার মনে হল সে যেন এমন এক ধূসর ফাঁকা রাজ্য ছেড়ে চলেছে যার কথা সে একটা বইয়ে পড়েছিল — সেখানে কোন জনপ্রাণী ছিল না, ছিল না কোন গাছপালা, থাকার মধ্যে ছিল কেবল রাশি রাশি পাথর আর পাথরের মাঝখানে থাকত এক ভালোমানুষ যাদুকর — যে কেউ এ রাজ্যে এসে পড়ত সে তাদের সাগ্রহে পথ দেখিয়ে দিত।

বসন্তের এক পরিষ্কার দিনের সন্ধ্যা। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, জানলার কাচের ওপর টকটকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ইলিয়ার মনে পড়ে গেল সেই দিনের কথা যে দিন নদীর পার থেকে সে প্রথম এই শহরটাকে দেখতে পায়। মালপত্র বোঝাই পোঁটলার ভারে তার কাঁধ টনটন করছিল — পায়ের গতি মন্থর হয়ে এলো। ফুটপাথের ওর দিয়ে যে সব পথচারী যাচ্ছিল তাদের গায়ের সঙ্গে ওর বোঝার ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল, প্রচন্ড ঘর্ঘর আওয়াজে ঘোড়ার গাড়ি চলেছে;

সূর্যের তির্যক রশ্মির মধ্যে ধূলিকণা উড়ছিল, চার দিকে হৈ-চৈ, ব্যস্ততা, খুশির আমেজ। বালক এই কয় বছরে শহরে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা তার মনের মধ্যে জাগতে লাগল। তার মনে হল সে যেন বড় হয়ে গেছে, গর্বে ও সাহসের অনুভূতিতে তার বুক ফুলে উঠল, কানের মধ্যে বাজতে লাগল ব্যাপারীর কথাগুলো:

'তুই লেখাপড়া জানা ছেলে, বোকা নোস, তোর স্বাস্থ্য ভালো, তুই কুঁড়েও নোস... এগুলো তোর হাতের তুরুপ...'

ইলিয়া আবার জোরে জোরে পা বাড়িয়ে দিল, মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগল উচ্ছ্বসিত আনন্দ এবং কাল যে আর মাছের দোকানে যেতে হবে না এই ভেবে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

পেত্রুখা ফিলিমোনভের বাড়িতে ফিরে আসার পর ইলিয়া গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করল যে মাছের দোকানে কাজ করে সে সত্যি সত্যিই বেশ বড় হয়ে গেছে। সে বাড়ির সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছে আর সকলেই তার সঙ্গে তোষামোদ করে কৌতূহলী হয়ে কথা বলছে। পেরফিশ্‌কা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'নমস্কার, দোকানী বাবু! কী ভাই, কাজের মেয়াদ শেষ হল বুঝি? তোমার কীর্তিকাণ্ড শুনলাম — হা-হা! আরে ভাই, ওরা পছন্দ করে পা চাটা, সত্যি কথা বললে ওদের গায়ে ফোস্কা পড়ে...'

মাশা ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল:

'ও-হো-হো! তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে!'

ইয়াকভেরও আনন্দ হল।

'যাক, আবার একসঙ্গে থাকা যাবে... আমার একটা বই আছে — 'অ্যাল্‌বিজেন্‌স' — গল্প বটে, তোকে বলব'খন! সেখানে সাইমন মনফোর বলে একজন লোক আছে — আজব লোক!'

ইয়াকভ্ আর দেরি না করে অগোছাল ভাবে তাড়াহুড়ো করে গল্পের বিষয়বস্তু বলতে বসে গেল। ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে ইলিয়ার এই ভেবে আনন্দ হল যে ভারী মাথাওয়ালা তার এই বন্ধুটি আগের মতোই রয়ে গেছে। স্ত্রোগানির দোকানে ইলিয়া যে আচরণ করেছে তার মধ্যে ইয়াকভ্ অসাধারণ কিছু দেখতে পেল না। সে কেবল ওকে বলল:

'ঠিক করেছিস...'

পেত্রুখা কিন্তু ইলিয়ার আচরণে অবাক হয়ে গেল, আশ্চর্য হওয়ার ভাব গোপন না করে সে তারিফ করে বলল:

'তুই ওদের ওপর বেশ এক হাত নিয়েছিস, বেশ করেছিস ভাই! তবে এটা ঠিকই যে কিরিল ইভানভিচের পক্ষে কার্পকে ছাড়িয়ে দিয়ে তোকে রাখার কোন প্রশ্নই আসে না। কার্প কাজ-কারবার জানে, ওর দর অনেক। তুই সৎ পথে চলতে চাস, রাখা-ঢাকার ধার ধারলি না... তাই ত ও তোর ওপর টেক্কা মারল...'

কিন্তু পর দিন তেরেন্তি কাকা ভাইপোকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল:

'তুই পেত্রুখার সঙ্গে অত... অত বেশি কথাবার্তা বলিস না... একটু সাবধান থাকবি... ও তোকে গালাগাল করে... বলে, ইশ্, ধম্মপুত্তুর এসেছেন আমার!'

ইলিয়া হেসে উঠল।

'কিন্তু গতকাল যে আমার প্রশংসা করল!'

পেত্রুখার মনোভাবে কিন্তু নিজের সম্পর্কে ইলিয়ার উঁচু ধারণা ক্ষুণ্ণ হল না। সে নিজেকে বীর বলে ভাবতে লাগল, বুঝতে পারল যে ব্যাপারীর কাছে ঐ পরিস্থিতিতে অন্য লোক যে রকম আচরণ করত তার চেয়ে ভালো আচরণ সে করেছে।

মাস দুয়েক পর, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন নতুন কাজ পাওয়া গেল না তখন কাকার সঙ্গে ইলিয়ার এই রকম কথাবার্তা হল:

'হুম্-ম্!' কুঁজো হতাশ সুরে টেনে টেনে বলল। 'তোর আর কোথাও কাজ জুটছে না... সবাই বলে — বেশি বড়... এভাবে আমরা বাঁচব কী করে বল দেখি?'

উত্তরে ইলিয়া গম্ভীর ভাবে জোর দিয়ে বলল:

'আমার বয়স পনেরো, আমি লেখাপড়া জানি। আমার সাহস বেশি বলে অন্য জায়গা থেকেও আমাকে তাড়িয়ে দেবে — তা সে যে কাজই হোক না কেন!'

'তাহলে কী করা যায়?' বিছানায় বসে থাকতে থাকতে দুহাতে বিছানায় ঠেস দিয়ে তেরেন্তি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলি কি, আমার জন্য অর্ডার দিয়ে একটা বাক্স বানাও, জিনিসপত্র কিনে দাও — ধর সাবান, সেণ্ট, ছুঁচ, বইপত্র — এমনি হরেক রকম জিনিস!.. আমি ফিরি করে বেড়াব!'

'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ইলিয়া — আমার মাথার ভেতর সরাইখানার সোরগোল!.. ঘটাং, ঘটাং, ঘটাং... ভালোমতো ভাবার শক্তি নেই। চোখের সামনে, বুকের ভেতরে — সব জায়গায় এই একই, কেবল এই একটাই জিনিস...'

কুঁজোর চোখের ওপর সত্যি সত্যিই একটা উত্তেজনার ছাপ, মনে হয় যেন সে কোন একটা হিসাব কষছে অথচ কিছুতেই সে হিসাব মেলাতে পারছে না।

'আরে তুমি দেখ না! আমাকে ছেড়েই দেখ না,' ইলিয়া স্বাধীনতা লাভের চিন্তায় বিভোর হয়ে অনুনয় করে বলল।

'ঠিক আছে, ভগবান তোর মঙ্গল করুন! চেষ্টা করে দেখব!..'

'দেখই না, কী হয়!' ইলিয়া আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

'ওঃ!' তেরেন্তি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিষণ্ণ স্বরে বলল: 'তুই যদি আরও শিগ্‌গির বড় হয়ে উঠতিস! আরও একটু যদি বড় হতিস — ওহো-হো! তাহলে আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতাম... তুই নোঙ্গরের মতো আমাকে আটকে রেখেছিস — তোর জন্যে এই পচা জলার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। নয়ত আমি চলে যেতাম সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে... তাঁদের গিয়ে বলতাম: 'বাবা, তোমরা অন্তর্যামী। আমাকে দয়া কর, উদ্ধার কর! আমি পাপী, মহাপাপী!' '

কুঁজো নীরবে কাঁদতে লাগল। ইলিয়া বুঝতে পারল কোন পাপের কথা তার কাকা বলছে, নিজেরও তা ভালোমতো মনে পড়ল। ওর বুক কেঁপে উঠল। কাকার জন্য ওর দুঃখ হল এবং ভয়ার্ত দুচোখ বয়ে অঝোরে জল ঝরছে দেখে সে বলল:

'আচ্ছা আচ্ছা, আর কাঁদতে হবে না...' চুপ করে থেকে একটু ভেবে পরে সান্ত্বনার সুরে যোগ করল: 'ঠিক আছে, ওঁরা তোমাকে ক্ষমা করবেন!..'

ইলিয়া ফিরি করতে শুরু করে দিল। সকাল থেকে সন্ধে অবধি সে বুকের ওপর বাক্স ঝুলিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে, নাক ওপরের দিকে তুলে ভারিক্কি চালে লোকজনের দিকে চেয়ে দেখে। টুপিটা মাথার ওপর জুত করে টেনে বসিয়ে ও কণ্ঠা বাঁকিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কচি গলায় হাঁকে:

'সাবান! জুতোর কালি! চুলের কাঁটা, সেফ্‌টিপিন! ছুঁচ সুতো!'

চার দিকে বয়ে চলে কোলাহলপূর্ণ বর্ণোজ্জ্বল জীবনের তরঙ্গ, সে তরঙ্গের মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে, অবলীলাক্রমে ভেসে চলে। বাজারের ভিড়ের মধ্যে সে ঠেলাঠেলি করে, সরাইখানায় গিয়ে গম্ভীর ভাবে ডাবল চায়ের অর্ডার দেয়, সাদা রুটির সঙ্গে সেটা অনেকক্ষণ ধরে খেতে থাকে ভারিক্কি চালে — হাবভাবে মনে হয় যেন এমন লোক যে নিজের দর জানে। জীবন তার কাছে মনে হল সহজ, সরল, মধুর। তার স্বপ্ন সহজ ও পরিষ্কার আকার নিল — সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগল আর কয়েক বছর বাদে সে হবে ছোটখাটো, ঝকমকে তকতকে একটা দোকানের মালিক, দোকানটা হবে শহরের কোন ভালো রাস্তার ওপর, যেখানে তেমন হৈ-হট্টগোল নেই, তার দোকানে থাকবে হালকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনিহারী জিনিসপত্র — সেগুলোর ছোঁয়ায় জামাকাপড়ে দাগ ধরার কিংবা জামাকাপড় নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। সে নিজেও ফিটফাট, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন। রাস্তার ওপরের পড়শীরা ওকে খাতির করে, মেয়েরা মধুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। সন্ধেবেলায় দোকান বন্ধ করে সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আলোকোজ্জ্বল ঘরে বসে চা পান করে, বই পড়ে। সব ব্যাপারে পরিচ্ছন্নতা — ভদ্র জীবনযাত্রার অপরিহার্য ও প্রধান শর্ত বলে তার মনে হল। সে তখনই এ রকম স্বপ্ন দেখত যখন কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত না, তার মনে ঘা দিত না, কেননা যখন সে নিজেকে স্বাবলম্বী বলে বুঝতে পেরেছে তখন থেকেই তার বোধ সজাগ হয়ে পড়েছে, সে হয়ে পড়েছে অভিমানী।

কিন্তু যখন কিছুই বিক্রি না হওয়ায় সে ক্লান্ত হয়ে সরাইখানায় কিংবা রাস্তায় কোথাও বসে থাকত, তার মনে পড়ত পুলিশের কর্কশ চিৎকার আর গুঁতো, খদ্দেরদের সন্দিগ্ধ ও অপমানজনক মনোভাব, তারই মতো ফেরিওয়ালাদের — প্রতিদ্বন্দ্বীদের গালিগালাজ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তখন তার মধ্যে প্রবল, অস্থির একটা অনুভূতি অস্পষ্ট ভাবে তোলপাড় করে উঠত। তার চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে জীবনকে আরও গভীর ভাবে দেখত আর স্মৃতি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে সেগুলোকে একের পর এক তার বিবেচনার কোঠায় সাজিয়ে রাখত। সে স্পষ্ট দেখতে পেল সব মানুষই তার সঙ্গে ছুটেছে সেই এক লক্ষ্যে — খুঁজছে সেই একই শান্ত, অন্নতৃপ্ত ও পরিচ্ছন্ন জীবন, যেটা তারও ইচ্ছে। আর নিজের সে পথে যদি কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়

তাহলে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে কেউ লজ্জা পায় না; সকলেই লোভী, নির্দয়, প্রায়ই অকারণে, নিজের কোন লাভ না হলেও, স্রেফ মানুষকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যেই একে অন্যকে অপমান করে। কখনও কখনও হাসতে হাসতে অপমান করে, ক্বচিৎ কেউ অপমানিতের জন্য দুঃখ বোধ করে।

এই সব ভাবনা-চিন্তার ফলে ব্যবসার আকর্ষণ সে হারিয়ে ফেলল, পরিপাটি, ছোটখাটো দোকানের স্বপ্ন তার যেন মিলিয়ে গেল, বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা আর শরীরে অবসাদ ও আলস্য সে অনুভব করতে লাগল। তার মনে হল সে ব্যবসা করে এত টাকা কোন দিনই পাবে না যা দিয়ে দোকান খোলা যায়, বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই ভাবে কাঁধে ও পিঠে আঁটা বেল্টের ব্যথা নিয়ে বাক্স বুকের ওপর ঝুলিয়ে ধুলোমাখা, গরম রাস্তায় রাস্তায় তাকে ঘুরে মরতে হবে। কিন্তু ব্যবসায় সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রফুল্লতা নতুন করে জেগে উঠত, স্বপ্ন প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

শহরের এক জনাকীর্ণ রাস্তায় ইলিয়া পাভেল গ্রাচোভের দেখা পেল। কামারের ছেলে ভবঘুরের মতো নিশ্চিন্ত মনে ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলেছে, তার হাত দুটো শতচ্ছিন্ন প্যান্টের পকেটে গোঁজা, তার কাঁধে ঢলঢল করছে নিজের মাপের চেয়ে বড় নীল রঙের একটা জামা — সেটাও ছেঁড়াখোঁড়া, নোংরা, বিরাট বিরাট বুট-জুতোর হিলগুলো বাঁধানো রাস্তার পাথরের ওপর খট্‌খট্ আওয়াজ তুলছে। কানাত ভাঙা টুপিটা মস্তানের ভঙ্গিতে বাঁ কানের ওপর কাত করা, রোদে মাথার অর্ধেকটা পুড়ে যাচ্ছে, মুখে ও ঘাড়ে তেলচিটে ময়লার পুরু প্রলেপ। পাভেল দূর থেকে ইলিয়াকে দেখে চিনতে পারল, খুশি মনে তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু আগ বাড়িয়ে দেখা করার জন্য তেমন কোন ব্যস্ততা প্রকাশ করল না।

'বড় যে জাঁক দেখছি তোর!' ইলিয়া বলল।

পাভেল শক্ত মুঠোয় ওর হাত চেপে ধরল, হাসতে লাগল। ধুলোবালির মুখোসের আড়ালে তার দাঁত ও চোখ চকচক করছিল।

'কেমন আছিস?'

'আছি, যেমন থাকা যায়, খাবার জুটলে — গিলি, না জুটলে চিঁচিঁ করতে করতে শুয়ে পড়ি!.. তোকে দেখে আমার ভালো লাগল। মার গুলি ও সব!'

'তুই কি আর আসবিই না?' ইলিয়া হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল। পুরনো বন্ধুকে কালিঝুলিমাখা অবস্থায় এমন খুশিখুশি দেখতে পেয়ে তারও ভালো লাগছিল। সে পাভেলের জুতোর দিকে তাকাল, তারপর নিজের নয় রুবল দামের বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল।

'তুই কোথায় থাকিস আমি কোত্থেকে জানব?' গ্রাচোভ বলল।

'সেই ওখানেই — পেত্রুখার বাড়িতে...'

'কিন্তু ইয়াকভ্ যে বলল তুই নাকি কোথায় মাছ বিক্রির কাজ করছিস...'

ইলিয়া স্ত্রোগানির কাছে তার চাকরির কাহিনী সগর্বে পাভেলকে বলল।

'আচ্ছা, আমরা তাহলে, একই গোয়ালের গোরু!' গ্রাচোভ সায় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমারও ঐ হাল — কাজ পণ্ড করার জন্যে ছাপাখানা থেকে তাড়িয়ে দিল, গেলাম এক আঁকিয়ের কাছে — রং গোলা আর এটা ওটা কাজ... গোল্লায় যাক, এক দিন ভুল করে কাঁচা সাইনবোর্ডের ওপর বসে পড়েছিলাম। তা শুরু হয়ে গেল ধোলাই! ওঃ সে কি রাম ধোলাই! কর্তা, গিন্নী, কারিগর — কেউ আর বাদ রাখল না, হয়রান হয়ে যে বন্ধ করবে তার কোন লক্ষণই নেই। এখন আমি জলকলের মিস্ত্রীর কাছে কাজ করি। মাসে ছয় রুবল করে পাই... দুপুরের খাবার খেতে গিয়েছিলাম, এখন কাজে যাচ্ছি।'

'তাড়া নেই তোর।'

'আরে যেতে দে। কাজের কি আর কোন শেষ আছে? তোদের ওখানে এক দিন যেতে হবে দেখছি...'

'আসিস!' ইলিয়া অন্তরঙ্গ সুরে বলল।

'বই পড়িস ত?'

'নয়ত কী, আর তুই?'

'একটু আধটু খাবলা মারি...'

'আর কবিতা লিখিস?'

'কবিতাও...'

পাভেল আবার খুশিতে হিহি করে হাসতে লাগল।

'আসিস কিন্তু, কেমন? কবিতা নিয়ে আসিস।'

'আসব... ভোদ্‌কা নিয়ে আসব...'

'মদ খাস নাকি?'

'ঢকঢক করে গিলি... যাক গে, চলি!..'

'আচ্ছা!' ইলিয়া বলল।

সে পাভেলের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের পথ ধরল। ছেঁড়াখোঁড়া বেশধারী এই ছেলেটা যে তার মজবুত জুতোজোড়া ও পরিপাটি বেশ দেখে ঈর্ষা ত প্রকাশ করলই না, এমনকি, যেন লক্ষ্যও করল না — এটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। অথচ ইলিয়া যখন নিজের স্বাবলম্বী জীবনের বৃত্তান্ত দিল তখন পাভেল আনন্দ প্রকাশ করল। ইলিয়ার দুশ্চিন্তা হল এই ভেবে, সকলে যেমন পরিপাটি, শান্ত ও স্বাধীন জীবন চায় পাভেলের কি তাতে কোন স্পৃহা নেই?

গির্জার প্রার্থনা সেরে ফিরে আসার পর বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠার ভাব বিশেষ করে তীব্র হয়ে ইলিয়াকে পেয়ে বসত। দুপুরের প্রার্থনা ও সান্ধ্য উপাসনা তার ক্বচিৎ বাদ যেত। সে প্রার্থনা করত না, স্রেফ কোন একটা কোনায় দাঁড়িয়ে থাকত, উদাস মনে ভজন শুনত। লোকজন স্থির হয়ে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের নীরবতার মধ্যে থাকত একাত্মতা। ধূপধুনার ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে গানের ঢেউ ভজনালয় ঘিরে ভাসত, মাঝে মাঝে ইলিয়ার মনে হত সেও বুঝি ওপরে উঠছে, ঈষদুষ্ণ, মধুর এক শূন্যতার মধ্যে ভাসছে, তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। এক উঁচু চিন্তা ধীরে ধীরে তার মনকে অধিকার করে বসত, জীবনের ব্যস্ততা তার কাছে তখন একেবারেই অচেনা এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হত। প্রথম প্রথম এই অভিজ্ঞতা আলাদা ভাবে ইলিয়ার মনের মধ্যে বাসা বাঁধত, সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলেমিশে যেত না, কিশোরকে অস্থির করে তুলত না। কিন্তু পরে সে লক্ষ্য করল যে তার মনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা সব সময় তার ওপর নজর রাখছে। সেটা ভয়ে ভয়ে কোথায় যেন গভীরে গিয়ে গা ঢাকা দেয়, দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার সময় সে চুপচাপ, কিন্তু গির্জায় এলেই তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা সম্পর্কে ইলিয়ার যে স্বপ্ন, তার বিরোধী বিশেষ এক ধরনের, উদ্বেগজনক কী একটা ভাবনা জাগিয়ে তোলে। এই রকম মুহূর্তগুলোতে তার মনে পড়ে যেত সন্ন্যাসী আন্তিপা সম্পর্কে কাহিনী আর আঁস্তাকুড়-ঘাঁটা বুড়োর দরদমাখা কথা:

'ভগবান সব দেখেন, সব জানেন! তিনি ছাড়া আর কোন গতি নেই!'

ইলিয়া বাড়ি ফিরত অস্বস্তিকর বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে, তার মনে হত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার স্বপ্ন ম্লান হয়ে গেছে, তার নিজের মধ্যেই যেন এমন

একটা কেউ আছে যে মনিহারী দোকান খুলতে চায় না। কিন্তু জীবন তার নিজের পথে চলল আর এই কেউ একটা তার মনের গহনে লুকিয়ে রইল।

ইয়াকভের সঙ্গে সমস্ত রকম কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও ইলিয়া কিন্তু একবারও ওকে নিজের এই দ্বৈত মনোভাবের কথা বলে নি। সে নিজেও নিরুপায় হয়ে সে সম্পর্কে ভাবত, নিজের ইচ্ছেয় কখনই এই দুর্বোধ্য অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামাত না।

সন্ধ্যাগুলো তার ভালোই কাটত। শহর থেকে ফিরে এসে সে মাটির তলার ঘরে, মাশার কাছে যেত, কর্তৃত্বের সুরে জিজ্ঞেস করত:

'মাশা! সামোভার তৈরি আছে ত?'

সামোভার তৈরি করেই রেখে দেওয়া হত টেবিলের ওপর, টগবগ, হিসহিস আওয়াজ তুলত। ইলিয়া সব সময় চাকা-বিস্কুট, পেপারমিণ্ট-কেক, মধুমাখা কেক আবার কখনও বা জ্যাম — এই রকম এটা ওটা মুখরোচক খাবার আনত, আর মাশা ভালোবাসত ওকে চা খাওয়াতে। মাশাও টাকা রোজগার করতে শুরু করে দিয়েছে: মাতিৎসা ওকে কাগজের ফুল তৈরি করতে শিখিয়েছে। ফুরফুরে, মন মাতানো সরসরে কাগজ দিয়ে ফুল বানাতে মাশার ভালো লাগত। কখনও কখনও সে দিনে দশ কোপেক পর্যন্ত রোজগার করত। ওর বাবা টাইফয়েডে শয্যাশায়ী হয়ে দুমাসেরও ওপর হাসপাতালে পড়ে ছিল, শুকনো রোগা শরীর নিয়ে সে সেখান থেকে ফিরে এলো, তার মাথায় তত দিনে একরাশ চমৎকার কালো কোঁকড়া চুল গজিয়েছে। সে তার এলোমেলো অবিন্যস্ত দাড়ি কামিয়ে ফেলল, বিবর্ণ ও বসে যাওয়া গাল সত্ত্বেও তাকে বয়সের তুলনায় ছোকরা মনে হতে লাগল। আগের মতোই সে অন্যের কাছে কাজ করতে লাগল, এমনকি বাড়ি সম্পূর্ণ মেয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাত কাটানোর জন্য ক্বচিৎ ঘরে ফিরে আসত। মাশাও বাবাকে অন্যদের মতোই পেরফিশ্‌কা বলে ডাকতে শুরু করল। মুচি তার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কের কথা ভেবে মজা পেত এবং কোঁকড়া চুলওয়ালা তার এই মেয়েটি, যে তার নিজের মতোই ফুর্তিতে হোহো করে হাসতে পারত, তার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও বোধহয় মনে মনে পোষণ করত।

মাশার ঘরে সান্ধ্য চায়ের আসরে নিত্য এসে জুটত ইলিয়া ও ইয়াকভ্। ওরা অনেকক্ষণ ধরে চা খেত, যা যা তাদের মনে লাগত সে সব বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করত, গলগল করে ঘামত। ইলিয়া শহরে যা দেখেছে তার বিবরণ

দিত, ইয়াকভ্ সারা দিন বই পড়ত — সে তার পড়া গল্প বলত, বলত সরাইখানার নানা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করত আর মাঝে মাঝে — যেটা প্রায়ই ঘটত — এমন সব কথা বলত যা ইলিয়া ও মাশার কাছে উদ্ভট ও দুর্বোধ্য বলে মনে হত। চায়ের স্বাদটা হত অসাধারণ, আর আগাগোড়া কলাই করা সামোভারটা যেন ভালোমানুষ বুড়োর মতো চাতুরীর সঙ্গে দরদ মেশানো মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাত। বেশির ভাগ সময়ই এমন হত যে সবে চায়ের স্বাদটা ওদের মুখে লেগেছে এমন সময় সামোভার প্রচণ্ড রাগে গরগর, ফোঁসফোঁস আওয়াজ শুরু করে দিল — দেখা গেল ওতে আর জল নেই। মাশা তখন ওটাকে আবার ভর্তি করার জন্য নিয়ে যেত। প্রতি সন্ধ্যায়ই এ কাজটা তাকে কয়েক বার করতে হত।

চাঁদ উঠলে তার কিরণও ছেলেমেয়েদের দলে এসে জুটত।

নোনা ধরা দেয়ালে চাপা পড়া, ভারী, নীচু ছাদে ঢাকা এই খোঁড়লটার মধ্যে সব সময় আলো-বাতাসের অভাব বোধ হত, কিন্তু এখানেই আমোদ-ফুর্তি চলত, প্রতি সন্ধ্যায় এখানে ভালো ভালো অনেক অনুভূতির আর কৈশোরের সরল ভাবনা-চিন্তার জন্ম হত।

মাঝে মাঝে চা পানের সময় পেরফিশ্কা উপস্থিত থাকত। সচরাচর সে বসে থাকত মাটিতে বসে যাওয়া বিশাল উনুনের কাছাকাছি মাচার ওপর কিংবা উঠে গিয়ে বসত উনুনটার ওপরে, সেখান থেকে মাথা বার করত, আধা অন্ধকারে তার খুদে খুদে সাদা দাঁতের পাটি চকচক করত। মেয়ে ওকে বড় একটা মগে করে চা আর সেই সঙ্গে চিনি ও রুটি দিত। সে ঠাট্টা করে বলত:

'অশেষ ধন্যবাদ মারিয়া পেরফিলিয়েভ্না। বড়ই প্রীত হলেম!'

কখনও কখনও ঈর্ষাভরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠত:

'বেশ আছ তোমরা! এই ত চাই! একেবারে বড় মানুষদের মতো।'

তারপর মৃদু হেসে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করত:

'জীবন? ক্রমেই তা ভালো হয়ে ওঠে! বাঁচাটা যেন বছরের পর বছর আরও আনন্দের হয়ে ওঠে। তোমাদের বয়সে আমার কথা বলার সঙ্গী বলতে ছিল জুতো টানা দেওয়ার সরঞ্জাম। এমন টানা দিতে হত যে পিঠ টনটন করে উঠত, যেন কেউ হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমিও আনন্দে, মানে যন্ত্রণায় কোঁকাতাম। টানা আলগা দিলে — পিঠটা হালকা হওয়ায় মনটা কেমন কেমন করত,

বন্ধুর অভাবে কাঁদত। কিন্তু বন্ধুর জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না — বড় পেয়ারের বন্ধু! জীবনে কত আনন্দই না পেতাম, মাইরি বলছি! তোমরা বড় হবে, মনে করতে পারবে এ সব কথা — কথাবার্তা, নানা ঘটনা আর তোমাদের এই চমৎকার জীবনের সব ব্যাপার। আর আমি বড় হলাম — ছেচল্লিশ বছর বয়স চলছে — কিন্তু মনে করার মতো কিছুই আমার নেই! ছিটেফোঁটাও না! স্রেফ ফাঁকা। তোমাদের বয়সে যেন আমি কালা আর অন্ধ ছিলাম। কেবল মনে আছে যে ঠান্ডায় আর খিদেয় আমার মুখের ভেতরে দাঁতের পাটি সব সময় ঠকঠক করে কাঁপত, মুখে কালির পোঁচ। আমার হাড়গোড়, কান, চুল যে কী করে গোটা রয়ে গেল তা বোঝা ভার। দয়া করে আমাকে চুল্লী ছুঁড়ে মারাটাই বাদ রেখেছে, তবে চুল্লীতে ঠুসে পিটুনি দিয়েছে — খুশিমতো পিটিয়েছে! লোকে চেষ্টা করেছে বটে, শিক্ষা দিয়েছে, দড়ির মতো পাকিয়ে মুচড়েছে... কিন্তু বাপু যতই মার আর ধর, ছালচামড়া ছাড়াও, রক্ত চোষ আর মেঝেই আছাড় দাও না কেন — রুশী চিজ মরার নয়! তা তাকে হামানদিস্তায় ফেলে কোট না কেন — ঠিক গোটা বেরিয়ে আসবে! খাসা, মজবুত জিনিস বাবা... আমাকে দেখ না: গুঁড়িয়ে ছাতু করেছে, কেটে কুচি কুচি করেছে, অথচ আমি দিব্যি টুনটুনিটির মতো বেঁচে আছি, সরাইখানা থেকে সরাইখানায় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ছি, দুনিয়া দেখে আনন্দ পাচ্ছি! ভগবান আমাকে ভালোবাসেন... একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন, হেসে উঠলেন, ওঃ, এটা ওটা নানা কথা বললেন। তারপর ধুত্তোর বলে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন...'

ছেলেমেয়েরা সকলেই মুচির পরিপাটি কথাগুলো শুনে হাসত। ইলিয়াও হাসত, কিন্তু সেই সঙ্গে পেরফিশ্‌কার ঐ সব কথা সব সময় ঘুরে ফিরে তার মনের মধ্যে একটা চিন্তাই জাগিয়ে তুলত। এক দিন ও অবিশ্বাসের হাসি হেসে মুচিকে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার কি তবে কোন কিছুতেই ইচ্ছে নেই?'

'ইচ্ছে নেই মানে? এই দ্যাখ না কেন, মদ খেতে ত আমার সব সময় ইচ্ছে করে...'

'না, সত্যি করে বল, তোমার কি কোন কিছু ইচ্ছে করে না?' ইলিয়া ওকে চেপে ধরল।

'সত্যি বলব? উঁ-উঁ.. তাহলে... অ্যাকর্ডিয়ান পেলে বেশ হয়!.. একটা

খাসা অ্যাকর্ডিয়ান পেতে চাই... এই দাম হবে ধর কুড়ি-পঁচিশ! ব্যস্, আর কিছু না।'

ও নিঃশব্দে হাসতে লাগল, কিন্তু তক্ষুনি কী যেন মনে হতে থেমে গেল, এবারে সে তার পুরো মত প্রকাশ করে ইলিয়াকে বলল:

'না ভাই, অ্যাকর্ডিয়ান দিয়েই বা আমার কাজ কী?... প্রথম কথা, দামী হলে নির্ঘাত মদের পেছনে সেটা উড়ে যাবে! দ্বিতীয় কথা, যদি দেখা যায় যে ওটা আমারটার চেয়ে খারাপ? এখন আমার যেটা আছে সেটাই বা খারাপ কি? ওর কি কোন দাম আছে! আমার প্রাণটাই ত ওর ভেতরে! আমার অ্যাকর্ডিয়ানের কোন তুলনা নেই — দুনিয়ায় হয়ত এ রকম একটাই আছে... অ্যাকর্ডিয়ান হল বৌয়ের মতো... আমার বৌটা ছিল স্বর্গের দেবী, ও রকম মানুষ হয় না! এখন কি আর আমি বিয়ে করতে পারি? সম্ভব নাকি? ওর মতো আর কাউকে খুঁজে পাব না... নতুন বৌকে নির্ঘাত পুরনো মাপকাঠিতে দেখব, আর তাতে দেখা যাবে... না, তাতে আমাদের দুজনেরই আরও খারাপ হবে!.. ওঃ, ভাই, ভালো বলেই ত আর ভালো নয়, ভালোবাসি বলেই না ভালো।'

নিজের অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে মুচির এই বড়াইয়ের বিরুদ্ধে ইলিয়ার বলার কিছু ছিল না। পেরফিশ্‌কার বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব আওয়াজে এক বাক্যে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করে। কিন্তু মুচির যে কোন রকম বাসনাই নেই ইলিয়া তা বিশ্বাস করতে পারল না। ওর মনে একটা প্রশ্ন অবধারিত হয়ে দেখা দিত: আচ্ছা, সারা জীবন যে লোকটা নোংরার মধ্যে বাস করছে, ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় পরে ঘুরছে, মাতলামি করছে, যে লোকটা অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে পারে তার ভালো কোন কিছুর বাসনা নেই — এও কি সম্ভব? এই ভাবনা থেকে তার মনে হতে লাগল পেরফিশ্‌কা যেন সাধু-সন্ন্যাসী গোছের মানুষ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সব সময় কৌতূহল ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে এই ভাবনা-চিন্তাহীন লোকটাকে নিরীক্ষণ করত, তার মনে হত মুচি একটা অপদার্থ মাতাল হলে কী হবে মনের দিক থেকে এ বাড়ির সকলের চেয়ে ভালো।

অল্পবয়সীদের দলটা কখনও কখনও এমন গভীর ও বিরাট বিরাট সব প্রশ্নের মুখোমুখি হত যেগুলো মানুষের সামনে অতল খাদের মতো হাঁ করে জেগে উঠে প্রবল শক্তিতে নিজের রহস্যময় অন্ধকার গহ্বরে তার অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধি ও মনকে আকর্ষণ করে। এই সব প্রশ্ন খুঁচিয়ে তুলত ইয়াকভ্। ওর একটা অদ্ভুত অভ্যেস গড়ে উঠেছিল — হাতের কাছে যা পেত

তাকেই সে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরত যেন সে পায়ে কোন জোর পাচ্ছে না। বসা অবস্থায় সে কাছাকাছি কোন শক্ত জিনিসের গায়ে ঠেস দিত কিংবা শক্ত মুঠোয় তাকে চেপে ধরত। রাস্তায় দ্রুত পায়ে অথচ অসমান তালে যেতে যেতে সে কেন যেন পোস্টগুলো হাত দিয়ে ছুঁত — যেন গুনতে গুনতে চলেছে, কিংবা বেড়াগুলোকে হাত দিয়ে এমন ভাবে ধাক্কা মারত যেন তাদের শক্তি পরীক্ষা করে দেখছে। মাশার ওখানে চা পানের সময় সে বসত জানলার নীচে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, তার হাতের লম্বা আঙ্গুলগুলো সব সময় টেবিলের কিনারা কিংবা চেয়ার আঁকড়ে ধরত। তার বিরাট মাথা পাট-করা নরম চুলে ঢাকা, চুলের রং — ভিজে ছোবড়ার মতো। কথা বলার সময় মাথাটাকে কাত করে সে সঙ্গীদের দিকে তাকাত, ফ্যাকাসে মুখের ওপর তার নীল চোখজোড়া কখনও কুঁচকে উঠত কখনও বা বিস্ফারিত হয়ে উঠত। আগের মতোই সে ভালোবাসত নিজের স্বপ্নের কথা বলতে আর যে বই সে পড়েছে তার বিষয়বস্তু বলতে গিয়ে নিজের কল্পনা থেকে উদ্ভট কিছু যোগ না করে সে কোনমতেই পারত না। ইলিয়া তার এই দোষ ধরে ফেলত, কিন্তু ইয়াকভ্ তাতে বিচলিত হত না, সে কেবল বলত:

'যত ভালো করে বলা যায় সেই ভাবে তোদের বললাম। ধর্মের বই-টই হলে অন্য কথা — তার ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ বইয়ের বেলায় যায়! ও তো মানুষেরই লেখা, আমিও — মানুষ। আমার যেখানে ভালো না লাগে সে জায়গাটা আমি বদলাতে পারি... না, তুই আমাকে একটা কথা বল দেখি — মানুষ যখন ঘুমোয় তখন তার আত্মাটা কোথায় থাকে?'

'তা আমি কোত্থেকে জানব?' ইলিয়া উত্তর দেয়। এ ধরনের প্রশ্ন সে পছন্দ করত না — তার মনের মধ্যে অপ্রীতিকর একটা অস্থিরতা জাগিয়ে তুলত।

'আমার মনে হয়, খুব সম্ভব, উড়ে যায়,' ইয়াকভ্ জানায়।

'নিশ্চয়ই উড়ে যায়,' মাশা জোর দিয়ে বলে।

'তা তুই জানিস কোত্থেকে?' ইলিয়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'অমনিই আর কি...'

'উড়ে যায়,' মৃদু হেসে ভাবনায় ডুবে গিয়ে ইয়াকভ্ বলে। 'ওরও ত বিশ্রাম করা দরকার... আর তা থেকেই — স্বপ্ন...'

এর উত্তরে কী বলা যায় তা না বুঝতে পেরে ইলিয়া চুপ করে থাকে, যদিও বন্ধুর কথার প্রতিবাদ জানানোর প্রচন্ড ইচ্ছে তার হত। আর তারা তিন জন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকত, কখনও কখনও কয়েক মিনিট। অন্ধকার খোঁড়লটাতে যেন আরও অন্ধকার ঘনিয়ে আসত। বাতি শিষ তোলে, সামোভার থেকে কয়লা পোড়ার গন্ধ পাওয়া যায়, ভেসে আসে একটা অদ্ভুত চাপা কোলাহল — মাথার ওপরে সরাইখানায় গমগম আওয়াজ, হৈ-হট্টগোল। আবার শোনা যায় ইয়াকভের মৃদু কণ্ঠস্বর:

'লোকে হৈচৈ করছে... কাজকর্ম, এটা ওটা করছে। এটাকে বলে — বেঁচে থাকা। তারপর — সব ফক্কা! অক্কা পেল লোকটা... এর মানে কী? তুই কী বলিস ইলিয়া, অ্যাঁ?'

'মানে কিছুই না... বুড়ো হল, মরার সময় ঘনিয়ে এলো...'

'জোয়ান জোয়ান লোক আর বাচ্চারাও ত মরে... সুস্থ লোকেও মরে।'

'যদি মরে ত বুঝতে হবে সুস্থ নয়...'

'তাহলে লোকে বাঁচে কী করতে?'

'ঘুরে ফিরে সেই এক!' ঠাট্টা করে হেসে বলল ইলিয়া। 'বাঁচতে হবে বলেই বাঁচে। কাজ করে, কাজে সফল হওয়ার চেষ্টা করে। সকলেই চায় ভালো ভাবে বাঁচতে, মানুষ হওয়ার সুযোগ খোঁজে। সকলেই সুযোগ খোঁজে কী করে ধনী হওয়া যায়, ভদ্র ভাবে বাঁচা যায়...'

'তা এ ত গেল গরীবদের কথা। কিন্তু বড়লোকেরা? ওদের সব আছে। ওদের আবার খোঁজার কী আছে?'

'হুঁঃ বুদ্ধি বটে! বড়লোক! আরে বড়লোক না থাকলে গরীবরা কাজ করবে কাদের জন্যে?'

ইয়াকভ্ একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তার মানে, তুই বলতে চাস, সকলে কাজের জন্যেই বেঁচে থাকে?'

'হ্যাঁ তা বলা যায়... সকলেই অবশ্য নয়... একদল কাজ করে, অন্যেরা অমনি অমনি। তারা অনেক কাজ করে ফেলেছে, টাকা-পয়সা যথেষ্ট জমিয়েছে... তাই জীবন কাটায়।'

'কিন্তু কেন?'

'আরে মলো যা! ওদেরও ত বাঁচতে ইচ্ছে করে — নাকি করে না? তোরও ত বাঁচতে ইচ্ছে করে!' ইলিয়া রেগে বন্ধুর ওপর ঝাঁজিয়ে উঠল। কিন্তু সে

যে কেন রেগে গেল এর উত্তর তার পক্ষে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। কারণটা কি এই যে ইয়াকভ্ তাকে এ ধরনের জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করছে, নাকি প্রশ্নটা সে ভালোমতো করতে পারে নি বলে?

'তুই বেঁচে আছিস কেন — অ্যাঁ?' সে চিৎকার করে বন্ধুকে বলল।

'সেটাই ত আমি জানি না!' ইয়াকভ্ আমতা আমতা করে উত্তর দিল। 'আমি পারলে মরতামই... ভয় করে... আবার ইচ্ছেও করে...'

তারপর হঠাৎই সে নরম গলায় অভিযোগের সুরে বলে:

'তুই কিন্তু অমনি অমনিই রেগে যাচ্ছিস। ভেবে দ্যাখ, লোকে বেঁচে থাকে কাজ করার জন্যে আবার কাজ তাদের জন্যে... তাহলে ওরা? দাঁড়াচ্ছে, একটা চরকির মতো... ঘুরছে ত ঘুরছেই, কিন্তু আছে একই জায়গায়। বোঝাও যায় না — কেন? ভগবানই বা কোথায়? তাহলে চাকার খুঁটিটাই কি ভগবান? তিনি আদম আর ইভকে বললেন সৃষ্টি কর, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবীতে বসতি কর — তারপর?'

ইয়াকভ্ বন্ধুর দিকে ঝুঁকে পড়ে নীল চোখ দুটি ভয়ে বড় বড় করে রহস্যজনক ভাবে ফিসফিসিয়ে বলল:

'ব্যাপার কি জানিস? কথাটা বলা হয়েছিল, কেন — তাও বলা হয়েছিল। কিন্তু কেউ ভগবানের ওপর বাটপারি করে ঐ ব্যাখ্যাটা চুরি করে লুকিয়ে রাখে... এটা করে শয়তান! আর কে হতে পারে? শয়তানেরই কাজ! তাই কেউই আর জানে না — কেন?'

ইলিয়া বন্ধুর অসংলগ্ন কথাগুলো শুনল, তাতে ও আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে অনুভব করে চুপ করে গেল।

ইয়াকভ্ কিন্তু আরও তড়বড় করে গলা আরও নামিয়ে বলে চলল, তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, ফ্যাকাসে মুখটা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল, তার কথার কোন মর্মই উদ্ধার করা গেল না।

'ভগবান তোর কাছ থেকে কী চান জানিস? জানিস না ত?' এতক্ষণ মুখে যে কথার খই ফুটছিল তারই মাঝখানে সে বিজয়ীর ভঙ্গিতে স্পষ্ট করে বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবারও তার মুখ থেকে ঝরে পড়তে লাগল অনর্গল অসংলগ্ন কথা। মাশা অবাক হয়ে হাঁ করে তার বন্ধু ও রক্ষককে দেখছিল। ইলিয়া রাগে ভুরু কোঁচকাল। বুঝতে পারছে না বলে তার মানে লাগছিল। সে মনে মনে নিজেকে ইয়াকভের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে ভাবত, অথচ

ইয়াকভ্ তার অপূর্ব স্মৃতিশক্তি আর নানা জ্ঞানের বিষয় বলার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে ইলিয়াকে তাক লাগিয়ে দিল। চুপচাপ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ার ফলে এবং মাথার মধ্যে ঘন কুয়াসা জমে উঠেছে অনুভব করে সে শেষ অবধি রাগে বক্তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল:

'জাহান্নামে যাক! পড়ে পড়ে বকে গেছিস, নিজে কিছুই বুঝিস না...'

'আমিও ত তাই বলি — কিছুই বুঝতে পারি না!' অবাক হয়ে ইয়াকভ্ বলে উঠল।

'তা সে কথা সোজাসুজি বললেই ত হয় বাপু! তা নয়ত পাগলের মতো কেবল বকবক করে চলেছিস... আর আমাকে কিনা সেগুলো শুনতে হচ্ছে!'

'না, না, দাঁড়া!' ইয়াকভ্ এতে দমল না। 'আসলে যে কিছু বোঝারই উপায় নেই... ধর না কেন বাতির কথা। আগুন। কোথা থেকে এলো? এই — আছে, এই — নেই! দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালাম — জ্বলছে... তার মানে — সব সময়ই আছে... বাতাসে অদৃশ্য থেকে ওড়ে নাকি?'

এই প্রশ্নটাও ইলিয়াকে মুগ্ধ করল। তার মুখ থেকে অবজ্ঞার ভাব দূর হল, সে বাতিটার দিকে তাকিয়ে বলল:

'বাতাসেই যদি থাকবে ত সব সময়ই গরম হত, অথচ ঠাণ্ডায়ও দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে... তার মানে, বাতাসে যে আছে তা নয়।'

'তাহলে কোথায়?' বন্ধুর দিকে উৎসুক চোখ মেলে ইয়াকভ্ জিজ্ঞেস করল।

'দেশলাইয়ে,' মাশার গলা শোনা গেল।

কিন্তু বন্ধুদের এই সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মেয়েটির কথার কোন জবাব মিলত না। সেও এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই এর জন্য তার অভিমানও হয় না।

'কোথায়?' আবার বিরক্তির স্বরে ইলিয়া চিৎকার করল। 'আমি জানি না। জানতে চাইও না! জানি যে তার মধ্যে হাত ঢোকান উচিত না, তবে তার কাছে থেকে শরীর গরম করা যায়। ব্যস — আর কিছু জানি না।'

'ওঃ কী কথাই বললি!' ইয়াকভ্ রাগে উত্তেজিত হয়ে বলল। '"জানতে চাই না!" এমন কথা ত আমিও বলতে পারি, যে কোন বুদ্ধুই এমন বলতে পারে... না, তুই আমাকে বুঝিয়ে বল — আগুন কোত্থেকে আসে? রুটির কথা আমি জিজ্ঞেস করব না, যে কারও কাছে স্পষ্ট: ফসল থেকে দানা, দানা

থেকে ময়দা, ময়দা থেকে ময়দার কাই, ব্যস — রুটি তৈরী হয়ে গেল! কিন্তু মানুষ পয়দা হয় কী করে?'

ইলিয়া আশ্চর্য হয়ে ঈর্ষার দৃষ্টিতে বন্ধুর বিরাট মাথাটার দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে ওর প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে ইলিয়া জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে কড়া কড়া কথা বলত। ইলিয়ার গড়ন মজবুত, তার বুকের ছাতি চওড়া, কিন্তু সেও কেন যেন এই সব ক্ষেত্রে চুল্লীর দিকে সরে যেত, কাঁধ দুটো চুল্লীতে ঠেকিয়ে কোঁকড়া চুলে ভর্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করে করে বলত:

'তুই একটা আহাম্মক, এ ছাড়া আর কী বলা যায়! এ সব তোর মাথায় আসে কাজকর্ম কিছু করিস না বলে। তোর আবার জীবন কী? বার কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা — একটা হাতি-ঘোড়া কিছু কাজ নয়। তুই সারাটা জীবন ঐ খাম্বা হয়েই কাটাবি। রোজ সকাল থেকে সন্ধে অবধি আমার মতো শহরে ঘুরে ঘুরে নিজের ভাগ্য নিজেকে খুঁজতে হত তাহলে আবোল-তাবোল জিনিস না ভেবে ভাবতি কী করে মানুষ হতে হয়, সুযোগ খুঁজতে হয়। তোর মাথাটা এই জন্যেই বড় যে তা হাবিজাবি দিয়ে ঠাসা। কাজের ভাবনা হয় ছোট ছোট, তাতে মাথা ফুলে ওঠে না...'

হাতের শক্ত মুঠোয় কিছু একটা আঁকড়ে ধরে ইয়াকভ্ চেয়ারে ঝুঁকে বসে থাকত, চুপচাপ ওর কথা শুনে যেত। মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ঠোঁটজোড়া নাড়ত, চোখ পিটপিট করত।

কথা শেষ করে ইলিয়া যখন টেবিলের ধারে বসত তখন ইয়াকভ্ আবার দার্শনিকতা শুরু করে দিত:

'লোকে বলে এমন বই আছে — বিজ্ঞানের বই — যাদুবিদ্যার বই — তাতে নাকি সব কিছুর ব্যাখ্যা আছে... অমন বই যদি পাওয়া যেত তাহলে পড়ে দেখতাম... নিশ্চয়ই দারুণ গোছের কিছু হবে!'

মাশা টেবিলের পাশ থেকে উঠে এসে নিজের খাটে বসত, সেখান থেকে কালো চোখ দুটি মেলে একবার এর দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকাত। তারপর সে হাই তুলতে তুলতে ঢুলতে শুরু করত, অবশেষে বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ত।

'এবারে ঘুমোনোর সময় হয়ে গেছে!' ইলিয়া বলত।

'একটু দাঁড়া... মাশার গা ঢেকে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিই।'

কিন্তু ইলিয়া ইতিমধ্যেই হাত বাড়িয়ে দরজা খুলতে যাচ্ছে দেখে ইয়াকভ্ ব্যস্ত হয়ে কাতর স্বরে মিনতি করে:

'একটু দাঁড়া না রে! একা যেতে ভয় করে — অন্ধকার!..'

'আরে ছোঃ!' ইলিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ওঠে। 'ষোল বছরের বুড়ো ধাড়ি, তুই কিনা এখনও একটা কচি খোকার মতো! এই দ্যাখ না, আমি — আমি কাউকে ডরই? শয়তানের সামনাসামনি পড়লেও ত আমি আঁতকে উঠব না!'

ইয়াকভ্ কোন জবাব না দিয়ে মাশাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারপর চটপট ফুঁ দিয়ে বাতি নেভায়। বাতির শিখা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যেতে চার দিক থেকে অন্ধকার নিঃশব্দে এসে ঘরটাকে গ্রাস করে ফেলে। অবশ্য মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে চাঁদের মৃদু কিরণ মেঝেতে ঝরে পড়ত।

একবার এক উৎসবের দিনে ইলিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ি ফিরল, তার চেহারা ফ্যাকাসে। সে জামাকাপড় না খুলেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। তার বুকের মধ্যে জমাট বরফের মতো ভারী হয়ে চেপে বসে ছিল ক্রোধ, ঘাড়ে একটা ভোঁতা যন্ত্রণার ফলে মাথা নাড়ানো যাচ্ছিল না, অসহ্য একটা অপমানে তার গোটা শরীরটা যেন কাতরাচ্ছে।

ঐ দিন সকালে এক ডেলা সাবান ও এক ডজন হুক পেয়ে এক সেপাই তাকে ম্যাটিনি শো'র সময় সার্কাসের তাঁবুর সামনে পসরা নিয়ে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছিল, ইলিয়াও সার্কাসের গেটের কাছে জাঁকিয়ে দাঁড়ায়। এমন সময় এক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সেখানে এসে ইলিয়ার ঘাড়ে রদ্দা বসিয়ে দিল, যে পায়াগুলোর ওপর ওর জিনিসপত্রের বাক্সটা বসানো ছিল তার গায়ে লাথি মারল — জিনিসগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল, কিছু কিছু জিনিস কাদায় পড়ে বরবাদ হয়ে গেল, কিছু খোয়া গেল। মাটি থেকে সেগুলো তুলতে তুলতে ইলিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলল:

'এ রকম করার কিন্তু আপনার কোন অধিকার নেই, স্যার...'

'কী-ই?..' কটা গোঁফে তা দিয়ে পুলিশের লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'গায়ে হাত দেওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই...'

'বটে? মিগুনভ! ওকে থানায় নিয়ে যা!' শান্ত স্বরে ইন্‌স্পেক্টর হুকুম দিল।

যে সেপাইটি ইলিয়াকে সার্কাসের সামনে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছিল সেই তাকে থানায় নিয়ে গেল, সেখানে তাকে সন্ধে অবধি বসে থাকতে হল।

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এর আগেও তার হয়েছে, কিন্তু থানায় যাওয়া তার এই প্রথম এবং প্রথম বারই যে অপমান ও ক্রোধ সে অনুভব করল তার কোন সীমা নেই।

যে ভয়ানক যন্ত্রণার ভার ইলিয়ার বুকের ওপর চেপে বসে ওর সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে চোখ বুঁজে সে একমনে তার কথাই ভাবছিল। পার্টিশনের ওপাশে সরাইখানার তুমুল হৈ-হট্টগোল চলতে থাকে — যেন কুয়াসাচ্ছন্ন শরতের দিনে ঘোলাটে জলস্রোত গলগল করে পাহাড় থেকে ঝরে পড়ছে। লোহার ট্রের ঝনঝন আওয়াজ, বাসনপত্রের টুংটাং, থেকে থেকে ভোদকা, চা, বীয়ার চেয়ে হাঁকডাক... ওয়েটাররা চেঁচাচ্ছে:

'এক্ষুনি!'

সেই সোরগোল ভেদ করে ইস্পাতের কাঁপা কাঁপা তারের মতো ভেসে আসে ঘড়ঘড়ে চড়া গলায় এক বিষণ্ণ গান:

এত দু-খ আছে... আগে বুঝি নাই...

অন্য আরেকটা মিষ্টি খাদের গলা তার সঙ্গে যোগ দিল — হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ডুবতে ডুবতে অপূর্ব মৃদু কণ্ঠের সুর ভেসে এলো:

সারা যৌ-ব-ন... দুখে গেল হা-য়!

কে একজন শুকনো কাঠ চেরার আওয়াজের মতো চেঁচিয়ে বলল:

'মিথ্-থ্যুক! শাস্ত্রে আছে: 'আমার সহিষ্ণুতার উপদেশ যদি পালন কর তাহা হইলে প্রলোভনের মুহূর্তে আমি তোমাকে রক্ষা করিব'...'

'তুই নিজেই মিথ্যুক,' কে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠে তাকে বাধা দিয়ে স্পষ্ট বলল, 'আবার সেখানেই বলা হয়েছে: 'যেই হেতু তুমি ঈষদুষ্ণ, তাপিত নহ, শীতলও নহ, সেই হেতু আমি আমার মুখ অন্তর হইতে তোমাকে নিক্ষেপ করিব...' এইবার! কী হল?'

একটা হাসির হুল্লোড় উঠল, তার পর খনখনে গলার টুকরো টুকরো কথা ছড়িয়ে পড়ল:

'আর আমি মাগীর মুখের ওপর — আচ্ছা করে কষিয়ে দিলাম! ঝারলাম কানে, দিলাম বসিয়ে দাঁতে! দমাদ্দম!'

খনখনে গলা থেকে হোহো হাসির আওয়াজ উঠল, লোকটা আবার বলে চলল:

'মাগী ধপ্ করে পড়ে গেল! আমি আবার ওর মুখের ওপর বসালাম, আহা আমার চাঁদমুখ রে! ন্-নে হতচ্ছাড়ী! আমি তোকে প্রথম চুমু খেয়েছি, আমিই তোর দফা রফা করব...'

'কোথাকার আমার গুরুমশায় এলে বাওয়া!' কে যেন ঠাট্টা করে বলে উঠল।

'না, মেজাজ গরম হবে না ত কী!'

' 'যেহেতু আমি প্রেম করি, সেই হেতু আমি ভর্ৎসনাও করি, আমিই দণ্ড দিব'... ভুলে গেলে নাকি হে? 'বিচার করিও না, বিচারিত হইবে না' — আবার সেই রাজা ডেভিডেরই কথা — ভুলে যাচ্ছ কেন?'

তর্কবিতর্ক, গান, হাসি — সবই ইলিয়া শুনছিল, কিন্তু কোনটাই তার মনে কোন দাগ কাটছিল না, সব পাশ কাটিয়ে কোথায় যেন গিয়ে পড়ছিল। তার সামনে, অন্ধকারের মধ্যে ভাসছিল পুলিশ ইন্স্পেক্টরের বাঁকা নাকওয়ালা ফালি মুখ, মুখের ওপর কটমট করে জ্বলছে একজোড়া চোখ, তার কটা গোঁফজোড়া নাচছে। ইলিয়া মুখটার দিকে যত তাকায় ততই তার দাঁতকপাটি লেগে যায়। এদিকে পার্টিশনের ওপাশে গানের আওয়াজ বাড়তে লাগল, গায়কেরা উৎসাহিত হয়ে উঠল, তাদের গলা আরও খুলে গেল, আরও জোরালো হয়ে বাজতে লাগল, গানের করুণ সুর ইলিয়ার মর্ম স্পর্শ করল, তার বুকের মধ্যে যেখানে ক্রোধ ও অপমান বরফের মতো জমাট বেঁধে ছিল সেখানে গিয়ে ঘা দিল।

গিরি কন্-দ-র্, দরিয়া — কত না...
ঘুরে হ-য়-রা-ন ওরে ভাই...

দুটো কণ্ঠস্বরই গলা মিলিয়ে করুণ সুরে গেয়ে উঠল:

সাইবে-রিয়ায় বৃথা ঘুরে মরি,
করি সন্-ধান ঘরের ঠিকা-না...

বিষাদমাখা কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে শুনতে ইলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সরাইখানার জমাট হৈ-হট্টগোলের ভেতরে তা যেন আকাশের মেঘের গায়ে

ছোট ছোট তারার মতো ঝলমল করতে লাগল। মেঘের রাশি দ্রুত ভেসে চলে আর তারাদলও এই জ্বলে, এই মিলিয়ে যায়...

খিদের জ্বালায় ছিঁড়ে যায় নাড়ী,
শীতে হাড়গোড় ভেঙ্গে যায় যায়...

ইলিয়া ভাবল, হ্যাঁ, গান গায় বটে এরা, দিব্যি গায়, এমন গায় যে মন জুড়ে বসে। কিন্তু এরাই পরে ভোদকা খেয়ে মাতাল হয়ে হাতাহাতি করবে... মানুষের মধ্যে ভালো কী আর বেশিক্ষণ থাকতে পারে!

ওরে তুই, পোড়া ক-পা-ল আমার...

— চড়া গলায় করুণ সুর উঠল।

তার পরই খাদের গলা জোরে, গম্ভীর আওয়াজে ধরল:

চেপেছিস বুকে পা-ষা-ণে-র ভার...

ইলিয়ার মনের মধ্যে জেগে উঠল অতীতের স্মৃতি — ইয়েরেমেই দাদুর চেহারা। বুড়োর দুগাল বয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত আর সে মাথা নাড়িয়ে বলত:

‘কত খোঁজাই না খুঁজলাম, কিন্তু ন্যায়বিচার কোথাও দেখতে পেলাম না...’

ইলিয়া ভাবল, ইয়েরেমেই দাদু ভগবানকে ভালোবাসত, কিন্তু চুপেচুপে টাকা জমাচ্ছিল। আবার দেখ, তেরেন্তিই কাকা ভগবানকে ভয় করে অথচ টাকা চুরি করল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সব সময় কেমন যেন দুটো দিক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বুকের ভেতরে যেন একটা ওজনযন্ত্র আছে আর হৃৎপিন্ডটা যেন কাঁটার মতো কখনও এদিকে কখনও ওদিকে ঘুরে গিয়ে ভালো-মন্দের ওজন নির্দেশ করে।

‘বটে!’ সরাইখানার মধ্যে কে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল। তার পরেই এমন জোরে ভারী একটা কিছু দড়াম্ করে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল যে ইলিয়ার খাটটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

‘দাঁড়া!.. দাঁড়া বলছি...’

‘ধর ওকে...’

‘পাক্ড়ো...’

গোলমাল হঠাৎ বেড়ে গেল, চরমে উঠল, নতুন নতুন অনেক আওয়াজ

এসে জুটল, সব আওয়াজই শূন্যে পাক খেতে লাগল, হুহুঙ্কার তুলল, কাঁপতে লাগল— এক পাল হিংস্র ও ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো যেন কোন্দল বাধিয়ে তুলেছে।

ইলিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে শুনতে লাগল, তার আনন্দ হল এই ভেবে যে সে যা আশা করেছিল ঠিক তাই ঘটেছে এবং এটা লোকচরিত্র সম্পর্কে তার ধারণাই সমর্থন করছে। সে মাথার নীচে হাত দিয়ে আবার চিন্তার রাজ্যে নিজেকে সমর্পণ করল।

'...আন্‌তিপা দাদু নির্ঘাত মহাপাপ করেছিল, তাই পরপর আট বছর মৌন হয়ে প্রায়শ্চিত্তের জন্যে প্রার্থনা করে... অথচ লোকে তাকে ক্ষমা করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করে, এমনকি তাকে সাধু আখ্যা দেয়... কিন্তু তার ছেলেদের রেয়াত করল না। একটিকে সাইবেরিয়ায় পাঠাল, অন্যটিকে গাঁ থেকে খেদিয়ে দিল...'

'এখানে একটা বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার!' ব্যবসাদার স্ত্রোগানির জমকাল কথাগুলো ইলিয়ার মনে পড়ে গেল। 'একজন যেখানে সৎ সেখানে যদি নয় জন বদ হয় তাহলে কারও কোন লাভ নেই, ভালো লোকটা বরবাদ হয়ে যায়... যারা দলে ভারী — সত্য তাদেরই পক্ষে...'

ইলিয়া মনে মনে হাসল। তার বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা সাপের মতো কিলবিল করে উঠল মানুষের ওপর ক্রোধ। স্মৃতি তার সামনে একের পর এক হাজির করতে লাগল পরিচিত নানা চেহারা। বিপুল দেহ নিয়ে কুৎসিত মাতিৎসা উঠোনে কাদার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে, গোঙাচ্ছে:

'মা!.. মা গো! একটি বার যদি এসে দেখা দিতে!'

পেরফিশ্‌কা মাতাল অবস্থায় তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তার পা টলছিল, সে ধমক দিয়ে বলল:

'খেয়ে একেবারে টং! হারামজাদী...'

ওদিকে দেউড়ি থেকে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল পেত্রুখা — স্বাস্থ্যবান পেত্রুখার মুখ টকটক করছে, তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

সরাইখানার কেলেঙ্কারির পাট চুকল। তিনটি কণ্ঠস্বর — দুটি মেয়েদের এবং একটি পুরুষের — গান করার চেষ্টা করল, কিন্তু গান জমল না। কে যেন অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে এসে খানিকক্ষণ সেটাকে বাজাল, বাজানটা ভালো হল না, শেষকালে থামিয়ে দিল।

সরাইখানার সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে এলো পেরফিশ্কার সুরেলা গলা। মুচি গানের মতো সুর তুলে হড়বড় করে চেঁচিয়ে উঠল:

'ঢাল, ঢাল, পাত্তর ভর, যা লাগে দেবেন কত্তা! মদ খাব, মাগীবাজী করব, ফতুর হয়ে দোরে দোরে ভিখ মাগব। এখান ওখান থেকে দড়ি কলসী কি আর মিলবে না রে বাপু! দড়ি-কলসীর হাত এড়িয়েই বা যাবে কোথায় — নিজের শিরার ফাঁসেই দম আটকে টেঁসে যাবি!'

হো হো হাসি ও বাহবা দেওয়ার চিৎকার শোনা গেল...

ইলিয়া বেরিয়ে এসে উঠোনে, দেউড়ির কাছে দাঁড়াল, তার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল কোথাও চলে যায়, কিন্তু কোথায় তা সে জানে না। অনেক রাত হয়ে গেছে; মাশা ঘুমোচ্ছে; ইয়াকভের মাথাটা কেমন বিগড়ে গেছে, সে বাড়িতে শুয়ে আছে। ওদের বাড়িতে যেতে ইলিয়ার ভালো লাগে না, কেননা তাকে দেখা মাত্র পেত্রুখা সব সময় বিরক্তির ভাব করে ভুরু নাচায়। শরৎকালের ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে। প্রায় ঘুটঘুটে ঘন অন্ধকারে উঠোন ঢাকা পড়ে গেছে, আকাশ দেখা যায় না। উঠোনের সমস্ত দালান কোঠা বাতাসে জমাট বাঁধা অন্ধকারের বিরাট বিরাট পুঞ্জের মতো দেখাচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে বাতাসে কিসের একটা দুম্দাম্ ও সোঁসোঁ আওয়াজ উঠল, শোনা গেল চাপা ফিসফিস শব্দ — যেন জীবন সম্পর্কে মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছে। বাতাস ইলিয়ার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার মুখে জোর ঝাপটা দিল, পেছনে ঘাড়ের ওপর ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলল... ইলিয়া কেঁপে উঠল, মনে মনে ভাবল, এ ভাবে বাঁচা সম্ভব নয়, একেবারেই সম্ভব নয়। এই নোংরামি ও হানাহানি থেকে কোথাও পালিয়ে গিয়ে একা একা ভদ্র ভাবে, শান্ত জীবন কাটানো দরকার...

'এখানে কে দাঁড়িয়ে?' চাপা গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল।

'কে বলছে?'

'আমি... মাতিৎসা...'

'তুমি এখানে কোথায়?'

'কাঠের গাদার ওপর বসে আছি...'

'কেন?'

'অমনি...'

দুজনেই চুপ করে গেল।

'আজ আমার মার বার্ষিকী,' মাতিৎসা অন্ধকারের ভেতর থেকে জানাল।

'বহু আগে মারা গেছে?' নেহাৎই কিছু একটা বলতে হয় বলেই ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'অনে—ক আগে... বছর পনেরো... তার বেশিই বা হবে... তোর মা বেঁচে আছে?'

'না... আমার মাও মারা গেছে... আচ্ছা, তোমার বয়স কত বল ত?'

মাতিৎসা একটু চুপ করে থেকে শিস দিয়ে জবাব দিল:

'তিরিশ হয়ে গেছে... পায়ে বড় ব্যথা করে... ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, বড় ব্যথা করে... কত যে রগড়ালাম — অনেক কিছু মালিশ করে দেখলাম, কিছুতেই কিছু হয় না।'

কে যেন সরাইখানার দরজা খানিকটা খুলে দিল। সেখান থেকে একরাশ প্রচণ্ড আওয়াজ হুড়মুড় করে উঠোনে এসে পড়ল, বাতাস তাকে লুফে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

'তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' মাতিৎসা জিজ্ঞেস করল।

'অমনিই... খারাপ লাগছে...'

'আমার মতোই... আমার ঘরটা ত আবার কফিনের মতো।'

ইলিয়া দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পেল।

তারপর মাতিৎসা ওকে বলল:

'আমার ঘরে আসবি?'

যেখান থেকে মাতিৎসার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, ইলিয়া সেদিকে তাকাল।

'চল,' উদাস সুরে সে উত্তর দিল।

চিলেকোঠায় যাওয়ার পথে সিঁড়িতে মাতিৎসা চলল ইলিয়ার আগে আগে। সে সিঁড়ির ধাপের ওপর প্রথমে ডান পা রাখল, তারপর ভারী নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাঁ পা ওপরে তুলল। ইলিয়া কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করে তার পিছু পিছু চলল, সেও চলছিল ধীরে ধীরে; যন্ত্রণার জন্য মাতিৎসার যেমন উঠতে কষ্ট হচ্ছিল, তেমনি তারও যেন কষ্ট হচ্ছিল মনের ভারের জন্য।

লম্বা, এক ফালি জায়গা — এই হল মাতিৎসার ঘর। তার ছাদের গড়ন সত্যি সত্যিই কফিনের ঢাকনার মতো। দরজার কাছে জায়গা জুড়ে আছে বিরাট একটা চুল্লী, দেয়ালের ধারে, চুল্লীতে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে চওড়া খাট,

খাটের উল্‌টো দিকে — টেবিল, তার দুপাশে দুটো চেয়ার। জানলাটা দেখাচ্ছিল ছাইরঙা দেয়ালের ওপর একটা কালো চৌকোর মতো। জানলার ধারে — আরও একটা চেয়ার। এখানে বাতাসের হুহু শব্দ ও গোলমাল আরও জোরে শোনা যাচ্ছিল। ইলিয়া জানলার ধারে চেয়ারে বসে পড়ল, দেয়ালের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে তার নজরে পড়ল এক কোনায় একটি ছোট্ট আইকন।

'এটা কার আইকন?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'সেণ্ট আন্নার,' মাতিৎসা নীচু গলায় সম্ভ্রমের সুরে বলল।

'তোমার নাম কী?'

'আমার নামও আন্না... জানতিস না?'

'না।'

'কেউই জানে না,' অতি কষ্টে বিছানার ওপর চেপে বসতে বসতে মাতিৎসা বলল। ইলিয়া ওর দিকে তাকাল, কিন্তু কথা বলার কোন ইচ্ছে সে অনুভব করল না। মাতিৎসাও চুপ করে রইল। এই ভাবে চুপ্‌চাপ তারা অনেকক্ষণ, মিনিট তিনেক বসে রইল, ওরা যেন একে অন্যের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে না। শেষকালে মাতিৎসা জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে কী করা যায়?'

'জানি না,' ইলিয়া জবাব দিল।

'হুঁ, জানিস না কী রকম!' অবিশ্বাসের সুরে হেসে সে বলল। 'তুই আমাকে খেতে দে। বোতল দুয়েক বীয়ার কিনে আন... না, বলি কি বরং, খাবার কিনে দে আমাকে!.. স্রেফ খাবার চাই, আর কিছু চাই না...'

ওর গলা বুঁজে এলো, গলা খাঁকারি দিয়ে, অপরাধীর সুরে সে বলে যেতে লাগল:

'দেখছিস, পায়ে কী দারুণ ব্যথা, রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে... কোথাও বেরোতে পারি না... যেটুকু পুঁজি ছিল খেয়ে শেষ করে ফেলেছি... আজ পাঁচ দিন হল এই ভাবে বসে আছি... গতকাল বলতে গেলে খাই-ই নি, আর আজ ত একেবারেই খাই নি... মাইরি বলছি, সত্যি!'

ঠিক এই সময় ইলিয়ার মনে পড়ে গেল যে মাতিৎসা হল রাস্তার মেয়ে। সে মাতিৎসার প্রকাণ্ড মুখটার ওপর ভালো করে নজর বুলাল, দেখতে পেল তার কালো চোখ দুটো একটু একটু হাসছে আর ঠোঁটজোড়া এমন ভাবে

কাঁপছে যেন সে অদৃশ্য কী একটা চুষছে... ওর সামনা সামনি ইলিয়ার মনের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল এক অস্বস্তিকর অনুভূতি, বিশেষ করে তার সম্পর্কে ঝাপসা এক ধরনের কৌতূহল।

'এক্ষুনি আনছি...'

ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল সরাইখানার বার-বারান্দায়, রান্নাঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। চিলেকোঠায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হঠাৎ তার মন থেকে দূর হয়ে গেল। তবে এই অনিচ্ছার ভাবটা তার মনের বিষণ্ণ অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীর কাছ থেকে সে দশ কোপেক দিয়ে সেদ্ধ মাংসের ছাঁট, কিছু রুটির টুকরো এবং ভুক্তাবশিষ্ট কিছু খাবার কিনল। রাঁধুনী খাবারগুলোকে একটা তেলতেলে চালুনির মধ্যে গুছিয়ে দিল, ইলিয়া চালুনিটাকে থালার মতো করে দুহাতে নিল। বার-বারান্দায় বেরিয়ে এসে আবার থমকে দাঁড়াল, উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগল, কী করে বীয়ার যোগাড় করা যায়। বার-এ গিয়ে নিজে যে কিনবে তার যো নেই — তেরেন্তি জিজ্ঞেস করবে বীয়ারে ওর কী দরকার। সে রান্নাঘর থেকে বাসন ধোয়ার লোকটাকে ডাক দিল, তাকে কিনে আনতে বলল। লোকটা দৌড়ে গেল, ফিরে এসে কোন কথা না বলে বোতলগুলো তার হাতে গুঁজে দিয়ে রান্নাঘরের দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

'দাঁড়াও!' ইলিয়া বলল। 'এটা কিন্তু আমার নিজের জন্যে না — এক বন্ধু এসেছে কি না...'

'কী?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'বন্ধুকে খাওয়াচ্ছি আর কি...'

'ওঃ, তা কী হয়েছে?'

ইলিয়া দেখল যে মিথ্যে কথাটা না বললেও হত, সে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। ও ধীরেসুস্থে ওপরের দিকে চলল, যেতে যেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পাততে লাগল, তার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কেউ তাকে পথে আটকায়। কিন্তু বাতাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না, ওকে কেউ আটকাল না, চিলেকোঠায় যখন সে ঢুকল তখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে এই মেয়েলোকটা সম্পর্কে তার মন লালসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যদিও মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় ভয় ভাবও ছিল।

মাতিৎসা চালুনিটাকে নিজের কোলের ওপর রেখে চুপচাপ সেখান থেকে তার মোটা মোটা আঙুলে ছাইরঙা খাবারের টুকরোগুলো তুলতে থাকে, গোগ্রাসে মুখে পোরে আর শব্দ করে চিবোয়। ওর দাঁতগুলো বিরাট বিরাট, ধারাল। এক একটি টুকরো দাঁতের ফাঁকে গোঁজার আগে সে সেটাকে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল, ভাবটা এমন যেন সেই টুকরোর ভেতরে কোন জায়গাটার স্বাদ বেশি তার খোঁজ করছে।

ইলিয়া মেয়েলোকটাকে এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভাবছিল কী করে তার পক্ষে সম্ভব হবে একে জড়িয়ে ধরা, ওর ভয় হল যদি না পারে তাহলে সে ইলিয়াকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এই চিন্তায় ইলিয়া উত্তেজিত হয়ে পরক্ষণেই চুপসে যাচ্ছিল।

ঘুলঘুলি দিয়ে হাওয়া উড়ে এসে দরজায় ধাক্কা খেতে লাগল আর প্রতি বারই দরজা কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াও শিউরে উঠতে লাগল এই ভেবে যে এখুনি হয়ত কেউ ভেতরে এসে ঢুকবে, তাকে এখানে দেখে ফেলবে...

'দরজাটা বন্ধ করে দেব?' ইলিয়া বলল।

মাতিৎসা নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, চালুনিটাকে সরিয়ে রাখল, ক্রুশ করল।

'ভগবানকে ধন্যবাদ — পেট ভরল! ওঃ, আর কতই বা মানুষের দরকার হয়!'

ইলিয়া চুপ করে রইল। মাতিৎসা তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আর যার খাঁই বেশি তার কাছ থেকে দাবিও করা হয় বেশি,' মাতিৎসা বলল।

'কে দাবি করে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কেন? ভগবান!'

ইলিয়া আবার চুপ করে গেল। ওর মুখে ভগবানের নাম শুনে ইলিয়ার মনের মধ্যে তীব্র অথচ অস্পষ্ট এমন এক অনুভূতি জেগে উঠল যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই মেয়েমানুষটিকে আলিঙ্গন করার যে বাসনা ইলিয়ার ছিল এখনকার এই অনুভূতি তার বিরোধিতা করল। মাতিৎসা দুহাতে বিছানায় ঠেস দিল, নিজের বিপুল শরীরকে খানিকটা তুলে দেয়ালের দিকে

সরিয়ে নিয়ে গেল। এবারে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে কেমন একটা কাঠ কাঠ গলায় বলতে শুরু করল:

'খেতে খেতে আমি কেবল পেরফিশ্‌কার মেয়ের কথাই ভাবছিলাম... অনেক দিন থেকেই অবশ্য ওর কথা ভাবি... ও তোদের সঙ্গে — তোর আর ইয়াকভের সঙ্গে থাকে — এ থেকে ভালো কিছু হবে না বলেই আমার মনে হয়... কচি বয়সে ছুঁড়ীটাকে তোরা নষ্ট করবি, ও তখন আমার পথ ধরবে... আর আমার পথ — জঘন্য, কুৎসিত; ও পথে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা যায় না, মাগীরা আর ছুঁড়ীরা পোকার মতো কিলবিল করে চলে...'

মাতিৎসা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কোলের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটো নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে বলে চলল:

'মেয়েটা শিগ্‌গিরই সোমত্ত হয়ে উঠবে। আমি আমার জানাশুনা রাঁধুনী আর অন্য মেয়েদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেছি — এই মেয়েটার কি কোন গতি হয় না? না, ওরা বলে, কোন গতি হওয়ার নেই... বলে — বেচে দে!.. তাতে ওর ভালো হবে, ও টাকা-পয়সা পাবে, জামাকাপড় পাবে, ওর ঘর-বাড়ি হবে... এমন ব্যাপার ঘটে, ঘটে যে তা আমি জানি... কোন বড়লোক হয়ত শরীরের দিক থেকে অথর্ব আর কদাকার হয়ে পড়েছে, তখন কোন মাগী আর তাকে অমনি অমনি ভালোবাসতে চায় না... ঠিক এই রকম কদাকার লোকেই নিজের জন্যে মেয়ে কিনে নেয়... এটা হয়ত মেয়েটার পক্ষে ভালোই, তবু প্রথম প্রথম ত খারাপ লাগেই... এমন ব্যাপার এড়াতে পারলেই ভালো... ইজ্জৎ রক্ষা করে অনাহারে জীবন কাটানো বরং...'

এই পর্যন্ত বলে মাতিৎসা কাশতে লাগল — যেন কোন একটা কথা তার গলায় আটকে গেছে; তারপর নির্বিকার কণ্ঠে শেষ করল:

'বরং অনাহারে নোংরা জীবন কাটানোর চেয়ে ভালো...'

বাতাস তখন হুহু করে চিলেকোঠায় ঢুকে হুটোপুটি খাচ্ছে, দরজায় দারুণ ঘা মেরে চলছে।

মেয়েমানুষটির নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর, তার ভারী ও নিশ্চল মূর্তি ইলিয়ার মনের মধ্যে কামনা চরিতার্থ করার উপযোগী অনুভূতির বিকাশ ঘটানোর এবং সাহস জাগিয়ে তোলার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াল। মাতিৎসা যেন তাকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে দিতে লাগল — এটা লক্ষ্য করে তার মন বিগড়ে গেল...

'ভগবান, হা ভগবান!' মাতিৎসা ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। 'হায় মা মেরী!..'

ইলিয়া রেগে চেয়ারের ওপর নড়ে বসল এবং কঠিন স্বরে বলে উঠল:

'নিজেকে জঘন্য বলছ আবার এদিকে মুখে কেবল ভগবান আর ভগবান! তুমি কি মনে কর ভগবান থোড়াই তোমার এই নামোচ্চারণের তোয়াক্কা রাখেন?'

মাতিৎসা ওর দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থাকল, মাথা নাড়ল।

'তোর কথা বুঝতে পারলাম না...'

'না বোঝার কিছু নেই!' ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল। 'করছ ছেনালিপনা, তারপর — ভগবান! ভগবানকে ভালোই যদি বাস ত ছেনালিপনা কেন বাপু?'

'ওঃ!' মাতিৎসা অস্থির হয়ে চিৎকার করে উঠল। 'বলিস কী রে? পাপী-তাপীরাই যদি তাঁর নাম না করে ত করবে কে?'

'কে করবে অতশত আমি জানি না!' এই মেয়েমানুষটিকে এবং বিশ্বসুদ্ধ মানুষকে অপমান করার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষার জোয়ার অনুভব করে ইলিয়া বলল। 'এটাই জানি যে তোমাদের মুখে তাঁর নাম শোভা পায় না, হ্যাঁ, হ্যাঁ! তোমাদের মুখে শোভা পায় না! তোমরা তাঁর আড়ালে কেবল একে অন্যের কাছ থেকে ঘাপটি মেরে থাক... আমি কচি খোকাটি নই, সবই দেখি। সকলেই ঘ্যানঘ্যান করে, নালিশ করে, কিন্তু ত্যাঁদড়ামি করার বেলায় ঠিক আছে। কেন তা হলে অন্যকে ঠকানো, অন্যের ওপর বাটপারি? পাপ করে করে হদ্দ হল, তারপরই কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! ভগবান, ক্ষমা কর! ও সব আমার জানা আছে, তোমরা হলে ঠক, শয়তান! নিজেদের ঠকাচ্ছ, ভগবানকেও ঠকানোর ফিকির করছ!..'

মাতিৎসা কিছু না বলে ঘাড় বাড়িয়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল, ওর চোখে ফুটে উঠেছে হতবুদ্ধির ভাব। ইলিয়া দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় ছিটকিনি টেনে খুলে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা দড়াম্ করে ঠেলে দিল। সে অনুভব করল, মাতিৎসাকে চরম অপমান করেছে আর তা ভেবে সে মনে মনে খুশিই হল, বুকটা হালকা হয়ে গেল, মাথার ভেতরটাও আগের চেয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে। দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিল, রাগে তখনও সে মনে মনে আওড়াতে লাগল মনে আঘাত দেওয়ার উপযোগী, পাথরের মতো শক্ত শক্ত কথা। ওর

মনে হল এই গনগনে কথাগ্নলো যেন তার মনের ভেতরের অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলছে, তাকে লোকজনের পাশ কাটিয়ে অন্য এক পথের সন্ধান দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই সে নিজের বক্তব্য কেবল যে মাতিৎসাকে বলেছে তা নয়, তেরেন্‌তি কাকা, পেত্রুখা এবং ব্যবসাদার স্প্রোগানি — কাউকেই বলতে বাদ রাখে নি।

উঠোনে বেরিয়ে এসে সে মনে মনে বলল, 'ঠিক হয়েছে! তোমাদের সঙ্গে আবার রেখে ঢেকে বলার কী আছে? — হারামজাদী কোথাকার!..'

মাতিৎসার বাড়িতে যাওয়ার কিছু দিন পর থেকে ইলিয়া বেশ্যাবাড়িতে যাতায়াত শুরু করে দিল। প্রথম দিন ঘটনাটা ঘটল এই ভাবে: এক দিন সন্ধেবেলায় সে বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় রাস্তার একটা মেয়েমানুষ তাকে বলল:

'যাবে নাকি গা?'

ইলিয়া তার দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে চুপচাপ তার পাশাপাশি চলতে লাগল, চেনাশোনা কারও চোখে পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে বার বার চারপাশে তাকাতে থাকে। কয়েক পা যাওয়ার পর মেয়েমানুষটা তাকে আগে থেকে জানিয়ে দিল:

'দেখো — পুরো এক রুবল লাগবে কিন্তুক।'

'ঠিক আছে,' ইলিয়া বলল। 'তাড়াতাড়ি পা চালাও...'

মেয়েমানুষটার ডেরা পর্যন্ত তারা চুপচাপ চলল। এখান থেকেই শুরু...

কিন্তু মেয়েমানুষদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ফলে খরচটা হঠাৎই দেদার বেড়ে গেল। ইলিয়া এখন প্রায়ই ভাবতে থাকে তার এই ব্যবসা — অযথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ দিয়ে ভদ্র ভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না। এক সময় তার ইচ্ছে হল অন্য সব খুচরো কারবারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেও লটারীর কারবারে নেমে আর সকলের মতোই লোকজনকে ঠকায়। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করে তার মনে হল এ চিন্তাটা ছোট ধরনের, এতে ঝামেলাও আছে। পুলিশের লোকজনের নজর এড়িয়ে চলতে হবে, তাদের তোয়াজ করতে হবে, দক্ষিণা দিতে হবে — ব্যাপারটা ইলিয়ার পক্ষে অসহ্য। সরাসরি ও সাহসের সঙ্গে সে লোকের চোখে চোখ রাখা পছন্দ করত, সব সময় আর সব ফিরিওয়ালার তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পড়ত, সে যে ভোদকা খেত না এবং প্রতারণা করত না এই ভেবে তার রীতিমতো

ভালো লাগত। রাস্তায় সে হাঁটত ধীরেসুস্থে, ভারিক্কি চালে, তার চোয়ালভাঙা শুকনো মুখটা দেখাত গম্ভীর ধরনের। কথা বলতে বলতে সে তার কালো চোখজোড়া কোঁচকাত, কথা বলত কম, ভেবেচিন্তে। প্রায়ই সে মনে মনে ভাবত হাজারখানেক রুবল কিংবা তারও বেশি কিছু পেয়ে গেলে কী ভালোই না হত! চুরি-ডাকাতির গল্প তার মনের মধ্যে দারুণ কৌতূহল জাগিয়ে তুলত — সে কাগজ কিনে মনোযোগ দিয়ে চুরি-ডাকাতির খুঁটিনাটি বিবরণ পড়ত, তারপর লক্ষ্য করত চোর ধরা পড়ল কি না। ধরা পড়লে ইলিয়া রেগে যেত, ওদের সমালোচনা করত, ইয়াকভ্‌কে বলত:

'আহাম্মকগুলো ধরা পড়ে গেল!.. আরে, যা পারিস না তা করতে যাওয়া কেন বাপু?'

এক দিন সন্ধেবেলা সে ইয়াকভ্‌কে বলল:

'চোরবাটপাররা অনেক ভালো আছে, যারা সৎপথে থাকে তাদের অবস্থাই বরং খারাপ!'

ইয়াকভের মুখের পেশিতে টান ধরল, সে চোখ কোঁচকাল। জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় তার হাবভাব সচরাচর যেমন হয়ে থাকে সেই ভাবে গলা নামিয়ে রহস্যের সুরে সে বলল:

'গত পরশু তোর কাকা সরাইখানায় এক বুড়োর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল — লোকটা ধর্মজ্ঞানী-ট্যানী হবে। বুড়ো বলল, বাইবেলে নাকি লেখা আছে: 'লুঠেরাদের ডেরা নির্ঝঞ্ঝাট, যারা ভগবানকে বিরক্ত করে তারা নিরাপদ, তারা ভগবানকে কোলে করেই আছে।''

'আচ্ছা — বানিয়ে বলছিস না ত?' বন্ধুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'আমার কথা নয়,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে, শূন্যে কিছু একটা হাতড়ানোর ভঙ্গি করে ইয়াকভ্ বলে চলল। 'বাইবেলে বলা হয়েছে... হতে পারে বুড়ো নিজেই বানিয়েছে... আমি ওকে আবার জিজ্ঞেস করতে ঐ একই কথা বলল...'

তারপর ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল:

'আমার বাবার কথাই ধর না — নির্ঝঞ্ঝাট। অথচ ভগবান তার ওপর বিরক্ত...'

'তা আর বলতে!' ইলিয়া বলে উঠল।

'শহরের কাউন্সিলের ভোটে জিতেছে...'

ইয়াকভ্ মাথা নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোগ করল:

'মানুষের প্রত্যেকটা কাজ এমন হওয়া উচিত যেন তা নিজের বিবেকের সামনে একটা নিরেট গোল ডিমের মতো ঝকঝক করে, অথচ দ্যাখ না... আমার গা ঘিনঘিন করে... কিছুই বুঝতে পারি না... এ জীবনে আমি অভ্যস্ত নই. সরাইখানায় আমি কোন আগ্রহ পাই না... এদিকে বাবা সমানে মন্ত্রণা দিয়ে চলছে, বলে, 'আর কুঁড়েমি নয়, বুদ্ধি খাটা, কাজে লেগে পড়!' কী কাজ? না, তেরেন্তি যখন না থাকে তখন আমি বার কাউণ্টারে বিক্রি করি... আমার ঘেন্না লাগে, কিন্তু সহ্য করে যাই... এদিকে নিজে থেকে যে কিছু একটা করব সে সামর্থ্যও নেই...'

'পড়াশুনা করা দরকার!' ইলিয়া ভারিক্কি চালে বলল।

'জীবনটা বড় কঠিন,' ইয়াকভ্ মৃদু স্বরে বলল।

'কঠিন? তোর জীবন? মিথ্যেবাদী কোথাকার!' বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার নীচে ইয়াকভ্ যেখানে বসে ছিল সেদিকে এগিয়ে আসতে আসতে ইলিয়া চেঁচিয়ে বলল। 'আমার জীবন কঠিন — এটা ঠিক! কিন্তু তোর কী? বাপ বুড়ো হলে — সম্পত্তির মালিক হবি... কিন্তু আমি? রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দোকানে দোকানে প্যাণ্ট, কোর্তা, ঘড়ি, আরও কত কিছুই না দেখি... ঐ রকম প্যাণ্ট পরার মতো সামর্থ্য আমার হবে না, ঐ রকম ঘড়িও কখনও পাব না — বুঝলি? অথচ আমার সাধ হয়... আমার সাধ হয় লোকে যেন আমাকে সম্মান করে... আমি অন্যদের চেয়ে কমটা কী? আমি তাদের চেয়ে ভালো! অথচ চোর-ডাকাতরা আমার সামনে দিব্যি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা শহরের কাউন্সিলে ভোট পাচ্ছে! তারা ঘর-বাড়ি আর সরাইখানার মালিক... চোর-ডাকাতের কপালে যত সুখ, অথচ আমার নেই — কেন? আমিও চাই...'

ইয়াকভ্ বন্ধুর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে হঠাৎ মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বলল:

'ভগবান না করুন, তোর যেন ও রকম ভাগ্য না হয়!'

'কী? কেন?' ইলিয়া ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে উত্তেজিত ভাবে বন্ধুর দিকে তাকাতে তাকাতে চেঁচিয়ে উঠল।

'তুই লোভী। কিছুতেই তোর তৃপ্তি হওয়ার নয়,' ইয়াকভ্ বলল।

ইলিয়া রাগে জ্বলে উঠল, কাষ্ঠহাসি হাসল।

'তৃপ্তি হবে না? তোর বাপকে গিয়ে বল দেখি, আমার কাকার সঙ্গে মিলে ইয়েরেমেই দাদুর কাছ থেকে যে টাকা হাতিয়েছে তার অন্তত অর্ধেক যেন আমাকে দেয় — তাতেই আমি খুশি হব — হ্যাঁ!'

একথায় সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকভ্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মাথা নীচু করে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ইলিয়া দেখতে পেল ওর কাঁধ দুটো কাঁপছে আর ঘাড়টা এমন বেঁকে গেছে যেন ইয়াকভ্‌কে কেউ ভয়ানক ঘা মেরেছে।

'দাঁড়া!' ইলিয়া বন্ধুর হাত খপ্ করে ধরে ফেলে বিচলিত হয়ে বলল। 'কোথায় চললি?'

'ছাড়, ভাই,' ইয়াকভ্ ফিসফিস করে বলল, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে ইলিয়ার দিকে তাকাল। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ও শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে, ওর গোটা শরীরটা একটা নরম পিণ্ডের মতো হয়ে গেছে — যেন থেঁতলে গেছে...

'দাঁড়া না রে!' ইলিয়া ওকে আস্তে করে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল। 'তুই আমার ওপর রাগ করিস না। কথাটা কিন্তু সত্যি...'

'আমি জানি,' ইয়াকভ্ বলল।

'জানিস? কে বলল?'

'সকলেই বলে...'

'হুম্... তবে যারা বলে, তারাও কোন অংশে ভালো নয়!'

ইয়াকভ্ করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমি বিশ্বাস করি নি। আমার ধারণা ছিল ও সব হল লোকের হিংসে আর রাগের কথা। পরে বিশ্বাস করতে লাগলাম... তারপর তুইও যখন বলছিস, তার মানে...'

সে অসহায়ের ভঙ্গিতে হাত ঝটকা দিয়ে বন্ধুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, দুহাতে শক্ত করে চেয়ারে ভর দিয়ে ধপ করে বসে পড়ে নিশ্চল ও আড়ষ্ট হয়ে রইল, তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল। ইলিয়া তার কাছ থেকে সরে গিয়ে খাটে উঠে বসল, তার অবস্থা ইয়াকভেরই মতো, সেও চুপ করে রইল, বন্ধুকে যে কী বলে সান্ত্বনা দেবে তা বুঝে উঠতে পারল না।

'এই হল আমার জীবন!' অস্ফুট স্বরে ইয়াকভ্ বলল।

'বুঝতে পারছি,' ইলিয়া তার উত্তরে মৃদু স্বরে বলল। 'বুঝতে পারছি ভাই, তোর ভাগ্য ভালো না। তবে একটা সান্ত্বনা এই যে সকলেই তাই — যে দিকেই তাকাস না কেন...'

'তুই ব্যাপারটা ঠিকই জানিস?' ইয়াকভ্ বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তোর মনে আছে, আমি দৌড়ে চলে গেলাম? ফাঁক দিয়ে দেখলাম ওরা বালিশ সেলাই করছে... ও তখনও ঘড়ঘড় আওয়াজ করছিল...'

ইয়াকভ্ কাঁধ নাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে যেতে যেতে ইলিয়াকে বলল:

'চলি...'

'আচ্ছা। তুই কিন্তু ঐ সব ভেবে ভেবে মন খারাপ করিস না... কী আর করা যাবে, বল?'

'না, না, ঠিক আছে,' ইয়াকভ্ দরজা খুলতে খুলতে বলল।

ইলিয়া ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল, পরে ধপ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। ইয়াকভের জন্য ওর দুঃখ হল, কাকা আর পেত্রুখার ওপর, বিশ্বসুদ্ধ সকলের ওপর ও আবার রাগে টগবগ করে উঠল। এই সব লোকের মধ্যে ইয়াকভের মতো মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়। ইয়াকভ্ ভালো মানুষ, উদার, শান্ত, সৎ। ইলিয়া ভাবতে লাগল লোকজনের কথা, তার স্মৃতিতে এমন সব ঘটনার আবির্ভাব ঘটতে লাগল যাতে নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যাচারেরই পরিচয় মেলে। এ রকম অনেক ঘটনা তার জানা ছিল, তাই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সে যে লোকের গায়ে তিক্ততা ও কাদা ছিটাবে তাতে আর বিচিত্র কি! লোকজনের চেহারা তার সামনে যত কালো হয়ে আসত ততই একটা অদ্ভুত অনুভূতির ফলে তার পক্ষে নিশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত, তার সেই অনুভূতির মধ্যে থাকত কিসের যেন একটা কাতরতা, একটা হিংস্র উল্লাস এবং চারপাশে কালো কালো বিষাদগ্রস্ত জীবনের যে উদ্দাম ঘূর্ণি বইছে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের নিঃসঙ্গতা বোধজনিত ভীতি...

ছোট ঘরটার দেয়ালের তক্তা ভেদ করে সরাইখানা থেকে চুইয়ে চুইয়ে আসছিল ঘোলাটে গন্ধবহ আওয়াজ; শেষ পর্যন্ত একা একা ওখানে শুয়ে থাকা অসহ্য মনে হতে ইলিয়া উঠে পড়ে বেড়াতে বের হল। সরল অথচ ভারী এবং নাছোড়বান্দা চিন্তাটাকে বয়ে নিয়ে সে শহরের রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি

করতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল বুঝি কেউ, কোন শত্রু তার পেছন পেছন চলছে, তাকে ঠেলে দিচ্ছে সেখানে যে জায়গাটা আরও কদর্য, আরও একঘেয়ে, তাকিয়ে দেখাচ্ছে কেবল সেই জিনিস যাতে মন যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে, হৃদয়ে জন্মায় ক্রোধ। কিন্তু দুনিয়ায় ভালোও ত আছে, আছে ভালো মানুষ, ভালো ঘটনা, আনন্দ? কেন ও তা দেখতে পায় না, সর্বত্র ধাক্কা খায় কেবল যা কিছু মন্দ আর ক্লান্তিকর তার সঙ্গে? কে সব সময় তাকে অন্ধকার, নোংরামি আর বিদ্বেষের জগতের দিকে ঠেলে দেয়?

এই সব ভাবনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে চলতে চলতে তার খেয়াল হল সে হাঁটছে শহরের বাইরে পাথরের দেয়াল ঘেরা এক মঠের সামনের মাঠের ওপর দিয়ে। সামনের দিকে তাকাতে সে দেখতে পেল দূরে অন্ধকারের ভেতর থেকে ভারী হয়ে মেঘের সারি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মাথার ওপরে, অন্ধকারের মধ্যে কোথাও কোথাও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঝলক দিচ্ছে খণ্ড খণ্ড নীল আকাশ, সেখানে মিটমিট করছে ছোট ছোট তারা। থেকে থেকে রাতের নীরবতার সঙ্গে এসে মিশছে মঠের গির্জার ঘণ্টামিনার থেকে পেতলের ঘণ্টার সুরেলা আওয়াজ। মৃত্যুর মতো যে নিঃশব্দ ধরণীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে তার মাঝখানে এটাই একমাত্র জীবনচাঞ্চল্য। ইলিয়ার পেছনেই ছিল শহরের দালানকোঠা, কিন্তু সেখানকার ঐ আঁধার কালো পুঞ্জ থেকেও জীবনের কোন সাড়াশব্দ এই মাঠে এসে পেঁছাল না, যদিও রাত তখনও তেমন একটা কিছু হয় নি। হিমের রাত। ইলিয়া যেতে যেতে বরফে জমা কাদামাটিতে হোঁচট খাচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে নিঃসঙ্গতা ও ভয়ের একটা গা ছমছম করা অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল, সে থমকে দাঁড়াল। মঠের পাথরের ঠাণ্ডা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সে দাঁড়াল, স্থির হয়ে ভাবার চেষ্টা করল কে তাকে জীবনের পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কে তাকে কেবলই মন্দ আর দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা দিচ্ছে? কে?

'ভগবান, তুমি?' ইলিয়ার মনের মধ্যে জ্বলন্ত একটা প্রশ্ন ঝলক দিয়ে উঠল।

তার সর্বাঙ্গ হিমেল আতঙ্কে শিরশির করে উঠল; ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে এই রকম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে সে দেয়াল থেকে সরে এলো, দ্রুত পায়ে, হোঁচট খেতে খেতে দুহাত নিজের শরীরের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরে শহরের দিকে চলল। ফিরে তাকাতেও তার ভয় করছিল।

. . . .

এর কয়েক দিন বাদে পাভেল গ্রাচোভের সঙ্গে ইলিয়ার দেখা। তখন সন্ধে; তুষারের মিহি কণা বাতাসে অলস ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, রাস্তার বাতির আলোয় ঝিকমিক করছে। ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও পাভেলের পরনে ছিল একটা সুতির শার্ট, কোমরে কোন বেল্‌টও ছিল না। তার মাথা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে, পিঠ কুঁজো করে, পকেটে হাত গুঁজে সে এমন ভাবে চলেছে যেন চলতে চলতে পথে কোন কিছু খুঁজছে। ইলিয়া যখন নাগাল ধরার পর ওকে ডাক দিল তখন ইলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সে উদাসীন ভাবে বলল:

'অ্যাঁ!'

'কেমন আছিস?' ইলিয়া তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল।

'যতদূর খারাপ হতে হয়... আর তুই?'

'এই এক রকম আর কি...'

'খুব একটা সুবিধের নয় বলেই মনে হচ্ছে...'

ওরা চুপচাপ পাশাপাশি চলতে লাগল, একে অন্যের কনুইয়ের সঙ্গে কনুই ঠেকিয়ে।

'আমাদের এখানে আসবি না নাকি?' ইলিয়া বলল।

'কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি না... বুঝতেই পারছিস, অবসর সময় বলতে আমাদের বিশেষ কিছু নেই...'

'ইচ্ছে করলে ওর মধ্যেই সময় করে নেওয়া যায়,' ইলিয়া অভিযোগের সুরে বলল।

'তুই রাগ করিস নে... আমাকে ডাকছিস, কিন্তু নিজে ত একবারও জিজ্ঞেস করলি না আমি কোথায় থাকি, আমার কাছে আসার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম...'

'তা ঠিকই বলেছিস!' ইলিয়া হেসে বলল।

পাভেল তার দিকে তাকিয়ে এবারে খানিকটা সজীব হয়ে বলতে লাগল:

'আমি একা থাকি, বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ নেই, মনের মতো কাউকে পাওয়াও যায় না। প্রায় তিন মাস অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম — সারা সময়ের মধ্যে কেউ আসে নি...'

'কী হয়েছিল তোর?'

'মদ খেয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলেছিলাম... টাইফয়েড হয়েছিল... যখন সেরে উঠতে লাগলাম তখন আর এক যন্ত্রণা! সারা দিন সারা রাত একা একা পড়ে থাকতে থাকতে মনে হত আমি যেন কালা-বোবা — একটা কুকুর ছানার মতো, আমাকে গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারকে ধন্যবাদ... সব সময় আমাকে বই এনে দিতেন। তা নইলে মনের ছটফটানিতেই মরে যেতাম...'

'কেমন বই? ভালো?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ভালো! কবিতার বই পড়েছি — লেরমন্‌তভ্‌, নেক্রাসভ্‌, পুশকিন... সময় সময় পড়তে পড়তে মনে হত যেন দুধ খাচ্ছি। এমন কবিতাও আছে রে ভাই, যে পড়তে গেলে মনে হয় যেন প্রেয়সী তোমাকে চুমু দিচ্ছে। কোন কোন কবিতা আবার বুক ফালা ফালা করে দেয়, ফুলকির মতো জবলে, সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেয়...'

'আমার কিন্তু বই পড়ার অভ্যেস চলে গেছে,' ইলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। 'পড়তে গেলে — এক, কিন্তু যা চোখে পড়ে তা অন্য।'

'তাও মন্দ না। সরাইখানায় যাওয়া যাক কী বলিস? বসে একটু গল্পগুজব করা যাবে। আমার অবশ্য একটা জায়গায় যেতে হবে, তবে এখনও সময় আছে।'

'চল,' ইলিয়া রাজি হয়ে বন্ধু ভাবে পাভেলের হাত ধরল। পাভেল আবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমাদের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব কখনও ছিল না,' ও বলল, 'অথচ তোর সঙ্গে দেখা হলে বেশ লাগে।'

'জানি না, তোর ভালো লাগে কি না, তবে আমার — লাগে।'

'ওঃ কী বলব ভাই!' পাভেল ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল। 'তুই যখন আমার নাগাল ধরলি তখন আমি এমন সব ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম যেগুলো এখন মনে না করাই ভালো!' হাত ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে ও হাত নাড়ল, চুপ করে গিয়ে আরও ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

পথে প্রথমেই যে সরাইখানাটা পাওয়া গেল ওরা তাতে ঢুকে পড়ল, সেখানে একটা কোনা বেছে নিয়ে বসে বীয়ার অর্ডার দিল। বাতির আলোয় ইলিয়া দেখতে পেল পাভেলের মুখটা রোগা আর লম্বাটে ধরনের হয়ে গেছে, তার চোখজোড়া অস্থির অস্থির, ঠোঁট দুটো আগে কেমন একটা বাঁকা হাসি লেগে থাকায় সামান্য ফাঁক হয়ে থাকত এখন আঁটসাঁট বোজা।

'তুই কোথায় কাজ করিস?' ইলিয়া ওকে জিজ্ঞেস করল।

'আবার সেই ছাপাখানায়ই,' পাভেল বিষণ্ণ সুরে বলল।

'কঠিন?'

'কাজটা নয় — দুশ্চিন্তা।'

এককালের ফুর্তিবাজ ও চটপটে ছেলে পাভেলকে মনমরা ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় দেখতে পেয়ে ইলিয়া কেমন যেন এক ধরনের আনন্দ অনুভব করল। তার জানতে ইচ্ছে করছিল পাভেলের এই পরিবর্তনের কারণ কী।

'কবিতা লিখিস এখনও?' পাভেলের গেলাসে বীয়ার ঢালতে ঢালতে সে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

'এখন ছেড়ে দিয়েছি, তবে আগে দেদার লিখতাম। ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম — প্রশংসা করলেন। একটা ত উনি কাগজেই ছাপিয়ে দিলেন।'

'আচ্ছা!' ইলিয়া অবাক হয়ে বলল। 'কী রকম কবিতা? বল না, শুনি!'

ইলিয়ার প্রবল আগ্রহ আর কয়েক গেলাস বীয়ার পাভেলকে উৎসাহিত করে তুলল। তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, তার হলদেটে গালের দুপাশে গোলাপী ছোপ ধরল।

'কী রকম?' হাত দিয়ে জোরে জোরে কপাল রগড়াতে রগড়াতে ও ইলিয়ার প্রশ্নের জের টেনে বলল। 'ভুলে গেছি। মাইরি বলছি, ভুলে গেছি! আচ্ছা দাঁড়া, মনে পড়লেও পড়তে পারে। চাকের ভেতরের মৌমাছির ঝাঁকের মতো ওগুলো আমার মাথার মধ্যে থাকে কিনা! — গুনগুন করে। মাঝে মাঝে এমন হয় যে লিখতে গিয়ে দারুণ ছটফটে হয়ে পড়ি। ভেতরে ভেতরে টগবগ করতে থাকি, চোখ বয়ে জল পড়ে, ইচ্ছে করে জিনিসটা জুত করে লিখি, কিন্তু কথা খুঁজে পাই না...' নিশ্বাস ফেলে, ঝট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সে যোগ করল, 'মনের মধ্যে সমস্তটা জমাট বেঁধে থাকে, অথচ কাগজে লিখতে গেলে — ফাঁকা...'

'তুই আমাকে যে কোন একটা বল না!' ইলিয়া অনুনয় করল। পাভেলের দিকে সে যতই তাকায় ততই তার কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে আর সেই কৌতূহলের সঙ্গে একটু একটু করে এসে মেশে সহানুভূতি ও বিষাদের ভাব।

'আমার লেখাগুলো শুনলে হাসি পাবে — আমি লিখি নিজের জীবনের কথা,' পাভেল বিব্রত হাসি হেসে বলল। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে চাপা গলায় বলতে লাগল:

রাত কাটে ঘোর যাতনায়!
চাঁদের কিরণ ঝলকায় জানালায়,
ঘষাকাচ ভেদ করে মধুর হাসির কণা
নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে ঘরের দেয়ালে
এঁকে চলে আপন খেয়ালে —
মৃদু নীল আলিপনা।
নির্বাক। বসে দেখি তাই।
আঁখিপাতা ভারী, তবু চোখে ঘুম নাই।

পাভেল থামল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এবারে আরও ধীরে ধীরে, আরও চাপা গলায় বলে চলল:

নিয়তি রুধিছে শ্বাস।
হৃদয়ে গভীর ক্ষত, দেহে নাগপাশ।
দয়িতার সঙ্গসুখ — তাও কেড়ে মোরে
রেখে দিল মদিরার ঘোরে।
সুরার বোতলখানি সমুখে আমার —
চন্দ্রালোকে আহা কি বাহার!
জুড়াব হৃদয়জ্বালা গাঢ় মদিরায়:
চেতনা বিলোপ পাবে ঘন কুয়াসায়,
নিদ্রা কিবা ভাবনার নাহি রবে রেশ।
ভাবি আরও এক পাত্র হলে হত বেশ!
করি পান। কেবা করে যদি ঘুম পায়?
তন্দ্রাসুখ টুটে মোর গেছে ভাবনায়।

বলা শেষ হতে পাভেল ইলিয়ার দিকে এক ঝলক তাকাল, এবারে মাথাটা আগের চেয়েও নীচু করল।

'ব্যস্, আমার প্রায় সব কবিতাই এ রকম,' চাপা গলায় পাভেল বলল। সে আঙুল দিয়ে টেবিলের কানা বাজাতে লাগল, অস্থির ভাবে চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে বসল।

ইলিয়া অবাক হয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে পাভেলের দিকে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার কানে তখনও বাজছিল সাজানো গোছানো

কথাগুলো, কিন্তু তার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছিল যে সেগুলো লিখেছে এই রোগা ছোকরাটা, যার চোখজোড়া ছটফটে, যার পরনে পুরনো, মোটা কাপড়ের শার্ট আর ভারী হাই বুট।

'বেড়ে হয়েছে ভাই, খুব একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার কিন্তু এটা নয়!' পাভেলের দিকে ভালো করে তাকাতে তাকাতে টেনে টেনে মৃদু স্বরে সে বলে উঠল। 'বেশ লাগল... একেবারে আমার মনের কথা — সত্যি বলছি! আচ্ছা, আরও একবার শোনা দেখি...'

পাভেল ঝট্ করে মাথা তুলল, চোখে খুশির ভাব নিয়ে শ্রোতার দিকে তাকাল। ওর আরও কাছে সরে এসে কোমল সুরে জিজ্ঞেস করল:

'সত্যি বলছিস — ভালো লাগছে?'

'কী আশ্চর্য! মিথ্যে বলব নাকি?'

পাভেল গলা নামিয়ে আচ্ছন্নের মতো আবৃত্তি করতে লাগল, মাঝে মাঝে গলা ধরে যেতে থেমে থেমে গভীর শ্বাস নিতে থাকে। ওর আবৃত্তি শেষ হয়ে যেতে পাভেল যে নিজে কবিতাটি লিখেছে এ ব্যাপারে ইলিয়ার সন্দেহ বেড়ে গেল।

'আর কী আছে? — শোনা দেখি,' ও অনুরোধ করল।

'আমি বরং খাতা নিয়ে তোর কাছে আসব'খন... আমার সবগুলোই বড় বড় কিনা... আমাকে এখন উঠতেও হচ্ছে। তা ছাড়া — ভালোমতো মনেও নেই ছাই। কেবল শেষ আর শুরুগুলো জিভের ডগায় ঘুরতে থাকে। শোন তাহলে, একটা কবিতা আছে — আমি যেন রাতের বেলায় বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলেছি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর ভয়ও লাগছে। আমি একা... আমি বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজছি, কাতর হয়ে বলছি:

বহে না চরণ আর,
হৃদয়ে দুরূহ ভার —
হায়, যত দূরে ধাই,
পথরেখা নাহি পাই!
জননী গো, বসুমতী,
বল কোথা তবে গতি?

বুকে তার গুঁজে মুখ
লভিলাম স্বর্গমুখ,
শুধালাম পেতে কান,
দেবে কোন সন্ধান?
গুঞ্জন শুনি, 'ওরে,
এইখানে লব তোরে!'

'শোন, ইলিয়া, আমার সঙ্গে চল, অ্যাঁ? যাবি? তোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না রে।'

পাভেল ছটফট করে উঠল, ইলিয়ার আস্তিন ধরে টান দিল, স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

'যাব!' ইলিয়া বলল। 'আমারও ইচ্ছে করছে না তোকে ছেড়ে দিতে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি ওগুলো তোর লেখা বলে আমার যেমন বিশ্বাস হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। তুই বেশ মজার! কবিতা তোর বেশ আসে।'

'আমার বলে বিশ্বাস করিস না বুঝি?'

'যদি সত্যিই তোর হয় তাহলে তোকে সাবাস বলতে হবে!' ইলিয়া আন্তরিকতার সঙ্গে বলল।

'আমি ভাই আরেকটু শিখে নিই না, অ্যায়সা লেখা লিখব না — দেখিস তখন!'

'চালিয়ে যা!'

'ওঃ ইলিয়া! যদি আরও জ্ঞান থাকত আমার!..'

ওরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাস্তায় চলল, চলতে চলতে চটপট এ ওর কথার পিঠে কথা ছুঁড়তে লাগল, উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হতে হতে ওরা ক্রমেই একে অন্যের আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। দুজনেরই এই ভেবে আনন্দ হল যে ওদের দুজনের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে মিল আছে আর এই আনন্দে তারা আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ল। পেঁজা বরফ তখন ঘন হয়ে পড়ছিল, তাদের মুখের ওপর ঝরে ঝরে গলে যাচ্ছিল, পোশাকের ওপর পড়ে পড়ে জমছিল, জুতোয় পড়ে আটকে যাচ্ছিল, ফুটন্ত খুদকণার মতো ওদের চার দিকে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল।

'ধুস শালা!' কাদা আর বরফে ভর্তি এক গর্তে হোঁচট খেতে ইলিয়া মুখ খারাপ করল।

'একটু বাঁ ধার ঘেঁসে চল।'

'কোথায় চলেছি?'

'সিদোরিখার কাছে — জানিস?'

'জানি,' একটু থেমে ইলিয়া উত্তর দিল, তারপর হেসে উঠে বলল, 'বলতে গেলে, ভাই, আমাদের একই পথ।'

'ওঃ!' পাভেল শান্ত স্বরে বলল, 'বুঝলাম! কিন্তু ওখানে আমার যাওয়া দরকার — কাজ আছে। তোকে বলব ইলিয়া! যদিও ব্যাপারটা বলতে গেলে দুঃখ লাগে...'

পাভেল সশব্দে থুতু ফেলল।

'বুঝলি, ওখানে একটা মেয়ে আছে। দেখলেই বুঝবি কেমন। বুকে একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আমাকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করেন ও ছিল তাঁর ঝি। সেরে ওঠার পর আমি ডাক্তারবাবুর কাছে বই আনতে যেতাম। ডাক্তারবাবুর বাড়ি আসতাম, বসতাম। আর মেয়েটা এদিকে লাফায়, হাসে। আমি ওর দিকে ঝুঁকলাম। সোজাসুজি কোন রকম কথাবার্তা ছাড়াই সে ঢলে পড়ল। আমাদের ব্যাপার জমে উঠল। আকাশে যেন আগুন খেলে গেল। আমি তার দিকে উড়ে যাই যেমন পোকা যায় আগুনের দিকে। চুমো খেতে খেতে ঠোঁট ফুলে ঢোল, হাড়গোড় মড়মড় করে ওঠে — ওঃ! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সে, ছোটখাটো, যেন খেলার জিনিস — জড়িয়ে ধরলি — মনে হয় যেন নেই! যেন পাখি হয়ে আমার বুকের ভেতরে উড়ে এলো, আর সেখানে গান গাইছে ত গাইছেই।'

ও চুপ করে গেল, লোভীর মতো মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা সুরুৎ আওয়াজ করল।

'তারপর?' ওর গল্পে মুগ্ধ ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'ডাক্তারের বৌ আমাদের ধরে ফেলল। জাহান্নামে যাক! মহিলা অমনিতে ভালো, তবে যত নষ্টের গোড়া! আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তাও বলত। বেশ ভালোই বলা চলে, সুন্দরী, কিন্তু হতচ্ছাড়ী ডাইনী!'

'তারপর?' ইলিয়া আবার বলল।

'তারপর আবার কী? — ঢিঢি পড়ে গেল। ভেরাকে তাড়িয়ে দিল...

গালাগালের একশেষ। আমাকেও বাদ দিল না। ভেরা আমার কাছে চলে এলো। আমার তখন কাজ ছিল না। ভাঁড়ে কানাকড়িও নেই। তবে মেয়েটার হিম্মৎ আছে বটে! পালিয়ে গেল। সপ্তাহ দুয়েক কোন পাত্তা নেই। তারপর যখন এলো তখন গায়ে হাল ফ্যাশনের পোশাক, ব্রেসলেট... টাকা-পয়সা... কিছু বাদ নেই।'

পাভেল দাঁত কড়মড় করে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'দিলাম ওকে ধোলাই, জোর ধোলাই...'

'পালিয়ে গেল?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'উঁহু। পালিয়ে গেলে ত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতাম। বলে, হয় আমাকে মেরে ফেল, নয়ত গায়ে হাত দিও না। বলে, আমি তোমার ঘাড়ের বোঝা... কিন্তু এ মন আর অন্য কাউকে দিচ্ছি না।'

'আর তুই কী করলি?'

'আমি যা করার সব রকমই করলাম — ওর ওপর মারধোর করলাম, কাঁদলামও। আর কী করতে পারি? খাওয়াব যে সে সামর্থ্য ত আর নেই।'

'কিন্তু ও কি কাজ করতে চায় না?'

'সে কথা ওকে কে বলে! বলে, এই ভালো! তা নয়ত বাচ্চা-কাচ্চা হবে, তাদের নিয়ে আরেক হাঙ্গামা। আর এতে সব দিকই পুরো বজায় থাকছে, সব তোমার, বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলাও রইল না।'

ইলিয়া একটু ভেবে বলল:

'বুদ্ধি আছে বটে!'

পাভেল চুপ করে রইল, সে বরফে ঢাকা অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি পা ফেলে ফেলে চলতে লাগল। বন্ধুর থেকে তিন পাখানেক এগিয়ে গেছে, এমন সময় থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরল।

'যেই মনে হয় অন্যেরা ওকে চুমো খাচ্ছে আমার বুকের ভেতর কে যেন গলানো সীসা ঢেলে দেয়,' ও শুকনো গলায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করল।

'ওকে ছাড়তে পারিস না?'

'ওকে?' পাভেল অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

মেয়েটাকে দেখার পর ইলিয়া ওর অবাক হওয়ার কারণ বুঝতে পারল।

ওরা শহরের শেষ সীমানায় একটা একতলা বাড়ির সামনে এলো। বাড়ির ছয়টা জানলার খড়খড়ি একেবারে আঁটসাঁট বন্ধ, ফলে তার চেহারা হয়েছে

একটা লম্বা গোলাবাড়ির মতো। ভিজে বরফ ঘন হয়ে তার দেয়াল ও ছাদ লেপে দিয়েছে, যেন বাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলার মতলব করছে।

পাভেল গেটে ধাক্কা মারতে মারতে ইলিয়াকে বলল:

'এটা একটা বিশেষ ধরনের বাড়ি। সিদোরিখা মেয়েদের ঘর দেয়, খাওয়া দেয়, তার জন্যে প্রত্যেকের কাছ থেকে নেয় পঞ্চাশ রুবল করে। আছে মাত্র চারটি মেয়ে। তা ছাড়া সিদোরিখা বিক্রির জন্যে মদটা, বীয়ারটা, মিঠাই-টিঠাইও রাখে। তবে মেয়েদের ওপর কোন রকম চাপ দেয় না — ইচ্ছে হয় — ঘুরে বেড়াও, ইচ্ছে হয় ত বাড়িতে বসে থাক, কেবল মাসে মাসে পঞ্চাশ রুবল ঠেকালেই হল। মেয়েদের দাম আছে — এ টাকা ওরা সহজেই পেয়ে যায়। এখানে একজন আছে — অলিম্পিয়াদা — পঁচিশ রুবলের কমে তাকে পাওয়া যায় না।'

'তোরটার দাম কত?' ইলিয়া পোশাক থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করল।

'জানি না — ওরও দাম অনেক,' পাভেল একটু চুপ করে থেকে মিনমিন করে জবাব দিল।

দরজার ওপাশে একটা আওয়াজ উঠল। বাতাসে আলোর সোনালি সুতো কাঁপছে।

'কে ওখানে?'

'আমি, ভাস্সা সিদরভ্না, আমি — গ্রাচোভ।'

'অ!' দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়াল ছোটখাটো চেহারার কাঠ কাঠ গড়নের এক বুড়ি, তার লোলচর্ম মুখের ওপর নাকটা বিরাট। সে হাতের মোমবাতিটা তুলতে পাভেলের মুখে আলো পড়ল। গদগদ সুরে বুড়ি বলল, 'এই যে। এদিকে ভেরা ত হেদিয়ে গেল, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। তোর সঙ্গে এটা কে রে?'

'বন্ধু।'

'কে এলো?' অন্ধকার টানা বারান্দার মধ্যে কোথা থেকে কার যেন সুরেলা গলা ভেসে এলো।

'ভেরার কাছে এসেছে রে অলিম্পিয়াদা,' বুড়ি বলল।

'ভেরা, তোর!' ঐ একই সুরেলা গলা বারান্দায় ফাঁপা ফাঁপা আওয়াজ তুলল।

এই সময় বারান্দার গভীরে একটা কোনায় দরজা তাড়াতাড়ি হাঁ হয়ে খুলে গেল। অনেকখানি আলোর দাগের মধ্যে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ের ছোট মূর্তি, তার সর্বাঙ্গে সাদা পোশাক, ঘন সোনালি চুলের গোছা তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

'এত দেরি!' খিটখিটে আদুরে গলায় সে টেনে টেনে বলল। তারপর পাভেলের কাঁধে দুহাত দিয়ে পায়ের চেটোয় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল, খয়েরি রঙের চোখজোড়া তুলে ইলিয়ার দিকে তাকাল।

'এ হল আমার বন্ধু — ইলিয়া লুনিয়োভ।'

'নমস্কার!'

মেয়েটি ইলিয়ার দিকে হাত বাড়াল তার সাদা ব্লাউজের চওড়া হাতা প্রায় কাঁধ অবধি উঠে গেল। ইলিয়া চিনীতভাবে আলতো করে তার উষ্ণ হাতের সঙ্গে হাত মেলাল। গভীর বনের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছপালা আর জলায় ঘেরা উঁচু জায়গার মাঝখানে একটা ছিমছাম বার্চগাছ দেখতে পেলে মনে যেমন আনন্দ হয় সে রকম দৃষ্টিতে সে পাভেলের বান্ধবীর দিকে তাকাল। মেয়েটি যখন ওকে ঘরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল তখন সেও পাশে সরে গিয়ে সবিনয়ে বলল:

'আপনি আগে!'

'ওঃ, কী ভদ্র!' হাসতে হাসতে ও বলল। ওর হাসিটাও চমৎকার — ফুর্তির হাসি, স্পষ্ট হাসি। পাভেলও হাসল, বলল:

'ছোকরার মুণ্ডুটা তুমি ঘুরিয়ে দিয়েছ ভেরা। দেখ, দেখ, মধুর সামনে ভালুকের মতো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'সত্যি নাকি?' খুশির সুরে মেয়েটি ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

'সত্যি!' ইলিয়া হেসে সায় দিল। 'আপনার সুন্দর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়ে চলছি।'

'একবার প্রেমে পড়ে দ্যাখ! কেটে ফেলব না!..' পাভেল উল্লাসে হাসতে হাসতে হুমকি দিয়ে বলল। ওর প্রণয়িনীর সৌন্দর্য ইলিয়াকে মুগ্ধ করেছে দেখে ওর আনন্দ হচ্ছিল, গর্বে ওর চোখজোড়া ঝকঝক করে উঠল। এদিকে নারীর শক্তি সম্পর্কে সচেতন মেয়েটিও কোন রকম লজ্জাশরমের বালাই না রেখে সরল ভাবে নিজেকে জাহির করছে। তার পরনে স্কার্টের ওপর ছিল ঢিলে ব্লাউজ, ঘাগরাটা ধপধপে সাদা। ব্লাউজের বোতাম খোলা, হাঁ হয়ে বেরিয়ে

আছে কচি নিটোল শালগমের মতো শরীর। ছোটখাটো মুখের ওপর গাঢ় গোলাপী রঙের ঠোঁটজোড়া আত্মতৃপ্তির হাসিতে একটু একটু কাঁপছে; খেলনায় শিশুর ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত যেমন অবস্থা হয় তেমনি ভাবে মেয়েটি নিজেই নিজেতে মোহিত। ইলিয়া আর চোখ ফেরাতে পারে না, চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল কেমন চপল ভঙ্গিতে, নাকটা সামান্য উঁচিয়ে সে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে, পাভেলের দিকে সোহাগ ভরে তাকাচ্ছে, হাসতে হাসতে কথা বলছে। তার নিজের যে এমন বান্ধবী নেই একথা ভেবে ইলিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল।

ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ঘরটার মাঝখানে সাদা চাদরে ঢাকা একটা টেবিল, টেবিলের ওপর সোঁসোঁ আওয়াজ তুলছে সামোভার, চার দিকের সব কিছুই তাজা, যৌবনের ছোঁয়া লাগা। কাপ, মদের বোতল, প্লেটে সসেজ ও রুটি — সবই ইলিয়ার ভালো লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগিয়ে তুলল পাভেলের প্রতি ঈর্ষা। পাভেল খোশমেজাজে বসে ছিল, গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলে যাচ্ছিল:

'তোমাকে দেখলেই যেন রোদের তাপ পাই, সব কিছু ভুলে যাই, সুখের আশায় থাকি। তোমার মতো সুন্দরীকে ভালোবেসে বাঁচা সার্থক, তোমাকে দেখেও সুখ।'

'পাভেল! আঃ কী ভালো লাগছে!' ভেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

'গরম! একেবারে হাতে গরম! অ্যাই ইলিয়া! ঝিম মেরে থাকিস না। তুইও কাউকে খুঁজে বার কর।'

'হ্যাঁ — ভালো দেখে!' ইলিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের নতুন এক সুরে বলল।

'ভগবানেরও সাধ্যি নেই আপনার চেয়ে ভালো জুটিয়ে দেন!' ইলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে বলল।

'যা জানেন না তা বলবেন না,' ভেরা মৃদু স্বরে বলল।

'ও জানে,' পাভেল ভুরু কুঁচকে বলল, তারপর ইলিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'বুঝলি কিনা — সবই ভালো, আনন্দের, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় — বুকটা কেটে ফালা ফালা হয়ে যায়!'

'ও সব মনে না করলেই হল,' মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে ভেরা বলল। ইলিয়া তাকিয়ে দেখল ওর কান লাল হয়ে গেছে।

'তুমি বরং অন্য রকম করে ভাব,' মেয়েটি শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে

চলল, 'ভাব না কেন, অন্তত একটা দিনও আমার!.. আমারই কি জীবন সহজ? ঐ যে গান আছে না — দুখের গান একাই গাই, সুখের ভাগ তোমায় দিই — আমার অবস্থাটা হল সেই রকম।'

ওর কথা শুনতে শুনতে পাভেল ভুরু কোঁচকাতে লাগল। ইলিয়ার ইচ্ছে হল এদের কিছু একটা ভালো কথা বলে, এমন কিছু বলে যাতে ওদের মনটা চাঙ্গা হয়।

'গেরো যখন খোলা যাবে না তখন আর কী করা?' ইলিয়া একটু ভেবে বলল। 'তবে আমি তোমাদের দুজনকেই বলি, আমার হাজার রুবল থাকলে তোমাদের দিতাম। বলতাম, এই নাও, তোমাদের ভালোবাসার খাতিরে দিচ্ছি, দয়া করে নাও। কেননা, আমি মনে মনে বুঝতে পাচ্ছি, তোমাদের টান — প্রাণের টান, তোমাদের ভালোবাসার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, আর সব ব্যাপারের তোয়াক্কা না করলেই হল।'

ওর মধ্যে কী যেন দপ্ করে উঠল, একটা তীব্র আবেগের ঢেউ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মেয়েটি মাথা তুলে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে আর পাভেলও তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে এবং তার কাছ থেকে আরও কিছুর অপেক্ষা করছে দেখে উত্তেজনায় ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি জীবনে এই প্রথম দেখছি একজন মানুষ অন্য জনকে কেমন ভালোবাসে। আর পাভেল, তোর আসল দাম আজ মর্মে মর্মে — যতখানি হতে পারে, বুঝতে পারলাম! এই এখানে বসেই সোজাসুজি বলছি — হিংসে হয়। অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে আমি যা বলি শোন: চুভাশিয়া আর মর্দোভিয়ার লোকদের আমি পছন্দ করি না, দুচক্ষে দেখতে পারি না! পিঁচুটিতে ভরা ওদের চোখ। অথচ ওদের সঙ্গে একই নদীতে স্নান করতে হয়, ঐ একই নদীর জল খাই। ওদের জন্যে কি তাই বলে নদীই ছেড়ে দেব? আমার বিশ্বাস — ভগবান নদী শুদ্ধ করেন।'

'ঠিক বলেছিস ইলিয়া! সাবাস!' পাভেল সোৎসাহে চেঁচিয়ে বলল।

'আপনি বরং ঝরনার জল খেলেই পারেন,' মৃদু স্বরে ভেরা বলল।

'না, বরং একটু চা ঢালুন আমার জন্যে!' ইলিয়া বলল।

'ওঃ কী দারুণ লোক আপনি!' মেয়েটি সহর্ষে বলে উঠল।

'অনেক ধন্যবাদ!' ইলিয়া গম্ভীর ভাবে জবাব দিল।

এই ছোট্ট দৃশ্যটি পাভেলের ওপর মদের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

তার প্রাণচঞ্চল মুখে গোলাপী আভা দেখা দিল, চোখ দুটো উৎসাহে ঝকঝক করতে লাগল। ও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঘরময় ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'ওঃ কী যে বলব! শিশুর মতো সরল মানুষ যখন দেখা যায় তখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে কী ভালোই যে লাগে! ইলিয়া, তোকে এখানে আনায় আমার মনটা বড় খুশি হয়ে উঠল। একটু মদ খাওয়া যাক ভাই!'

'আমোদে মেতে উঠল!' মেয়েটি সস্নেহে হেসে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তারপর ইলিয়াকে উদ্দেশ করে বলল, 'ও সব সময়ই এ রকম — এই উৎসাহে জ্বলে ওঠে আবার এই কেমন ম্যাড়মেড়ে, মনমরা আর রাগী রাগী হয়ে ওঠে।'

দরজায় টোকা পড়ল।

'ভেরা, আসতে পারি?' কে যেন জিজ্ঞেস করল।

'আয়, আয়! এ হল ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্, আর এ — অলিম্পিয়াদা — লিপা, আমার বান্ধবী।'

ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে ফিরে তাকাল: ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা, সুঠাম গড়নের মেয়েমানুষ, তার শান্ত নীল চোখ দুটি ইলিয়ার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। তার পোশাক থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সেণ্টের গন্ধ, গাল দুটোতে সতেজ ভাব, গোলাপী আভা, মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা কালো চুলের গোছা তার আকৃতিকে আরও উন্নত ও দীর্ঘ করে তুলছে।

'এদিকে আমি একা একা বসে আছি — একঘেয়ে লাগছে। শুনতে পাচ্ছি তোর এখানে হাসাহাসি হচ্ছে, তাই চলে এলাম। কিছু মনে করলি না ত? এখানে দেখছি নাগরী ছাড়া এক নাগর বসে আছে। ওকে ফাঁদে ফেলব — দেখবে তোমরা?'

সে হিল্লোলিত ভঙ্গিতে চেয়ারটা ইলিয়ার কাছে সরিয়ে নিয়ে এসে বসল।

'ওদের এখানে বসে বসে আপনার বেজার লাগছে — বলুন সত্যি কি না? ওরা এখানে প্রেম করছে, আপনার হিংসে হচ্ছে -- তাই না?'

'ওদের সঙ্গে আমার বেজার লাগছে না,' মেয়েমানুষটির ঘনিষ্ঠতায় বিব্রত হয়ে ইলিয়া বলল।

'দুঃখের কথা!' শান্ত স্বরে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সে ইলিয়ার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভেরার উদ্দেশে বলল, 'জানিস গতকাল ভজনের সময়

আশ্রমে গিয়েছিলাম, এমন এক সন্ন্যাসিনীকে দেখলাম যে কী বলব — আঃ! অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে... দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর ভাবি এ কী করতে আশ্রমে এলো? ওর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল...'

'আমি হলে মোটেই দুঃখ করতাম না,' ভেরা বলল।

'হুঃ, কী যে বলিস! বললেই বিশ্বাস করব আর কি...'

অলিম্পিয়াদার চার দিকে বাতাসে ভুরভুর করছে সেন্টের মিষ্টি গন্ধ, ইলিয়া তাতে নিশ্বাস নিতে লাগল, সে আড়চোখে তাকে দেখতে দেখতে তার কণ্ঠস্বর মন দিয়ে শুনতে লাগল। কথা বলছে সে অপূর্ব শান্ত স্বরে, টানা টানা, তার কণ্ঠস্বরে ঘুমপাড়ানি যাদু ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন তার কথায়ও আছে মধুর ও গভীর ঘ্রাণ...

'বুঝলি ভেরা, আমি খালি ভাবি — পলুএক্‌তভের সঙ্গে ঝুলে পড়ি, না কী করি বল ত?'

'আমি জানি না...'

'হয়ত ঝুলেই পড়ব। লোকটা বুড়ো — বড়লোক। তবে — লোভী। আমি ওকে বলছি ব্যাঙ্কে আমার নামে পাঁচ হাজার জমা রাখতে আর মাসে মাসে দেড়শ' করে দিতে, ও তিন হাজার আর একশ'র বেশিতে রাজী হচ্ছে না।'

'লিপা! এ সব কথা এখন বলিস না,' ভেরা অনুনয় করল।

'ঠিক আছে, বলব না!' শান্ত স্বরে অলিম্পিয়াদা বলল, তারপর ইলিয়ার দিকে আবার মুখ ফেরাল। 'এই যে ইয়ং ম্যান, আসুন একটু কথাবার্তা বলা যাক। আপনাকে আমার মনে ধরেছে। আপনার মুখটা সুন্দর, চোখে বেশ একটা সৌম্য ভাব আছে। আপনি কী বলেন এর জবাবে?'

'কিছুই বলি না,' বিব্রত ভাবে হেসে ইলিয়া জবাব দিল। সে অনুভব করছিল যে এই মেয়েমানুষটি মেঘের কুণ্ডলীর মতো তাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরছে।

'কিছুই না? আপনি বড় বেরসিক ত? আপনি কী করেন!'

'আমি একজন হকার।'

'আ-চ্ছা? আমি ভাবলাম বুঝি ব্যাঙ্কের কর্মচারী কিংবা ভালো কোন দোকানের কর্মচারী-টর্মচারী হবেন। আপনি বেশ পরিপাটি।'

'আমি পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসি,' ইলিয়া বলল। ওর অস্বস্তিকর গরম বোধ হল, সেন্টের গন্ধে ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

'পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন? এ ত ভালো কথা। কিন্তু আপনার কি কোন কিছু আন্দাজ করার ক্ষমতা আছে?'

'তার মানে?'

'আপনি কি আন্দাজ করতে পারছেন না যে বন্ধুকে বিরক্ত করছেন?' নীল চোখওয়ালা মেয়েমানুষটি কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি!' ইলিয়া থতমত খেয়ে বলল।

'ভেরা ওকে আমি বাগিয়ে নিয়ে যেতে পারি?'

'যদি যায় ত নিয়ে যা না!' ভেরা হাসতে হাসতে বলল।

'কোথায়?' ইলিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আরে তুই যা না বাপু, বুদ্ধু কোথাকার!' পাভেল চেঁচিয়ে বলল।

ইলিয়া আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, বোকার মতো হাসছিল। এদিকে অলিম্পিয়াদা এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল, শান্ত স্বরে বলতে লাগল:

'আপনি বুনো ধরনের, আমিও খামখেয়ালি আর একরোখা। যদি মাথায় খেলে সূর্য নিভিয়ে দেব তাহলে ছাদে উঠে তার দিকে ফুঁ দিতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ নিশ্বাস থাকবে। বুঝলেন ত আমি কেমন?'

ইলিয়া ওর হাতে হাত ধরে চলল, সে ওর কথা বুঝতে পারছিল না, প্রায় শুনতেই পাচ্ছিল না, কেবল অনুভব করছিল ওর উষ্ণতা, কোমলতা, ওর শরীরের ঘ্রাণ...

এই অপ্রত্যাশিত খেয়ালি বন্ধনে ইলিয়া পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ল, তার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল একটা আত্মতৃপ্তির অনুভূতি এবং জীবন তার হৃদয়ে যে আঘাত হেনেছে তার ক্ষত যেন সারিয়ে তুলল। পরিপাটি পোশাক পরনে এক সুন্দরী নারী, নিজে থেকে, ইচ্ছে করে মহার্ঘ চুম্বন তাকে দান করছে কিন্তু প্রতিদানে কিছুই চাইছে না — এই অনুভূতি তাকে নিজের চোখের সামনে বড় করে তুলল। তার মনে হল সে যেন এক প্রশস্ত নদীর বুকে শান্ত তরঙ্গের মধ্যে ভেসে চলছে, তরঙ্গভঙ্গ সোহাগভরে তার শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

'আমার আদুরে!' ইলিয়ার কোঁকড়ানো চুল নিয়ে খেলতে খেলতে কিংবা ওর ওপরের ঠোঁটের কালো রোঁয়ার ওপর আঙুল বুলাতে বুলাতে অলিম্পিয়াদা বলত। 'তোমাকে আমার ক্রমেই বেশি করে ভালো লাগছে। তোমার বুকে বল

আছে, বুকের পাটা আছে, আমি দেখছি, তুমি যদি কিছু চাও তা আদায় না করে ছাড়বে না। আমার স্বভাবও তাই। আমার বয়সটা একটু কম হলে তোমাকে বিয়ে করতাম। তাহলে দুজনে মিলে গানের সুরের মতো জীবনটা হেসে খেলে কাটাতে পারতাম...'

অলিম্পিয়াদা সম্পর্কে ইলিয়ার মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল: ইলিয়ার মনে হত সে বুদ্ধিমতী, ন্যক্কারজনক জীবনযাপন করা সত্ত্বেও আত্মসম্মান বোধ তার ছিল। নিজের ঐ কচি গলার মতোই নরম ও নিটোল আর নিজের চরিত্রের মতোই ছিমছাম ছিল তার শরীর। ওর যত্ন, পরিচ্ছন্নতাবোধ, সব বিষয়ে কথা বলার দক্ষতা এবং সকলের সঙ্গেই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, এমনকি মাথা উ'চু করে চলার ক্ষমতা ইলিয়ার ভালো লাগত। কিন্তু মাঝে মাঝে ইলিয়া তার কাছে এলে যখন দেখতে পেত যে সে বিছানায় পড়ে আছে, তার চুল এলোমেলো হয়ে লুটাচ্ছে তখন মনের মধ্যে এই মেয়েমানুষটার প্রতি বিতৃষ্ণা জেগে উঠত, সে তার ঘোলাটে ম্যাড়মেড়ে চোখের দিকে চুপচাপ কটমট করে তাকাত, তাকে ডেকে সম্ভাষণ জানানোর পর্যন্ত ইচ্ছে হত না।

ইলিয়ার অনুভূতি আঁচ করতে পেরেই যেন সে কম্বলটা গায়ে জড়াতে জড়াতে ওকে বলত:

'এখান থেকে যাও! ভেরার ওখানে গিয়ে বস। বুড়িকে বল জল আর বরফ দিতে।'

সে পাভেলের বান্ধবীর পরিপাটি ঘরে চলে যেত। ওর গোমড়া মুখ দেখে ভেরা কাচুমাচু হয়ে হাসত। এক দিন ভেরা জিজ্ঞেস করল:

'আমাদের বোনটা পচে গেল নাকি?'

'ওঃ ভেরা!' ইলিয়া জবাব দিল। 'আপনার পাপ — যেন বরফের স্তূপ। হাসলেন — গলে গেল।'

'বেচারি! — যেমন পাভেল, তেমনি আপনি,' ভেরা দুঃখ করে বলল।

ভেরাকে ও ভালোবাসত, তার জন্য ওর দুঃখ হত, পাভেলের সঙ্গে তার ঝগড়া হলে ও অস্থির হয়ে পড়ত, তাদের মধ্যে মিটমাট করে দিত। ইলিয়ার ভালো লাগত ওর কাছে বসতে, ওকে দেখতে যখন ও নিজের সোনালি রঙের চুল আঁচড়াত কিংবা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কোন কিছু সেলাই করত। ঐ সব মুহূর্তে মেয়েটিকে ইলিয়ার আরও বেশি করে ভালো লাগত,

সে আরও তীব্র ভাবে অনুভব করত তার দুঃখ এবং যতটা পারা যায় তাকে সান্ত্বনা দিত।

ভেরা ওকে বলত:

'এ ভাবে চলা উচিত নয়, চলা উচিত নয়, ইলিয়া ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌। আমার কলঙ্ক কোন মতেই ঘুচবার নয়, কিন্তু পাভেল, পাভেল কেন আমার সঙ্গে থেকে নষ্ট হচ্ছে ?'

অলিম্পিয়াদার আবির্ভাবে ওদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ত। নীল রঙের চওড়া ড্রেসিং গাউনে তাকে দেখাত চাঁদের ঠাণ্ডা আলোর মতো। সে নিঃশব্দে এসে হাজির হত।

'চল গো আদুরে, চা খেতে চল! পরে তুইও আয়, ভেরা।'

ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টায় এখন সে হয়ে উঠেছে গোলাপী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাকে দেখাচ্ছে নিটোল ও শান্ত। সে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে ইলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যায়, ইলিয়া তার পেছন পেছন চলতে চলতে ভাবতে থাকে এক ঘণ্টা আগে নোংরা হাতে দোমড়ানো অবস্থায় যাকে দেখেছিল এ কি সেই?

চা খেতে খেতে অলিম্পিয়াদা ওকে বলত:

'দুঃখের বিষয় এই যে লেখাপড়া তুমি বিশেষ কর নি। হকারের কাজ ছেড়ে অন্য কিছু একটা ধরতে হয়। দাঁড়াও, আমি তোমার কাজ জুটিয়ে দেব। তোমার একটা হিল্লে করা দরকার। পলুএক্‌তভের কাছে বহাল হলেই করতে পারব।'

'কী — পাঁচ হাজার দিচ্ছে নাকি?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'দেবে!' অলিম্পিয়াদা জোরের সঙ্গে উত্তর দিল।

'তবে বলে দিচ্ছি, ওকে যদি কোন দিন মুখোমুখি পাই তাহলে মুণ্ডুটা খসিয়ে দেব!..' ইলিয়া বিতৃষ্ণায় জ্বলে উঠে বলল।

'রসো, টাকাটা আগে হাতে আসুক,' বলে ও হাসল।

ও যা যা চেয়েছিল ব্যবসায়ী তার কোনটাই দিতে বাকি রাখল না। কিছু দিন পরেই অলিম্পিয়াদার নতুন কামরায় বসে বসে ইলিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল মেঝের ওপর পাতা পুরু গালিচা, কালো রঙের ভেলভেটে ঢাকা আসবাবপত্র আর চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল তার প্রণয়িনীর মুখের কথা। পরিবেশের পরিবর্তনে অলিম্পিয়াদার মধ্যে বিশেষ কোন তৃপ্তির ভাব ইলিয়া দেখতে পেল না: বরাবরের মতোই সে শান্ত ও অবিচলিত।

'আমার বয়স সাতাশ, তিরিশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমার দশ হাজার রুবল হবে। তখন বুড়োটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব — আমি ওর হাত থেকে মুক্তি পাব। ওহে গুরুগম্ভীর আদুরে আমার, কী করে বাঁচতে হয়, আমার কাছ থেকে শেখ।'

ইলিয়া ওর কাছ থেকে শিখল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই অদম্য দৃঢ়তা। তবে এই রমণীটি যে তার সোহাগ অন্য একজনকে দিচ্ছে একথা ভেবে মাঝে মাঝে তার মনে ব্যথা লাগত, সে নিজেকে অপমানিত বোধ করত। তখন তার সামনে বিশেষ করে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত একটা দোকান দেওয়ার স্বপ্ন, এমন একটা পরিচ্ছন্ন ঘরের স্বপ্ন, যেখানে সে এই রমণীকে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। ইলিয়া নিশ্চিত নয় যে সে অলিম্পিয়াদাকে ভালোবাসে কি না, তবে এটা ঠিক যে অলিম্পিয়াদাকে ছাড়া তার চলবে না। এই ভাবে মাস তিনেক কেটে গেল।

একদিন ফিরি করার পর বাড়িতে এসে ইলিয়া মাটির নীচের ঘরে মুচির কাছে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল যে এক বোতল ভোদকা নিয়ে টেবিলের পাশে হাসি হাসি মুখ করে বসে আছে পেরফিশ্‌কা আর তার মুখোমুখি — ইয়াকভ্‌। টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ইয়াকভ্‌ মাথা নাড়াচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে:

'ভগবান যদি সব দেখেন, তাহলে তিনি আমাকেও দেখছেন... বাবা আমাকে ভালোবাসে না, বাবা — একটা বাটপাড়! ঠিক কি না?'

'ঠিক কথা, ইয়াকভ্‌! বলতে ভালো শোনায় না, কিন্তু কথাটা ঠিকই!' মুচি বলল।

'তাহলে আমি এখন কী করি?' এলোমেলো চুলভর্তি মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইয়াকভ্‌ অনেক কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল।

ইলিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল, তার বুকের ভেতরে একটা অস্বস্তির অনুভূতি মোচড় দিয়ে উঠল। সে দেখতে পেল ইয়াকভের লিকলিকে ঘাড়ের ওপর বিরাট মাথা অসহায়ের মতো এদিক ওদিক দুলছে, দেখতে পেল স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত পেরফিশ্‌কার হলদেটে শুকনো মুখ, তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সে চোখের সামনে সত্যি সত্যিই দেখছে ইয়াকভ্‌কে — তার পরিচিত সেই বিনীত ও শান্ত ইয়াকভ্‌কে। সে ইয়াকভের কাছে এগিয়ে গেল।

'এখানে তুই কী করছিস রে?'

ইয়াকভ্ চমকে উঠল, ভয়ার্ত দুচোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকাল।

'আমি ভাবলাম বাবা বুঝি...' ইয়াকভ্ বাঁকা হেসে বলল।

'তুই কী করছিস, অ্যাঁ?' ইলিয়া আবার জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ওকে ছেড়ে দাও, ইলিয়া ইয়াকভ্‌লিচ্,' পেরফিশ্‌কা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে বলল। 'ও এক দিক থেকে ঠিকই করছে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে কেবল মদের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে...'

'ইলিয়া!' ইয়াকভ্ একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে উঠল। 'বাবা আমাকে মেরেছে!'

'ঠিকই বলেছে। আমি তার সাক্ষী,' পেরফিশ্‌কা নিজের বুকে ঘুসি মেরে জানাল। 'আমি সব দেখেছি — হলফ করে বলছি!'

ইয়াকভের মুখ সত্যি সত্যিই ফুলে গেছে, ওপরের ঠোঁটটা ফুলে ঢোল। বিষণ্ণ হাসি হেসে সে বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

'আমাকে মারার কী কারণ থাকতে পারে বল?' সে ওকে বলল।

ইলিয়া বুঝতে পারল বন্ধুকে সে সান্ত্বনা দিতে পারে না, তাকে দোষও দিতে পারে না।

'তোকে মারল কেন রে?'

ইয়াকভের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, সে কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না, দুহাতে মাথা আঁকড়ে ধরে হাউমাউ করে উঠল, তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। পেরফিশ্‌কা নিজের গেলাসে ভোদকা ঢালতে ঢালতে বলল:

'ওকে কাঁদতে দাও। মানুষ যখন কাঁদতে পারে তখন ভালোই বলতে হবে... মাশাও... কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চেঁচায় — বলে, আঁচড়ে চোখ ফালা ফালা করে দেব! আমি ওকে মাতিৎসার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।'

'বাপের সঙ্গে ইয়াকভের কী হয়েছে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'খুবই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল। তোর খুড়ো গাওনা ধরল। দুম্ করে বলে বসল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, কিয়েভে সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে যেতে চাই!..' সত্যি কথা বলতে গেলে কী, পেত্রুখা খুবই খুশি — তেরেন্‌তি চলে যাচ্ছে বলে সে খুশি। বন্ধু অনেক সময়ই অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়! সে বলল, 'তা যাও, আমার হয়েও সাধুদের কাছে একটু প্রার্থনা করো।' ইয়াকভ্ ধরে বসল, 'আমিও যাব...''

এ পর্যন্ত বলে পেরফিশ্‌কা চোখ বড় বড় করল, তার মুখের ভঙ্গি বিকৃত হয়ে উঠল, সে ভাঙ্গা গলায় টেনে টেনে বলল:

“কী-ই-ই?’ পেত্রুখা বলল। — ‘আমাকেও সাধুদের কাছে যেতে দাও!’ — ‘তার মানে?’ — ‘তোমার হয়ে ওঁদের কাছে প্রার্থনা করব…’ পেত্রুখা সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল, ‘তোর প্রার্থনা করা আমি বার করছি!’ কিন্তু ইয়াকভ্ গোঁ ধরে বসে রইল, ‘যাব!’ ব্যস, আর যায় কোথায়, পেত্রুখা ওর মুখের ওপর দুম্ করে এক ঘা বসিয়ে দিল! তারপর আরও… দমাদ্দম চলল!’

‘ওর সঙ্গে আর থাকতে পারছি না!’ ইয়াকভ্ চেঁচিয়ে উঠল। ‘আমি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা যাব! আমাকে মারল কেন? আমি ত খারাপ কিছু ভেবে বলি নি।’

ইয়াকভের চিৎকারে ইলিয়ার খারাপ লাগছিল, তাই সে অসহায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। কাকা যে তীর্থে যাবে বলে মনস্থ করেছে এ সংবাদে তার ভালোই লাগল: কাকা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও এই বাড়ি ছাড়বে, নিজে একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে একা থাকবে।

নিজের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে তেরেন্‌তি তার পেছন পেছন এসে হাজির। তার মুখে খুশির ভাব, চোখ দুটো সজীব হয়ে উঠেছে। কুঁজটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইলিয়ার কাছে এসে সে বলল:

‘আমি চলে যাচ্ছি! ভগবানের দয়ায়, অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে যাচ্ছি…’

‘তুমি খবর রাখ কি যে ইয়াকভ্ মদ টেনে মাতাল হয়ে পড়েছে?’ ইলিয়া নীরস গলায় বলল।

‘অ, তাই নাকি? ভালো কথা না!’

‘ওর বাপ ত তোমার সামনেই ওকে পেটায়?’

‘হ্যাঁ, আমার সামনেই… তাতে কী হয়েছে?’

‘তা তুমি কি এটাও বুঝতে পার না যে এই কারণে ও মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে?’ ইলিয়া রূঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করল।

‘এই জন্যে? আচ্ছা, তাই না কি?’

ইলিয়া পরিষ্কার দেখতে পেল যে ইয়াকভের কী হল না হল তাতে কাকার থোড়াই আসে-যায়, আর একথা ভেবে কুঁজোর ওপর তার আক্রোশ আরও বেড়ে গেল। তেরেন্‌তিকে এত খুশি সে আর কখনও দেখে নি এবং

ইয়াকভ্ যখন চোখের জল ফেলছে ঠিক সেই মুহূর্তে তার সামনে এই আনন্দের প্রকাশে ওর মনটা বিষিয়ে গেল।

'সরাইখানায় চলে যাও দেখি,' কাকাকে এই কথা বলে সে জানলার পাশে বসে পড়ল।

'ওখানে আবার কর্তা আছে... তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'কী কথা?'

কুঁজো তার কাছে এগিয়ে এসে রহস্যের সুরে বলতে শুরু করল:

'আমি শিগ্গিরই যাওয়ার যোগাড়-যন্তর করছি। তুই এখানে একা থাকবি, তাই... তার মানে...'

'যা বলার চট্পট বলে ফেল না,' ইলিয়া বলল।

'চট্পট?' চোখ পিটপিট করে গলা নামিয়ে তেরেন্তি বলে উঠল। 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়... আমি টাকা জমিয়েছি... সামান্যই।'

ইলিয়া ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বিদ্ঘুটে রকম হেসে উঠল।

'কী ব্যাপার?' কাকা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'জমিয়েছ, তাই না?'

'জমিয়েছ' কথাটা সে বেশ স্পষ্ট করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, তাই...' ইলিয়ার দিকে না তাকিয়ে তেরেন্তি বলে চলল, 'মানে, দুশ' আশ্রমে দেব বলে ঠিক করেছি, একশ' — তোকে।'

'একশ' ?' ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। তখনই সে আবিষ্কার করল যে অনেক দিন থেকেই মনের গহনে কাকার কাছ থেকে সে পাওয়ার আশা করছিল একশ' রুবল নয় — তার ঢের বেশি। আশাটা যে অন্যায় তা সে জানত, তাই একথা ভেবে তার নিজের ওপর রাগ হল, আর কাকা যে তাকে এত কম দিচ্ছে তার জন্য কাকার ওপরও রাগ হল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, রেগে, কঠিন স্বরে কাকাকে বলল:

'তোমার ঐ চুরির টাকা আমি নেব না।'

কুঁজো তার কাছ থেকে পিছু হটে এসে খাটের ওপর বসে পড়ল। তাকে বড় করুণ ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কুঁকড়ে গিয়ে সে হাঁ করে বিমূঢ় আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

'অমন করে দেখছ কী? আমার দরকার নেই।'

'হা ভগবান যিশু, দয়া কর!' তেরেন্তি ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠল।

'ইলিয়া, তুই আমার ছেলের মতো ছিলি। আমি ত তোর জন্যেই, তোর মুখ চেয়েই এ পাপ করেছি। তুই টাকাটা নে! নইলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।'

'এই কথা!' ইলিয়া বিদ্রূপের সুরে বলল। 'হিসাবের বিল হাতে নিয়ে ভগবানের কাছে যাচ্ছ? দাদুর টাকা চুরি করতে বুঝি আমি তোমাকে বলেছিলাম? একবার ভেবে দেখ কী লোকের টাকা তোমরা চুরি করেছ!..'

'ইলিয়া! নিজের জন্মের জন্যেও ত তুই বলিস নি,' ইলিয়ার দিকে হাস্যকর ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে কাকা তাকে বলল। 'না, টাকা তুই নে — খ্রীস্টের দোহাই! আমাকে উদ্ধার কর! তুই না নিলে ভগবান আমাকে পাপ থেকে রেহাই দেবেন না...'

ও অনুনয় করতে লাগল, ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল আর চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক। ইলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে রইল, সে বুঝে উঠতে পারল না কাকার জন্য তার দুঃখ হচ্ছে কিনা।

'ঠিক আছে, নেব,' শেষকালে সে বলল এবং তক্ষুনি ঘর ছেড়ে চলে গেল। কাকার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্তটা তার ভালো লাগছিল না, এতে সে নিজের কাছে ছোট হয়ে গেল। একশ' রুবল দিয়ে তার কী হবে? এ দিয়ে কীই বা করা সম্ভব? সে একথাও ভেবে দেখল যে কাকা যদি তাকে হাজার রুবল দিতে চাইত তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে তার এই উদ্‌ভ্রান্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের জায়গায় গড়ে তুলত ভদ্র জীবন, যে জীবন অতিবাহিত হত লোকালয় থেকে বহু দূরে শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে... আচ্ছা, কাকাকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় বুড়োর টাকার কতটা তার ভাগে পড়েছে? কিন্তু চিন্তাটা তার কাছে জঘন্য মনে হল...

অলিম্পিয়াদার সঙ্গে ইলিয়ার যে দিন পরিচয় হয় সে দিন থেকে পেত্রুখা ফিলিমোনভের বাড়িটা তার কাছে আরও বেশি নোংরা ও ঘিঞ্জি বলে মনে হতে লাগল। ঐ ঠাসাঠাসি ও নোংরা তার সর্বাঙ্গে জাগিয়ে তুলত একটা ঘিনঘিনে ভাব, যেন ঠান্ডা, পিছলে হাত তার দেহ স্পর্শ করেছে। আজ এই অনুভূতি তাকে বিশেষ ভাবে পীড়িত করল, বাড়িটার মধ্যে সে নিজের জায়গা খুঁজে পেল না, তাই সে চলল মাতিৎসার কাছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল মাতিৎসা তার চওড়া বিছানার পাশে চেয়ারের ওপর বসে আছে। সে ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল তুলে সাবধান করে দিল।

'চুপ! ঘুমোচ্ছে!..' একটু জোরেই সে ফিসফিস করে বলল, মনে হল যেন বাতাস ঝাপ্‌টা দিল।

বিছানায় গুটিসুটি মেরে মাশা ঘুমোচ্ছিল।

'কেমন মনে হয়?' মাতিৎসা তার বড় বড় চোখ দুটি গোল গোল করে রেগে ফিসফিসিয়ে বলল। 'পাষণ্ডগুলো বাচ্চাদেরও পেটাতে শুরু করেছে! ওদের মরণও হয় না!..'

চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে ছাইরঙা কিছু একটা দিয়ে জড়ানো মাশার আকৃতিটার দিকে তাকাতে তাকাতে ইলিয়া মাতিৎসার ফিসফিসানি শুনছিল। সে মনে মনে ভাবল:

'এই মেয়েটার কী দশা হবে কে জানে?..'

'জানিস, ঐ জঘন্য চরিত্রের শয়তান চোরটা মাশার চুল ধরে টেনেছে? ছেলেকে পিটিয়েছে আর ওকে ভয় দেখিয়েছে এই বলে যে বাড়ি থেকে দূর করে দেব। জানিস তুই? কোথায় যাবে মেয়েটা, অ্যাঁ?'

'আমি ওর একটা কাজ জুটিয়ে দিলেও দিতে পারি,' অলিম্পিয়াদা একটা ঝি খুঁজছে একথা মনে পড়তে ইলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

'তুই!' মাতিৎসা মুখ ঝামটে ফিসফিস করে বলল। 'তোর হালচালটা ভারিক্কি জমিদার গোছের। তাই বলে মনে করিস না যে এমন বড় বটগাছটি হয়ে উঠেছিস যে ছায়া বা ফল দিবি।'

'রসো, ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্‌ করো না,' অলিম্পিয়াদার কাছে এখনই যাওয়ার একটা ভালো ছুতো পেয়ে ইলিয়া বলল। 'মাশার বয়স কত?' ও জিজ্ঞেস করল।

'পনেরো... কতই বা আর হবে? তা পনেরো হলেই-বা কী? বারো বললেও বেশি মনে হবে... মেয়েটা বড়ই রোগা, পাতলা... এখনও একেবারে ছেলেমানুষ! এত বাচ্চাকে দিয়ে কোথাও কোন কাজ হবে না, কোন কাজ হবে না! ওর বেঁচে লাভ কী? এমন ঘুমে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খ্রীস্টের চরণে গতি পেলেও হত...'

এক ঘণ্টা বাদে সে অলিম্পিয়াদার বাড়ির দরজার পাশে এসে দাঁড়াল, অপেক্ষা করতে লাগল দরজা খোলার। অনেকক্ষণ কেউ খুলল না, তারপর দরজার ওপাশ থেকে সরু গলার চিঁচিঁ আওয়াজ শোনা গেল: 'কে?'

'আমি,' কে ওকে জিজ্ঞেস করছে আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবতে ভাবতে

ইলিয়া জবাব দিল। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা বেঢপ গড়নের একটা ঝি অলিম্পিয়াদার ছিল বটে, তবে তার গলাটা হেঁড়ে আর কর্কশ, তা ছাড়া সে কোন প্রশ্ন না করেই দরজা খুলে দেয়।

'কাকে চাই?' দরজার ওপাশ থেকে আবার প্রশ্ন।

'অলিম্পিয়াদা দানিলভ্না বাড়ি আছেন?'

দরজা হঠাৎ খুলে গেল, ইলিয়ার মুখের ওপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল — সে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না, চোখ কুঁচকে এক পা পিছিয়ে গেল।

ওর সামনে বাতি হাতে দাঁড়িয়ে এক বেঁটেখাটো বুড়ো। লোকটার গায়ে টকটকে লাল রঙের ভারী চওড়া জোব্বা। মাথায় তার চুলের নামগন্ধ নেই বললেই হয়, চিবুকের ওপর অস্থির ভাবে কাঁপছে ছাইরঙা, ছোট্ট, পাতলা দাড়ির গোছা। সে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকাল, তার তীব্র, উজ্জ্বল চোখজোড়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জ্বলজ্বল করছিল, ওপরের ঠোঁটে রুক্ষ গোঁফের রেখা — সেটা কেঁপে উঠল। তার অস্থিসার কালো হাতে ধরা বাতিটাও কাঁপছিল।

'কে তুমি? এসো দেখি, ভেতরে এসো...' ও বলল। 'তুমি কে হে?'

ইলিয়া বুঝতে পারল লোকটা কে। সে টের পেল তার মুখে রক্তের ঝলক খেলে গেল, বুকের ভেতরটা টগবগ করে উঠল। এই লোকটাই তাহলে নিটোল, নির্ভেজাল এই রমণীটির সোহাগের ভাগীদার!

'আমি একজন হকার,' চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে চাপা গলায় সে বলল।

বুড়ো তার দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখ টিপে বাঁকা হাসি হাসল। ওর চোখের পাতা — লাল, সেখানে একটিও পালক নেই, মুখের ভেতর থেকে হাঁ হয়ে বেরিয়ে আছে হলদেটে খোঁচা খোঁচা হাড়গোর।

'হকার-নাগর? কিসের হকার, অ্যাঁ? কিসের?' ধূর্তের মতো হাসতে হাসতে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, ইলিয়ার মুখের আরও সামনে বাতিটা বাড়িয়ে ধরল।

'খুচরো জিনিসপত্রের হকার... আতর, ফিতে... এই রকম সব টুকিটাকি,' ইলিয়া মাথা নীচু করে বলল, সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করল যে মাথাটা ঘুরছে আর চোখের সামনে ভাসছে লাল লাল ছোপ।

'বটে, বটে, বটে — চুলের ফিতে? আচ্ছা, আচ্ছা, ফিতে... লও গো নাগরী, আমি ফিরি করি... অ্যাঁ? তা কী মনে করে গো, হকার?'

'অলিম্পিয়াদা দানিলভ্‌নাকে চাই...'

'আচ্ছা, আচ্ছা! কেন চাই, অ্যাঁ?'

'জিনিস বিক্রি করেছিলাম, তার জন্যে টাকা পাই,' ইলিয়া শেষকালে জোর করে বলে ফেলল।

এই কুৎসিত বুড়োটার সামনে এক অজানা আতঙ্কে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, ওকে দেখা ইলিয়ার ঘেন্না হতে লাগল। বুড়োর বিষাক্ত দৃষ্টি ইলিয়ার বুকের ভেতরটা যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছিল, তার সেই দৃষ্টির মতো শান্ত, মিহি কণ্ঠস্বরের মধ্যেও ছিল কেমন যেন একটা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ভাব।

'টাকা? পাওনা আছে? ভা-লো কথা...'

বুড়ো ঝট্ করে ইলিয়ার মুখের ওপর থেকে বাতিটা সরিয়ে নিয়ে পায়ের চেটোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল, লোলচর্ম হলদেটে মুখটা ইলিয়ার দিকে এগিয়ে দিল।

'চিরকুট কোথায়? চিরকুট বার কর!' বিষাক্ত হাসি হেসে শান্ত স্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

'কিসের চিরকুট?' ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে ইলিয়া বলল।

'তোমার মনিবের কাছ থেকে গো! অলিম্পিয়াদা দানিলভ্‌নার কাছে চিরকুট — কোথায়? বার কর। আমি ওর কাছে পৌঁছে দেব। কোথায় — জলদি!' বুড়ো ইলিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। ছোকরার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।

'কোন চিরকুট-ফিরকুট আমার কাছে নেই!' মরিয়া হয়ে ও জোর গলায় বলে উঠল, অনুভব করছিল যে কোন মুহূর্তে অস্বাভাবিক কোন কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অলিম্পিয়াদার দীর্ঘ, ছিমছাম মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। সে বুড়োর মাথার ওপর দিয়ে শান্ত, অবিচল দৃষ্টিতে ইলিয়ার দিকে তাকাল।

'এখানে কী ব্যাপার, ভাসিলি গাভ্রিলভিচ্?' অনুত্তেজিত স্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

'কোন্ এক হকার — এই যে! আপনার কাছে নাকি পাওনা আছে। আপনি কি ওর কাছ থেকে ফিতে কিনেছিলেন? ওকে নাকি দাম দেন নি, অ্যাঁ? তাই এসেছে... এসে হাজির হয়েছে...'

অলিম্পিয়াদার সামনে ঘুরঘুর করতে করতে বুড়ো তার চোখ দুটো একবার অলিম্পিয়াদার মুখের ওপর, একবার ইলিয়ার মুখের ওপর বুলাতে লাগল। অলিম্পিয়াদা কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে ডান হাত দিয়ে বুড়োকে পাশে সরিয়ে দিল, তারপর হাতটা নিজের ড্রেসিং গাউনের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে চড়া গলায় ইলিয়াকে বলল:

'আসার আর সময় পেলে না?'

'আমিও ত তাই বলি!' বুড়ো খ্যাঁকখ্যাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। 'ব্যাটা বুদ্ধু কোথাকার, অ্যাঁ! অসময়ে এসে উৎপাত, অ্যাঁ! গাধা!'

ইলিয়া পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'চেঁচাবেন না, ভাসিলি গাভ্রিলভিচ্! ভালো লাগে না,' এই বলে ইলিয়ার দিকে ফিরে অলিম্পিয়াদা জিজ্ঞেস করল, 'কত পাওনা তোমার — তিন চল্লিশ? এই নাও।'

'এইবার ভাগ!' বুড়ো আবার চেঁচিয়ে উঠল। 'বলেন ত ওকে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি... আমি, আমি নিজেই দিচ্ছি!'

সে নিজের জোব্বাটা গুটিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দিল।

'নিকালো!' চেঁচিয়ে বলল ইলিয়াকে।

বন্ধ দরজার সামনে ঠাণ্ডার মধ্যে ইলিয়া দাঁড়িয়ে রইল, ফ্যালফ্যাল করে দরজাটার দিকে তাকাতে লাগল, তার বোধগম্য হচ্ছিল না সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। তার এক হাতে ধরা আছে টুপি, অন্য হাতে মুঠি করে ধরা আছে অলিম্পিয়াদার দেওয়া টাকা। সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত তার মনে হল কনকনে বরফের একটা বাঁধন যেন তার মাথাটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে, ঠাণ্ডায় পা দুটো ভেঙ্গে পড়ছে। তখন সে টুপি মাথায় দিল, টাকা-পয়সাগুলো পকেটে রাখল, হাত দুটো ওভারকোটের হাতার ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে শরীরটা কোঁকড়াল, মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন জমে বরফ হয়ে গেছে, সে অনুভব করছিল তার মাথার মধ্যে কতগুলো ভারী ভারী গুলি গড়াচ্ছে, মাথার দুপাশের রগে ঘা মারছে... সামনে ভাসছে ঠাণ্ডা বাতির

আগুনে আলোকিত হয়ে বুড়োর কালো মূর্তি আর তার হলদেটে চাঁদিটা।

বুড়োর মুখটা বিজয়ীর হাসিতে — একটা বিষাক্ত ও ধূর্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে...

পর দিন ইলিয়া ধীরে ধীরে, চুপচাপ শহরের বড় রাস্তা ধরে হাঁটছিল। সে কল্পনায় তখনও দেখতে পাচ্ছে বুড়োর কুটিল দৃষ্টি, অলিম্পিয়াদার শান্ত নীল চোখজোড়া আর টাকা দেওয়ার সময় তার হাতের ভঙ্গি। হিমেল হাওয়ায় তীক্ষ্ন তুষারকণা ভাসছে, ইলিয়ার মুখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

ভজনের দালান আর ব্যবসায়ী লুকিনের বিরাট বাড়ির মাঝখানে একটা নিরালা কোণের আড়ালে পড়ে আছে ছোট্ট একটা দোকান। এইমাত্র ইলিয়া দোকানটা পেরিয়ে গেল। দোকানে ঢোকার মুখে ঝুলছে মরচে ধরা সাইনবোর্ড:

ভাসিলি গাভ্রিলভিচ্ পলুএক্তভের
বন্ধকী কারবার

সোনা-রুপার ভাঙ্গা জিনিস, আইকনের মাউণ্টিং, মহার্ঘ দ্রব্যাদি
ও প্রাচীন মুদ্রা খরিদ করিয়া থাকি

যেতে যেতে দোকানের দরজার ভেতরে চোখ পড়তে ইলিয়ার মনে হল যেন কাচের ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাক মাথা নাড়িয়ে তার উদ্দেশে বিদ্রুপের হাসি হাসল। দোকানে ঢুকে কাছ থেকে বুড়োকে দেখার একটা অদম্য ইচ্ছে ইলিয়ার মনের মধ্যে জাগল। ছুতোও সঙ্গে সঙ্গে জুটে গেল — সব খুচরো কারবারীর মতো সেও হাতে কোন পুরনো মুদ্রা পড়লে জমিয়ে রাখত, বেশ কিছু জমলে পোদ্দারের কাছে রুবল পিছু এক রুবল বিশ কোপেক দরে বিক্রি করত। ওর মনিব্যাগে এখনও সে রকম কয়েকটা মুদ্রা পড়ে আছে।

ইলিয়া পিছু ফিরল, সাহস করে দোকানের দরজা ঠেলে নিজের টুকিটাকির বাক্স সমেত দোকানে ঢুকে পড়ল।

'নমস্কার!' মাথার টুপি খুলে ইলিয়া বলল।

সরু কাউণ্টারের ওপাশে বসে বসে বুড়ো ছোট্ট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পেরেক ওপড়াতে ওপড়াতে আইকনের মাউণ্টিং খুলছিল। যে ছোকরাটা

দোকানে ঢুকল তার দিকে এক লহমা তাকিয়েই সে মাথা নামিয়ে আবার কাজে মন দিল।

'কী চাই?' সে নীরস গলায় জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে চিনতে পারলেন?' ইলিয়া কেন যেন জিজ্ঞেস করে বসল।

বুড়ো আবার ওর দিকে তাকাল।

'চিনলামই না হয় — কী চাই?'

'পুরনো পয়সা কিনবেন?'

'দেখাও।'

ইলিয়া মনিব্যাগের জন্য পকেটে হাত বাড়াল। কিন্তু পকেট খুঁজে পাচ্ছিল না, বুড়োর ওপর আক্রোশে এবং তার সামনে আতঙ্কে ইলিয়ার বুক কাঁপতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতও কাঁপে। ওভারকোটের নীচে হাতড়াতে হাতড়াতে সে টাকপড়া ছোট্ট চাঁদিটার দিকে তাকাল, তার শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল।

'আরে, এতক্ষণ লাগছে কেন?' বুড়ো তিরিক্ষি হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এক্ষুনি বার করছি!' ইলিয়া মৃদু স্বরে উত্তর দিল।

শেষকালে মনিব্যাগটা সে বার করল। এবারে এগিয়ে গিয়ে কাউণ্টারের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তার ওপর মুদ্রাগুলো ফেলে দিল। বুড়ো সেগুলোর ওপর নজর বুলাল।

'ব্যস্?'

সরু সরু হলদেটে আঙুল দিয়ে রুপোর মুদ্রা আঁকড়ে ধরে সে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল।

'এটা ক্যাথারিনের... এটা আন্নার... ক্যাথারিন... পাভেল,' নাকি সুরে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল। 'এটাও... ক্রস খোদাই করা... বত্রিশ সনের... কে জানে এটা কী! নাও — এটা নেব না, একেবারে লেপাপোঁছা।'

'আরে সাইজ দেখেই ত বোঝা যাচ্ছে পঁচিশ কোপেক,' ইলিয়া রুক্ষ স্বরে বলল।

বুড়ো মুদ্রাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চট করে ক্যাশবাক্স টেনে বার করে তার ভেতরে হাতড়াতে লাগল।

ইলিয়া হাত চালিয়ে দিল, বুড়োর কপালের রগ ঘেঁষে শক্ত মুঠির আঘাত এসে পড়ল। সুদখোরটা দেয়ালে ছিটকে পড়ল, দেয়ালের সঙ্গে মাথায় ঠোক্কর

খেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার হুমড়ি খেয়ে কাউন্টারের ওপর পড়ে গেল, দুহাতে কাউন্টার আঁকড়ে ধরে লিকলিকে গলাটা ইলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল। ইলিয়া দেখতে পেল ওর ছোট, কালো মুখের ওপর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, শুনতে পেল ভাঙা ভাঙা স্বরে জোরে ফিসফিস করে লোকটা বলছে:

'ছেড়ে দে... বাপ্ আমার, ছেড়ে দে...'

'তবে রে হারামজাদা!' বলেই ইলিয়া প্রচণ্ড আক্রোশে বুড়োর টুঁটি টিপে ধরল। টিপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, এদিকে বুড়ো দুহাতে ইলিয়ার বুকে ঠেলা দিল, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলল। ওর চোখ দুটো লাল টকটকে আর বড় বড় হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, মুখের অন্ধকার গহ্বর থেকে জিভ বেরিয়ে পড়ে লকলক করতে লাগল — যেন খুনিকে ভেংচি কাটছে। ইলিয়ার হাতের ওপর গরম লালা ঝরে পড়তে লাগল, বুড়োর গলার ভেতরে কী যেন ঘড়ঘড় আর সাঁইসাঁই করে উঠল। বঁড়শির মতো বাঁকা, ঠান্ডা আঙুলগুলো ইলিয়ার ঘাড় স্পর্শ করল, ইলিয়া দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মাথাটাকে পেছন দিকে হেলাল, বুড়োর হালকা দেহটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে আরও জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। তার আঙুলের চাপে বুড়োর গলার নলি মটমট করে উঠছে। এ সময় যদি কেউ তাকে পেছন দিক থেকে আঘাত করত তাহলেও সে বুড়োকে ছাড়ত না। ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিউরে উঠে সে দেখতে লাগল পলুএক্তভের ঘোলা চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। ইলিয়া আরও জোরে তার গলা টিপে ধরল আর বুড়োর শরীর যত ভারী হয়ে আসতে লাগল ইলিয়ার বুকের ভারও যেন ততই হালকা হতে লাগল। অবশেষে ইলিয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে তার দেহটা আস্তে করে কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ইলিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল — দোকানে কোন লোকজন নেই, কোন সাড়াশব্দ নেই, এদিকে দরজার ওপাশে, রাস্তায় ভারী বরফ পড়ছে। মেঝেতে, ইলিয়ার পায়ের কাছে পড়ে ছিল দুটুকরো সাবান, মনিব্যাগ আর একটা ফিতে জড়ানো কাঠিম। ইলিয়া বুঝল যে এই জিনিসগুলো তার বাক্স থেকে পড়েছে, ওগুলোকে তুলে সে যথাস্থানে রাখল। তারপর ঘাড় বাড়িয়ে কাউন্টারের ওপাশে উঁকি মেরে বুড়োকে দেখে নিল: বুড়ো কাউন্টার আর দেয়ালের মাঝখানে কুন্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে, তার মাথাটা বুকের ওপর

ঝ্ঁকে পড়েছে, মাথার পেছনের হলদেটে চামড়াটা কেবল দেখা যাচ্ছে। এই সময় ইলিয়ার চোখে পড়ল খোলা ক্যাশবাক্স — বাক্সের মধ্যে ঝকঝক করছিল সোনার ও র্পোর ম্দ্রা, কয়েকটা নোটের তাড়াও চোখে পড়ল। ইলিয়া চটপট একটি তাড়া তুলে নিল, তারপর আর একটি এবং আরও। সেগ্লোকে সে জামার নীচে গ্ঁজে ফেলল।

সে ধীরেস্স্থে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, দোকান ছেড়ে তিন পাখানেক এগিয়ে যাওয়ার পর থামল, অয়েলক্লথ দিয়ে ফিরির জিনিসগ্লোকে ভালো করে ঢাকল, তারপর আবার এগিয়ে গেল। অদেখা স্দ্র শ্ন্যদেশ থেকে বরফ পড়ে পড়ে তখন ঘন হয়ে জমেছে। ইলিয়ার চারধারে এবং তার ভেতরেও নিঃশব্দে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ঠাণ্ডা ঘোলাটে কুয়াসার পর্দা। ইলিয়া চেষ্টা করে সে দিকে চোখ মেলে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখে অন্ভব করল একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। সে তার ডান হাতের আঙ্গ্ল দিয়ে চোখ দ্টো ছ্ঁয়ে দেখল, আতঙ্কে থমকে দাঁড়াল, তার পা যেন জমে মাটির সঙ্গে আটকে গেছে। তার মনে হল চোখ দ্টো যেন ব্ড়ো পল্এক্তভের চোখজোড়ার মতোই ঠিকরে কপালে উঠে এসেছে, যেন চির দিনই এ রকম যন্ত্রণাদায়ক ভাবে বিস্ফারিত হয়ে থাকবে, আর কখনই বন্ধ হবে না এবং প্রতিটি মান্ষ এখন সেখানে অপরাধের পরিচয় পাবে। যেন মড়ার চোখ। চোখের তারায় হাত ব্লোতে যন্ত্রণা অন্ভব করল, কিন্তু চোখের পাতা নামাতে পারল না। আতঙ্কে তার ব্ক শ্কিয়ে গেল। শেষকালে চোখের পাতা ফেলা সম্ভব হল; হঠাৎ অন্ধকার এসে তাকে ঘিরে ফেলল — সে আনন্দে অন্ধকার উপভোগ করতে লাগল। এই ভাবে চোখ বন্ধ করে সে স্থির হয়ে একঠায় দাঁড়িয়ে রইল, ব্ক ভরে বাতাস নিতে লাগল... কে যেন যেতে যেতে তাকে ঠেলা মেরে চলে গেল। ইলিয়া চট করে ফিরে তাকাল — পাশ দিয়ে চলে গেল একটা ঢ্যাঙা লোক, তার গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট। ইলিয়া তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। লোকটা শেষ পর্যন্ত সাদা পেঁজা বরফের ঘন ঝাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইলিয়া তখন হাত দিয়ে টুপিটা পাট করে নিয়ে ফুটপাথের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। তার চোখ ব্যথা করছে, মাথাটা ভার ভার হয়ে আছে। কাঁধ দ্টো কাঁপছে, হাতের আঙ্গ্লগ্লো তার ইচ্ছার বির্দ্ধে গ্টিয়ে আসছে, ব্কের ভেতরে একটা উদ্ধত, বেপরোয়া ভাব জেগে উঠে ভয়টাকে কোণঠাসা করে দিল।

রাস্তার মোড়ে পেঁছিতে সে ছাইরঙা পোশাক পরনে এক প্লিশম্যানকে দেখতে পেল, কোন কিছু না ভেবে ধীরে ধীরে, মৃদুমন্দ গতিতে একেবারে তার সামনে গিয়ে পড়ল। যেতে যেতে তার বুকের ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

'ওঃ কী বরফ!' পুলিশের লোকটার একেবারে কাছাকাছি ঘেঁষে এসে সে বলল, সঙ্গে সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, পড়েছে বটে! ভগবান করুন, এখন কনকনে ভাবটা একটু কমবে।' লোকটা খুশি হয়ে বলল। ওর মুখটা বিরাট, লাল টকটকে, মুখে দাড়ি আছে।

'এখন কটা বাজে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'দেখছি!' এই বলে সে হাতা থেকে বরফ ঝেড়ে হাতটা কোটের ভেতরে ঢোকাল। এই লোকটার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে থাকতে ইলিয়ার ভয় ভয় লাগছিল আবার সে মজাও পাচ্ছিল। হঠাৎ সে হাসি চাপতে না পেরে শুকনো হাসি হাসল।

'হাসার কী আছে?' নখ দিয়ে ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতে পুলিশের লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'আরে বরফে তোমার সর্বাঙ্গ ঢেকে গেছে দেখছি!' ইলিয়া বলে উঠল।

'এত জোর পড়লে ঢাকবে না ত কি! এখন হল গিয়ে দেড়টা... দেড়টা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। ঢাকবে বৈকি ভাই!.. তুমি ত এখন কোন চায়ের দোকানে, গরম জায়গায় গিয়ে ঢুকবে, আর আমাকে এখানে ছটা অবধি খাড়া থাকতে হবে। তোমার বাক্সটার ওপরই কত বরফ পড়েছে দেখ না।'

পুলিশম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলে খট্ করে ঘড়ির ডালা বন্ধ করল।

'হ্যাঁ, আমি চায়ের দোকানে যাব,' বলে ইলিয়া বাঁকা হাসি হাসল, তারপর যোগ করল, 'এই এটাতেই...'

'যাও যাও, আর জ্বালিও না বাপু।'

সরাইখানায় ঢুকে ইলিয়া জানলার নীচে একটা জায়গায় বসল। ও জানত, এই জানলা থেকে দেখা যায় সেই ভজনের দালানটা, যার পাশেই আছে পলুএক্‌তভের দোকান। কিন্তু এখন জানলার ওপাশে কেবল সাদা কুয়াসার পর্দা। ইলিয়া এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল জানলার পাশ দিয়ে পেঁজা বরফ ধীরে ধীরে উড়ে উড়ে মাটিতে ঝরে পড়ছে, পেঁজা তুলোর আড়ালে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে লোকজনের পায়ের চিহ্ন। ইলিয়ার হৃৎপিন্ডটা জোরে জোরে,

দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল, কিন্তু সে হালকা বোধ করল। সে বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করে চলল এরপর কী ঘটে দেখার জন্য।

বয় চা নিয়ে আসতে সে অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল:

'বাইরে কী রকম চলছে... স্বাভাবিক?'

'ঠান্ডাটা আগের চেয়ে কম... অনেক কমে গেছে!' বয় তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। ইলিয়া পট থেকে এক গেলাস চা ঢেলে নিল, চুমুক না দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল ঠিক যেন কোন একটা কিছুর প্রতীক্ষায়। ওর গরম বোধ হল — ওভারকোটের গলার বাঁধন খুলতে লাগল, সেই সময় চিবুকে হাত লেগে যেতে ও কেঁপে উঠল — মনে হল এ যেন তার হাত নয়, অন্য কারও ঠান্ডা হাত। হাতজোড়া মুখের সামনে তুলে সে আঙ্গুলগুলো ভালোমতো নিরীক্ষণ করে দেখল — হাত পরিষ্কার, কিন্তু তার মনে হল তবু, সাবান দিয়ে সাফ করা দরকার...

'পলুএক্‌তভ খুন হয়েছে!' হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে বলল।

ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল — মনে হল যেন চিৎকার করে তাকেই ডাকা হয়েছে। কিন্তু চায়ের দোকানের সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠে দরজার দিকে চলল, চলতে চলতে মাথায় টুপি আঁটতে লাগল। ট্রের ওপর পয়সা ফেলে দিয়ে নিজের বাক্সের স্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলিয়ে ইলিয়াও অন্যদের মতোই হন্তদন্ত হয়ে চলল।

মহাজনের দোকানের সামনে বিরাট ভিড় জমে গেছে, ভিড়ের মধ্যে পুলিশের লোকেরা ছুটোছুটি করছে আর ব্যস্ত ভাবে চেঁচামেচি করছে। যে দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে ইলিয়া কথা বলেছিল সেও সেখানে ছিল। লোকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, দোকানে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না, ভয়ার্ত চোখে সকলের দিকে তাকাচ্ছিল আর সমানে নিজের বাঁ গালে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল, তার বাঁ গাল এখন ডান গালের থেকেও বেশি লাল হয়ে উঠেছে। ইলিয়া তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লোকে কে কী বলে শুনে যাচ্ছিল। তার পাশেই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল কালো দাড়িওয়ালা দীর্ঘ আকৃতির এক ব্যবসাদার। খেঁকশিয়ালের চামড়ার কোট গায়ে সাদা চুলওয়ালা এক বুড়ো উত্তেজিত হয়ে বিবরণ দিচ্ছিল, লোকটা ভুরু কুঁচকে তা শুনছিল।

'অচৈতন্য হয়ে পড়েছে ভেবে ছেলেটা পিওত্‌র স্তেপানভিচের কাছে ছুটে গেল — বলল, দয়া করে আসুন, আমাদের মনিবের অসুখ করেছে। তিনি

ত পড়িমরি করে ছুটে এলেন, এসে দেখেন দেহে প্রাণ নেই! বোঝ কাণ্ড — কী সাহস! দিনে-দুপুরে, লোকজনে ভর্তি রাস্তার ওপরে কিনা এই ব্যাপার!'

'ভগবানের হাত!' কালো দাড়িওয়ালা ব্যবসাদারটি জোরে কেশে গম্ভীর, রুক্ষ স্বরে বলল। 'বোঝা যাচ্ছে ভগবান ওর পাপ আর সইতে পারছিলেন না...'

ব্যবসাদারের মুখটি আরও একবার দেখার উদ্দেশ্যে ইলিয়া সামনের দিকে এগিয়ে গেল, তাতে তার গায়ে ইলিয়ার বাক্সের ধাক্কা লাগল।

'আরে!' লোকটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে ইলিয়াকে সরিয়ে দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর কটমট করে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে কোথায়?'

ব্যবসাদার যার সঙ্গে কথা বলছিল তার দিকে ফিরে আবার বলল:

'শাস্ত্রে আছে — মানুষের মাথার একটি চুলও ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া পড়ে না...'

'সে আর বলতে!' বুড়ো সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তারপর চোখ টিপে চাপা গলায় যোগ করল, 'কে না জানে যে ভগবান বদ লোকদের ওপর নজর রাখেন... প্রভু, ক্ষমা করো! উচ্চারণ করা পাপ, কিন্তু না বলেও পারা যায় না!'

ইলিয়া হাসল। কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মনের মধ্যে প্রবল শক্তির এবং এক ভয়ানক ও মধুর সাহসের জোয়ার খেলে গেল। এ মুহূর্তে কেউ যদি ওকে জিজ্ঞেস করত, 'তুমি খুন করেছ?' তাহলে, ওর মনে হচ্ছিল, ও নির্ভয়ে জবাব দিত, 'হ্যাঁ...'

বুকের মধ্যে ঐ একই অনুভূতির তাড়নায় সে লোকজনের ভিড় ঠেলে দোরগোড়ায় সেপাইটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেপাই রেগে ওর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, চেঁচিয়ে বলল:

'কোথায়? ওখানে কী দরকার, অ্যাঁ? ভাগ বলছি!'

ইলিয়া টলতে টলতে আরেকজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকেও সে ধাক্কা খেল।

'দে ওর ঘাড়ে একটা রদ্দা কষিয়ে! মাতাল নাকি?'

ইলিয়া তখন ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ভজনের দালানের সিঁড়ির ওপর বসল, তার মনের ভেতরে ভেতরে লোকজনের উদ্দেশে হাসি পাকিয়ে

পাকিয়ে উঠছিল। পায়ের নীচে বরফ মাড়ানোর মরমর আওয়াজ আর চাপা গলায় কথাবার্তা ভেদ করে টুকরো টুকরো কথা তার কানে ভেসে আসতে লাগল:

'পাজির পা-ঝাড়াটা ত্যাঁদড়ামি করল কি না আমারই ডিউটির সময়!'

'শহরের পয়লা নম্বর সুদখোর ছিল।'

'অঝোরে বরফ পড়ছে... কিছুই দেখতে পাই নি।'

'কোন দয়ামায়া না করে লোকের ছাল চামড়া ছাড়িয়েছে।'

'ঐ দ্যাখ — বৌ এসেছে রে।'

'আহা, বেচারা!' ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় পরনে এক চাষী জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ইলিয়া উঠে দাঁড়াল, দেখতে পেল ভালুকের চামড়ায় মোড়া চওড়া স্লেজ থেকে থপথপ করে পা ফেলে এগিয়ে আসছে মোটাসোটা এক মাঝবয়সী মহিলা — তার গায়ে কোট, মাথায় কালো রুমাল। একজন পুলিশ অফিসার আর কটা গোঁফওয়ালা একটা লোক তাকে দুদিক থেকে ধরে রেখেছে।

'হা ভগবান!' বাতাসে তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। সকলে চুপ করে গেল। বুড়ির দিকে তাকাতে ইলিয়ার মনে পড়ে গেল অলিম্পিয়াদার কথা।

'ছেলে কোথায় গেল?' কে যেন নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

'মস্কোয়।'

'সে বোধ হয় এটাই চাইছিল...'

'তা আর বলতে!'

পলুএক্‌তভের জন্য যে কারও দুঃখ হচ্ছে না একথা ভেবে ইলিয়ার ভালো লাগছিল, তবে কালো দাড়িওয়ালা ব্যবসাদার ছাড়া বাদবাকি লোকগুলোকে তার মনে হচ্ছিল নির্বোধ, এমনকি ন্যক্কারজনক। ব্যবসাদারটির মধ্যে দৃঢ়তাব্যঞ্জক এবং প্রত্যয়জনক একটা কিছু ছিল, অন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে বনের মাঝখানে কাঠের গুঁড়ির মতো — তারা ইতরের মতো হিংস্র উল্লাসে বকবক করছে, ইলিয়াকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে।

মহাজনের ছোটখাটো দেহটা দোকানঘর থেকে বার করে আনা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল, তারপর ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ক্লান্ত অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করল। বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে

দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে টাকাগুলো গুনে দেখল — খুচরো নোটের দুটো মোটা মোটা তোড়ায় পাঁচশ' রুবল করে ছিল, তৃতীয়টাতে ছিল আটশ' পঞ্চাশ। এ ছাড়া এক তাড়া তমসুকের কাগজও ছিল, সেগুলো আর সে গুনল না। সব টাকা একটা কাগজে মুড়ে সে টেবিলের ওপর কনুই ভর দিয়ে ভাবতে বসে গেল — কোথায় লুকানো যায়? ভাবতে ভাবতে তার ঘুম পেয়ে গেল। টাকাগুলো চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখবে ঠিক করে সে প্রকাশ্যেই প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সে দিকে রওনা দিল, বার-বারান্দায় আসতেই ইয়াকভের মুখোমুখি পড়ে গেল।

'আরে তুই এসে গেছিস!' ইয়াকভ্ বলল। 'তোর হাতে ওটা কী?'

'এটা?' টাকার প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে ইলিয়া ওর প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলল। পাছে মুখ দিয়ে ফস করে কিছু বেরিয়ে পড়ে এই ভয়ে সামান্য আঁতকে উঠে প্যাকেটটা ওপরে তুলে নাড়াতে নাড়াতে তাড়াতাড়ি বলল, 'এটা হল ফিতের কাটিম।'

'চা খেতে আসবি?' ইয়াকভ্ জিজ্ঞেস করল।

'এই আসছি!'

ও তাড়াতাড়ি চলল, কিন্তু পায়ে তেমন আর জোর পেল না, মাথাটা ঝিমঝিম করছে, ভারী ভারী ঠেকছে — যেন সে মাতাল হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে চিলেকোঠায় ওঠার সময় সে সাবধানে পা ফেলে চলল, তার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ সাড়া পেয়ে যায়, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলে। আর যখন ও চিমনির পাশে মাটি খুঁড়ে টাকাগুলো পুঁতে রাখছিল তখন ওর হঠাৎ মনে হল চিলেকোঠার কোনায় অন্ধকারে কে যেন ঘাপ্‌টি মেরে আছে, তার ওপর নজর রাখছে। ওর প্রবল ইচ্ছে হল ঐ দিকে একটা থান ইঁট ছুঁড়ে মারে, কিন্তু সময়মতো প্রকৃতিস্থ হতে চুপচাপ নীচে নেমে গেল। তার মনের মধ্যে এখন আর কোন ভয় ছিল না — সে যেন টাকার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও চিলেকোঠায় লুকিয়ে ফেলেছে, তবে মনের মধ্যে জেগে উঠল দারুণ বিমূঢ় ভাব।

'কেন আমি লোকটাকে খুন করতে গেলাম?' — ইলিয়া মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল।

ও মাটির তলার ঘরে ঢুকতে দেখতে পেল মাশা চুল্লির কাছে সামোভার নিয়ে ব্যস্ত। ইলিয়াকে দেখা মাত্রই মাশা খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'আজ তুই খুব সকাল সকাল এসেছিস দেখছি!'

'বরফ পড়ছে, তাই,' বলেই ইলিয়া খেপে চিৎকার করে উঠল, 'সকাল সকাল মানে? রোজ যেমন আসি সেই সময়ই এসেছি। অন্ধকার হয়ে গেছে — দেখতে পাচ্ছিস না?'

'এখানে দুপুরেও অন্ধকার — তা তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'চেঁচাচ্ছি এই জন্যে যে তোরা সকলে গোয়েন্দার মতো — সকাল সকাল এসেছিস, কোথায় চল্লি, হাতে কী... কেন রে বাপু?'

মাশা ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাল, ধমকের সুরে বলল:

'তুই বড় মাতব্বর হয়ে গেছিস দেখছি ইলিয়া!'

'জাহান্নামে যা তোরা সব!' ইলিয়া গালাগাল দিয়ে টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। মাশা মনে মনে আহত হয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিল, সে সামোভারের চিমনিতে ফুঁ দিতে লাগল। পাতলা, ছোটখাটো গড়নের মেয়েটির কালো কালো কোঁকড়া চুলের রাশি দুলতে থাকে, ধোঁয়ায় সে কাশতে থাকে, চোখ কোঁচকায়। মাশার মুখটা ছিল রোগা রোগা, তার চোখের চারধারে কালি পড়ে থাকায় চোখজোড়ার দীপ্তি আরও বেশি হয়ে দেখা দিত, বাগানের নির্জন কোণে, লম্বা লম্বা আগাছার মাঝখানে যে সব ফুল জন্মায় সে রকম কোন এক ফুলের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা মিল ছিল। ইলিয়া তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল — এই মেয়েটি একা খোঁড়লের মধ্যে বাস করে, বড়দের মতো কাজ করে, ও কি জীবনে কখনও সুখের মুখ দেখতে পাবে? কিন্তু ইলিয়া এখন নির্ঝঞ্ঝাটে ভদ্র জীবনযাপন করবে — যে জীবনের স্বপ্ন সে এতকাল দেখে এসেছে। এই চিন্তায় তার মন আনন্দে ভরে উঠল এবং মাশার সামনে নিজেকে অপরাধী অনুভব করায় সে নীচু গলায় ওকে ডাকল।

'কী রে, গোঁয়ার?' মাশা সাড়া দিয়ে বলল।

'জানিস, আমি একটা জঘন্য লোক,' ইলিয়া বলল, ওর গলা কেঁপে উঠল — মাশাকে বলবে — না কি থাক? মাশা সোজা হয়ে তার দিকে হেসে তাকাল।

'তোকে শায়েস্তা করার কেউ নেই — তাই এ অবস্থা!'

মাশা তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে চলল:

'শোন ইলিয়া, তোর কাকাকে গিয়ে বল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। বল না! তোর পায়ে পড়ি, দোহাই তোর, পায়ে পড়ি!'

'কোথায়?' ইলিয়া ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল — নিজের ভাবনা-চিন্তায় সে এমন ডুবে ছিল যে মাশার কথা সে ভালোমতো বুঝতেই পারছিল না।

'তোর কাকার সঙ্গে! বলে দ্যাখ না!'

মাশা হাত জোড় করে ওর সামনে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াল, ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

'কী ভালোই না হত!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাশা বলল। 'বসন্তকালে যদি যাওয়া যেত! দিনের পর দিন একথাই ভাবছি, এমনকি স্বপ্নেও দেখি, কোথায় যেন যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি। বল না! তোর কথা শুনবে — বল যেন আমাকে নেয়! আমি ওর অন্ন ধ্বংস করব না। ভিক্ষে করে খাব। আমাকে লোকে ভিক্ষে দেবে — আমি ছোট কি না! কী বলিস ইলিয়া? বলিস ত তোর হাতে চুমু খাই।'

বলেই হঠাৎ সে ইলিয়ার হাত ধরে ফেলে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। ইলিয়া ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'বোকা মেয়ে!' ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'চুমু খেতে আসিস না, আমি খুনি...'

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথায় ভয় পেয়ে গিয়ে ও যোগ করল:

'কে বলতে পারে... কে বলতে পারে আমি মানুষ খুন করি নি! আর তুই কিনা চুমু খেতে চাস?'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' মাশা ওর আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল। 'চুমু খাওয়া আর এমন কী কথা? পেত্রুখা তোর চেয়েও খারাপ, কিন্তু যখনই কোন খাবারের টুকরো আমাকে দেয় তখন তার হাতেও চুম খাই। আমার ঘেন্না করে — কিন্তু ও নিজেই বলে — চুমু খা! আবার আমার গায়ে হাত বুলায়, চিমটি কাটে — লম্পট কোথাকার!'

ভয়ঙ্কর কথাগুলো উচ্চারণ করার জন্যই হোক বা শেষ পর্যন্ত না বলার দরুনই হোক — ইলিয়ার মনটা কিন্তু হালকা ও খুশি খুশি লাগল।

ইলিয়া হেসে স্নেহমাখা শান্ত স্বরে ওকে বলল:

'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করব! মাইরি বলছি, করব! তুই আশ্রমে যাবি। পথের জন্যে যা টাকা দরকার দেব।'

'ওঃ কী ভালো তুই!' মাশা চেঁচিয়ে উঠল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'দাঁড়া!' ইলিয়া গম্ভীর হয়ে বলল। 'বললাম ত — যাবি! আমার জন্যে প্রার্থনা করিস, মাশা।'

'তোর জন্যে ত? একশ' বার!'

দোরগোড়ায় ইয়াকভের আবির্ভাব ঘটল।

'এত চিৎকার-চেঁচামেচি করছিস কেন রে? রাস্তা থেকে পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।'

'ইয়াকভ্!' মাশা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, হাঁপাতে হাঁপাতে সে ইয়াকভ্কে বলে চলল, 'আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি! এই যে ও আমাকে বলেছে, কুঁজোকে বুঝিয়ে বলবে।'

'আ-চ্ছা!' বলে ইয়াকভ্ আস্তে করে শিস দিল। 'আমার দফা-রফা হল আর কি! এখন এখানে একদম একা একা পড়ে থাকব — আকাশের চাঁদের মতো।'

'একটা ধাই-টাই ভাড়া করে নে!' ইলিয়া হেসে পরামর্শ দিল।

'ভোদ্কা খেয়ে পড়ে থাকব,' মাথা ঝাঁকিয়ে ইয়াকভ্ বলল।

মাশা তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মাথা নীচু করে দরজার দিকে সরে গেল।

'ইয়াকভ্, তোর মনের একটুও জোর নেই। একটুও নেই!' বিষণ্ণ সুরে সে ওখান থেকে ধমক দিয়ে বলল।

'আর তোদের খুব মনের জোর আছে ত! একজনকে কিনা নরককুণ্ডে ফেলে চলে যাচ্ছিস!' মুখ গোমড়া করে টেবিলের ধারে ইলিয়ার মুখোমুখি বসে ও বলল:

'আমিও চুপিচুপি তেরেন্তির সঙ্গে চলে যাব না কি?'

'যা... আমি হলে চলে যেতাম।'

'তুই হলে! বাবা আমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে।'

সকলে চুপ করে গেল। তারপর ইয়াকভ্ কৃত্রিম খুশির সুরে বলে উঠল:

'মাতাল হতে বেশ লাগে ভাই! কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই, কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। '

মাশা টেবিলে সামোভার রাখল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

'তোর লজ্জাও করে না!'

'তুই চুপ কর দেখি!' ইয়াকভ্ ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'তোর বাপ ত না থাকার মধ্যেই। সে কি আর তোর জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?'

'আমার আবার জীবন!' মাশা বাধা দিয়ে বলল। 'ফিরে না তাকিয়ে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।'

'সকলেরই অবস্থা খারাপ!' ইলিয়া অস্ফুট স্বরে বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ইয়াকভ্ আবিষ্টের মতো জানলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল:

'এ সব থেকে কোথাও চলে যেতে পারলে কী ভালোই না হত! একটা বনের পাশে, নদীর ধারে বসা যেত, ভাবা যেত এটা ওটা নানা বিষয়।'

'এ হল জীবন থেকে পালানোর একটা যা-তা উপায়!' ইলিয়া আক্ষেপের সুরে বলল।

ইয়াকভ্ এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

'জানিস, একটা বই কিন্তু আমি খুঁজে পেয়েছি,' খানিকটা ভয়ে ভয়ে সে বলল।

'কী বই?'

'পুরনো। চামড়ায় বাঁধান, দেখতে অনেকটা স্তবগানের বইয়ের মতো — অধার্মিক গোছের কারও লেখা হবে। এক তাতারের কাছ থেকে সত্তর কোপেকে কিনেছি।'

'কী নাম?' ইলিয়া নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল। কথা বলার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না, তবে চুপ করে থাকাটা সমীচীন হবে না ভেবে সে বাধ্য হয়েই জিজ্ঞেস করল।

'নামের জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে,' ইয়াকভ্ গলার স্বর একটু নামিয়ে বলল, 'তবে, ওতে আমাদের সৃষ্টির কথা আছে। কঠিন বই। বইটাতে লেখা আছে যে সৃষ্টি সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন তোলেন মিলেটানের থালেস: 'তাঁহার নাম বারিকণা, বারিকণা হইতেই সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে এবং সৃষ্ট হইতেছে, অপিচ থালেস এমত উক্তি করিয়াছেন যে ঈশ্বর হইলেন চিন্তা যাঁহা হইতে বারিকণার এবং বারিকণাজাত যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব।' এ ছাড়া ডিয়াগোরাস নামে এক নাস্তিক ছিলেন, তিনি বলেন: 'সত্তায় কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই' — দেখা যাচ্ছে ভগবানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তারপর এপিকিউরাস... তাঁর কথায় 'ঈশ্বর যথার্থই বিদ্যমান, তবে তিনি কাহাকেও কোন সামগ্রী দান করেন

না, কাহারও মঙ্গল সাধন করেন না, জাগতিক কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন না...' তার মানে ভগবান যদি থাকেনও মানুষের জন্যে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই — আমি ত এই বুঝি! মোট কথা, যা খুশি তাই কর। তাঁর কোন দায়-দায়িত্ব নেই।'

ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে সামান্য উঠে তার বন্ধুর মন্থর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে কটমট করে ভুরু কুঁচকে বলল:

'ঐ বইটা দিয়ে তোর মাথায় দড়াম্ করে ঝাড়তে হয়!'

'কেন?' ইয়াকভ্ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'যাতে ওটা আর তোকে দেখতে না হয়। তুই একটা বুদ্ধু! যে লিখেছে সে আরেক বুদ্ধু!'

ইলিয়া টেবিলের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে উপবিষ্ট বন্ধুর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'ভগবান আছেন! তিনি সব দেখতে পান! সব জানেন! ভগবান ছাড়া আর কেউ নেই! জীবনটাই একটা পরীক্ষা। পাপ হল একটা প্রলোভনবিশেষ। আমরা নিজেদের সামলাতে পারব কি না তার পরীক্ষা। সামলাতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে — শাস্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সে শাস্তি — মানুষের কাছ থেকে নয় — তাঁর কাছ থেকে — বুঝলি? অপেক্ষা করতে হবে।' কথাগুলো সে এমন জ্বালাধরা আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করল যে ইয়াকভের বিরাট মাথার ওপর হাতুড়ির ঘায়ের মতো এসে পড়ল।

'থাম!' ইয়াকভ্ চেঁচিয়ে বলল। 'ওটা কি আমার কথা না কি?'

'তাতে কিছু যায় আসে না! তুই আমার বিচার করার কে, অ্যাঁ?' হঠাৎ রাগে ও উত্তেজনায় ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল। 'তাঁর ইচ্ছে ছাড়া তোর মাথার একটা চুলও পড়বে না! শুনেছিস? তার মানে আমি যে পাপ করেছি সেটা তাঁরই ইচ্ছে! বুঝেছিস বুদ্ধু?'

'আরে তুই খেপে গেলি না কি?' ভয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ্ চেঁচিয়ে উঠল। 'তুই আবার কী পাপ করেছিস?'

ইলিয়ার কানের ভেতর ঝাঁঝাঁ করে উঠল, প্রশ্নটা অস্পষ্ট ভাবে তার কানে গেল, সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইয়াকভ্ ও মাশার দিকে তাকাল। ওর উত্তেজনায় ও চেঁচামেচিতে মাশাও ঘাবড়ে গেছে।

'ওটা অমনি কথার কথা বললাম আর কি,' ইলিয়া চাপা গলায় বলল।

'তোর বোধহয় অসুখ করেছে,' মাশা ভয়ে ভয়ে বলল।

'চোখ দুটোও ঘোলা ঘোলা,' ইয়াকভ্ ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল।

ইলিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখের ওপর হাত বুলিয়ে শান্ত স্বরে বলল:

'ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে!..'

কিন্তু লোকজনের সঙ্গ তার কাছে অসহ্য, অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। সে চা না খেয়েই নিজের ঘরে চলে গেল।

ইলিয়া যখন বিছানায় শুয়ে পড়েছে তখন তেরেন্তি হাজির হল। তীর্থে গিয়ে পাপক্ষালনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে কুঁজোর চোখ এখন দিব্যজ্যোতিতে ঝকঝক করে — দেখে মনে হয় সে যেন আসন্ন পাপমুক্তির আনন্দে বিভোর। মুখে একটা মৃদু হাসি নিয়ে সে নিঃশব্দে ভাইপোর বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহের সুরে বলতে লাগল:

'তুই এসে গেছিস দেখে আমি ভাবলাম যাই, একটু আধটু সুখ-দুঃখের কথা বলি। আর ত বেশি দিন আমরা একসঙ্গে থাকছি না!'

'চললে তাহলে?' ইলিয়া নিরস গলায় জিজ্ঞেস করল।

'একটু গরম পড়লেই যাব। ইস্টারের আগেই কিয়েভে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'তাহলে শোন, মাশাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'কো-থায়!' কুঁজো হাত নেড়ে বলে উঠল।

'তুমি তাহলে শোন,' ইলিয়া জোর করে বলল। 'এখানে ওর করার কিছু নেই... তা ছাড়া ওর এই বয়স... ইয়াকভ্, পেত্রুখা... হ্যানা-ত্যানা... বুঝতেই পারছ? এই বাড়িটা সকলের কাছে একটা ফাঁদের মতো — অভিশপ্ত বাড়ি! ও যাক... আর ফিরে না এলে না আসুক।'

'ওকে নিয়ে আমি কোথায় যাব?' তেরেন্তি করুণ সুরে বলল।

'নাও, নাও!' ইলিয়া নাছোড়বান্দা। 'তোমার ঐ একশ'টা রুবলও ওর খরচ বাবদ নিয়ে নাও। আমার দরকার নেই। আর ও তোমার জন্যে প্রার্থনা করবে। ওর প্রার্থনার অনেক দাম আছে।'

কুঁজো অন্যমনস্ক ভাবে ইলিয়ার কথার সুর ধরে বলল:

'অনেক দাম আছে... তা বটে! এটা তুই ঠিক বলেছিস। তবে, তোর টাকা আমি নিতে পারছি না... ও টাকা রাখতেই হবে, যেমন আমরা ঠিক করেছি। আর মাশার ব্যাপারটা — ভেবে দেখা দরকার।'

বলতে বলতে তেরেন্‌তির চোখ হঠাৎ খুশিতে ঝকঝক করে উঠল, ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে সে উৎসাহে ফিসফিস করে বলল:

'ওঃ গতকাল কী লোকেরই যে দর্শন পেলাম তা আর কী বলব! নামজাদা লোক — পিওত্‌র ভাসিলিচ্‌ সিজভ্‌ — নাম শুনেছিস? দারুণ জ্ঞানী লোক! ভগবান নিজেই দয়া করে তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন — আমার মতো পাপী ভগবানের ক্ষমা পাবে কি না এই সন্দেহ থেকে আমার মনকে হালকা করার জন্যেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ইলিয়া চুপচাপ পড়ে রইল। সে মনে মনে চাইছিল কাকা যেন চলে যায়। আধবোঁজা চোখে সে জানলার দিকে তাকাতে সামনে দেখতে পেল উঁচু, অন্ধকার পাঁচিল।

'আমি তাঁর সঙ্গে পাপ নিয়ে, আত্মার উদ্ধার কী করে হয় তা নিয়ে কথা বললাম,' তেরেন্‌তি সোৎসাহে ফিসফিস করে বলে চলল। 'তিনি বললেন: 'বাটালীতে ধার দিতে হলে যেমন পাথর দরকার তেমনি মানুষের জীবনেও দরকার হয় পাপের, যাতে তার আত্মা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সমস্ত পাপের মোচনকারী ঈশ্বরের পদতলে ধূলিকণা হয়ে লুটিয়ে পড়ে।''

ইলিয়া দুষ্ট হাসি হেসে কাকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার ঐ ধর্মজ্ঞানী লোকটা শয়তানের মতো দেখতে নয় ত?'

'ছি-ছি, অমন কথা মুখেও আনিস নে,' তেরেন্‌তি হকচকিয়ে গিয়ে বলে উঠল। 'তিনি ধার্মিক লোক, তাঁর নামডাক এখন তোর ঠাকুর্দার চেয়েও বেশি... ওঃ ইলিয়া, কী বলব!'

ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কুঁজো চুকচুক শব্দ করল।

'ঠিক আছে!' ইলিয়া রূঢ় ভাবে আক্রোশের সুরে বলল। 'আর কী বলল সে?'

ইলিয়া বিশ্রী রকম হাসি হেসে উঠল। কাকার চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব।

'কী ব্যাপার?' ইলিয়ার কাছ থেকে সরে এসে সে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না। তিনি দামী কথাই বলেছেন। একেবারে আমার মনের কথা। আমিও তাই ভাবি — অক্ষরে অক্ষরে তাই ভাবি!'

ইলিয়া চুপ করে গেল, এক দৃষ্টিতে কাকার মুখের দিকে তাকাল, তারপর দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'উনি আরও বললেন,' তেরেন্‌তি সন্তর্পণে আবার বলতে শুরু করল, 'বললেন, পাপ আত্মাকে অনুশোচনার ডানা দেয়, তাকে পরমেশ্বরের আসনের সামনে বয়ে আনে...'

'কাকা, তোমার নিজের চেহারাটাও কিন্তু শয়তানের মতো!' ইলিয়া ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল, নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

বড় একটা পাখি যেমন ডানা ঝাপ্‌টা দেয়, সেই ভাবে কুঁজো অসহায়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে ভয়ে ও অপমানে জড়সড় হয়ে গেল। ইলিয়া বিছানায় উঠে বসে হাত দিয়ে কাকার পাঁজরে ঠেলা মেরে কঠিন স্বরে বলল:

'ছাড় দেখি।'

তেরেন্‌তি ঝট করে লাফিয়ে উঠে কুঁজ ঝাড়া দিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ফ্যালফ্যাল করে ভাইপোর দিকে তাকাল। ইলিয়া তখনও দুহাতের ওপর ভর দিয়ে খাটে বসে আছে, তার কাঁধ দুটো সামান্য উঠে আছে আর মাথাটা নীচু হয়ে ঝুলে পড়ে আছে বুকের ওপর।

'কিন্তু আমি যদি অনুশোচনা না করতে চাই?' ইলিয়া জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'যদি আমি এমন মনে করি যে পাপ আমি করতে চাই নি... আপনা আপনিই ঘটে গেছে... তাই ভগবানের ইচ্ছে... তাহলে আমার ভাবনার কী আছে? তিনি সব জানেন, সব কিছু চালান। এটা তার দরকার না হলে তিনি আমাকে আটকাতে পারতেন। কিন্তু তিনি ত আমাকে আটকালেন না — তার মানে আমি ঠিক কাজই করেছি। সব লোকেই অসৎ পথে জীবনযাপন করে, কেই বা অনুশোচনা করে?'

'তোর কথাবার্তা বুঝতে পারছি না, খ্রীস্ট তোর সহায় হোন!' তেরেন্‌তি হতভম্ব হয়ে বলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ইলিয়া হাসল।

'বুঝতেই যখন পারছ না তখন আমার সঙ্গে কথা বলতে আর এসো না।'

ও আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে কাকাকে বলল:

'শরীরটা খারাপ লাগছে।'

'সেই রকমই দেখতে পাচ্ছি।'

'আমার ঘুমানো দরকার। তুমি যাও!'

একা একা থাকতে থাকতে ইলিয়ার মনে হল যেন তার মাথার ভেতরে একটা ঘূর্ণি পাক খাচ্ছে। এই কয়েক ঘণ্টায় তার যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সবই অদ্ভুত রকম জট পাকিয়ে গেছে, কেমন একটা ভারী, গরম বাষ্পে মিলেমিশে গিয়ে তার মস্তিষ্কে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তার মনে হতে লাগল সে যেন অনেক দিন হলই এ রকম যন্ত্রণা বোধ করছে, যেন সে বুড়োকে আজ খুন করে নি, করেছে অনেক দিন আগে কোন এক সময়।

সে চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল, তার কানে তখনও বাজছে বুড়োর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর:

'আরে এতক্ষণ লাগছে কেন?'

কালো দাড়িওয়ালা ব্যবসাদারের কঠিন কণ্ঠস্বর মাশার অনুনয়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, ইয়াকভের পড়া ধর্মবিরোধী বইয়ের কথাগুলো ধর্মজ্ঞানীর উপদেশের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। সব কাঁপছে, টলমল করছে, নীচের দিকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারলে এ সব ভুলে যাওয়া যেত। ও ঘুমিয়ে পড়ল...

সকালে জেগে উঠতে জানলার ওপারে দেয়ালের গায়ে আলো পড়তে দেখে সে বুঝতে পারল যে দিনটা পরিষ্কার, ঠাণ্ডা। গতকালের সব কথা তার মনে পড়ল, নিজের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করল, অনুভব করল — এখন সে জানে তাকে কী ভাবে চলতে হবে। এক ঘণ্টা বাদে বুকের ওপর বাক্স ঝুলিয়ে সে রাস্তা দিয়ে চলল, বরফ থেকে ঠিকরে পড়া আলোয় চোখ কুঁচকে শান্ত দৃষ্টিতে সামনের লোকজনকে দেখতে লাগল। গির্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে অভ্যাসবশত মাথা থেকে টুপি খুলে ক্রুশ করল। পলুএক্‌তভের বন্ধ দোকানঘরের পাশের ভজন দালানের সামনেও ক্রুশ করল, তারপর এগিয়ে গেল, মনের মধ্যে কোন ভয়, কোন ক্ষোভ, কোন রকম অস্থিরতা অনুভব করল না। দুপুরের খাওয়ার সময় সরাইখানায় বসে বসে সে মহাজনের দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ খবরের কাগজে পড়ল। 'হত্যাকারীর সন্ধানে পুলিশ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে' — এই কথাগুলো পড়তে পড়তে সে হেসে অগ্রাহ্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অপরাধী নিজে ধরা দিতে না চাইলে তাকে কখনই ধরা যাবে না...

সন্ধেবেলা অলিম্পিয়াদার ঝি ইলিয়ার কাছে একটা চিরকুট নিয়ে এলো:

'নয়টার সময় কুজনেৎস্কায়া স্ট্রীটের কোনায় স্নানঘরের কাছে এসো।'

পড়ার পর তার মনে হল গোটা ভেতরটা যেন ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। তার চোখের ওপর ভেসে উঠল প্রণয়িনীর উপেক্ষাভরা চেহারা, কানে বাজতে লাগল কটু, অপমানজনক কথাগুলো:

'আসার আর সময় পেলে না?'

চিরকুটের দিকে তাকাতে তাকাতে সে ভাবতে লাগল কেন অলিম্পিয়াদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এর কারণটা ভাবতেও তার ভয় করছিল, হৃৎপিন্ডটা আবার উদ্বেগে ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠল। নয়টার সময় সে সাক্ষাতের জায়গায় এসে হাজির হল। মেয়েরা কেউ জোড়ায় জোড়ায় কেউ বা একা একা স্নানঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের মধ্যে অলিম্পিয়াদার দীর্ঘ আকৃতি দেখতে পেয়ে ওর উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। অলিম্পিয়াদার গায়ে ছিল একটা পুরনো ধরনের পশুলোমের কোট আর মাথাটা রুমাল দিয়ে এমন ভাবে জড়ানো যে ইলিয়া কেবল তার চোখ দেখতে পেল। ইলিয়া কোন কথা না বলে তার সামনে এগিয়ে এলো।

'চল!' বলেই অলিম্পিয়াদা মৃদু স্বরে যোগ করল, 'কোটের কলার দিয়ে মুখটা আড়াল করে নাও।'

যেন লজ্জায় মুখ ঢাকছে এ রকম ভাব করে ওরা স্নানঘরের করিডর পেরিয়ে একটা আলাদা কামরায় গিয়ে গা ঢাকা দিল। অলিম্পিয়াদা তৎক্ষণাৎ মাথার রুমাল ছুঁড়ে ফেলে দিল। হিমের আঘাতে ঈষৎ রক্তিম তার মুখে শান্ত ভাব দেখে ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হল আবার সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করল যে অলিম্পিয়াদাকে এত শান্ত দেখতে তার ভালো লাগছিল না। অলিম্পিয়াদা তার পাশে সোফার ওপর বসল।

'বুঝলে গো আদুরে, শিগ্গিরই গোয়েন্দা পুলিশের কাছে তোমার আর আমার ডাক পড়ছে,' ইলিয়ার মুখের দিকে গদগদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল।

'কেন?' হাতের তালু দিয়ে গোঁফের ওপরের গলা তুষারকণা মুছতে মুছতে ও জিজ্ঞেস করল।

'আহা কী ন্যাকা রে আমার — ভান করা হচ্ছে!' ঠাট্টা করে মৃদু স্বরে অলিম্পিয়াদা বলে উঠল।

ও ভুরু কোঁচকাল, ফিসফিস করে ইলিয়াকে বলল:

'আমার ওখানে আজ এক গোয়েন্দা এসেছিল।'

ইলিয়া তার দিকে তাকিয়ে বিরস কণ্ঠে বলল:

'গোয়েন্দা পুলিশই বল আর তোমার কাজকর্মই বল — ও সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে ডেকেছ কেন তা সরাসরি বল না?'

অলিম্পিয়াদা তাচ্ছিল্যভরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল: 'ও, মনে লেগেছ বুঝি! তা আমার বাপু এখন ও সবের সময় নেই। যা বলি শোন: গোয়েন্দা পুলিশ তোমাকে ডেকে পাঠাবে, জিজ্ঞেস করবে, আমার সঙ্গে তোমার কবে থেকে আলাপ, প্রায়ই আমার কাছে আসতে কি না — সব ঠিক ঠিক বলবে, সত্যি কথা বলবে — শুনছ?'

'শুনছি!' ইলিয়া হেসে বলল।

'বুড়োর কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে তুমি ওকে কখনও দেখ নি। ওর সম্পর্কে জান না। আমি যে কারও রক্ষিতা হয়ে ছিলাম তা তোমার জানা ছিল না — বুঝেছ?'

অলিম্পিয়াদা জাঁকাল ভঙ্গিতে, কটমট করে তার দিকে তাকাল। ইলিয়া মনের মধ্যে একটা জ্বালা ও আনন্দ অনুভব করল। তার মনে হল অলিম্পিয়াদা তাকে ভয় পাচ্ছে। ইলিয়ার ইচ্ছে করল ওকে কিছুটা যন্ত্রণা দেয়, তাই চোখ কুঁচকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিঃশব্দে হাসতে লাগল, কোন কথা বলল না। তাতে অলিম্পিয়াদা কেঁপে উঠল, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সে ইলিয়ার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল।

'অমন করে তাকাচ্ছ কেন? কী হল ইলিয়া?' সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া দাঁত বার করে বলল, 'আচ্ছা বল দেখি, আমি মিথ্যে বলব কেন? বুড়োকে ত তোমার ওখানে দেখেছি।'

একটা বিষণ্ণতা ও ক্রোধ হঠাৎ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে সে শান্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলে চলল:

'ওকে যখন দেখলাম তখনই আমি ভাবলাম — এই লোকটাই আমার পথের কাঁটা, এই আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। তখন ওকে খুন না করলে...'

'মিথ্যে কথা!' অলিম্পিয়াদা চিৎকার করে বলল, টেবিলে হাত ঠুকল। 'মিথ্যে কথা বলছ! ও তোমার পথে কাঁটা দেয় নি...'

'সে কী কথা?' ইলিয়া কঠিন স্বরে বলল।

'দেয় নি। তুমি চাইলেই ওর হাত থেকে ছাড়া পেতে পারতাম। আমি কি তোমাকে এমন ইঙ্গিত দিই নি, এমন কথা কি বলি নি যে যখন তখন ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি? তুমি চুপ করে থেকেছ, হেসেছ — তুমি আমাকে কখনই সত্যি করে ভালোবাস নি... তুমি নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ওর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলে।'

'খবরদার! মুখ সামলে!' ইলিয়া বলল। সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু অলিম্পিয়াদার ভর্ৎসনায় সে মনে মনে আহত হয়ে আবার বসে পড়ল।

'চুপ করব কেন শুনি?' অলিম্পিয়াদা বলল। 'আমার ভালোবাসার ধন, তুমি জোয়ান, সবল, আমার জন্যে কী তুমি করেছ? একবার যদি বলতে, বেছে নাও অলিম্পিয়াদা — হয় আমি, না হয় ও। কিন্তু তুমি — তুমি হলে রক্ষিতার পোষা হুলো বেড়াল, কোন তফাৎ নেই...'

ইলিয়া অপমানে কেঁপে উঠল, চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে লাগল, ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এলো, আবার সে উঠে দাঁড়াল।

'এত বড় কথা!'

'ও, মারবে না কি?' অলিম্পিয়াদা খেপে গিয়ে বলল, তার চোখ দুটো ঝলকে উঠল, সেও দাঁত খিঁচাল। 'মার দেখি কেমন! আমিও দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলব, তুমি খুন করেছ, আমার কথায় তুমি খুন করেছ। মেরেই দেখ না!'

ইলিয়া ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে তার বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে উঠল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সে ভাব কেটে গেল।

ও আবার সোফায় বসে পড়ল, একটু চুপ করে থেকে চাপা হাসি হাসল। ও দেখল অলিম্পিয়াদা ঠোঁট কামড়াচ্ছে, ভাপ আর সাবানের ভ্যাপসা গন্ধে পরিপূর্ণ নোংরা ঘরটার মধ্যে চোখ দিয়ে কিসের যেন সন্ধান করছে। এবারে সে স্নানঘরের দরজার পাশে আরেকটা সোফার ওপর বসে পড়ে মাথা নীচু করে রইল।

'হাস, শয়তান কোথাকার!'

'হাসবই ত।'

'তোমাকে যখন প্রথম দেখলাম তখন ভাবলাম এই ত পেয়েছি। ও আমার সহায় হবে।'

'লিপা!' ইলিয়া মৃদু স্বরে বলল।

অলিম্পিয়াদা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল, উত্তর দিল না।

'লিপা!' ইলিয়া আবার বলল। এবারে তার মনে হল সে যেন নীচে কোথাও ছিটকে পড়ে গেল — সে ধীরে ধীরে বলল, 'বুড়োকে কিন্তু আমিই খুন করেছি, ভগবানের দিব্যি — আমি!'

অলিম্পিয়াদা আঁতকে উঠল। মাথা তুলে বড় বড় বিস্ফারিত চোখে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করল:

'বোকা!'

ইলিয়া বুঝতে পারল ও তার কথায় ভয় পেয়েছে, কিন্তু কথার সত্যতায় বিশ্বাস করছে না। ইলিয়া উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল, পাশে এসে বসে বিভ্রান্তের মতো হাসতে লাগল। হঠাৎ অলিম্পিয়াদা ওর মাথাটা জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে ধরল, চুলে চুমু খেল।

'কেন আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ? ও যে খুন হয়েছে তাতে আমি খুশি,' ভারী, কর্কশ স্বরে ফিসফিস করে ও বলল।

'কাজটা আমিই করেছি,' মাথা নাড়িয়ে ইলিয়া বলল।

'চুপ্!' উদ্বিগ্ন হয়ে ও বলল। 'লোকটা খুন হওয়াতে আমি খুশি — ওদের সকলেরই এই গতি হওয়া উচিত — ওরা, যারা আমার কাছে ঘেঁষতে আসে। কেবল তুমি — তুমিই মানুষের মতো মানুষ, আমার সারা জীবনে এই প্রথম এমন মানুষ দেখলাম, লক্ষ্মী সোনা আমার!'

ওর কথাগুলো ইলিয়াকে একটু একটু করে কাছে টেনে আনতে লাগল। ইলিয়া আরও শক্ত করে ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজল, তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না, তাকে স্বীকার করতে হল যে তার একান্তই আপন এই নারীটি তার কাছে এখন আগের চেয়েও বেশি দরকারি।

'তুমি যখন রাগ করে আমার দিকে তাকাও তখন তোমার পরিপাটি চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারি কী নোংরা আমার এই জীবনটা আর তাই ত তোমাকে ভালোবাসি — ভালোবাসি তোমার অহঙ্কারের জন্যে।'

ইলিয়ার মাথার ওপর অঝোর ধারায় চোখের জল ঝরতে লাগল, তার স্পর্শ অনুভব করে সে নিজেও অনায়াসে কেঁদে ফেলল, স্বস্তি অনুভব করল।

অলিম্পিয়াদা নিজের বুকের ওপর থেকে ওর মাথাটা উঁচু করে ধরল, ওর ভিজে চোখে, গালে আর ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে বলল:

'আমি জানি — আমার রূপ তোমাকে যাদু করে রেখেছে, কিন্তু মনেপ্রাণে তুমি আমাকে ভালোবাস না, আমাকে ভালো চোখে দেখ না। আমার এই জীবনের জন্যে আর ঐ বুড়োর জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না।'

'ওর কথা আর বলো না,' ইলিয়া বলল। অলিম্পিয়াদার মাথার রুমালে নিজের মুখ মুছে ও উঠে দাঁড়াল।

'যা হওয়ার তা হবে!' শান্ত ও দৃঢ় স্বরে ও বলল। 'ভগবান যদি কাউকে শাস্তি দেবেন বলে মনে করেন তাহলে সর্বত্রই তিনি তার নাগাল পাবেন। তুমি যা বললে তার জন্যে ধন্যবাদ, লিপা। তুমি ঠিকই বলেছ — আমি তোমার কাছে অপরাধী। তুমি যে এমন... তা আমি ভাবি নি। কিন্তু তুমি — তুমি... এক কথায়, আমি অপরাধী।'

ওর গলা বন্ধ হয়ে এলো, ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখে রক্তের আভা খেলে গেল। ধীরে ধীরে কাঁপা কাঁপা হাতে ও এলোমেলো চুলে হাত বুলাল। তারপর হঠাৎ বিরক্তির ভঙ্গিতে হাত নেড়ে অবসন্ন সুরে ডুকরে কেঁদে উঠল:

'আমারই দোষ! কেন? কেন?'

অলিম্পিয়াদা ওর হাত চেপে ধরল, ইলিয়া তার পাশে সোফার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল।

'জান, আমি ওকে খুন করেছি, আমি!' অলিম্পিয়াদার কোন কথা কানে না তুলে ইলিয়া বলল।

'চুপ্ চুপ!' অলিম্পিয়াদা শিউর উঠে অর্ধস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে বলল। 'অমন কথা বলতে নেই।'

ভয়ে অলিম্পিয়াদা চোখে অন্ধকার দেখল, আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে ইলিয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে সে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'দাঁড়াও, বলছি। ব্যাপারটা হঠাৎই হয়ে গেল। ভগবান জানেন কী করে ঘটল। আমার কিন্তু সে রকম ইচ্ছে ছিল না। আমার ইচ্ছে ছিল ওর মুখটা একটু দেখি, তাই দোকানে ঢুকলাম। মাথায় বিশেষ কোন মতলবই ছিল না।

তারপর — হঠাৎ! শয়তান আমাকে ঠেলে দিল, ভগবান বাধা দিলেন না। টাকাগুলো অমনি অমনি নিলাম... কোন দরকার ছিল না... এঃ!'

বুক থেকে যেন ভারী একটা কিছু নেমে গেল অনুভব করে ও বুক ভরে নিশ্বাস নিল। অলিম্পিয়াদা কাঁপতে কাঁপতে ওকে আরও শক্ত করে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে ধরল, ফিসফিস করে টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কথা বলে চলল:

'টাকা নিয়ে ভালোই করেছ। তার মানে — ডাকাতি... তা না হলে লোকে ভাবত এটা রেষারেষির ব্যাপার।'

'আমি দোষ কবুল করতে যাচ্ছি না,' ইলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলল। 'শাস্তি দিতে হয় ভগবান দিন... লোকে বিচারক নয়। তারা বিচার করার কে?... এমন লোক কাউকে জানি না যে পাপ করে নি... এমন লোক দেখি নি।'

'হা ভগবান!' অলিম্পিয়াদা নিশ্বাস ফেলে বলল। 'ওগো, কী হবে এখন?.. আমি কিছু বুঝতে পারছি না... বলতে পারছি না, ভাবতেও পারছি না। এখান থেকে আমাদের এখন বেরিয়ে যাওয়া দরকার।'

অলিম্পিয়াদা উঠে দাঁড়াল, তার পা দুটো মাতালের মতো টলে উঠল। রুমাল দিয়ে মাথাটা জড়িয়ে নিয়ে সে হঠাৎই শান্ত স্বরে বলল:

'এখন কী হবে ইলিয়া? আর কি কোন আশাই নেই?'

ইলিয়া একথায় আপত্তি করে মাথা নাড়াল।

'তাহলে তুমি... ঠিক যেমন হয়েছিল তেমনি বলো গোয়েন্দা পুলিশকে।'

'তাই বলব... তোমার কি ধারণা নিজেকে বাঁচানোর মতো ক্ষমতা আমার নেই? তোমার কি ধারণা যে ঐ বুড়োটার জন্যে আমি ঘানি টানতে যাব? আমি মোটেই হাল ছাড়ছি না! মোটেই না — বুঝলে?'

উত্তেজনায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ দুটো চকচক করতে লাগল।

অলিম্পিয়াদা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল:

'টাকা বলতে ত মাত্র দুহাজার?'

'দুহাজার কত যেন...'

'বেচারি! এখানেও কোন লাভ করতে পারলে না!' অলিম্পিয়াদা দুঃখ করে বলল, ওর চোখে জল চিকচিক করে উঠল।

ইলিয়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বাঁকা হাসি হাসল।

'আমি কি টাকার জন্যে করেছি? আমার কথাটা বুঝতে পারছ না?...

দাঁড়াও আমাকে আগে বেরোতে দাও... সব সময় পুরুষ মানুষই আগে বের হয়।'

'তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির আমার কাছে এসো... আমাদের লুকোচুরির কোন দরকার নেই... শিগ্‌গির আসবে!' অলিম্পিয়াদা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমু খেল। ইলিয়া বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় বেরিয়ে সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিল। যেতে যেতে বার বার পেছন দিয়ে দেখতে লাগল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না। অলিম্পিয়াদার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ইলিয়ার মনটা হালকা হয়ে গেছে, ইলিয়া এখন ওর ওপর প্রসন্ন। ইলিয়া যখন খুনের কথা ওর কাছে স্বীকার করল তখন কিন্তু না কথায় না হাবভাবে ইলিয়ার মনে কোন আঘাত ও দেয় নি, তাকে দূরে সরিয়ে ত দেয়ই নি, বরং তার পাপের একটা ভাগের দায় যেন নিজের বলে গ্রহণ করেছে। সেই আবার এক মিনিট আগেই, ইলিয়ার অপরাধের কথা তখন পর্যন্ত না জেনেই, তার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, আর ক্ষতি করতও — অলিম্পিয়াদার মুখ দেখেই ইলিয়া তা বুঝতে পেরেছিল... অলিম্পিয়াদার কথা ভাবতে ভাবতে ইলিয়া স্নিগ্ধ হাসি হাসল। পর দিন ইলিয়ার মনে হল সে যেন একটা বন্য জন্তু — শিকারিরা তার পিছু নিয়েছে।

সকালে সরাইখানায় পেত্রুখার সঙ্গে তার দেখা। ইলিয়া তাকে নমস্কার জানাতে সে তার উদ্দেশে মাথা নোয়াল, সেই সঙ্গে তার দিকে কেমন যেন একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। তেরেন্‌তিও তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কোন কথা বলল না। ইয়াকভ্‌ মাশার ডেরায় ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত স্বরে বলল:

'গতকাল সন্ধ্যায় এক পুলিশ অফিসার এসেছিল, তোর সম্পর্কে নানা কথা বাবাকে জিজ্ঞেস করল... কী ব্যাপার রে?'

'কী জিজ্ঞেস করল?' ইলিয়া বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তোর হালচাল কেমন... ভোদকা খাস কি না... মেয়েদের সঙ্গে নটঘট আছে কি না। কোন এক অলিম্পিয়াদার নাম করল — জানেন কী? — জিজ্ঞেস করল। কী ব্যাপার রে?'

'আমি তার কী জানি ছাই?' এই বলে ইলিয়া চলে গেল।

ঐ দিনই সন্ধেবেলা সে অলিম্পিয়াদার কাছ থেকে আরও একটি চিরকুট পেল। সে লিখেছে:

'তোমার সম্পর্কে আমাকে জেরা করেছে। সব কিছু সবিস্তারে বলেছি। ভয়ের কিছুই নেই, খুব সাদাসিধে ব্যাপার। ঘাবড়িও না। চুমু নিও, সোনা আমার!'

ইলিয়া চিরকুটটাকে আগুনে ফেলে দিল। ফিলিমোনভের বাড়িতে এবং সরাইখানায় সকলে মহাজন হত্যার কথা বলাবলি করতে লাগল। সেই সব বিবরণ শুনতে শুনতে ইলিয়া বিশেষ করে কী একটা যেন আনন্দ পায়। তার ভালো লাগত লোকজনের মাঝখানে ঘুরে ঘুরে ঘটনা সম্পর্কে ওদেরই মনগড়া বিশদ বিবরণ জিজ্ঞেসবাদ করে শুনতে। সে মনে মনে এমন একটা শক্তি অনুভব করত যে এখন ইচ্ছে করলে সে ওদের সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে যদি একবার বলে, 'এটা আমার কাজ!'

কেউ কেউ লোকটার দক্ষতা ও সাহসের প্রশংসা করল, কেউ কেউ আফশোস করল সে সব টাকা সরানোর অবসর পায় নি বলে, কারও কারও আশঙ্কা হল ধরা না পড়লে হয়। মহাজনের জন্য কিন্তু কারোই দুঃখ হল না, কেউই তার সম্পর্কে ভালো কিছু বলল না। লোকজনের মধ্যে নিহত লোকটির প্রতি দরদের চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে ওর মনে তাদের সম্পর্কে হিংস্র উল্লাসের অনুভূতি জেগে উঠল। ও পলুএক্‌তভের কথা ভাবছিল না, কেবল ভাবছিল একটা গুরুতর পাপ সে করে ফেলেছে আর তার প্রতিফল তাকে শিগ্‌গিরই পেতে হবে। এই ভাবনা কিন্তু ওকে উদ্বিগ্ন করল না, তা ওর মনের মধ্যে জমাট বেঁধে রয়ে গেল, রয়ে গেল তার মনের একটা অংশ হয়ে। আঘাত পেয়ে কোন জায়গা ফুলে গেলে যেমন হয় এও তেমনি — স্পর্শ না করলে ব্যথা টের পাওয়া যায় না। ইলিয়ার গভীর বিশ্বাস ছিল যে এমন এক সময় আসবে যখন ভগবান তাকে শাস্তি দেবেন—তিনি সব জানেন, আইন ভঙ্গকারী অপরাধীকে তিনি ছেড়ে দেবেন না। যে কোন মুহূর্তে প্রতিফল গ্রহণের এই স্থির ও দৃঢ় প্রস্তুতির ফলে ইলিয়া মনের মধ্যে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য অনুভব করল না। কেবল সে আরও পরছিদ্রান্বেষী হয়ে দাঁড়াল।

ইলিয়া আগের চেয়েও গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল, তবে আগের মতোই সে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত জিনিস নিয়ে শহরে ঘোরে, সরাইখানায় বসে, লোকজনকে লক্ষ্য করে, তাদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে। এক দিন চিলেকোঠায় পুঁতে রাখা টাকার কথা তার মনে পড়ে গেল, তার মনে হল ওগুলোকে অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলা দরকার, কিন্তু তখনই আবার মনে

মনে বলল, 'দরকার নেই। ওখানেই থাক... খানাতল্লাসি হলে খুঁজে পাবে — তখন স্বীকার করব!'

কিন্তু খানাতল্লাসি হল না, তদন্তকারীর কাছে তার তলবও আর পড়ে না। কেবল ছয় দিনের দিন তলব পড়ল। তদন্তকারীর কাছে যাওয়ার আগে ইলিয়া পরিষ্কার জামাকাপড় পরল, সবচেয়ে ভালো কোটটা গায়ে চাপাল, জুতোজোড়া ঝকঝকে পালিশ করল। সে একটা স্লেজগাড়ি ভাড়া নিল। গাড়ি উঁচুনীচু জায়গায় ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলল, ইলিয়া চেষ্টা করল সোজা ও স্থির হয়ে বসে থাকতে, কেননা তার ভেতরের সব কিছু এমন টানটান হয়ে ছিল যে তার মনে হচ্ছিল একটু অসতর্ক ভাবে নড়েচড়ে উঠলেই বুঝিবা মন্দ একটা কিছু ঘটে যায়। এই কারণে তদন্তকারীর কামরায় ঢোকার পথে সিঁড়ি দিয়েও সে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে — যেন ওর গায়ে আছে কাচের পোশাক।

তদন্তকারী অফিসারটি যুবক, তার মাথার চুল কোঁকড়া, নাক বাঁকা, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ইলিয়াকে দেখে সে প্রথমে নিজের রোগা রোগা সাদা হাত দুটো জোরে জোরে ঘসে নিল, তারপর নাক থেকে চশমা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বড় বড় কালো দুচোখ মেলে ইলিয়ার মুখ ভালো করে দেখতে লাগল। ইলিয়া কোন কথা না বলে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল।

'নমস্কার! বসুন... এই এখানে বসুন।'

এই বলে সে লাল টকটকে বনাতে ঢাকা বিরাট টেবিলের পাশে একটা চেয়ার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। ইলিয়া বসল, টেবিলের কিনারায় কিসের যেন কতকগুলো কাগজ পড়ে ছিল, সেগুলোকে সে সন্তর্পণে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর তা লক্ষ্য করে ভদ্র ভাবে কাগজগুলো সরিয়ে রাখল, তারপর ইলিয়ার মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল। একটা বইয়ের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে সে আড়চোখে চুপচাপ ইলিয়ার দিকে তাকাতে লাগল। এই নীরবতা ইলিয়ার ভালো লাগল না তাই সে ইন্‌স্পেক্টরের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল — এই প্রথম সে এমন চমৎকার আসবাবপত্র ও পরিচ্ছন্নতা দেখছে। দেয়ালে ফ্রেমে বাধানো প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ছবি ঝুলছে। তার একটিতে আঁকা রয়েছে খ্রীস্ট। মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ মনে, একা একা খ্রীস্ট চলেছেন কোন এক

ধ্বংসস্তূপের মাঝখান দিয়ে, তার পায়ের কাছে সর্বত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে মৃতদেহ, অস্ত্রশস্ত্র, ছবির পটভূমিতে আছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী — কী যেন জ্বলছে। ইলিয়া অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে ছবিটা দেখল, বুঝতে চেষ্টা করল এর অর্থ কী, এমনকি তার ইচ্ছে হল এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে কিন্তু ঠিক সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর দড়াম্‌ করে বইটা বন্ধ করল। ইলিয়া চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। ইন্‌স্পেক্টরের মুখের ভঙ্গি এখন কঠিন ও নীরস দেখাচ্ছে, ঠোঁট দুটো এখন হাস্যকর ভাবে ঠিক যেন অভিমানে ফুলে উঠেছে।

'তারপর,' সে আঙ্গুল দিয়ে টেবিলের ওপর টোকা মেরে বলল, 'ইলিয়া ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌ লুনিয়োভ — তাই ত?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বুঝতে পারছেন আপনাকে ডাকা হয়েছে কেন?'

'না,' জবাব দিয়ে ইলিয়া আবার ছবিটার দিকে এক ঝলক তাকাল। ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই, এখানে সবই ঝকঝকে তকতকে, সুন্দর — এমন পরিচ্ছন্নতা আর এত বেশি সুন্দর জিনিসপত্র ইলিয়া আগে কখনও দেখে নি। ইন্‌স্পেক্টরের গা থেকে কিসের যেন একটা মধুর ঘ্রাণ ভেসে আসছে। সব কিছু মিলে ইলিয়ার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে থাকে, তার মন শান্ত হতে থাকে, মনে মনে ঈর্ষা জেগে ওঠে, সে ভাবে, 'ইস্‌, কেমন দিব্যি আছে দেখ দেখি! চোর-বাটপার আর খুনে ধরায় বেশ লাভ আছে দেখছি! ওর মাইনে কত হতে পারে?'

'না?' ইন্‌স্পেক্টর যেন অবাক হয়ে গিয়ে ওর কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'অলিম্পিয়াদা দানিলভ্‌না কি আপনাকে কোন খবর দেয় নি?'

'না। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা নেই।'

তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর ঝট করে চেয়ারের পিঠে হেলান দিল আবার ঠোঁটজোড়া টেনে হাস্যকর একটা ভঙ্গি করল।

'কত দিন হবে?'

'তা বলতে পারছি না। দিন আট, নয়, সম্ভবত...'

'অ! আচ্ছা, বলুন ত বুড়ো পলুএক্‌তভকে কি ওর বাড়িতে প্রায় দেখতে পেতেন?'

'যে খুন হয়েছে তার কথা বলছেন ত?' তদন্তকারীর চোখের দিকে চেয়ে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।'

'কখনও দেখি নি।'

'কখনই দেখেন নি? হুম্...'

'দেখি নি।'

লোকটা তাচ্ছিল্যভরে দ্রুত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল কিন্তু ইলিয়া কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে, বিশেষ করে মন্থর গতিতে উত্তর দিচ্ছে দেখে সে অধীর হয়ে টেবিলের ওপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারতে থাকে।

'অলিম্পিয়াদা দানিলভ্না যে পলুএক্তভের রক্ষিতা ছিল তা কি আপনি জানতেন?' চশমার ফাঁক দিয়ে ইলিয়ার চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে সে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল।

সে দৃষ্টির সামনে ইলিয়া লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল, ও মনে মনে অপমানিত বোধ করল।

'না,' নিরাসক্ত কণ্ঠে ইলিয়া জবাব দিল।

'হ্যাঁ, সে ছিল পলুএক্তভের রক্ষিতা,' ইন্স্পেক্টর ঝাঁঝাল সুরে আবার বলল। 'ব্যাপারটা ভালো নয় বলেই কিন্তু আমার মনে হয়, কী বলেন?' ইলিয়া কোন উত্তর দিতে গরজ করছে না দেখে সে যোগ করল।

'ভালোর আর কী আছে?' ইলিয়া মিনমিন করে বলল।

'ঠিক কথা বলি নি?'

কিন্তু ইলিয়া আবার কোন উত্তর দিল না।

'আপনি কি তাকে অনেক দিন হল চেনেন?'

'এক বছরের ওপরে।'

'তার মানে পলুএক্তভের সঙ্গে তার পরিচয়ের আগে থেকেই তাকে আপনি চেনেন?'

'বড় চালু কুত্তা ত!' — ইলিয়া মনে মনে ভাবল, সে সুস্থির চিত্তে উত্তর দিল:

'তা জানব কী করে যখন আমার জানাই ছিল না যে সে পলুএক্তভের সঙ্গে বাস করত?'

ইন্স্পেক্টর ঠোঁটজোড়া ছুঁচাল করে শিস দিল, কী একটা কাগজের ওপর চোখ বুলাতে লাগল। ইলিয়ার দৃষ্টি আবার গিয়ে পড়ল ছবিটির ওপর, সে অনুভব করছিল এতে তার মনের অস্থিরতা কেটে যাচ্ছে। কোথা

থেকে যেন বাচ্চার খিলখিলে গলার সুরেলা আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর উল্লসিত ও গদগদ এক নারীকণ্ঠ টানাটানা সুরে গেয়ে উঠল:

জাদু রে আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, মানিক আমার!..

'এই ছবিটা আপনার খুব মনে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে?' ইন্‌স্পেক্টরের গলা শোনা গেল।

'খ্রীস্ট কোথায় চলেছেন?' ইলিয়া শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

ইন্‌স্পেক্টর হতাশ হয়ে উদাস দৃষ্টিতে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকাল, একটু চুপ করে থেকে বলল:

'দেখতে পাচ্ছেন, উনি পৃথিবীতে নেমে এসে দেখছেন লোকে তাঁর স্বর্গীয় নির্দেশ কেমন পালন করছে। লড়াইয়ের ময়দানের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখছেন চার দিকে নিহত লোকজন, বাড়ি-ঘরের ধ্বংসস্তূপ, অগ্নিকান্ড, লুঠতরাজ।'

'স্বর্গ থেকে উনি কি এটা দেখতে পান না?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হুম্... এ রকম আঁকা হয়েছে আরও জোর দিয়ে দেখানোর জন্যে, জীবন আর খ্রীস্টের শিক্ষার মধ্যে অসঙ্গতি দেখানোর উদ্দেশ্যে।'

এক ঝাঁক নাছোড়বান্দা মাছির মতো আবার কতকগুলো ছোট ছোট, নগণ্য প্রশ্ন ইলিয়াকে ছেঁকে ধরল। তারা যে তার মনোযোগকে বিভ্রান্ত করে, এই শূন্যগর্ভ, একঘেয়ে বাজে কথা যে তার সতর্কতাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় তা অনুভব করে সে ক্লান্ত বোধ করে এবং ইন্‌স্পেক্টর যে তাকে ক্লান্ত করছে একথা বুঝতে পেরে সে তার ওপর রেগে যায়।

ইন্‌স্পেক্টর এবারে যেন নেহাৎই প্রসঙ্গক্রমে চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে পারেন বৃহস্পতিবার বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম,' ইলিয়া বলল।

'আচ্ছা! কোন দোকানে? কোথায়?'

''প্লেভ্‌নায়'।'

'আপনি এমন নির্ভুল হয়ে কী ভাবে বলছেন যে ঠিক সে সময়ই চায়ের দোকানে ছিলেন?'

ইন্‌স্পেক্টরের মুখের পেশীতে কুঞ্চন দেখা দিল, সে টেবিলের ওপর বুক ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটির লক্ষ্য ইলিয়ার চোখজোড়ার ওপর যেন স্থির হয়ে রইল। ইলিয়া কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর সে নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল:

'চায়ের দোকানে যাওয়ার আগে আমি একজন পুলিশের লোকের কাছে কটা বাজে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

ইন্‌স্পেক্টর আবার চেয়ারের পিঠে হেলান দিল, পেন্সিল নিয়ে নিজের নখের ওপর টোকা মারল।

'পুলিশের লোকটা আমাকে বলল, একটা বেজে গেছে, কুড়ি মিনিট কিংবা ঐ রকম একটা কিছু হবে,' ইলিয়া ধীরে ধীরে বলল।

'লোকটা আপনাকে জানে?'

'তা জানে।'

'আপনার নিজের কি ঘড়ি নেই?'

'নেই।'

'ওর কাছে আগেও কি কখনও আপনি সময় জিজ্ঞেস করেছেন?'

'তা কখনও কখনও করেছি।'

''প্লেভ্‌নায়' অনেকক্ষণ বসেছিলেন?'

'খুনের খবর নিয়ে চেঁচামেচি হওয়ার আগে পর্যন্ত।'

'তারপর কোথায় গেলেন?'

'খুনের ব্যাপারটা দেখতে গেলাম।'

'ঐ জায়গায়, মানে দোকানের কাছে আপনাকে কেউ দেখেছিল কি?'

'সেই একই পুলিশের লোক দেখেছে... সে আমাকে ওখান থেকে তাড়িয়েও দেয়... ধাক্কা দেয়।'

'চমৎকার!' ইন্‌স্পেক্টর অনুমোদনের সুরে বলে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই অনেকটা যেন অমনি অমনিই জিজ্ঞেস করছে এমন ভান করে ইলিয়ার দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি যে পুলিশ কনস্টেবলের কাছে সময় জিজ্ঞেস করলেন তা খুনের আগে, না পরে?'

প্রশ্নটা ইলিয়া ধরে ফেলল। চেয়ারে বসা অবস্থায় সে রাগে চোখ ধাঁধানো সাদা শার্ট পরা এই লোকটির দিকে ফিরে তাকাল, ইলিয়ার চোখে পড়ল ওর

সর্ সর্ আঙ্গুল আর পরিষ্কার ছাঁটা নখ, ওর চশমার সোনার ফ্রেম আর গভীর কালো চোখজোড়া।

'তা আমি কী করে জানব?' ইলিয়া উত্তরে বলল।

ইন্‌স্পেক্টর শুকনো কাশি কাশল, হাতের আঙ্গুল মটকাল।

'চমৎকার!' অসন্তুষ্ট স্বরে সে বলল। 'খাসা! আরও কয়েকটা প্রশ্ন।'

এবারে ইন্‌স্পেক্টর কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে এবং আগ্রহজনক কিছু শোনার আশা বোধহয় ছেড়ে দিয়েই একঘেয়ে সুরে প্রশ্ন করে যেতে লাগল; ইলিয়াও উত্তর দিতে গিয়ে বার বার অপেক্ষা করতে থাকে সময়ের ব্যাপারে যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই ধরনের প্রশ্ন বুঝি আবার করা হয়। একেকটি কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে কেমন যেন শূন্যগর্ভ আওয়াজ উঠছিল, যেন সেখানে টান টান করে বাঁধা তারে আঘাত লাগছিল। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর এখন আর তাকে কুটিল প্রশ্ন করল না।

'ঐ দিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভেড়ার চামড়ার কোট আর কালো ফারের টুপি পরা লম্বা কোন লোককে দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন নি?'

'না,' ইলিয়া কঠিন স্বরে বলল।

'ঠিক আছে, এবারে আপনি যে এজাহার দিয়েছেন তা ভালো করে শুনুন, পরে সই করবেন,' এই বলে লেখা কাগজের আড়ালে মুখ রেখে সে একঘেয়ে সুরে হড়বড় করে সেটা পড়তে লাগল, পড়া হয়ে গেলে ইলিয়ার হাতে কলম গুঁজে দিল। ইলিয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সই করল, ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ইন্‌স্পেক্টরের দিকে তাকিয়ে অবসন্ন অথচ দৃঢ় স্বরে বলে উঠল:

'চলি তাহলে।'

লোকটি বিশেষ কোন নজর না দিয়ে নবাবী চালে মাথাটা সামান্য নাড়িয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে শুরু করল। ইলিয়া দাঁড়িয়ে রইল ইলিয়ার ইচ্ছে করছিল যে-লোকটা তাকে এতক্ষণ যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাকে সে কিছু একটা বলে। নিঃশব্দতার মধ্যে শোনা যাচ্ছিল কলমের খসখস শব্দ ভেতরের ঘর থেকে ভেসে আসছিল গানের কলি:

ছোট্ট পুতুল, পুতুল সোনা, নাচ ত দেখি...

'কী ব্যাপার?' ইন্‌স্পেক্টর হঠাৎ মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না,' ইলিয়া থমথমে মুখে বলল।

'আমি আপনাকে বললাম ত — যেতে পারেন।'

'যাচ্ছি।'

ওরা কটমট করে এ ওর দিকে তাকাল, ইলিয়ার মনে হল তার বুকের মধ্যে ভারী, ভয়ঙ্কর কী যেন একটা বেড়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ঘুরে গিয়ে ও আর দেরি না করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা খেয়ে সে অনুভব করল তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। আধঘণ্টা বাদে সে অলিম্পিয়াদার কাছে এসে হাজির হল। অলিম্পিয়াদা আগেই জানলা দিয়ে ওকে বাড়ির দিকে আসতে দেখে নিজে দরজা খুলে দিল। অলিম্পিয়াদা একেবারে খুশিতে ডগমগ হয়ে ইলিয়াকে অভ্যর্থনা জানাল। তার মুখ ফ্যাকাসে, চোখ দুটি বিস্ফারিত, সে অস্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

'এই ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছ!' অলিম্পিয়াদা বলে উঠল, যখন ইলিয়া তাকে জানাল যে তদন্তকারীর কাছ থেকে সোজা এখানে চলে এসেছে। 'এই ত চাই! তা সে কী বলল?'

'ঠগ!' আক্রোশ প্রকাশ করে ইলিয়া বলল। 'ফাঁদ পেতেছিল!'

'সেটা ত ওকে করতেই হবে,' অলিম্পিয়াদা তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলল। 'ওর চাকরিই তাই।'

'সোজা কথা বল না বাপু — এই এই ব্যাপার, এই এই কারণে তোমার ওপর সন্দেহ করা হচ্ছে...'

'কিন্তু তুমিও নিশ্চয়ই সোজাসুজি কিছু বল নি!' অলিম্পিয়াদা হেসে বলল।

'আমি?' ইলিয়া অবাক হয়ে বলল। 'হ্যাঁ... তা ঠিকই! চুলোয় যাক!' কী একটা কথা ভেবে যেন সে আশ্চর্য হয়ে গেল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওর সামনে বসে থাকতে থাকতে, মাইরি বলছি, আমার মনে হচ্ছিল আমি কোন ভুল করি নি।'

'যাক, ভগবানকে ধন্যবাদ।' অলিম্পিয়াদা খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল। 'সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে।'

ইলিয়া হেসে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল:

'আমাকে কিন্তু মিথ্যে কথা তেমন একটা বলতে হয় নি। আমার কপালটা ভালো, লিপা!'

ইলিয়া বিকট হাসি হেসে উঠল।

'আমার পেছনে ফেউ লেগেছে,' অলিম্পিয়াদা চাপা গলায় বলল। 'তোমার পেছনেও বোধহয় লেগেছে।'

'তা আর বলতে!' আক্রোশ ও ব্যঙ্গের সুরে ইলিয়া বলে উঠল। 'গন্ধ শুঁকছে, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার মতলব করছে — বনের ভেতরে নেকড়েকে যেমন করে। কিছুই হবে না — ওদের কম্ম নয়! আমি নেকড়ে নই, আমি একজন হতভাগা মানুষ। কাউকে খুন করার ইচ্ছে আমার ছিল না, আমার নিয়তিই আমাকে তিলে তিলে মারছে, যেমন পাভেল তার কবিতায় বলেছে। পাভেলকে মারছে, ইয়াকভ্‌কে — সকলকে মারছে!'

'ও কিছু না ইলিয়া,' চা ভেজাতে ভেজাতে অলিম্পিয়াদা বলল। 'সব কেটে যাবে!'

ইলিয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিষণ্ণ ও তিক্ত হতাশার সুরে বলে চলল:

'সারাটা জীবন পাঁকে আটকে আটকে পড়ছি। যা আমি ভালোবাসি না, যাকে ঘেন্না করি সে দিকেই কে যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে যায়। জীবনে এমন কোন মানুষ দেখতে পেলাম না যার দিকে তাকালেও আনন্দ লাগে। জীবনে কি তাহলে শুদ্ধতা বলতে কিছুই নেই? এই যে লোকটাকে গলা টিপে খুন করলাম — কেন? কী দরকার ছিল। অযথা হাত নোংরা করলাম, মনকে কষ্ট দিলাম... টাকাগুলো নিলাম... তাই বা নিতে গেলাম কেন?'

'ও সব ভেবে কষ্ট পেও না!' অলিম্পিয়াদা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল। 'ওর জন্যে দুঃখ করতে মন চায় না।'

'আমি দুঃখ করছি না... আমি নিজের পক্ষে কৈফিয়ত চাই। সকলেই যে যার কৈফিয়ত দেয়, কেননা বাঁচা দরকার! এই দেখ না গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টর — খাসা আছেন — যেন রাংতায় মোড়া মিঠাইটি। কাউকে খুন করতে সে যাবে না। সৎ ভাবে জীবন সে কাটাতে পারে — চার দিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।'

'দাঁড়াও, এই শহর থেকে আমরা চলে গেলে ত পারি।'

'না না, আমি কোথাও যাব না!' অলিম্পিয়াদার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে

ইলিয়া দৃঢ় স্বরে বলল। সঙ্গে সঙ্গে কাউকে যেন হুমকি দিচ্ছে এমন সুরে যোগ করল, 'আমি অপেক্ষা করব, দেখব পরে কী হয়।'

অলিম্পিয়াদা কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় ডুবে গেল। সে টেবিলের পাশে সামোভারের সামনে বসে ছিল। সাদা রঙের চওড়া ড্রেসিং গাউনে তাকে জমকাল ও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

'ওদের সঙ্গে আমার আরও তর্ক করার আছে,' ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে মাথা সজোরে দুলিয়ে ইলিয়া বলল।

'বুঝেছি!' মনে মনে আহত হয়ে অলিম্পিয়াদা বলল। 'তুমি যে যেতে চাও না তার কারণ এই যে আমাকে ভয় কর। তুমি ভাবছ এখন আমি তোমাকে শক্ত করে চেপে ধরব, ভাবছ তোমার গোপন কথা জানি বলে তার সুযোগ নেব? ভুল করছ গো, ভুল করছ! জোর করে আমি তোমাকে টেনে নিয়ে যাব না।'

অলিম্পিয়াদা শান্ত স্বরেই কথা বলছিল, কিন্তু তার ঠোঁট দুটো যেন যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছিল।

'এ তুমি কী বলছ?' ইলিয়া ওর কথায় অবাক হয়ে গেল।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি তোমাকে আটকে রাখছি না। যেখানে খুশি চলে যেতে পার — কোন আপত্তি নেই।'

'দাঁড়াও!' ইলিয়া তার পাশে বসে পড়ে ওর হাত ধরে বলল। 'আমি বুঝতে পারছি না, কেন তুমি এমন কথা বললে।'

'আর ন্যাকামি করতে হবে না!' অলিম্পিয়াদা ঝটকা মেরে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিষণ্ণ সুরে চিৎকার করে বলল। 'আমি জানি তুমি অহঙ্কারী, তোমার দয়ামায়া বলে কিছু নেই! বুড়োর জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না, আমার জীবনকে তুমি ঘেন্না কর, এখন ভাবছ যে আমার জন্যেই এ সব ঘটেছে। তুমি আমাকে ঘেন্না কর!'

'একদম বাজে কথা!' ইলিয়া ফুঁসে উঠল। 'বাজে কথা — আমি তোমাকে কোন ব্যাপারেই দোষী করছি না। আমি জানি, পরিচ্ছন্ন আর নিষ্পাপ মেয়েরা আমাদের মতো লোকের জন্যে তৈরি হয় নি। তারা আমাদের নাগালের বাইরে। তাদের বিয়ে করতে হয় — তারা ছেলেপুলের জন্ম দেয়। যা কিছু পরিচ্ছন্ন তা বড়লোকদের জন্যে আর আমাদের জন্যে থাকে এঁটোকাটা, ছিবড়ে, থুতু ফেলা আর ঘাঁটামাল।'

'ঘাঁটামালই যদি মনে কর ত আমাকে ছেড়ে দাও!' অলিম্পিয়াদা চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল। 'চলে যাও!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল চিকচিক করে উঠল, ইলিয়ার ওপর সে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো কথা বর্ষণ করে চলল, 'আমি নিজের ইচ্ছেয় এই খোঁড়লে ঢুকেছি, কেননা এখানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে। এই টাকার ওপর সিঁড়ি করেই আমি ওপরে উঠে আসব, আবার ভালোমতো জীবন কাটাব। তুমি আমাকে এ কাজে সাহায্য করেছ। তা আমি জানি। আমি তোমাকে ভালোবাসি — এক গণ্ডা লোক খুন করলেও ভালোবাসি। তোমার সৎ গুণের জন্যে নয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি — তোমার গর্ব, তোমার যৌবন, কোঁকড়া চুলে ভর্তি মাথা, শক্ত হাত আর, কঠিন চাউনি... তোমার মুখের কটু কথাগুলো আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়... তবু মরার সময় পর্যন্ত আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব... তোমার পায়ে চুমু খাব — এই দেখ!'

অলিম্পিয়াদা ওর পায়ের ওপর পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চুমু খেতে খেতে বলতে লাগল:

'ভগবান সাক্ষী! আমি নিজের উদ্ধারের জন্যে পাপ করেছি। সারা জীবন পাঁকের মধ্যে না কাটিয়ে আমি যদি পাঁকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার শুদ্ধ হই তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে ক্ষমা নিশ্চয়ই পাব। সারা জীবন কষ্ট পেতে আমি চাই না! আমার সর্বাঙ্গ নোংরা, কলঙ্কিত, চোখের সব জল দিয়েও তা ধুয়ে ফেলা যাবে না।'

ইলিয়া প্রথমে ওকে সরিয়ে দিয়ে মেঝে থেকে ওঠানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ও শক্ত করে ইলিয়াকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, তার হাঁটুর ওপর মাথা রেখে পায়ে মুখ ঘষছে আর অবসন্ন সুরে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে চলছে। তখন ইলিয়া কাঁপা কাঁপা হাতে ওর গায়ে হাত বুলাল, তারপর মেঝে থেকে সামান্য তুলে ধরে ওকে আলিঙ্গন করল, ওর মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর রাখল। অলিম্পিয়াদার তপ্ত গাল ইলিয়ার গাল স্পর্শ করল, ইলিয়ার শক্ত দুহাতের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে তার সামনে নতজানু হয়ে সে গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে বলে চলল:

'কেউ যদি একবার পাপ করে থাকে তার কি সারা জীবন হীন অবস্থায় পড়ে থাকতে ভালো লাগে?.. যখন ছোট ছিলাম তখন সৎবাপের লালসার দৃষ্টি আমার ওপর পড়ে। আমি তাকে খাঁড়ার এক ঘা বসিয়ে দিই। তারপর আমার

ওপর এক চোট নেওয়া হল। ছোট মেয়েটাকে মদ খাইয়ে ওরা মাতাল করে দিল... ছিলাম ফুলের মতো নিষ্পাপ, ফুটফুটে, শক্ত ধাঁচের মেয়েটি... নিজের দুর্দশার কথা ভেবে কাঁদলাম, আমার সৌন্দর্যের জন্যে দুঃখ হচ্ছিল... আমি চাই নি, আমি চাই নি... কিন্তু তারপর দেখলাম, কিছুতেই কিছু আসে-যায় না! ফেরার আর পথ নেই। ভাবলাম, বেশি টাকা দে, যাব। সক্কলকে দারুণ ঘেন্না করতে লাগলাম, টাকা-পয়সা চুরি করতাম, মাতলামি করতাম। তোমার আগে মনেপ্রাণে আমি কাউকে চুমু খাই নি।'

নীচু ফিসফিস স্বরে কথাগুলো শেষ করার পর সে হঠাৎ ইলিয়ার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলে উঠল:

'ছেড়ে দাও!'

ইলিয়া আরও শক্ত করে দুহাতে ওকে চেপে ধরে আবেগে, মরিয়ার মতো ওকে চুমু দিতে লাগল।

'তোমার কথার ওপর আমার কিছু বলার নেই,' ইলিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল। 'তবে একটা কথা বলি, আমাদের যখন কেউ গ্রাহ্যি করে না তখন আমরাও কাউকে গ্রাহ্যি করি না!... তুমি ভালো কথা বলেছ। আঃ তুমি কী ভালো! তোমাকে ভালোবাসি... কত যে ভালোবাসি তা কী করে বলব! কথায় বলে বোঝাতে পারি না।'

অলিম্পিয়াদার কথা, তার আক্ষেপ ইলিয়ার মনের মধ্যে তার প্রতি একটা আন্তরিক, পবিত্র অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। তার শোক যেন ইলিয়ার দুঃখের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, ওদের দুজনকে একাত্ম করে তুলল। দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে ওরা অনেকক্ষণ নীচু সুরে একে অন্যকে তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে যেতে লাগল।

'আমাদের ভাগ্যে আর সুখ নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে অলিম্পিয়াদা বলল।

'তাহলে দুঃখই ভাগাভাগি করে নেব! কয়েদে ঘানি টানতে হয় — তাও একসঙ্গে, কী বল? শুনছ? কিন্তু আপাতত ভালোবাসার আগুনে শোক পুড়িয়ে ফেলব। এখন আমাকে পুড়িয়ে মার আর যাই কর — বুকের ভেতরটা আমার হালকা হয়ে গেছে।'

কথাবার্তায় উত্তেজিত, সোহাগে পুলকিত ওরা যেন কুয়াসা ভেদ করে

একে অন্যকে দেখে। আলিঙ্গনে ওদের গরম লাগছিল, পোশাকে আঁটসাঁট মনে হচ্ছিল।

জানলার বাইরে আকাশ ধূসর, একঘেয়ে। একটা কনকনে কুয়াসা ধরণীকে ঢেকে দিয়েছে, গাছপালা ছেয়ে গেছে জমাট শিশিরের সাদা প্রলেপে। জানলার সামনের বাগানটাতে কচি বার্চগাছের সরু সরু ডালপালা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়ে তুষারের কণা ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। শীতের সন্ধে ঘনিয়ে এলো...

কয়েক দিন বাদে ইলিয়া জানতে পারল যে ব্যবসায়ী পলুএক্তভের খুনের ব্যাপারে পুলিশ ভেড়ার চামড়ার টুপি পরা এক লম্বা চেহারার লোকের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। নিহত ব্যক্তির দোকানে জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে আইকনের দুটো রুপোর মাউন্টিং পাওয়া যায় — দেখা যাচ্ছে সেগুলো চোরাই মাল। দোকানে যে ছেলেটি কাজ করে সে বলে যে ঘটনার দিন তিনেক আগে মাউন্টিং দুটো ভেড়ার চামড়ার কোট পরনে আন্দ্রেই নামে এক লম্বা চেহারার লোকের কাছ থেকে কেনা হয়। জানা যায় যে লোকটা পলুএক্তভের কাছে একাধিক বার সোনার ও রুপোর জিনিসপত্র বেচে এবং পলুএক্তভ তাকেও টাকা-পয়সা ধারও দিত। পরে এমনও জানা গেল যে হত্যাকাণ্ডের আগের দিন এবং সে দিনও ঐ রকম চেহারার একটা লোককে শুঁড়িখানায় হৈ-হল্লা করতে দেখা যায়।

প্রতি দিনই এ ব্যাপারে কোন না কোন নতুন গুজব ইলিয়ার কানে আসে। গোটা শহর এই দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী, রাস্তায়-ঘাটে, চায়ের দোকানে — সর্বত্রই এ নিয়ে আলোচনা চলে। এই সব কথাবার্তায় ইলিয়া কিন্তু আর আগ্রহ বোধ করে না বললেই হয় — বিপদের চিন্তা তার বুক থেকে খসে পড়েছে ঘায়ের খোসার মতো, আর তার জায়গায় সে অনুভব করে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। তার ভাবনা কেবল একটিই — এখন সে কী ভাবে জীবনযাপন করবে?

তার মনে হচ্ছিল সে যেন ফৌজে নাম লেখানো এক সেপাই, যেন দূরের অজানা পথের যাত্রী। কিছু দিন হল ইয়াকভ্ তার পেছনে বড় বেশি লেগে আছে। তার চেহারা উস্কখুস্ক, জামাকাপড়ের কোন ঠিক নেই, সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সরাইখানায় ও উঠোনে ঘুরঘুর করে আর হতভম্ব দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল

করে সব কিছুর দিকে তাকাতে থাকে। তাকে দেখে মনে হত যেন বিশেষ কোন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত এক মানুষ। ইলিয়ার সঙ্গে দেখা হতে সে রহস্যজনক সুরে তড়বড় করে চাপা গলায় কিংবা ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করে:

'একটু সময় দিতে পারবি? তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'দাঁড়া, এখন সময় নেই।'

'তুই বুঝতে পারছিস না, ব্যাপারটা জরুরী।'

'কী ব্যাপার?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'ঐ বইটা — আরে ভাই, তার মাথামুণ্ডু বোঝা — ওঃ কী বলব!' ইয়াকভ্ আতঙ্কিত স্বরে বলল।

'ধুত্তোর নিকুচি করেছি তোর বইয়ের! তুই বল দেখি তোর বাপ এমন কটমট করে আমার দিকে তাকায় কেন?'

কিন্তু বাস্তবে যা ঘটছিল তার দিকে ইয়াকভের মনোযোগ ছিল না। বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে সে হকচকিয়ে গিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল:

'কী হয়েছে? আমি কিছু জানি না ত! একবার অবশ্য শুনেছিলাম তোর কাকাকে বলছিল যেন তুই জাল টাকা-পয়সার কারবার ধরেছিস... যত সব আজেবাজে কথা।'

'আজেবাজে যে তা তুই কী করে জানলি?' ইলিয়া হেসে জিজ্ঞেস করল।

'আরে, ও আবার একটা কথা হল? কী ধরনের টাকা? যত সব রাবিশ!' এই বলে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত নাড়া দিয়ে ইয়াকভ্ ভাবনায় ডুবে গেল। 'তাহলে, একটু কথা বলার সময় তোর হবে না?' হতভম্ব দৃষ্টিতে বন্ধুর ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে এক মিনিট বাদে সে বলল।

'বইয়ের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। এই একটা জায়গা আমি যা বুঝলাম — ওঃ ওঃ ওঃ, কী আর বলব ভাই।'

সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক এমন মুখভঙ্গি করল যেন গরম কোন কিছুর ছ্যাঁকা লেগেছে। ইলিয়া বন্ধুর দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে একটা অদ্ভুত জীব কিংবা জরদ্‌গব গোছের কিছু একটা। সময় সময় তার মনে হয় ইয়াকভ্ একটা অন্ধ, তাকে সব সময় হতভাগ্য ও জীবনের পক্ষে অনুপযোগী বলে মনে হয়। বাড়িতে সকলে বলাবলি করছে, পাড়াসুদ্ধ লোকেও জানে যে পেত্রুখা ফিলিমোনভ তার রক্ষিতাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, রক্ষিতাটি চালায়

শহরের এক দামী বেশ্যাবাড়ি, অথচ ইয়াকভ্ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। ইলিয়া যখন জিজ্ঞেস করল বিয়েটা কি শিগ্‌গিরই হচ্ছে নাকি তার উত্তরে ইয়াকভ্ প্রশ্ন করল:

'কার বিয়ে?'

'তোর বাপের রে।'

'অ! তা কে জানে? কী নির্লজ্জ! আর বৌ খুঁজে পেল না — ছ্যাঃ!'

'তুই কি জানিস যে তার একটা ছেলে আছে — বেশ বড় ছেলে, জিমন্যাসিয়ামে পড়াশুনা করে?'

'না, জানতাম না ত! তাতে হলটা কী?'

'তোর বাপের সম্পত্তির মালিক হবে রে।'

'আচ্ছা!' ইয়াকভ্ নির্বিকার। তারপরই হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'ছেলে? এতে হয়ত আমারই লাভ হবে, কী বলিস? আমার বাবা ত এই ছেলেটাকেই বার কাউণ্টারে রাখবে! আমি তাহলে যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারি!.. তাই যেন হয়।'

স্বাধীনতার স্বাদ আগে থেকেই অনুমান করে ইয়াকভ্ পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করল। ইলিয়া করুণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল।

'সাধে কি আর বলে, বোকা ছেলে গাজর চায়, খাবার দিলে হাত গুটায়। ওঃ কী আর বলব তোকে! জানি না এই দুনিয়ায় তুই কী করে বাস করবি?'

ইয়াকভ্ সতর্ক হয়ে চোখ বড় বড় করল, সে ফিসফিস করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'কথাটা আমি ভেবেছি! বড় কথা হল, মনকে গোছগাছ করা চাই। বোঝা দরকার ভগবান তোমার কাছ থেকে কী চান। এখন আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি — লোকে যেন সুতোর মতো জট পাকিয়ে গেছে, নানা দিকে টানাটানি চলছে, কিন্তু কাকে কোন দিকে যেতে হবে, শক্ত করে কোনটা আঁকড়ে ধরতে হবে তা কারও জানা নেই! মানুষ জন্মায় — কারও জানা নেই; বেঁচে থাকে — জানি না কেন, মারা যায় — সব চুকে গেল। দাঁড়াচ্ছে এই যে সবচেয়ে আগে জানা দরকার, কিসের জন্যে আমি আছি। এই হল মোদ্দা কথা!'

'ইস্ এই সব যুক্তিতর্ক নিয়েই তুই গেলি দেখছি,' ইলিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল। 'এতে কার কী লাভ?'

সে অনুভব করছিল যে ইয়াকভের বিষাদমাখা কথাগুলো আগের চেয়েও তার মনকে বেশি আঘাত করছে এবং এই সব কথা তার মনের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা-চিন্তা জাগিয়ে তুলছে। তার মনে হচ্ছিল মনের ভেতরে অন্ধকার যে সত্তাটা ভদ্র জীবন সম্পর্কে তার সমস্ত সাদাসিধে ও উজ্জ্বল স্বপ্নের চিরকাল বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে সে-ই যেন এখন বিশেষ ব্যগ্র হয়ে ইয়াকভের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছে, সে-ই যেন মাতৃগর্ভে শিশুর মতো তার মনের ভেতরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ইলিয়ার অস্বস্তি হতে লাগল, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, তার মনে হল এর কোন প্রয়োজন ছিল না। সে ইয়াকভের সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

'কী লাভ জিজ্ঞেস করছিস? খুবই সোজা কথা। আগুন ছাড়া যেমন চলে না — এও তেমনি।'

'তোর হালচাল একটা বুড়োর মতো, ইয়াকভ্। তোর সঙ্গে কথা বলতে বেজার লাগে। কথায় বলে, কপাল কে না খোঁজে? — শুয়োরেও তা বোঝে।'

এই কথাবার্তার পর ইলিয়ার মনে হতে লাগল সে যেন অনেকটা নোনতা জিনিস খেয়ে ফেলেছে: একটা নিদারুণ তৃষ্ণা তাকে পেয়ে বসল, মনে হচ্ছিল কী যেন একটা চাই। ঈশ্বর সম্পর্কে তার পীড়াদায়ক, কুয়াসাচ্ছন্ন ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে এখন এসে মিশতে থাকে নৃশংস ও কঠোর এক অনুভূতি।

'সব দেখেন, অথচ ছেড়ে দেন...' — ও বিষণ্ণ হয়ে মনে মনে ভাবল, অনুভব করল যে পরস্পরবিরোধিতা সমাধানের কোন উপায় খুঁজে না পাওয়ার দরুন তার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। অলিম্পিয়াদার কাছে গিয়ে তার আলিঙ্গনবন্ধনের মধ্যে সে নিজের ভাবনা-চিন্তা ও উদ্বেগের হাত থেকে উদ্ধার পায়।

মাঝে মাঝে সে ভেরার কাছে আসে। ফুর্তির জীবন এই মেয়েটিকে ধীরে ধীরে পাঁকদহের অতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে উল্লসিত হয়ে ইলিয়ার কাছে ধনী ব্যবসায়ী, বড় বড় সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর অফিসারের সঙ্গে ব্যভিচারের বর্ণনা দেয়, ত্রোইকা গাড়িতে চেপে ভ্রমণ আর রেস্তোরাঁর গল্প বলে, ভক্তদের দেওয়া উপহার — পোশাক, ব্লাউজ, আঙটি ওকে দেখায়। পুরুষ্টু, সুডৌল, শক্ত গড়নের এই মেয়েটি রীতিমতো বড়াই করে বর্ণনা দিত তাকে দখল করার জন্য তার ভক্তদের মধ্যে কেমন বিবাদ বেধে যায়।

তার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও ফুর্তিবাজ মেজাজের জন্য ইলিয়া মুগ্ধ না হয়ে পারত না, কিন্তু সময় সময় সে সতর্কতার সঙ্গে তার উদ্দেশে মন্তব্য করে:

'এই খেলায় আপনি কিন্তু বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়ছেন ভেরা, দেখবেন।'

'ও এই কথা? এটাই ত আমার গতি। গেলে অন্তত জাঁকজমক নিয়ে যাব। যা পাওয়া যায় লুটে নিলাম তারপর — শেষ!'

'তাহলে পাভেলের কী হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরুজোড়া কেঁপে উঠত, ফুর্তির ভাব মিলিয়ে যেত।

'আমার কাছ থেকে সরে গেলেই পারে... আমার সঙ্গে থাকা ওর পক্ষে কঠিন। বৃথাই ও কষ্ট পাচ্ছে। আমার আর থামার উপায় নেই — মাছি চিটে গুড়ে আটকে পড়েছে।'

'আপনি কি ওকে ভালোবাসেন না?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না!' রীতিমতো গম্ভীর হয়ে সে প্রতিবাদ করে বলে। 'ও আশ্চর্য মানুষ!'

'তাহলে? ওর সঙ্গে থাকলেই ত হয়।'

'তার মানে ওর ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকি? ও নিজেই ত কায়ক্লেশে রুজি রোজগার করে, আমাকে পুষবে কী করে? না, ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়।'

'দেখবেন, খারাপ যেন কিছু না ঘটে যায়,' ইলিয়া এক দিন ওকে এই বলে সতর্ক করে দিল।

'হা ভগবান!' ভেরা আক্ষেপ করে বলল। 'আমার কী করা উচিত বলুন? আমি কি একজন মানুষের জন্যে জন্মেছি? সকলেরই ত আমোদফুর্তি করার সাধ জাগে। সকলেই যে যার মতো জীবন কাটায় — ও, আপনি, আমি — সকলেই।'

'ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়!' ইলিয়া বিষণ্ণ হয়ে চিন্তিত ভাবে বলল। 'আমরা যে জীবন কাটাই তা কিন্তু কেবল নিজের জন্যে নয়।'

'তাহলে কার জন্যে?'

'ধরুন না এই আপনিই — আপনার জীবন ব্যবসায়ীদের জন্যে, নানা ধরনের কুচরিত্রের লোকের জন্যে।'

'আমি নিজেই ত কুচরিত্রের!' বলে ভেরা উল্লাসে হোহো করে হেসে উঠল।

ওর কাছ থেকে চলে আসার সময় ইলিয়ার মনটা বিষাদে ভরে যায়। এই সময়ের মধ্যে পাভেলের সঙ্গে তার বার দুয়েক দেখা হয়, তাও এক ঝলক। বন্ধুকে ভেরার কাছে দেখতে পেয়ে পাভেল ভুরু কোঁচকায়, রাগে জ্বলতে থাকে। ইলিয়ার উপস্থিতিতে ও দাঁতে দাঁত চেপে চুপচাপ বসে থাকে, তার বসা গালের ওপর লাল ছোপ ফুটে ওঠে। ইলিয়া বুঝতে পারত যে বন্ধু ওকে ঈর্ষা করছে, এতে সে একটা আনন্দ পেত। কিন্তু সেই সঙ্গে ইলিয়া এটাও পরিষ্কার দেখতে পেল যে পাভেল এমন এক ফাঁস গলায় পরেছে যেখান থেকে অক্ষত ভাবে বেরিয়ে আসার বিশেষ সম্ভাবনা তার নেই। পাভেলের জন্য তার দুঃখ হল, ভেরার জন্য — আরও বেশি, তাই সে ওর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিল। অলিম্পিয়াদার সঙ্গে সে আবার মধুচন্দ্রিকা কাটাতে লাগল। কিন্তু এখানেও সেই কনকনে ঠান্ডার ঝাপ্‌টায় ইলিয়ার বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। কোন কোন সময় কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, গভীর ভাবনায় ডুবে যায়। অলিম্পিয়াদা তখন সোহাগের সুরে ফিসফিস করে ওকে বলে:

'লক্ষ্মীটি আমার! ও সব ভেবো না... দুনিয়ায় এমন লোক খুব কমই আছে যাদের হাতে কোন কলঙ্ক নেই।'

'তাহলে শোন,' ইলিয়া গম্ভীর হয়ে নিরুত্তাপ স্বরে তাকে উত্তর দেয়। 'দোহাই তোমার, এ ব্যাপার নিয়ে আর একটি কথাও না! আমি হাতের কথা ভাবছি না। তুমি বুদ্ধিমতী হতে পার, কিন্তু আমার ভাবনা মোটেই বুঝতে পার না। তুমি অন্তত আমাকে বাতলাও কাউকে আঘাত না দিয়ে সৎ ভাবে কী করে জীবন কাটানো যায়। বুড়োর কথা ভুলে যাও।'

কিন্তু বুড়োর প্রসঙ্গ চেপে রাখার মতো ক্ষমতা অলিম্পিয়াদার ছিল না, ইলিয়াকে বার বার বলত ওকথা যেন সে ভুলে যায়। ইলিয়া রাগ করত, ওকে ছেড়ে চলে যেত। ইলিয়া যখন আবার আসত তখন ও ক্ষিপ্ত হয়ে তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলত যে সে ওকে ভয়বশত ভালোবাসে, এর কোন প্রয়োজন নেই, ও ইলিয়াকে ছেড়ে দিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবে। অলিম্পিয়াদা কাঁদত, ইলিয়াকে চিমটি কাটত, ওর ঘাড় কামড়ে দিত, পায়ে চুমু খেত, তারপর উন্মত্তের মতো নিজের গায়ের পোশাক ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলত:

'আমি কি দেখতে ভালো নই? আমার শরীর কি কুৎসিত? আমার

শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা দিয়ে, প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি — আমাকে কাট — তাও হাসব।'

ওর নীল চোখজোড়া গভীর হয়ে আসে, ঠোঁট দুটি কামনায় থরথর করে আর বুক উ‍ঁচু হয়ে উঠে সাগ্রহে ইলিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ ইলিয়া ওকে আলিঙ্গন করে চুমু দেয়। তারপর বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে থাকে: 'এত জীবন্ত, এমন উষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও কী করে ও সহ্য করত বুড়োর ঐ জঘন্য সোহাগ?' সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিয়াদাকে তার বিশ্রী মনে হত, ওর চুমুর কথা মনে হতে তার গা ঘিনঘিন করে উঠত, সে থুতু ফেলত। একবার অলিম্পিয়াদা যখন প্রচণ্ড আবেগে মত্ত তখন উচ্ছ্বসিত সোহাগে জর্জরিত ইলিয়া তাকে বলে বসল:

'আচ্ছা, ঐ বুড়ো শকুনকে আমি যখন খুন করলাম তারপর থেকেই দেখছি তুমি আমাকে আরও বেশি সোহাগ করতে শুরু করেছ।'

'তা ঠিক — তাতে কী হয়েছে?'

'আ-চ্-ছা! ভাবলেও হাসি পায়... এমন কিছু লোক আছে যাদের কাছে পচা ডিম টাটকা ডিমের চেয়ে মুখরোচক বলে মনে হয়, আবার কোন কোন লোক আপেল তখনই খেতে ভালোবাসে যখন তা পচতে শুরু করে। অদ্ভুত!..'

অলিম্পিয়াদা ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকাল, আলস্যজড়িত মৃদু হাসি হাসল, উত্তর দিল না।

একবার শহর থেকে বাড়িতে ফিরে ইলিয়া জামাকাপড় ছাড়ছিল, এমন সময় তেরেন্তি নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল। ঢোকার পর দরজাটা ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে আড়ি পেতে সেখানে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কুঁজটা ঝাড়া দিয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। ইলিয়া গোটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বাঁকা হেসে তার মুখের দিকে তাকাল।

'ইলিয়া!' চেয়ারের ওপর বসতে বসতে তেরেন্তি চাপা গলায় বলল।

'উঁ?'

'তোর সম্পর্কে নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছে... নোংরা কথাবার্তা লোকে বলছে।'

কুঁজো ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, চোখ নামাল।

'যেমন?' ইলিয়া জুতো খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল।

'এই... যে যেমন খুশি। কেউ কেউ বলছে ব্যাপারটাতে তোর হাত আছে।

সেই যে মহাজন খুন হল না... অন্যেরা বলছে তুই নাকি জাল টাকা-পয়সার কারবার করছিস।'

'ওদের হিংসে হচ্ছে না কি?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'এখানে নানা রকম লোকজনের আনাগোনা চলছে... গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন, গুপ্তচর ধরনের। ওরা পেত্রুখাকে তোর সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করে চলছে।'

'তা করুক গে না,' ইলিয়া নির্বিকার ভাবে বলল।

'তা ত ঠিকই। ওদের আমরা গ্রাহ্যি করতে যাব কেন? আমরা কি দোষ করেছি?'

ইলিয়া হেসে ফেলল। ও বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'এখন অবশ্য ওদের আনাগোনা বন্ধ হয়েছে... আর আসছে না! কেবল পেত্রুখা নিজেই শুরু করে দিয়েছে...' তেরেন্‌তি বিব্রত ও সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল। 'ইলিয়া, তুই বরং অন্য কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে চলে যা, কী বলিস? তা নয়ত পেত্রুখা বলে বেড়াচ্ছে: 'বজ্জাত লোকজন আমার বাড়িতে থাকবে এটা আমি সহ্য করব না, আমি বাপু সরকারী লোক।'

ইলিয়ার মুখ ক্রোধে থমথমে হয়ে উঠল, সে কাকার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল:

'নিজের ঐ বার্নিস করা মুখের ওপর যদি ওর দরদ থাকে তাহলে যেন একটি কথাও না বলে! ওকে সাফ একথা বলে দিও। আমার সম্পর্কে এমন বেআদব কথাবার্তা যদি শুনি তাহলে ওর মুণ্ডু গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেব। আমি যাই হই না কেন তার বিচার করার মালিক ও নয় — ওর মতো বাটপার নয়। আর এখান থেকে আমি যাব যখন আমার খুশি হবে। আমার ইচ্ছে সাধু আর ধার্মিক লোকজনের সঙ্গে একটু বাস করে দেখি।'

ইলিয়ার রাগ দেখে কুঁজো ঘাবড়ে গেল। মিনিট খানেক সে চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল, আস্তে আস্তে কুঁজটা চুলকাতে চুলকাতে ভয়ে ভয়ে ভাইপোর দিকে তাকাল। ইলিয়া শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, দুচোখ বড় বড় করে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তেরেন্‌তি চোখ বুলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ইলিয়ার মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, সুন্দর গম্ভীর মুখ, মুখের ওপর স্বল্প গোঁফের রেখা, কঠিন চিবুক, তাকিয়ে দেখল তার চওড়া বুকের ছাতি, নিরীক্ষণ করল তার শক্তসমর্থ ও সুঠাম দেহ, তারপর আস্তে আস্তে বলল:

'তুই জোয়ান হয়ে উঠেছিস রে! গাঁয়ে যদি থাকতিস তাহলে মেয়ের দঙ্গল তোর পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। ঠিকই বলছি... ওখানে দিব্যি থাকতে পারতিস! আমি তোকে টাকা পাঠিয়ে দিতাম... তুই দোকান খুলতিস, কোন বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতিস! তোর জীবনটা অনায়াসে গড়াবে পাহাড় থেকে স্লেজগাড়ি নামার মতো।'

'এমনও ত হতে পারে যে আমি পাহাড়ে উঠতে চাই?' ইলিয়া বিষণ্ণ হয়ে বলল।

'পাহাড়ে — হ্যাঁ তা নিশ্চয়ই!' তেরেন্তি ওর কথাটা চট্ করে লুফে নিয়ে বলল। 'আরে আমি যে একথা বললাম তার মানে হল জীবনটা সহজ হয়ে গড়গড়িয়ে যাবে। তবে যাবে তা পাহাড়ের ওপরে।'

'আর পাহাড় থেকে কোথায়?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

কুঁজো ওর দিকে তাকিয়ে খনখনে গলায় হেসে উঠল। সে আবার কী যেন বলতে শুরু করল, কিন্তু ইলিয়ার আর সে দিকে কান ছিল না। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হচ্ছিল একের পর এক ঘটনা এসে কেমন অলক্ষিতে ও নিপুণ ভাবে জীবনে জালের মতো বুনট বাঁধে। ঘটনার পর ঘটনা মানুষকে ঘিরে ধরে, পুলিশ যেমন চোর ডাকাতকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি ভাবে নিয়ে চলে যখন যেখানে খুশি। এই ত সে ভাবছিল এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে — কোথাও একা গিয়ে থাকবে, এক্ষুনি, হাতের কাছে এই ত সুযোগ। সে ভয়ে, এক দৃষ্টিতে কাকার দিকে তাকাল, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। তেরেন্তি জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

'আরে খোলোই না,' ইলিয়া রেগে গিয়ে জোর গলায় বলল।

কুঁজো ছিটকিনি খুলে দিতে দোরগোড়ায় আবির্ভাব ঘটল ইয়াকভের। তার হাতে বাদামী রঙের একটা বই।

'ইলিয়া, মাশার ওখানে যাই চল!' বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে উত্তেজিত ভাবে ও বলল।

'কী হয়েছে ওর?' ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

'ওর? জানি না। ও বাড়ি নেই।'

'সন্ধেবেলা ও আবার কোথায় ঘোরাঘুরি শুরু করেছে?' কুঁজো সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল।

'ও মাতিৎসার সঙ্গে বের হয়,' ইয়াকভ্ বলল।

'ব্যাপার সুবিধের না দেখছি,' তেরেন্তি টেনে টেনে বলল।

ইয়াকভ্ ইলিয়ার হাত ধরে ঝটকা টান দিল।

'তুই কি খেপে গেলি না কি রে?' ইলিয়া বলল।

'জানিস — এ নির্ঘাত্ জাদুবিদ্যা — জাদু না হয়ে যায় না!' নীচু গলায় ইয়াকভ্ বলল।

'কে?' জুতো পরতে পরতে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'এই যে এই বইটা — মাইরি বলছি। দেখবি'খন, চল! সোজা কথায় বলতে গেলে — আজব চীজ্!' অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বন্ধুকে পেছন পেছন টেনে নিয়ে যেতে যেতে ইয়াকভ্ বলে চলল। 'পড়তে গেলে গায়ে একেবারে কাঁটা দিয়ে ওঠে!.. কিন্তু ঘূর্ণি জলের মতো কেবলই টানে।'

ইলিয়া বন্ধুর উত্তেজনা টের পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল তার গলা কাঁপছে। মুচির ঘরে ঢুকে ওরা যখন বাতি জ্বালাল তখন ইলিয়া দেখতে পেল ইয়াকভের মুখ ফ্যাকাসে, তার চোখ দুটো ঘোলাটে, মাতালের মতো খুশির আমেজ ধরা।

'মদ খেয়েছিস নাকি রে?' সন্দিগ্ধ ভাবে ইয়াকভের দিকে তাকাতে তাকাতে সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি? না, আজ এক ফোঁটাও খাই নি... আমি কিন্তু এখন আর খাই না — কেবল বাবা বাড়ি থাকলে বুকে বল আনার জন্যে দু-তিন পাত্তর খাই! বাবাকে ভয় করি। খাই কেবল এমন জিনিস যাতে ভোদকার মতো গন্ধ নেই... শোন তাহলে!'

ও ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল, বই খুলে তার ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল। পুরনো হওয়ার দরুন বইটার মোটা পাতায় হলুদের ছোপ লেগেছে। পাতার লেখার ওপর আঙ্গুল রেখে ইয়াকভ্ কাঁপা কাঁপা গলায় পড়ে গেল:

'তৃতীয় অধ্যায়। মানুষের উদ্ভব। — শোন!'

নিশ্বাস নিয়ে সে বাঁ হাত ওপরে ওঠাল, তার ডান হাতের আঙ্গুল পৃষ্ঠার ওপর এপাশ থেকে ওপাশে নড়তে লাগল, সে জোরে পড়তে শুরু করল:

''পূর্বোক্ত ডিওডোর যাহা বলিয়াছেন তাহা হইল এই যে আদি মানবেরা ছিল সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষ।' — শুনছিস? — সদ্‌গুণসম্পন্ন! —

'এমত বিষয়সমূহ যিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি গভীর। অপিচ, তাঁহার বক্তব্য এই যে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই এবং মানবজাতির অস্তিত্ব — নিরপেক্ষ, অনাদি, অনন্তকাল...''

ইয়াকভ্ বই থেকে মাথা তুলল, শূন্যে হাত নেড়ে ফিসফিস করে বলল:

'শুনছিস? অ-না-দি!'

'পড়ে যা!' চামড়ায় বাঁধানো পুরনো পুঁথিটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ইলিয়া বলল। ইয়াকভ্ তখন আবার গলা নামিয়ে উৎসাহের সুরে পড়ে যেতে লাগল:

''এমত তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন সিসেরো, সামোসের পিথাগোরাস, আরখিটা টেরেন্টিন, আথেন্সের প্লেটো, ক্সেনোক্রাট, স্টাগিরার আরিস্টট্ল এবং আরও বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন যে জগৎ তাহার শাশ্বত প্রকাশমানতায় অনাদি ও অনন্ত।' — দেখছিস আবারও সেই অনাদি! — 'কিন্তু এই শাশ্বত সত্তার অভ্যন্তরেই রহিয়াছে জাত ও জায়মানের প্রকাশ এবং তাহাতেই নিহিত থাকে সৃষ্টির ধারণা, অপিচ সত্তার বিনাশ উপলব্ধ হয়...''

ইলিয়া হাত বাড়িয়ে বইটা দড়াম্ করে বন্ধ করে দিল।

'রাখ দেখি!' ও বাঁকা হাসি হেসে বলল। 'নিকুচি করেছি তোর বইয়ের। কিছু জার্মান জাতের লোক এখানে শক্ত শক্ত জ্ঞানের কথা বলেছেন — দেখাই যাচ্ছে। এর মাথামুণ্ডু বোঝে সাধ্যি কার?'

'দাঁড়া!' ভয়ে ভয়ে চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ইয়াকভ্ বলে উঠল, চোখ দুটো বড় বড় করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই তোর আদি জানিস?'

'কী রকম?' ইলিয়া রেগে চেঁচিয়ে উঠল।

'চ্যাঁচাস নে... ধর না কেন আত্মা। মানুষ ত আত্মা নিয়ে জন্মায়, তাই না?'

'তাতে কী হল?'

'তার মানে এই যে মানুষের জানা উচিত — কোথা থেকে সে এসেছে, কী ভাবে এসেছে? লোকে বলে যে আত্মা অমর — আত্মা চিরকালই ছিল। ঠিক কি না? কী করে তুমি জন্মালে তা জানতে না চেয়ে যা জানা দরকার তা হল এই — কী করে তুমি বুঝলে যে বেঁচে আছ? জন্মালে তুমি জীবন

নিয়ে — কিন্তু জীবন্তটা হলে কখন? মায়ের পেটে? ভালো কথা! তাহলে তোমার মনে থাকে না কেন পেট থেকে পড়ার আগে কী ভাবে ছিলে? এমনকি তার পরেও, বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্তই বা কী ভাবে কাটিয়েছিলে তাই বা জান না কেন? আর আত্মা যদি থাকেই তাহলে সে কোথায় আছে? কী হল, বল।'

ইয়াকভের চোখ দুটো বিজয়ের আনন্দে জ্বলে উঠল, তার মুখ আনন্দ ও পরিতৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ইলিয়ার তাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

'এই হল তোর আত্মা!' ইয়াকভ্ চেঁচিয়ে উঠল।

'আহাম্মক!' কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে ইলিয়া বলল। 'এতে আনন্দ করার কী আছে?'

'না না — আমি আনন্দ করছি না, অমনি আর কি...'

'অমনি আর কি মানে! কী কারণে আমি বেঁচে আছি এটা বড় কথা নয়, কথাটা হল, কী ভাবে বেঁচে থাকা উচিত — কী ভাবে বেঁচে থাকা উচিত যাতে সব কিছু দিব্যি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, যাতে আমাকে কেউ আঘাত না করে, আমি নিজেও কাউকে আঘাত না দিই। এমন কোন বই আমাকে খুঁজে বার করে দে যেখানে তা বাতলে দেওয়া আছে।'

ইয়াকভ্ চিন্তিত ভাবে মাথা নীচু করে বসে রইল। বন্ধুর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে তার আনন্দপূর্ণ উত্তেজনা নিভে গেল। একটু চুপ করে থেকে সে উত্তরে বন্ধুকে বলল:

'তোর দিকে তাকিয়ে দেখি — কেন জানি না, তোর হাবভাব ঠিক আমার পছন্দ হচ্ছে না। তোর মনের মধ্যে কী আছে বুঝতে পারছি না, তবে দেখতে পাচ্ছি আজকাল তুই কী কারণে জানি না বড়াই করতে শুরু করেছিস। ভাবটা এই যেন তুই একটা সাত্ত্বিক গোছের কেউ।'

ইলিয়া হেসে ফেলল।

'হাসছিস কেন? ঠিকই বলছি। সকলেরই কড়া সমালোচনা করছিস। যেন কারও ওপর কোন দরদ নেই।'

'ঠিকই নেই,' ইলিয়া কঠিন স্বরে বলল। 'কার ওপর দরদ থাকবে? কেনই বা থাকবে? লোকে আমাকে ভালো কী দিয়েছে?.. প্রত্যেকেই দুমুঠো অন্নের ধান্দায় অন্যের কাঁধে চেপে বসতে চায় অথচ মুখে বলে, আমাকে

ভালোবাস, আমাকে ভক্তি কর! বোকা পেয়েছে আর কি! আমাকে ভক্তি কর — আমিও তোমাকে ভক্তি করব! আমার ভাগ আমাকে দাও, তখন আমি তোমাকে ভালো বাসলেও বাসতে পারি! সকলেই গিলতে চায়।'

'কিন্তু মানুষ ত শুধু গেলার জন্যেই বাঁচে না,' ইয়াকভ্ অসন্তুষ্ট হয়ে বাধা দিয়ে বলল।

'জানি! প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দিয়ে নিজেকে সাজায়, কিন্তু সে ত মুখোস! আমি দেখছি — আমার খুড়োটি ভগবানের সঙ্গে হিসাব-নিকেশ করতে চায়, যেমন করে থাকে দোকানের কর্মচারী তার মনিবের সঙ্গে। তোর বাপ গির্জায় আইকন দিয়েছে — এ থেকে বলা যেতে পারে সে হয় কাউকে ঠকিয়েছে কিংবা ঠকানোর মতলব করছে... যে দিকেই তাকাও না কেন সর্বত্র এই একই ব্যাপার। দেওয়ার বেলায় খুদকণা, নেওয়ার বেলায় সোনাদানা। সকলেই একে অন্যের চোখে ধুলো দেয়, একে অন্যের সমর্থন খোঁজে। আমার কথা হল, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক পাপ যদি করে থাক তাহলে গর্দান পেতে দাও।'

'এটা তুই ঠিকই বলেছিস,' চিন্তিত ভাবে ইয়াকভ্ বলল, 'বাবার সম্পর্কে ঠিক বলেছিস, কুঁজোর সম্পর্কেও। ওঃ, আমরা ঠিক জায়গায় জন্মাই নি রে ইলিয়া! তোর অবশ্য শরীরে রাগ আছে, সকলকে সমালোচনা করিস আর তাতেই সান্ত্বনা পাস, তোর সমালোচনা রীতিমতো কড়া। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই। এখান থেকে যদি কোথাও চলে যেতে পারতাম!' করুণ স্বরে ইয়াকভ্ চেঁচিয়ে উঠল।

'যাবি কোথায়?' ইলিয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে মৃদু হেসে বলল।

দুজনেই মনমরা হয়ে টেবিলের পাশে চুপ্‌চাপ মুখোমুখি বসে রইল। টেবিলের ওপর পড়ে ছিল লোহার বকলস আঁটা, চামড়ায় বাঁধানো বাদামী রঙের বিশাল বইটা।

বার-বারান্দায় কাদের যেন সাড়া পাওয়া গেল, মৃদু কণ্ঠের আওয়াজ কানে এলো, তারপর কে যেন অনেকক্ষণ ধরে দরজার হাতল হাতড়াতে লাগল। ওরা দুজন চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। দরজাটা আচম্‌কা খুলে না গিয়ে একটু একটু করে খুলে গেল, পেরফিশ্‌কা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। চৌকাটের ওপর সে একটা হোঁচট খেয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে গেল, ডান হাত দিয়ে অ্যাকর্ডিয়ানটা সে ওপরে ধরে রেখেছে।

'হেই!' এই বলে সে মাতালের হাসি হেসে উঠল। তার পেছন পেছন এসে হাজির হল মাতিৎসা। সে তৎক্ষণাৎ মুচির দিকে ঝুঁকে পড়ে তার হাত ধরে ওঠাতে গেল।

'এঃ, খেয়ে চুর হয়ে আছে... মাতাল কোথাকার!' ভরাট গলায় মাতিৎসা বলল।

'অ্যাই শালী, ধরবি না বলছি, আমি নিজেই উঠব। নি-জে।'

সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত তুলে দুই বন্ধুর দিকে তেড়ে গেল।

'পেন্-নাম হই দাদারা! পেন্নাম।'

মাতিৎসা বোকার মতো ভারী গলায় হিহি করে হাসতে লাগল।

'তোমরা কোথায় ছিলে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

ইয়াকভ্ মৃদু হাসতে হাসতে চুপচাপ মাতালদের দেখছিল।

'কোথায় ছিলাম? বাছারা আমার! চাঁদ আমার — হুম্!' বলেই পেরফিশ্কা মেঝের ওপর থপথপ্ করে পা ঠুকে ঠুকে গান শুরু করে দিল:

বাছা, তোর হাড় বড় কাঁচা!
গায়-গতরে হলে হবে
কসাইখানায় বেচ!

'অ্যাই শালী! আয় বরং সেই গানটা গাওয়া যাক, যেটা তুই আমাকে শিখিয়েছিস... চলে আয়!'

পেরফিশ্কা চুল্লীর দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাতিৎসার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কনুই দিয়ে মাতিৎসার পাঁজরে ঠেলা দিতে দিতে সে অ্যাকর্ডিয়ানের চাবিগুলোতে আঙুল বুলাল।

'মাশা কোথায়?' ইলিয়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'অ্যাই শুনতে পাচ্ছ?' ইয়াকভ্ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে উঠল। 'সত্যি করে বল দেখি মাশা কোথায়?'

কিন্তু মাতালেরা চিৎকার চেঁচামেচিতে কান দিল না। মাতিৎসা মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে গাইতে শুরু করল:

দাদা গো দাদা, মদটা বড় খাসা...

পেরফিশ্‌কা তার অ্যাকর্ডিয়ানে আঙুল চালাল, চড়া গলায় ধুয়া তুলল:

দাদা গো দাদা, সোমবারেও চলতে পারে নেশা...

ইলিয়া উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধ ধরে এমন ঝাঁকানি দিল যে পেরফিশ্‌কার মাথার পেছন দিকটা চুল্লীতে ঠুকে গেল।

'মেয়ে কোথায়?'

'মা-ঝ রা-তে মেয়ে তার হা-য় বাড়ি ছেড়ে যা-য়,' পেরফিশ্‌কা হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে অর্থহীন বিড়বিড় করতে থাকে।

ইয়াকভ্ মাতিৎসাকে জেরা করতে লাগল।

'বলব না! বলব না গো, না, না, না,' মাতিৎসা বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল।

'ওরা, এই বদমাশ দুটো বোধহয় ওকে বেচে দিয়েছে,' কাষ্ঠ হাসি হেসে ইলিয়া বন্ধুকে বলল। ইয়াকভ্ ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকাল, করুণ স্বরে মুচিকে জিজ্ঞেস করল:

'পেরফিশ্‌কা, শুনছ? মাশা কোথায়?'

'মা-শা!' ব্যঙ্গ করে টেনে টেনে মাতিৎসা বলল। 'ওর গতি হয়েছে।'

'ইলিয়া! কী হবে? কী করা যায়?' ইয়াকভ্ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া চুপ করে রইল, মুখ কালো করে মাতাল দুজনের দিকে তাকাতে লাগল।

মাতিৎসা ক্ষ্যাপার মতো গান গেয়ে চলল, বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে একবার ইলিয়ার দিকে আরেক বার ইয়াকভের দিকে তাকাতে লাগল, তারপর আচমকা অদ্ভুত ভাবে হাত নাড়িয়ে বলে উঠল:

'এক্-খুনি দূর হয়ে যাও আমার ঘর থেকে! এটা এখন আমার ঘর। আমরা বিয়ে করব।'

মুচি পেট চেপে ধরে হোহো করে হাসতে লাগল।

'চলে আয় ইয়াকভ্,' ইলিয়া বলল। 'ওদের মতিগতি বোঝা ভার।'

'দাঁড়া!' হতভম্ব হয়ে ভয়ার্ত স্বরে ইয়াকভ্ বলল। 'পেরফিশ্‌কা, মাশা কোথায় বল।'

'মাতিৎসা! ওরে আমার বৌ রে, ওদের সামলা! হুস্-হুস্... ওদের ওপর হম্বিতম্বি কর, ওদের চিবিয়ে খা... বলো, মাশা কোথায়?'

পেরফিশ্‌কা ঠোঁট দুটো একসঙ্গে করে শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে ছুঁচালো করল, কিন্তু শিস দিতে পারল না, তার বদলে ইয়াকভের দিকে জিভ বাড়িয়ে আবার হোহো করে হেসে উঠল। মাতিৎসা বুক উঁচিয়ে ইলিয়ার দিকে এগিয়ে গেল, রাগে ফুঁসে উঠে গলা চড়িয়ে বলল:

'তুই কেডা রে? ভেবেছিস জানি না?'

ইলিয়া মাতিৎসাকে ঠেলে ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরের বারান্দায় ইয়াকভ্‌ ওর নাগাল ধরল, কাঁধ চেপে ধরে অন্ধকারের মধ্যে ওকে থামিয়ে বলল:

'এটা ওরা কী করে করল? এমন সাহস ওদের কী করে হল? ও ত ছোট, ইলিয়া? ওরা কি সত্যি সত্যিই ওকে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিল?'

'আর ঘ্যানঘ্যান করিস না!' ইলিয়া কর্কশ স্বরে ওকে থামিয়ে দিল। 'এতে কোন কাজ হবে না। আগে ওদের ওপর নজর রাখা উচিত ছিল। তুই আদি খুঁজছিলি আর ওরা এদিকে শেষ করে দিল।'

ইয়াকভ্‌ গুম মেরে রইল, কিন্তু এক মিনিট বাদেই ইলিয়ার পেছন পেছন উঠোন দিয়ে যেতে যেতে আবার বলল:

'আমার দোষ নেই। আমি জানতাম যে ও ঠিকে কাজ করতে যায়, কোথায় যেন ঘরদোর ঝাঁট দেয়।'

'তুই দোষী কি না দোষী তাতে আমার বয়েই গেল!' ইলিয়া উঠোনের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলল। 'এই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া দরকার। বাড়িটাকে পুড়িয়ে ফেলা দরকার।'

'ওঃ ভগবান, ভগবান!' ইলিয়ার পেছনে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ্‌ মৃদু স্বরে বলল। তার হাত দুটো অসহায়ের মতো দেহের দুপাশে ঝুলে রইল আর মাথাটা সে এমন ভাবে নীচু করে রাখল যেন কোন আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

'কাঁদ!' তাচ্ছিল্য ভরে বলে ইলিয়া বন্ধুকে উঠোনের মাঝখানে অন্ধকারের মধ্যে রেখে চলে গেল।

পর দিন সকালে ও পেরফিশ্‌কার কাছ থেকে জানতে পারল যে খ্রেনভ্‌ নামে এক দোকানদারের সঙ্গে মাশার বিয়ে হয়ে গেছে। লোকটা বিপত্নীক, কিছু দিন আগে তার বৌ মারা গেছে, বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে।

পেরফিশ্‌কা চুল্লীর ওপর বিছানা পেতে শুয়ে ছিল। আগের দিন বেশি

রকম মদ খাওয়ার দরুন তার মাথা ভার হয়ে ছিল। থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে চলছিল:

'লোকটা আমাকে বলল: 'আমার হল গিয়ে দুটো বাচ্চা। দুটিই ছেলে। ওদের দেখাশোনার জন্যে ধাই দরকার কিন্তু ধাই হল বাইরের লোক, চুরিটুরি করবে... তাই বলি, তুমি বরং মেয়েকে বুঝিয়ে বল...' তা আমি ওকে বোঝালাম, মাতিৎসাও বোঝাল। মাশা — বুদ্ধিমতী, ও চট্ করে বুঝল! আর কোথায়ই বা ওকে দিই, আরও খারাপ বৈ ভালো কিছু কখনই হত না!.. মেয়ে বলল, 'যা হবার তা হবে, আমি রাজী।' ও গেল। তিন দিনে সব কাজ সারা হয়ে গেল... আমি আর মাতিৎসা তিন রুবল করে পেলাম। আমরা দুজনেই গতকাল সঙ্গে সঙ্গে মদ খেয়ে তা উড়িয়ে দিয়েছি! তা এই মাতিৎসাটা গিলতে পারে বটে! — ঘোড়ারও সাধ্যি নেই এত খায়!..'

ইলিয়া চুপচাপ শুনে গেল। ও বুঝতে পারল যে মাশা ভালোই গুছিয়ে নিয়েছে — এর চেয়ে ভালো আর আশা করা যায় না। তবু মেয়েটার জন্য তার কষ্ট হল। হালে ইলিয়ার সঙ্গে ওর প্রায় দেখাই হত না, ইলিয়া ওর কথা ভাবতও না, অথচ এখন হঠাৎ মনে হল যেন মাশা ছাড়া এই বাড়িটা আরও কুৎসিত হয়ে পড়েছে।

চুল্লীর ওপর থেকে হলদেটে ফোলা ফোলা মুখ ইলিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল, পেরফিশ্কার ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজে মনে হচ্ছিল যেন শরতের বাতাসে গাছের শুকনো ডালপালা মড়মড় করে উঠছে।

'খেত্রনভ্ আমাকে বলে দিয়েছে আমি যেন ওদিকে পা না দিই! বলে, দোকানে মাঝে মধ্যে আসিস, এক-আধ পাত্তর খাওয়ার মতো পয়সা দেব'খন। তবে স্বর্গে যেমন তোর ঢোকার ভরসা নেই তেমনি আমার বাড়ির দিকে পা বাড়ানোর কথা মনেও আনিস না!.. ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্, খোয়ারি ভাঙার জন্যে তোমার কাছে পাঁচটা কোপেক হবে কি? দয়া করে দাও বাবা আমার।'

'তা তোমার এখন কী হবে?' ইলিয়া বলল।

মুচি মেঝেতে থুতু ফেলে উত্তর দিল:

'আমি এখন প্রাণ ভরে মদ খাব। মাশার যত দিন কোন গতি হয় নি তত দিন আমার খানিকটা অন্তত লজ্জাশরম ছিল, মাঝে মাঝে একটু আধটু কাজকর্মও করেছি, ওর সামনে কেমন কেমন যেন মনেও হত। কিন্তু এখন জানি ওর খাওয়া পরার অভাব নেই, ও সিন্দুকে তোলা হয়ে থাকল।

তার মানে আমি ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে মাতলামি করে বেড়াতে পারি।'

'ভোদকা ছাড়তে পার না?'

'কিছুতেই না!' আলুথালু মাথাটা নাড়তে নাড়তে মুচি জবাব দিল। 'আর ছাড়বই বা কেন? কথায় বলে, যার যেমন ভাব, তেমনি লাভ! যে মানুষের মাথায় কিছুই ঢোকে না তার ভালোই বা কী, মন্দই বা কী? একটা কথা তাহলে বলি শোন — একটা মতলব অবশ্য আমার এক কালে ছিল — সে, যখন বৌ বেঁচে ছিল। তখন ইচ্ছে ছিল ইয়েরেমেই দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা মারি। আমার ভাবনাটা ছিল এই রকম: আমি যদি নাও মারি অন্য কেউ না কেউ বুড়োর টাকা গায়েব করবেই। তবে ভগবানের আশীর্বাদে আমার আগে অন্যে সেই কাজটা সেরে ফেলল। আমার কোন আক্ষেপ নেই। কিন্তু তখন আমি বুঝলাম যে চাওয়ার ব্যাপারেও চটপটে হওয়া চাই।'

মুচি হাসল, এবারে সে চুল্লী থেকে নামার তোড়জোড় করল।

'এবারে দাও দেখি পাঁচটা কোপেক। নাড়িভুঁড়ি জ্বলে গেল — মরে যাচ্ছি।'

'নাও, গেলাস নিয়ে বেরিয়ে পড়,' এই বলে ইলিয়া হেসে পেরফিশ্‌কার দিকে তাকাল। এবারে সে বলল:

'জানি তুমি একটা ভণ্ড, একটা মাতাল — এ সবই সত্যি। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার চেয়ে ভালো লোক আজ অবধি আমার জানা নেই।'

পেরফিশ্‌কা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ইলিয়ার গম্ভীর অথচ কোমল মুখের দিকে তাকাল।

'ঠাট্টা করছ না কি?'

'বিশ্বাস কর আর নাই কর। আমি তোমার প্রশংসা করে বলছি না, আসলে বলছি লোকের নিন্দে করে।'

'দামী কথা! না, দেখছি আমার মাথায় পেরেক ঠুকলেও ঢুকবে না। কিছুই বুঝতে পারছি না। যাই দেখি এক চুমুক মেরে আসি, তাহলে একটু জ্ঞানগম্যি হলেও হতে পারে...'

'দাঁড়াও!' ইলিয়া ওর জামার হাতা ধরে থামাল। 'তুমি ভগবানকে ভয় পাও?'

পেরফিশ্‌কা অস্থির হয়ে এ পা ছেড়ে ও পায়ের ওপর ভর দিল।

'আমি ভগবানকে ভয় করতে যাব কেন? আমি কাউকে আঘাত দিই না,' ও যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল।

'প্রার্থনা কর?' ইলিয়া গলার স্বর নামিয়ে জেরা করল।

'তা তা... প্রার্থনা ত করিই, তবে জানই ত — কালেভদ্রে!..'

ইলিয়া দেখল মুচি কথা বাড়াতে চায় না, তার সমস্ত মন এখন পড়ে রয়েছে শুঁড়িখানায়।

'যাও, যাও,' ইলিয়া ভাবতে ভাবতে বলল। 'তবে একটা কথা বলি, মারা যাওয়ার পর ভগবান জিজ্ঞেস করবেন: 'ওহে মানুষ, জীবনটা কী ভাবে কাটিয়েছ?' '

'তা আমি বলব, প্রভু, জন্মেছিলাম ছোট হয়ে, মারা গেলাম মাতাল হয়ে — কিছুই মনে নেই... উনি হেসে আমাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে দেবেন।'

মুচি খুশিতে হেসে চলে গেল।

ইলিয়া একা ঐ ঘরে রয়ে গেল। তার ভেবে বড় খারাপ লাগছিল যে এই চাপা, নোংরা খোঁড়লটাতে মাশা আর কখনও আসবে না, পেরফিশ্‌কাকেও শিগ্‌গিরই এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

এপ্রিলের সূর্য তখন জানলায় উঁকি মারছে, বহুকালের ঝাঁট না দেওয়া মেঝের ওপর তার কিরণ ঝরে পড়েছে। এই ঘরটার সব কিছুই শ্রীহীন বিশৃঙ্খল, এখানে মন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন এখানে কারও মৃত্যু ঘটেছে।

চেয়ারে বসে ইলিয়া তার সামনের বিশাল ভারী গড়নের রংচটা চুল্লীট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তার মনের মধ্যে একের পর এক বিষণ্ণ চিন্ত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল।

'গিয়ে পাপ স্বীকার করব না কি?' — হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুতের মতো চিন্তা খেলে গেল।

পরক্ষণেই সে ক্ষোভের সঙ্গে মন থেকে সে চিন্তা দূর করে দিল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় পেত্রুখা ফিলিমোনভের বাড়ি ছাড়তে ইলিয়া বাধ্য হল ঘটনাটা ঘটল এই ভাবে: ইলিয়া শহর থেকে ফিরে এসে উঠোনে আতঙ্কগ্রস্ত কাকাকে দেখতে পেল। কাকা ওকে কাঠের গুঁড়ির স্তূপের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল:

'ইলিয়া, তোকে এবার এই বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে... আজ এখানে যা কাণ্ডটা হয়ে গেল!'

কুঁজো শিউরে উঠে চোখ বুঁজল, দুহাত দিয়ে উরু চাপড়াল।

'ইয়াকভ্ মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে বাপকে সোজা মুখের ওপর চোর বলে বসল! এ ছাড়া বেহায়া লম্পট, নিষ্ঠুর — এমনি আরও সব গালিগালাজ ছাড়ল, ক্ষ্যাপার মতো গলা ফাটাল! পেত্রুখাও সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ করে ওর দাঁতের ওপর বসিয়ে দিল! চুলের মুঠি ধরে টানল, গায়ের ওপর দুমদাম লাথি কষল, যত রকমে পারে মারধোর করে ওকে রক্তাক্ত করে দিল! ইয়াকভ্ এখন পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। পেত্রুখা তারপর আমার ওপর সে যা তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল! বলল, 'ইলিয়াকে এখান থেকে খেদিয়ে দাও...' তুইই নাকি ইয়াকভ্কে ওর বিরুদ্ধে বিগড়ে দিয়েছিস। ওঃ কী সাঙ্ঘাতিক চোটপাটই না করল! তাই বলছিলাম কি...'

ইলিয়া কাঁধ থেকে বাক্সঝোলানোর স্ট্র্যাপ খুলে নিয়ে বাক্সটা কাকার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল:

'ধর!'

'দাঁড়া! কো-থায় চললি?'

ইয়াকভের জন্য দুঃখে আর ওর বাবার ওপর রাগে ইলিয়ার হাত দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল।

'ধর বলছি,' দাঁত কড়মড় করতে করতে একথা বলে সে সরাইখানার দিকে চলল। সে এত শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছিল যে তার গালের দুপাশের হাড় আর চোয়াল দুটো ব্যথা করতে লাগল, মাথার মধ্যে হঠাৎ সোঁ সোঁ আওয়াজ করে উঠল। সেই আওয়াজের ভেতর দিয়ে ও শুনতে পেল কাকা চিৎকার করে ওকে থানা, পুলিশ, প্রাণের আশঙ্কা সম্পর্কে কী সব বলে যাচ্ছে, কিন্তু ইলিয়া কান না দিয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল।

সরাইখানায় বার কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পেত্রুখা উস্কোখুস্কো একটা লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল। পেত্রুখার টাকের ওপর প্রদীপের আলো পড়েছে, দেখে মনে হচ্ছিল তার গোটা মাথাটা পরিতৃপ্তির হাসিতে চকচক করছে।

'ও, ব্যবসাদার যে!' ইলিয়াকে দেখে সে ঠাট্টা করে চেঁচিয়ে বলল, রাগে তার ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। 'তোকেই ত চাই...'

পেত্রুখা নিজের ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ইলিয়া উগ্র মূর্তি ধরে দৃঢ় ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে গেল।

'সরে দাঁড়া বলছি!' ইলিয়া জোরে হাঁক দিল।

'কী-ই?' পেত্রুখা টেনে টেনে বলল।

'ইয়াকভের কাছে যেতে দাও।'

'দাঁড়া, দিচ্ছি বটে।'

ইলিয়া কোন কথা না বলে সর্বশক্তিতে পেত্রুখার গালে চড় কষিয়ে দিল। পেত্রুখা কাতরাতে কাতরাতে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। চার দিক থেকে ওয়েটাররা ছুটে এলো।

'ধর ওকে! মার!' কে যেন চেঁচিয়ে বলল।

লোকজন এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিল — যেন তাদের গায়ের ওপর কেউ টগবগে গরম জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ইলিয়া পেত্রুখাকে ডিঙিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ছোট্ট ঘরটি মদের পেটী আর কতকগুলো সিন্দুকে ঠাসাঠাসি। সেখানে একটা কুপি মিটমিট করে জ্বলছে। আধা অন্ধকার ও ঠাসাঠাসির মধ্যে ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে দেখতে পেল না। ইয়াকভ্ মেঝেতে পড়ে ছিল, তার মাথাটা ছিল অন্ধকারের দিকে, মুখটা কালো ও ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। প্রদীপ তুলে নিয়ে আলগোছে বসে ইলিয়া আহতের মুখের ওপর আলো ফেলল। কালশিটে ও জখমে ইয়াকভের মুখ একটা কুৎসিত কালো আবরণে ঢেকে গেছে, তার চোখজোড়া অসাড় হয়ে গেছে, ফুলে গেছে, সে অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছিল, ঘড়ঘড় আওয়াজ করছিল এবং মনে হল কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না কেননা সে কাতরাতে কাতরাতে জিজ্ঞেস করল:

'কে?'

'আমি,' ইলিয়া উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মৃদু স্বরে বলল।

'একটু জল দে...'

ইলিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে।

'পেছনের দেউড়ি দিয়ে যাও,' কে যেন হাঁক দিল।

'আমি ওকে ছুঁই নি,' গোলমাল ভেদ করে পেত্রুখার তীক্ষ্ন খনখনে গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

ইলিয়া হিংস্র আনন্দে বাঁকা হাসি হাসল। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ও শান্ত স্বরে অবরোধকারী লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিল।

'ওহে শোন তোমরা! গলাবাজি থামাও... ওকে যে আমি মুখের ওপর ঝেড়েছি তাতে ও মারা যাবে না, এর জন্যে কোর্টে আমার বিচার হতে পারে! তাই বলছি, অন্যের চরকায় তেল দিও না। দরজা ঠেলাঠেলি করো না, আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি।'

দরজা খুলে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির ভঙ্গিতে ও চৌকাটের ওপর দাঁড়াল, সাবধানতার জন্য ও হাতের মুঠি পাকিয়ে রাখল। ওর মজবুত গড়ন আর মুখে স্পষ্ট মারমুখী ভাব দেখে লোকজন পিছিয়ে গেল। পেত্রুখা কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সকলকে ঠেলাঠেলি করতে করতে গর্জাতে লাগল:

'ওরে ব্যাটা গুণ্ডা!'

'ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, একবার দয়া করে এদিকে এসে দেখে যাও সকলে!' দোরগোড়া থেকে একপাশে সরে গিয়ে ইলিয়া লোকজনকে ভেতরে ঢুকতে বলল। 'দেখে নয়ন সার্থক করুন, একটা মানুষের কী হাল ও করেছে।'

আগন্তুকদের কেউ কেউ ইলিয়ার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে ঘরে ঢুকে পড়ল, তারা ইয়াকভের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'উঃ একেবারে যেন ইস্তিরি চালিয়ে দিয়েছে।!' বিস্ময়ে আতঙ্কে ওদের একজনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

'জল নিয়ে এসো। পুলিশেও একটা খবর দেওয়া দরকার,' ইলিয়া বলল।

লোকজন যে তার পক্ষে এটা ও দেখতে পেল, অনুভব করল, তাই সে গলা উঁচিয়ে তীব্র স্বরে বলল:

'পেত্রুখা ফিলিমোনভকে কে না জানে? কে না জানে যে সে এই তল্লাটের পয়লা নম্বরের হারামজাদা। কিন্তু তার ছেলে খারাপ এমন কথা কি কেউ বলতে পারবে? এখন এই হয়েছে ছেলের অবস্থা — হাড়গোড় ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, চিরজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যায় নি তাই বা কে বলবে? এর জন্যে বাপের কোন বিচার হবে না। অথচ আমি পেত্রুখাকে এক ঘা দিয়েছি — তার জন্যে আমার বিচার হবে... এটা বুঝি ভালো? এটা কি ন্যায্য? এমনই চলছে সর্বত্র — একজনকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, আরেক জন ভুরু পর্যন্ত কোঁচকাতে সাহস করে না।'

কেউ কেউ সহানুভূতি দেখিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কেউ কেউ চুপচাপ বেরিয়ে চলে গেল। এদিকে পেত্রুখা তর্জন-গর্জন করতে করতে সকলকে তাড়াতে লাগল।

'এখান থেকে যাও বলছি সব! যাও! এটা আমার ব্যাপার, ছেলে আমার! ভাগো এখান থেকে! পুলিশের ভয় আমি করি না। কোর্টের কোন দরকার আমার নেই। কিস্সু দরকার নেই... কোর্ট-কাছারি ছাড়াই তোকে ঠাণ্ডা করব। ভাগ বলছি!'

ইলিয়া হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে পড়ে ইয়াকভ্‌কে জল খাওয়াচ্ছিল, বন্ধুর ক্ষতবিক্ষত ফোলা ঠোঁট দেখে তার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

'নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে,' জল গিলতে গিলতে ফিসফিস করে ইয়াকভ্ বলল। 'ইলিয়া, লক্ষ্মীটি আমার, আমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যা!'

ওর ফুলে ওঠা চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

'ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার,' পেত্রুখার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ স্বরে ইলিয়া বলল।

ছেলের দিকে তাকিয়ে পেত্রুখা অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তার একটা চোখ ড্যাবড্যাব করছে, অন্যটার অবস্থা ইয়াকভেরই মতো — ইলিয়ার আঘাতে ফুলে প্রায় বুঁজে গেছে।

'শুনতে পাচ্ছ কী বলছি?' ইলিয়া চেঁচিয়ে বলল।

'চেঁচামেচি করার দরকার নেই!' হঠাৎ আস্তে, নরম সুরে পেত্রুখা বলল। 'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চলবে না — নানা রকম রটনা হবে। তা চলবে না।'

'ইতর!' বলে ইলিয়া অবজ্ঞার সঙ্গে ওর পায়ের ওপর থুতু ফেলল। 'ভালো চাস ত হাসপাতালে পাঠা! না পাঠালে এমন সোরগোল তুলব যে আরও খারাপ হবে।'

'রসো রসো! অত মাথা গরম করার কী আছে? ও হয়ত ভান করছে।'

ইলিয়া লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে ফিলিমোনভ লাফিয়ে দরজার দিকে সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে বলল:

'ইভান! একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আন — হাসপাতালে যেতে হবে, পনেরো কোপেক! ইয়াকভ্, জামাকাপড় পরে নে। আর ভান করতে হবে না। রাস্তার লোক ত আর তোকে ধরে মারে নি — মেরেছে নিজের বাপ। তোর বয়সে এর চেয়ে অনেক বেশি আমার ওপর দিয়ে গেছে।'

হ্যাঙ্গার থেকে জামাকাপড় খুলে সে ইলিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল, ঘরের মধ্যে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে করতে উত্তেজিত হয়ে দ্রুত বলে যেতে লাগল ছেলেবেলায় কেমন মার তাকে খেতে হয়েছে।

বার কাউণ্টারের ওপাশে তেরেন্‌তি দাঁড়িয়ে ছিল। ইলিয়ার কানে আসছিল তার বিনীত, নম্র গলার আওয়াজ:

'তিন কোপেকের, না পাঁচ কোপেকের? ক্যাভিয়ার? ক্যাভিয়ার সব ফুরিয়ে গেছে... হেরিং মাছ নিতে পারেন...'

পর দিন ইলিয়া একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পেল — রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট্ট কামরা। ঘরটা ভাড়া দিচ্ছিল লাল ব্লাউজ পরা এক মহিলা। তার মুখে গোলাপী আভা, পাখির ঠোঁটের মতো ছোট্ট তার নাক, মুখের হাঁ ছোট, ছোট কপালের ওপর সুন্দর ভাবে ঝুলে ছিল কালো চুলের গোছা, থেকে থেকে সে তার ছোটসরু হাত তাড়াতাড়ি চালিয়ে চুলগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছিল।

'এমন একটা চমৎকার ঘরের জন্যে পাঁচ রুবল — বেশি কিছু নয়!' তার গভীর, সজীব চোখজোড়া চওড়া কাঁধওয়ালা অল্পবয়সী ছোকরাটিকে বিচলিত করছে দেখে সে হাসতে হাসতে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল। 'ওয়াল পেপার সম্পূর্ণ নতুন, জানলা বাগানের দিকে — আর কী চাই? সকালে আপনার জন্যে সামোভার চাপিয়ে দেব, তবে নিয়ে আসতে হবে নিজেকে...'

'আপনি কি এ বাড়ির চাকরানী?' ইলিয়া কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মহিলার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল, সে ভুরু কোঁচকাল, সোজা হয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল:

'চাকরানী না, আমি এই ফ্ল্যাটের কর্ত্রী, আমার স্বামী...'

'আচ্ছা, তার মানে আপনি বিবাহিতা?' ইলিয়া অবাক। সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গৃহকর্ত্রীর ছিমছাম, রোগাটে চেহারার ওপর চোখ বুলাল। এবারে কিন্তু মহিলা আর রাগ করল না, মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'কী আজব লোক আপনি! এই বলেন চাকরানী, এখন আবার বিশ্বাস করছেন না যে আমি বিবাহিতা...'

'তা বিশ্বাস করবই বা কী করে? — আপনি যে একটা ছোট মেয়ের মতো দেখতে!' ইলিয়াও ঠাট্টা করে হেসে বলল।

'গত তিন বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী — পুলিশে কাজ করে...'

ইলিয়া তার মুখের দিকে তাকাল, এবারেও নিঃশব্দে হেসে উঠল — যদিও সে নিজেই জানে না — কেন।

'আজব বটে!' কাঁধ সামান্য ঝাঁকিয়ে মহিলা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল। 'তা কী হল — ঘরটা ভাড়া নেবেন কি?'

'সেটা ঠিক করে ফেলেছি! আগাম চাই কি?'

'তা আর বলতে!'

'আমি ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যে জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসছি।'

'ভালো কথা। এমন একজন ভাড়াটে পেয়ে আমি খুশী — আপনাকে দেখে মনে হয় ফুর্তিবাজ।'

'তেমন একটা নয়,' ইলিয়া সামান্য হেসে বলল।

মনের মধ্যে একটা প্রীতিকর অনুভূতি নিয়ে ও হাসতে হাসতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। নীল রঙের ওয়াল পেপার মোড়া ঘর এবং ছোটখাটো গড়নের চটপটে মহিলাটিকেও তার ভালো লাগছিল। কিন্তু পুলিশের ফ্ল্যাটে বাস করবে ভেবে তার কেন যেন বিশেষ করে আনন্দ হচ্ছিল। এর মধ্যে সে অনুভব করছিল হাস্যকর, চাঞ্চল্যকর, সম্ভবত তার পক্ষে বিপজ্জনকও একটা কিছু। ইয়াকভ্‌কে দেখতে যাওয়া দরকার। সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে চেপে বসল এবং ভাবতে লাগল টাকাগুলো দিয়ে কী করা যায়, কোথায়ই বা এখন সেগুলোকে লুকানো যায়?..

হাসপাতালে এসে জানা গেল ইয়াকভ্‌কে সবে স্নান করানো হয়েছে, এখন সে ঘুমাচ্ছে। কী করা উচিত — চলে যাবে, না বন্ধুর ঘুম ভাঙ্গা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তা বুঝতে না পেরে ইলিয়া করিডরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশ দিয়ে হলুদ রঙের ড্রেসিং গাউন পরনে একের পর এক রোগীর দল ধীরে ধীরে চটি পায়ে ফট্‌ফট্‌ করতে করতে চলে যেতে লাগল, তারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের মৃদু কথাবার্তার আওয়াজের সঙ্গে দূর থেকে কাতরানির শব্দ এসে মিশছিল... দীর্ঘ পাইপের মতো করিডর বয়ে ভেসে আসছিল ফাঁপা প্রতিধ্বনি। মনে হচ্ছিল হাসপাতালের গন্ধমাখা বাতাসে অদৃশ্য কে যেন নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, বিষণ্ণতা ছড়াচ্ছে। ইলিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল এই হলুদ রঙের চার দেয়ালের মাঝখান থেকে বেরিয়ে

পড়ে। কিন্তু রোগীদের মধ্যে একজন ইলিয়ার দিকে এগিয়ে এলো, হাত বাড়িয়ে মৃদু স্বরে বলল:

'এই যে, কী খবর?'

ইলিয়া তার দিকে চোখ তুলল, তারপর হতভম্ব হয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল...

'পাভেল! তুইও এখানে?'

'আর আবার কে আছে?' পাভেল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল।

ওর মুখটা কেমন যেন ছাইরঙা, চোখজোড়া উদ্‌ভ্রান্তি ও উদ্বেগের দরুন মিটমিট করছিল। ইলিয়া ওকে সংক্ষেপে ইয়াকভের কথা বর্ণনা করার পর বলে উঠল:

'তোর চেহারা যে একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেছে!'

পাভেল নিশ্বাস ফেলল, ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল। অপরাধীর মতো সে মাথা নীচু করল, ভাঙা ভাঙা গলায় ফিসফিস করে আওড়াল:

'ওলট-পালট হয়ে গেছে...'

'তোর কী হয়েছে?' সহানুভূতির সুরে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ, জানিস না যেন...'

পাভেল তার বন্ধুর মুখের দিকে এক ঝলক তাকাল, আবার মাথা নামিয়ে ফেলল।

'ছোঁয়াচে রোগে ধরেছে?'

'তা ছাড়া কী?'

'এটা কি তাহলে ভেরার কাছ থেকেই ধরল?'

'আর কার কাছ থেকে?' পাভেল বিষণ্ণ হয়ে বলল।

ইলিয়া মাথা ঝাঁকাল।

'আমারও কোন এক দিন ধরবে।'

পাভেল ভরসা করে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'আমি ভাবলাম তুই এখন আমাকে দেখে নাক সিঁটকাবি। এদিক ওদিক হাঁটছি, হঠাৎ দেখি — তুই! লজ্জা হল, মুখ ঘুরিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেলাম।'

'বুদ্ধির ঢেঁকি!' ইলিয়া ধমক দিয়ে বলল।

'তুই কী চোখে দেখবি তা আমি কী করে জানব? রোগটা জঘন্য... দুসপ্তাহ হতে চলল এখানে আটকে পড়ে আছি। কী একঘেয়ে লাগে, কী যন্ত্রণা!

রাতে মনে হয় কয়লার আঁচে ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম। সময় আর কাটে না। যেন চোরাবালি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, চেঁচিয়ে ডাকলে যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এমন কেউ নেই...'

ও প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল, ওর মুখের পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছিল, হাত দুটো ড্রেসিং গাউনের পার খামচে খামচে ধরছিল।

'ভেরা কোথায়?' ইলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'তার ছাই আমি কী জানি?' পাভেল তিক্ত হাসি হাসল।

'আসে না?'

'একবার এসেছিল — আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। দুচক্ষে দেখতে পারি না!' রাগে বিড়বিড় করে ও বলল।

ইলিয়া ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'কী সব বাজে বক্‌ছিস! অন্যের কাছ থেকে যদি ন্যায়বিচার চাস তাহলে নিজেকেও ন্যায়ের পথে থাকতে হয়। ওর দোষ কী?'

'কাকে তাহলে দোষী করব?' পাভেল উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় বলল। 'কাকে? সারা রাত জেগে জেগে আমি ভাবি — আমার জীবনটা কেন বরবাদ হয়ে গেল? হল এই কারণে যে আমি ভেরাকে ভালোবেসেছিলাম — তাই না? ওকে আমি যে কী ভালোবাসতাম তা কেমন করে বোঝাব? — আকাশের সমস্ত তারা দিয়েও লিখে বোঝানো যাবে না!'

পাভেলের চোখ লাল হয়ে উঠল, তার চোখ দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল বড় বড় দুফোঁটা চোখের জল। ড্রেসিং গাউনের আস্তিন দিয়ে ও গাল মুছল।

পাভেলের জন্য ইলিয়ার যতটা দুঃখ না হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি হচ্ছিল ভেরার জন্য। মনে মনে তা অনুভব করে সে বলল, 'এসবই ফাঁকা বুলি। এক আধ ঢোক খেলি — খাসা লাগল — বল পেলি, ঢকঢক করে খেলি — গালাগাল শুরু করলি, মাতাল হলি! ওর দশাটা কী? ওরও ত রোগটা ধরেছে?'

'ওরও ধরেছে,' বলেই কাঁপা গলায় পাভেল উল্‌টে প্রশ্ন করল, 'তুই কি মনে করিস ওর জন্যে আমার দুঃখ হয় না? আমি ওকে খেদিয়ে দিলাম... কী ভাবে ও চলে গেল... কী কান্নাই না কাঁদল!.. কোন শব্দ না করে কী অঝোরে যে কাঁদল — আমার বুকের রক্ত জমে গেল। নিজেরই কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু

আমার বুকের ওপর তখন পাথর চেপে ছিল। আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনায় ডুবেছিলাম। ওঃ ইলিয়া! আমাদের জীবন বলতে কিছুই নেই...'

'হ্যাঁ!' ইলিয়া অদ্ভুত রকম হাসতে হাসতে টেনে টেনে বলল। 'জটিল কী যেন একটা ঘটছে! সকলকে পিষে মারছে, পিষে মারছে। ইয়াকভের বাপ ওর জীবনটা অতিষ্ঠ করে ফেলছে, মাশাকে ধরে ওরা এক বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, তুই...'

ও হঠাৎ মৃদু হেসে উঠল, গলা নামিয়ে বলল:

'এক আমারই কপালটা ভালো! যা ভাবি তাই সঙ্গে সঙ্গে হাতে পেয়ে যাই!'

'বেয়াড়া ধরনের কথা বলছিস,' কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পাভেল বলল, 'রসিকতা করছিস নাকি?'

'না না, আমি রসিকতা করতে যাব কেন? করছে অন্য কেউ। আমাদের সকলকে নিয়েই রসিকতা করছে... জীবনের কথা ভাবি, দেখি — ন্যায় বলে কিছু নেই।'

'তা আমিও দেখতে পাই! 'কোমল স্বরে অথচ বুকের সমস্ত জোর দিয়ে পাভেল বলল।

তার মুখে লাল ছোপ খেলে গেল, চোখজোড়া সুস্থ লোকের মতো সজীব ও চঞ্চল হয়ে উঠল, চকচক করতে লাগল।

ওরা করিডরের আধা অন্ধকার কোণে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। জানলার কাচ ছিল হলুদ রঙে লেপা। এখানে দেয়ালে ভালো করে ঠেস দিয়ে ওরা উৎসাহের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল, কথা বলতে বলতে একে অন্যের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছিল। দূরের কোন এক জায়গা থেকে ভেসে আসছিল তারের গুনগুন আওয়াজের মতো একটা টানা টানা আর্তনাদ, মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি মাপা একেকটা সময়ের অন্তর অন্তর তারে ঘা মারছে, তারটা তার ফলে কেঁপে উঠছে, বেজে উঠছে মরিয়া হয়ে এমন এক ভঙ্গিতে যেন সে ঠিকই জানে যে তার অসুস্থ কাঁপুনি উপশম করার মতো দরদী প্রাণ কোথাও নেই। জীবনের কঠোর হাতে সে আঘাত পেয়েছে উপলব্ধি করে পাভেল ছটফট করছে: ঐ তারের মতো সেও উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল এবং দ্রুত, অসংলগ্ন ভাবে নিজের অভিযোগ ও ভাবনা চিন্তা বন্ধুর কাছে ফিসফিস করে বলে চলল। আর ইলিয়া অনুভব করল যে পাভেলের কথাগুলো যেন ওর অন্তর থেকে

স্ফুলিঙ্গের মতো বেরিয়ে আসছে, যে তামসিক ও পরস্পরবিরোধী চিন্তা ইলিয়ার মনকে চিরকালই অস্থির করে তোলে এ স্ফুলিঙ্গ তাকে যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তার মনে হল জীবনের সামনে যে বিমূঢ় ভাব তার ছিল সে জায়গায় জ্বলে উঠেছে অন্য একটা কিছু, মনে হল এই বুঝি তার মনের অন্ধকার দূর হয়ে আলো প্রকাশ পাবে, সে চিরকালের জন্য সান্ত্বনা পাবে।

'যার খাওয়া পরার অভাব নেই সে সাধু, যার পেটে বিদ্যে আছে সে ন্যায়ের ধ্বজাধারী — এমন কেন হয়?' ইলিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে প্রাণ খুলে ফিসফিস করে বলে চলল, সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে চার দিকে তাকাতে লাগল যেন তার জীবনের অনিষ্ট যে সাধন করেছে সেই শত্রু আশেপাশেই কোথাও আছে।

'আমাদের কথা কে বুঝবে?' ইলিয়ার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা।

'তা ঠিক! কাকেই বা বলি?'

পাভেল চুপ করে গেল। ইলিয়া ভাবতে ভাবতে আনমনে করিডরের গহনে দৃষ্টিপাত করল। এখন, দুজনেই চুপ করে যেতে কাতরানি আরও স্পষ্ট করে ভেসে এলো। মনে হচ্ছিল এক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কারও বিপুল ও শক্তিশালী বুক আর্তনাদ করে উঠছে।

'তুই কি অলিম্পিয়াদার সঙ্গেই আছিস?' পাভেল জিজ্ঞেস করল ইলিয়াকে।

'হ্যাঁ, আছি!' মৃদু হেসে ইলিয়া উত্তর দিল। সেই রকম মৃদু হাসতে হাসতেই গলার আওয়াজ রীতিমতো নামিয়ে সে বলে চলল, 'জানিস, ইয়াকভ্ এমন পড়াই পড়েছে যে ভগবানে অবিশ্বাস করছে।'

পাভেল ওর দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ সুরে জিজ্ঞেস করল:

'বটে?'

'ও একটা বই পেয়েছে... আচ্ছা, তুই এ ব্যাপারে কী মনে করিস?'

'আমি, বুঝলি কিনা... তেমন একটা না... গির্জায় যাই-টাই না,' পাভেল ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে মৃদুকণ্ঠে বলল।

'আমি কিন্তু অনেক ভাবি, ভেবে ভেবে বুঝে উঠতে পারি না ভগবান কী করে এ সব সহ্য করেন।'

আবার ওদের মধ্যে দ্রুত কথাবার্তা চলতে লাগল। ওরা অন্য কোন দিকে খেয়াল না করে তাতে ডুবে রইল যতক্ষণ না হাসপাতালের এক পরিচারক এসে ওদের তাড়া দিল।

'এখানে লুকিয়ে আছ কী বলে, অ্যাঁ?' লোকটা ঝাঁঝিয়ে উঠে ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

'লুকিয়ে আছি কে বলল?' ইলিয়া জবাবে বলল।

'দেখতে পাচ্ছ না বাইরের লোক সব চলে গেছে?'

'না দেখতে পাই নি ঠিকই... চলি পাভেল... ইয়াকভের কাছে একবার যাস।'

'হয়েছে হয়েছে — যাও!' লোকটা চেঁচাল।

'শিগ্‌গিরই আসিস আবার!' পাভেল অনুনয় করে বলল।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর ইলিয়া তার দুই বন্ধুর ভাগ্য নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়ল। সে দেখতে পেল, তিন জনের মধ্যে ওর ভাগ্যটাই সবচেয়ে ভালো। তবে এই বোধ তার মনে প্রীতিকর কোন অনুভূতি জাগিয়ে তুলল না। ও কেবল তিক্ত হাসি হেসে সন্দেহের দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখল...

নতুন ফ্ল্যাটে সে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল, বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী সম্পর্কে তার কৌতূহলের সীমা ছিল না। কর্ত্রীর নাম — তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না। মহিলাটি ফুর্তিবাজ, বকবক করতে ওস্তাদ। ইলিয়া নীলরঙা ঘরটিতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই সে নিজের গোটা জীবনের বিশদ বর্ণনা তাকে দিয়ে ফেলল।

সকালে ইলিয়া যখন নিজের ঘরে চা খেতে থাকে তখন মহিলাটি কনুই পর্যন্ত হাতা গুটিয়ে অ্যাপ্রন এঁটে রান্নাঘরে ঘুরঘুর করে বেড়ায়, ওর দরজার দিকে উঁকি মেরে সোৎসাহে বলে:

'আমরা কর্তাগিন্নীতে বড়লোক না হলেও শিক্ষিত লোক। আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেছি, আমার স্বামী পড়েছে ফৌজী তালিমের স্কুলে — যদিও শেষ করে নি... কিন্তু আমরা বড়লোক হতে চাই, আর হবও... ছেলেপুলে আমাদের নেই, বড় খরচ ত ছেলেপুলের পেছনেই। আমি নিজে রান্নাবান্না করি, নিজেই বাজারে যাই। নোংরা কাজকর্মের জন্যে একটা ছোট মেয়েকে মাসে দেড় রুবল দিয়ে ঠিকে নিয়েছি, নিজের বাড়ি থেকে এসে কাজ করে। জানেন আমি কত টাকা বাঁচাই?'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে সে আঙ্গুল দিয়ে গুনতে থাকে:

'রাঁধুনি — তাকে মাইনে দাও তিন রুবল, তার ওপর তার খোরাকি — সাত: হল দশ! মাসে সে রুবল তিনেকের জিনিস ত সরাবেই — তেরো!

রাঁধ্বনির থাকার ঘর ভাড়া দিচ্ছি আপনাকে —আঠারো! একজন রাঁধ্বনির পেছনে খরচ কত ব্বঝুন একবার! তারপর আমি সব কিছ্ব কিনি পাইকারী দরে: মাখন কিনি আধ প্বদ্* হিসাবে, ময়দা — বস্তা হিসাবে, গ্বড়-চিনি কিনি প্বরো ডেলা হিসাবে। এ সব থেকে আমার লাভ হয় র্ববল বারো মতন... মোট তিরিশ র্ববল! আমি যদি কোথাও কাজ করতাম — প্বলিশ স্টেশনে বা টেলিগ্রাফ অফিসে — তাহলে আমার আয়ের সবটাই চলে যেত রাঁধ্বনির পেছনে। এখন দেখা যাচ্ছে আমার পেছনে স্বামীর কোন খরচ নেই — এই নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি! কী ভাবে জীবন কাটাতে হয় ব্বঝলেন ত ইয়াং ম্যান! শিখে রাখ্বন।'

মহিলা ধ্বর্তের ভঙ্গিতে ছটফটে দৃষ্টিতে ইলিয়ার ম্বখের দিকে তাকাল, ইলিয়া তার দিকে চেয়ে হাসল। মহিলাটিকে তার ভালোই লাগছিল, সে তার শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করছিল। সকালে জেগে উঠলেই ইলিয়া দেখতে পেত কর্ত্রী ইতিমধ্যেই রান্নাঘরে কাজকর্মে ব্যস্ত, তার সঙ্গে সঙ্গে আছে ম্বখে বসন্তের দাগওয়ালা একটি ম্বখচোরা কিশোরী — সে নিষ্প্রভ চোখে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কর্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা ইলিয়া যখন বাড়ি আসত তখন মহিলা হেসে তাকে দরজা খ্বলে দিত, তাকে দেখাত ছিমছাম, পরিপাটি আর তার শরীর থেকে ভেসে আসত কিসের যেন একটা মধ্বর ঘ্রাণ। তার স্বামী যদি ঘরে থাকত তাহলে স্বামী গীটার বাজাত আর সে স্বরেলা গলায় তার সঙ্গে গান গাইত কিংবা বোকা বানিয়ে চুমো জরিমানা আদায়ের শর্তে দ্বজনে তাস খেলতে বসত। এই খোশমেজাজী, এই আবেগপ্রবণ স্বরে তারের স্পন্দন, তাস ভাঁজার আওয়াজ, চুমকুড়ি — সবই ইলিয়া শ্বনতে পেত তার ঘর থেকে। ওরা থাকত দ্বটো ঘর নিয়ে — শোয়ার ঘর এবং আরও একটি ঘর যেটি আবার যোগ করা ছিল ইলিয়ার কামরা সঙ্গে। ঐ ঘরটা ছিল ওদের খাবারঘর ও বৈঠকখানা। সন্ধেটা তারা ওখানে কাটাত। সকালে ঘরটা পাখির কলকণ্ঠে ম্বখরিত হত — নীলকণ্ঠ পাখিরা পাল্লা দিয়ে কিচির মিচির করত, যেন ঝগড়া করছে, দোয়েল-ফিঙের দল গান গাইত, কোন কোন পাখি ব্বড়োদের মতো ভারিক্কি চালে বিড়বিড় করত, কিচমিচ আওয়াজ তুলত, কখনও কখনও এই সব চড়া গলার সঙ্গে এসে মিলত শ্যামা-চন্দনার কোমল গীতধ্বনি।

---

* প্বদ্ — র্বশী ওজনের পরিমাপ — ষোল কিলোগ্রাম। — সম্পাঃ

তাতিয়ানার স্বামী কিরিক নিকোদিমভিচ্ আভ্‌তনোমভের বয়স বছর ছাব্বিশেক। লোকটি লম্বা-চওড়া গড়নের, তার নাক বিরাট, দাঁতগুলো কালো কালো। তার ভালোমানুষ গোছের মুখটা ব্রণতে ছাওয়া, অনুজ্জ্বল চোখজোড়ায় শান্ত ও স্থির দৃষ্টি সব কিছুর ওপর ঘুরে ঘুরে পড়ত। কদম ছাঁট করে কাটা হালকা রঙের চুল তার মাথার ওপর বুরুশের মতো খাড়া হয়ে থাকত। মোটাসোটা গোটা চেহারাটা নিয়ে আভ্‌তনোমভকে কেমন যেন আনাড়ি ও হাস্যকর ঠেকত। হাঁটত সে থপথপ করে। প্রথম সাক্ষাতেই সে কেন যেন ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করে বসল:

'তুমি সুরেলা পাখি পছন্দ কর?'

'করি।'

'ধর?'

'না,' ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ইলিয়া জবাব দিল।

লোকটা নাক কুঁচকে একটু ভেবে আরও জিজ্ঞেস করল:

'ধরেছ?'

'না, ধরি নি।'

'কখনও না?'

'না।'

কিরিক আভ্‌তনোমভ এবারে অনুকম্পাভরে হেসে বলল:

'যদি না ধরে থাক তার মানে তুমি ওদের ভালোবাস না... আমি কিন্তু ধরতাম, তার জন্যে কর্প্‌স থেকে আমাকে বার পর্যন্ত করে দেওয়া হয়। এখনও ধরতে ইচ্ছে হয়, তবে ওপরওয়ালার চোখে হেয় হওয়ার সাধ নেই; কেননা সুরেলা পাখি ভালোবাসা একটা বেশ প্রশংসা করার মতো শখ হলে কী হবে, পাখি ধরা — আমোদ-ফুর্তির ব্যাপার, একজন ভারিক্কি লোকের উপযুক্ত নয়। তোমার জায়গায় হলে আমি অবশ্যই দোয়েল ধরতাম! আমুদে পাখি। এই পাখি সম্পর্কেই বলা হয়েছে, অলৌকিক পাখি।'

কথা বলতে বলতে আভ্‌তনোমভ স্বপ্নালু চোখে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, তার কথা শুনতে শুনতে ইলিয়ার অস্বস্তি লাগছিল। তার মনে হল পুলিশের লোকটি রূপকের ছলে পাখি ধরার কথা বলছে, সে যেন অন্য কোন কিছুর ইঙ্গিত করছে। কিন্তু আভ্‌তনোমভের ম্যাড়মেড়ে চোখজোড়া দেখে সে আশ্বস্ত হল; তার মনে হল লোকটার মধ্যে কোন ধূর্ততা নেই।

ইলিয়া বিনীত ভাবে হাসল, কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। ভাড়াটের এই বিনম্র নীরবতা ও গম্ভীর ভাব স্পষ্টতই তার ভালো লাগল, সে হেসে বলল:

'সন্ধেবেলায় আমাদের এখানে চা খেতে এসো। কোন সঙ্কোচ করো না, তাস খেলা যাবে — বোকা বানানোর খেলা... অতিথি-টতিথি আমাদের বাড়িতে কদাচিৎ আসে। লোকজন এলে ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু তাদের খাওয়াতে হয়, এটা অস্বস্তিকর, কেননা বড় খরচের ব্যাপার।'

এই দম্পতির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ইলিয়া যত লক্ষ্য করে তাদের প্রতি ইলিয়ার প্রীতি ততই বাড়তে থাকে। ওদের সব কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মজবুত, সবই চলছে নির্বিঘ্নে আর ওরা একে অন্যকে ভালোবাসে বলেই মনে হয়। ছোটখাটো গড়নের ছটফটে মহিলাটি যেন এক নীলকণ্ঠ পাখি, তার স্বামীটি জড়ভরত গোছের দাঁড়ের পাখির মতো, আর ঘরটা পাখির বাসার মতোই আরামের। সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসে বসে ইলিয়া কর্তাগিন্নীর কথাবার্তা শুনত আর ভাবত:

'এই না হলে জীবন!'

ও তখন ঈর্ষার বশে নিশ্বাস ফেলে আরও বেশি করে ভাবত এমন এক দিনের কথা যখন সে নিজের দোকান খুলবে, তার থাকবে ছোট্ট পরিপাটি একটি ঘর, ও পাখি পুষবে, একা একা শান্ত ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করবে,— যেন স্বপ্নরাজ্য। দেয়ালের ওপাশে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না বাজারে কী কী কিনেছে কত বাঁচিয়েছে তার বৃত্তান্ত স্বামীকে দিতে থাকে, স্বামী নীচু গলায় মৃদু হেসে প্রশংসা করে বলে:

'ওঃ কী বুদ্ধিমতী! এসো, চুমু দিই।'

শহরের নানা ঘটনার বিবরণ, যে সব কেসের ফাইল সে তৈরি করেছে তার বিষয়ে এবং পুলিশের বড়কর্তা কিংবা অন্য কোন কর্তা তাকে কী বলেছেন সে সব গল্প সে তার গিন্নীর কাছে বলত। ওরা চাকরিতে ওর উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে বলাবলি করত, পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটটাও বদল করা দরকার কিনা তারও আলোচনা চলত।

এ সব শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন এক দুর্বোধ্য ভারী বিষণ্ণতা ইলিয়াকে পেয়ে বসত। নীল রঙের ছোট্ট ঘরটাতে দম বন্ধ হয়ে আসত, সে অস্থির ভাবে ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন ভাবে দেখত যেন বিষণ্ণতার কারণ খুঁজে

দেখছে, অনুভব করত যে হৃদয়ে আর সে ভার বহন করতে পারছে না। তখন সে অলিম্পিয়াদার কাছে চলে যেত কিংবা রাস্তায় ঘুরে বেড়াত।

অলিম্পিয়াদার দাবিদাওয়া ও ঈর্ষা ক্রমেই বেড়ে চলছে, তার সঙ্গে ইলিয়ার প্রায়ই ঝগড়া হয়। ঝগড়ার সময় সে কখনই পলুএক্‌তভের খুনের উল্লেখ করত না, তবে মেজাজ যখন ঠিক থাকত সেই সব মুহূর্তে সে আগের মতোই ইলিয়াকে বোঝাত ওকথা যেন ভুলে যায়। অলিম্পিয়াদার এই সংযমে ইলিয়া অবাক হয়ে যেত। এক দিন ঝগড়ার পর ইলিয়া তাই ওকে জিজ্ঞেস করল:

'লিপা! তুমি যখন ঝগড়া কর তখন বুড়োকে নিয়ে একটি কথাও তোল না কেন?'

অলিম্পিয়াদা কোন রকম দ্বিধা না করে উত্তর দিল:

'তার কারণ এই যে এটা আমার ব্যাপার নয়, তোমারও নয়। তোমাকে ধরতে যখন পারে নি তখন বুঝতে হবে সে উচিত সাজাই পেয়েছে। তুমি নিজেই ত বলেছ ওকে খুন করার কোন দরকার তোমার ছিল না। তার মানে তোমার হাত দিয়ে ওর সাজা হয়েছে...'

ইলিয়া অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল।

'কী ব্যাপার?' অলিম্পিয়াদা জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না... ভাবছিলাম কি মানুষ যদি মূর্খ না হয় তাকে বদমাশ হতে রোখে কে? সব কিছুরই একটা যুক্তি সে খুঁজে বার করবে, সর্বত্রই দোষ দেখতে পাবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না,' অলিম্পিয়াদা মাথা নেড়ে বলল।

'না বোঝার কী আছে?' ইলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'সোজা কথা। বলছিলাম কি, দুনিয়ায় এমন কোন জিনিস আছে দেখাও যা চিরকাল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এমন জিনিস খুঁজে বার কর দেখি যার পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক দুনিয়ায় একজন অতি বুদ্ধিমানও কোন যুক্তি দেখাতে পারে নি! বার কর! পাবে না... এমন জিনিস দুনিয়ায় নেই।'

একবার ঝগড়ার পর ইলিয়া দিন চারেক আর অলিম্পিয়াদার কাছে গেল না। এমন সময় সে ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। অলিম্পিয়াদা লিখেছে:

'প্রিয়তমেষু ইলিয়া, বিদায়, চিরবিদায়। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমাকে খুঁজতে যেও না — পাবে না। প্রথম স্টীমারে চেপেই এ পোড়া শহর ছেড়ে চলে যাব। এ শহরে আমার হৃদয় সারা জীবনের জন্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি দূরে, আর ফিরব না। আমার ফেরার কথা মনেও এনো না, আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। তুমি আমার ভালো যা কিছু করেছ তার জন্যে মনেপ্রাণে ধন্যবাদ জানাই, মন্দ কিছু থাকলে তা মনেও আনব না। সত্যি কথাটা তাহলে তোমাকে বলি — আমি যে নেহাৎ একা একা কোথাও চলে যাচ্ছি তা নয়, আমি যাচ্ছি এক যুবকের সঙ্গে। এই যুবক, আনানিন, বহুকাল ধরে আমার পেছনে লেগে আছে, কাকুতি-মিনতি করে বলছে তার সঙ্গে বাস করতে রাজী না হলে তার ধ্বংসের জন্যে আমি দায়ী হব। আমি রাজী হয়েছি — এখন আমার সবই সমান। আমরা সাগর পাড়ের গাঁয়ে চলে যাব। ওখানে আনানিনদের মাছের ভেড়ি আছে। লোকটা সাদাসিধে গোছের, বোকাটে ধরনের — আমাকে বিয়ে অবধি করতে চায়। বিদায়! তোমাকে যেন স্বপ্নে দেখেছিলাম, জেগে উঠলাম — কিছুই নেই। আমার বুক কেমন ভেঙ্গে যাচ্ছে তা যদি তুমি জানতে। আমার একমাত্র আপন মানুষ, আমার চুমু নিও। লোকের সামনে গর্ব করো না — আমরা সবাই অসুখী। আমি, তোমার লিপা, এখন শান্তশিষ্ট হয়ে গেছি। এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এত যন্ত্রণা যে মনে হয় খাঁড়ার নীচে মাথা পেতে আছি।

অলিম্পিয়াদা শ্লিকোভা।

তোমার নামে পোস্টে একটা পার্সেল পাঠালাম — স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আঙটি। আমার মাথার দিব্যি, পরো।

অ. শ.'

ইলিয়া চিঠিটা পড়ল। ঠোঁট এত জোরে কামড়াল যে যন্ত্রণা হতে লাগল। তারপর আরও, আরও কয়েক বার পড়ল। প্রতি বারই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা তার আরও বেশি করে ভালো লাগতে লাগল। অসমান, বড় বড় অক্ষরে লেখা এই সাধারণ শব্দগুলো পড়তে যেমন মনে মনে কষ্ট হচ্ছিল তেমনি আহ্লাদও হচ্ছিল। এই নারী তাকে কতটা গভীর ভাবে ভালোবাসে তা ইলিয়া আগে ভাবে নি, এখন তার মনে হল ও তাকে মনেপ্রাণে, গভীর ভাবে ভালোবাসত। ওর চিঠি পড়তে পড়তে ইলিয়ার মন গর্বে ও পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। কিন্তু

এই পরিতৃপ্তির জায়গায় একটু একটু করে জুড়ে এসে বসতে লাগল নিকট জনকে হারানোর চেতনা। এখন তার মন খারাপ হলে সে কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে এই চিন্তায় ইলিয়া বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। সে নারীর চেহারা ইলিয়ার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, মনে পড়ে তার উন্মত্ত সোহাগ, তার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা — ইলিয়ার বুকের মধ্যে ক্রমেই গভীরতর হয়ে বিঁধতে থাকে আক্ষেপের তীব্র অনুভূতি। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সে ভুরু কুঁচকে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেখানে আধা অন্ধকারে এল্‌ডারবেরির ঝোপঝাড় মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে, বার্চগাছের সরু সরু ডালপালা বাতাসে নড়ছে। দেয়ালের ওপাশে বিষণ্ণ সুরে বেজে চলছে গীটার, তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না চড়া গলায় গান ধরেছে:

সাগরছেঁচা মুক্তামানিক
চাইনে আমি ভা-ই...

ইলিয়া চিঠিটা হাতে ধরে রাখল, অলিম্পিয়াদার কাছে নিজেকে তার অপরাধী বলে মনে হতে লাগল, বিষাদ ও করুণা তার বুকে চেপে বসল, তার গলা টিপে ধরল।

সাগরতলে হারিয়ে যাওয়া
আঙটিটা মোর চাই-ই...

দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে এলো। তারপর পুলিশের লোকটি ভরাট গলায় হো হো করে হেসে উঠল আর গায়িকা খিলখিল করে হাসতে হাসতে রান্নাঘরে ছুটে গেল। রান্নাঘরে ঢুকেই কিন্তু সে হঠাৎ চুপ করে গেল। ইলিয়া অনুভব করল কর্ত্রী যেন তার কাছাকাছিই কোথাও আছে, কিন্তু তার দিকে ঘুরে দেখার ইচ্ছে ইলিয়ার হল না, যদিও সে বুঝতে পারছিল তার ঘরের দরজা খুলে গেছে। ইলিয়া নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে ছিল, সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করছিল কী ভাবে নিঃসঙ্গতা তাকে জড়িয়ে ধরছে। জানলার বাইরে গাছপালা তখনও এদিক ওদিক দুলছিল। ইলিয়ার মনে হচ্ছিল সে যেন মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিমেল গোধূলির মধ্যে কোথাও উড়ে চলেছে...

'ইলিয়া ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌! চা খাবেন?' কর্ত্রী তাকে ডেকে বলল।

'না...'

জানলার বাইরে গির্জার ঘণ্টার প্রবল আওয়াজ উঠল; গম্ভীর আওয়াজ মৃদু গতিতে অথচ সজোরে জানলার কাচ স্পর্শ করল, কাচগুলো এমন ভাবে কেঁপে উঠল যে মনে হল কানে বাজছে ঝনঝন আওয়াজ। ইলিয়া ক্রুশ করল, তার মনে পড়ল যে অনেক কাল গির্জায় যাওয়া হয় নি, এই সুযোগে ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া যাবে ভেবে তার আনন্দ হল।

'আমি প্রার্থনাসভায় যাচ্ছি,' দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল। কর্ত্রী কপাট ধরে ঠিক দোরগোড়ায়ই দাঁড়িয়ে ছিল কৌতূহলী দৃষ্টিতে ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে। তার অপলক দৃষ্টিতে ইলিয়া বিব্রত বোধ করল, সে তার কাছে অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই যেন বলে উঠল:

'বহুকাল গির্জায় যাই নি...'

'ঠিক আছে! আমি তাহলে ন'টা নাগাদ সামোভার গরম করব।'

গির্জায় যেতে যেতে ইলিয়া তরুণ আনানিনের কথা ভাবতে লাগল। ইলিয়া তাকে জানত: লোকটা ধনী ব্যবসাদার, 'আনানিন ব্রাদার্স' নামে মাছের ফার্মের সবচেয়ে কমবয়সী অংশীদার। ছোকরা রোগাটে, তার চুল সাদাটে, মুখ ফ্যাকাশে, চোখের রং নীল। সে এই শহরে নতুন এসেছে, এসেই ব্যভিচারে মেতে উঠেছে।

'ওঃ কী জীবন এই সব লোকের। — একেবারে বাজপাখির মতো,' ইলিয়া ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে। 'পালক গজাতে না গজাতেই পায়রার ওপর ছোঁ!'

নিজের ভাবনা-চিন্তায় বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ইলিয়া গির্জায় প্রবেশ করল, এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অন্ধকার কোনায়, যেখানে ঝাড়লণ্ঠন জ্বালানোর সিঁড়ি রাখা ছিল।

বাঁ দিকের গায়কদল গাইছিল 'করুণাময় প্রভু'। ধর্মযাজকের ভাঙা ভাঙা ও চাপা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মেলাতে না পেরে কোন এক আনাড়ি ছেলে বিশ্রী রকম কান ফাটানো সুরে গান গেয়ে চলছিল। বেসুরো সুরে ইলিয়ার বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল ছোঁড়ার কান দুটো আচ্ছা করে মলে দেয়। চুল্লী জ্বালানোর ফলে কোনায় গরম লাগছিল, পোড়া ন্যাকড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। গরম পোশাক পরনে এক বুড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে তিরিক্ষি সুরে বলল:

'এটা আপনার দাঁড়ানোর জায়গা নয় গো...'

বুড়ির দামী পোশাকের ওপর নকুলের পুচ্ছ শোভিত কলারের দিকে ইলিয়ার চোখ পড়ল। সে চুপচাপ সরে গেল, মনে মনে ভাবল:

'গির্জায়ও তাহলে যার যার জায়গা আছে...'

পলুএক্‌তভ খুন হওয়ার পর ইলিয়া এই প্রথম গির্জায় এসেছে, এখন সেকথা মনে পড়ে যেতে সে আঁতকে উঠল।

'প্রভু, দয়া কর,' সে ক্রুশ করতে করতে ফিসফিস করে বলল।

গায়কের দল সুললিত সুরে গলা ছেড়ে গান শুরু করল। সুস্পষ্ট স্তোত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু সপ্তমের সুর ঘুঙুরের বিশুদ্ধ ও মিষ্টি আওয়াজের মতো মাথার ওপরের গম্বুজের নীচে বেজে চলল, চড়া গলার আওয়াজ টানটান করে বাঁধা তারের মতো সুরেলা হয়ে কাঁপতে লাগল। ধারাস্রোতের মতো অবিরাম সুরলহরী বয়ে চলছে আর তার পটভূমিকায় সপ্তমের ধ্বনি যেন স্বচ্ছ জলধারায় সূর্যের প্রতিফলনের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। খাদের ভরাট ও গভীর সুর শিশু কণ্ঠস্বরকে তুলে মহা সমারোহে শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছে। থেকে থেকে চড়া সুরের মধুর ও প্রবল নিনাদ ছাপিয়ে উঠছে, আবার শিশু কণ্ঠস্বরের উজ্জ্বল চমক গম্বুজের আলো-আঁধারির গা বয়ে ওপরে উঠছে, সেখান থেকে শুভ্রবসনমণ্ডিত সর্বশক্তিমান চিন্তামগ্নচিত্তে, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে প্রার্থনাকারীদের মাথার ওপর দুহাত প্রসারিত করে রেখেছেন। দেখতে দেখতে কোরাসের সুর শব্দপুঞ্জের সঙ্গে মিলেমিশে ধারণ করল সূর্যাস্ত কালের মেঘের রূপ, যখন মেঘ দেখতে হয় গোলাপী, লাল, সিঁদুরে, তার রঙের বাহার নিয়ে সূর্যের রশ্মিতে জ্বলতে থাকে, নিজের সৌন্দর্যের আবেশে বিগলিত হয়ে পড়ে।

গান থেমে গেল। ইলিয়া গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার ভালো লাগছিল — মনের যে জ্বালা নিয়ে সে এখানে এসেছিল, তা আর এখন অনুভব করা যাচ্ছে না, নিজের অপরাধ নিয়েও এখন সে মাথা ঘামাচ্ছে না। গানে তার মন হালকা ও নির্মল হয়ে গেছে। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভালো বোধ করায় সে হতভম্ব হয়ে গেল, নিজের এই অনুভূতিকে তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না, মনের মধ্যে সে অনুশোচনার সন্ধান করল কিন্তু খুঁজে পেল না।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন ভাবনা ছুঁচের মতো তাকে বিঁধল:

'কর্ত্রী যদি কৌতূহলবশে তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে টাকাগুলো দেখে ফেলে?'

ইলিয়া ছুটে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলো, একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে তাতে চেপে বাড়ির দিকে রওনা দিল। যেতে যেতে তার উদ্বেগ ক্রমাগত বেড়ে চলল, সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল: 'যদি পায়ও তাতেই বা কী আছে? ওরা রিপোর্ট করবে না, নিজেরাই মেরে দেবে...'

কিন্তু ওরা রিপোর্ট করবে না টাকাটা মেরেই দেবে — এই চিন্তায় সে আরও বিচলিত হয়ে পড়ল। তার মনে হল এমন যদি ঘটে তাহলে সে এক্ষুনি, এই গাড়িতে চেপেই থানায় চলে যাবে, বলবে যে পলুএক্‌তভকে সেই খুন করেছে। না, মহাপাপের বিনিময়ে যে টাকা সে পেয়েছে তা দিয়ে অন্যেরা নির্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দে, ভদ্র ভাবে জীবন নির্বাহ করবে আর সে নিজে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায়, উদ্বেগের মধ্যে পড়ে থাকবে — এটা হতে পারে না। এই চিন্তায় আতঙ্কে তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। বাড়িতে পেঁছে সে হ্যাঁচকা টানে দরজার ঘণ্টি বাজাল, দাঁতে দাঁত চেপে, হাত মুঠো করে পাকিয়ে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না ওকে দরজা খুলে দিল।

'উঃ কী জোরে ঘণ্টি বাজিয়েছেন! কী ব্যাপার? আপনার কী হয়েছে?' ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে সে ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া কিছু না বলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারল যে সে মিছিমিছিই ভয় পেয়েছিল। জানলার ওপরের ফ্রেমের পেছন দিকে সে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। জায়গাটায় ছোট্ট একটা পালক এমন আলতো ভাবে গুঁজে রেখেছিল যে টাকায় কেউ হাত দিলেই পালকটা খসে পড়ে যাবে। এখন সে খয়েরি রঙের ফ্রেমের ওপর পালকের সাদা দাগ স্পষ্টই দেখতে পেল।

'আপনার কি শরীর খারাপ করেছে?' কর্ত্রী দরজার সামনে এসে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না... আমি হয়ত আপনাকে ঠেলা দিয়েছিলাম — ক্ষমা করবেন...'

'ও কিছু না... একটু দাঁড়ান, গাড়ির ভাড়া কত দিতে হবে?'

'কিছু যদি মনে না করেন, মিটিয়ে দিন...'

কর্ত্রী দৌড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়া লাফ দিয়ে চেয়ারের ওপর উঠে জানলার ফ্রেমের ফাঁক থেকে টাকা বার করে নিয়ে পকেটে পুরল, এবারে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল... নিজের উদ্বেগের জন্য তার লজ্জা হতে লাগল। পালকের ব্যাপারটা তার কাছে নিজের এই অবস্থার মতোই মূর্খামি ও হাস্যকর বলে মনে হল।

'কী কান্ড!' — ভেবে সে মনে মনে হাসল। ইতিমধ্যে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না আবার দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছে।

'গাড়ির ভাড়া — কুড়ি কোপেক লাগল,' সে তড়বড় করে বলল। 'আপনার কি মাথা ঘুরাচ্ছে না কি?'

'হ্যাঁ, জানেন, গির্জায় দাঁড়িয়ে আছি আছি, এমন সময়...'

'আপনি একটু শুয়ে থাকুন,' ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ভদ্রমহিলা বলল। 'শুয়ে থাকুন, লজ্জা করার কিছু নেই... আমি আপনার কাছে বসছি... আমি একা — কর্তা ডিউটিতে, ক্লাবে গেছেন।'

ইলিয়া বিছানার ওপর বসল। ঘরে একটিমাত্র চেয়ারই ছিল। ভদ্রমহিলা তাতে বসল।

'আমি আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করলাম,' ইলিয়া বিব্রত ভাবে হেসে বলল।

'ও কিছু না,' কৌতূহলী দৃষ্টিতে, কোন রকম আব্রু না রেখে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না তার মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে উত্তরে বলল। দুজনেই চুপ। ইলিয়া বুঝতে পারছিল না তার সঙ্গে কী কথা বলবে, মহিলা কিন্তু তাকে ঐ রকমই নিরীক্ষণ করতে করতে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল।

'কী ব্যাপার?' ইলিয়া চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'বলব?' চতুর ভঙ্গিতে সে বলল।

'বলুন।'

'আপনি ভান করতে জানেন না — এই বলছিলাম আর কি!'

ইলিয়া চমকে উঠে তার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, জানেন না। আপনি আবার অসুস্থ কিসের? মোটেই অসুস্থ নন, আসল কথা আপনি একটা খারাপ চিঠি পেয়েছেন — আমি দেখেছি, দেখেছি।'

'হ্যাঁ, তা পেয়েছি,' ইলিয়া মিনমিন করে, সন্তর্পণে বলল।

জানলার বাইরে ডালপালার সড়সড় আওয়াজ শোনা গেল। মহিলা তীক্ষ্ন

দৃষ্টিতে কাচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, পরে আবার ইলিয়ার দিকে মুখ ফেরাল।

'বাতাস, কিংবা পাখি-টাখি হবে। শুনুন তাহলে ভালোমানুষের ছেলে, ভাড়াটে মশাই, আপনি আমার কথাটা শুনবেন কি? আমার বয়স কম হলেও আমি বোকা নই।'

'দয়া করে বলুনই না,' কৌতূহলবশে তার দিকে তাকিয়ে ইলিয়া জানতে চাইল।

'আপনি ঐ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিন,' কর্ত্রী ভারিক্কি চালে বলল। 'আপনাকে ত্যাগ করে সে লক্ষ্মী মেয়ের কাজ করেছে, সত্যি বলছি! বিয়ে করার সময় আপনার এখনও হয় নি, আপনার কোন সঙ্গতি নেই, আর সঙ্গতিহীন লোকের বিয়ে করা উচিত নয়। আপনি স্বাস্থ্যবান যুবক, আপনি অনেক রোজগার করতে পারেন, আপনি দেখতে সুন্দর — মেয়েরা সব সময়ই আপনার প্রেমে পড়বে। তবে নিজে আপাতত প্রেমে পড়তে যাবেন না। কাজকর্ম করুন, ব্যবসা করুন, টাকা-পয়সা জমান, বড় রকমের কোন কারবার ফাঁদার চেষ্টা করুন, নিজের দোকান খোলার চেষ্টা করুন, তখন, শাঁসালো গোছের অবস্থা হলে বিয়ে করুন। আপনার পক্ষে এ সবই সম্ভব হবে — আপনি মদ খান না, আপনি বিনয়ী, আপনি একা মানুষ।'

ইলিয়া মাথা নীচু করে শুনে গেল, মনে মনে তার হাসি পাচ্ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল আহ্লাদে, জোরে, গলা ফাটিয়ে হেসে ফেলে।

'মাথা নীচু করার কিছু নেই,' অভিজ্ঞ লোকের মতো গম্ভীর চালে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না বলে চলল। 'এ অবস্থা কেটে যাবে। প্রেম — না সারানোর মতো রোগ নয়। আমি নিজে বিয়ের আগে তিন-তিনবার প্রেমে পড়েছিলাম, একেবারে হাবুডুবু খাওয়ার মতো, কিন্তু কাটিয়ে উঠলাম! কিন্তু যখন বুঝলাম এবারে বিয়ে থা করা দরকার তখন কোন রকম প্রেম ছাড়াই বিয়ে করে বসলাম... তারপর প্রেমে পড়লাম — আমার স্বামীর প্রেমে... মেয়েরা কখনও কখনও নিজের স্বামীর প্রেমেও পড়তে পারে।'

'তাই নাকি?' চোখ বড় বড় করে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না খিলখিল করে হেসে উঠল।

'আমি ঠাট্টা করলাম। তবে সত্যি সত্যিই বলছি মেয়েদের পক্ষে ভালো না বেসেই বিয়ে করে পরে ভালোবাসা সম্ভব।'

বলেই সে আবার চোখের নানা ভঙ্গি করে বকবক করে চলল। মহিলার ছোটখাটো ছিমছাম চেহারার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে ইলিয়া মনোযোগ দিয়ে, আগ্রহের সঙ্গে তার কথা শুনে যেতে লাগল। ভদ্রমহিলা এত ছোটখাটো অথচ কী ধারাল, নির্ভরযোগ্য আর বুদ্ধিমতী!

'এমন মেয়ে বৌ হলে ডোবার কোন ভয় নেই,' ইলিয়া মনে মনে ভাবল। তার ভালো লাগছিল: তার সামনে বসে আছে একজন ঘরের বৌ, রক্ষিতা নয়, পরিপাটি, তন্বী, সত্যিকারের এক মহিলা, অথচ তার মতো একজন সাধারণ মানুষের সামনে দেমাক দেখাচ্ছে না এমনকি তার সঙ্গে 'আপনি আপনি' করে কথা বলছে। একথা ভেবে সে কর্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল, মহিলা যখন চলে যেতে উদ্যত হল তখন ইলিয়াও চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে মাথা নুইয়ে বলল:

'আমাকে অবজ্ঞা করেন নি বলে আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ, আপনার কথায় আমি সান্ত্বনা পেলাম।'

'সান্ত্বনা পেলেন? দেখলেন ত!' কর্ত্রী নিঃশব্দে হাসল, তার দুই গালে লাল ছোপ ধরল, দুচোখের স্থির দৃষ্টিতে সে কয়েক সেকেন্ড ইলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আচ্ছা, চলি,' কেমন যেন বিশেষ জোর দিয়ে কথাগুলো বলে সে কিশোরীর মতো লঘু পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করল...

যত দিন যেতে লাগল আভ্তনোমভ দম্পতিকে ইলিয়ার ততই বেশি করে ভালো লাগতে লাগল। পুলিশের লোকজনের অনেক কুটিলতা সে দেখেছে, কিন্তু কিরিককে দেখে তার মনে হত যেন একজন শ্রমিক, ভালোমানুষ গোছের এবং কাছের লোক। সে ছিল সংসারের দেহ, তার স্ত্রী — আত্মা। ঘরে সে কমই থাকত আর ঘরে তার গুরুত্বও তেমন ছিল না। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না ক্রমেই ইলিয়ার প্রতি আচরণে স্বচ্ছন্দ হয়ে এলো। সে তাকে দিয়ে কাঠ কাটাত, জল আনাত, ডাস্টবিনে ময়লা ফেলে আসতেও ইলিয়াকে বলত। ইলিয়া সানন্দে তার সমস্ত অনুরোধ রক্ষা করত। তার অলক্ষ্যে এই খুচরো কাজগুলো তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। তখন কর্ত্রী বসন্তের দাগওয়ালা বাচ্চা মেয়েটিকে প্রায় জবাবই দিয়ে দিল, বলল তাকে শুধু শনিবার-শনিবার এলেই হবে।

আভ্‌তনোমভদের বাড়িতে কখনও কখনও অতিথি আসত। তাদের মধ্যে একজন — থানার ছোট দারোগা কর্সাকভ্‌। লোকটা শুঁটকো, তার গোঁফজোড়া বিরাট। সে গগ্‌লস পরত, মোটা আকারের সিগারেট ফুঁকত, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা ছিল তার দুচক্ষের বিষ। সব সময় বিরক্তির সঙ্গে তাদের কথা বলত।

'আর কেউ ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো আইনশৃঙ্খলা ভাঙে না,' সে বলত। 'বেয়াড়া গোরু-ভেড়ার পাল! পথচারীদের মনে রাস্তার আইনকানুনের ওপর শ্রদ্ধার উদ্রেক সব সময়ই করানো যায়: পুলিশের বড়কর্তা কেবল নিয়ম ছাপিয়ে দিলেন — 'রাস্তার নীচের দিকে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা ডান ধার ঘেঁষে চলুন, যাঁরা উপরের দিকে যাচ্ছেন তাঁরা বাঁ দিকে ধরে চলুন' — ব্যস্‌ চুকে গেল। রাস্তায় চলাচলে তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলা চলে এলো। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের কোন নিয়মই মানানো যায় না, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা হল... এ হল গিয়ে... এ যে ছাই কী — কে জানে?'

সারা সন্ধে সে এই নিয়ে বকবক করে যেতে পারে, ইলিয়া তার কাছ থেকে আর কোন প্রসঙ্গ কখনও শোনে নি।

আরও একজন আসত। সে লোকটি ছিল অনাথ ভবনের সুপারিন্‌টেন্ডেণ্ট গ্রিজ্‌লভ্‌। সে ছিল স্বল্পভাষী, মুখে তার কালো দাড়ি। সে খাদের সুরে গাইতে ভালোবাসত 'আহা নীল, ঘন নীল সাগরের বুকে'। গ্রিজ্‌লভের বৌটি লম্বা চওড়া, তার দাঁতগুলো বিরাট বিরাট। সে এলেই তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নার মিষ্টি খেয়ে ফতুর করে যেত। সে চলে যাওয়ার পর তাই তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না তার উদ্দেশে গালিগালাজ করত।

'আমার ওপর বদমাইশি করে ও এই কাণ্ডটা করে!'

এ ছাড়া আসত আলেক্সান্দ্রা ভিক্তরভ্‌না গ্রাভ্‌কিনা আর তার স্বামী। মহিলাটি লম্বা আর পাতলা গড়নের, তার চুল কটা, সে এমন অদ্ভুত ভাবে নাক ঝাড়ত যে মনে হত বুঝি সুতির কাপড় পড়পড় করে ছেঁড়া হচ্ছে। স্বামীটি ফিসফিস করে কথা বলত, তার ছিল গলার ব্যামো। কিন্তু কথা সে বলে যেত অনর্গল আর তার মুখের ভেতর যেন শুকনো খড় খড়্‌খড়্‌ আওয়াজ করত। লোকটা ছিল অবস্থাপন্ন, আবকারী বিভাগে কাজ করত, কোন এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যও ছিল কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সব সময় গরিবদের গালাগাল করত, যে সব লোক তাদের ভালো

চায় তাদের প্রতি অশ্রদ্ধার অভিযোগ তুলে, মিথ্যাবাদী আর লোভী বলে ওদের দোষ দিত।

ইলিয়া নিজের ঘরে বসে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনত জীবন সম্পর্কে ওরা কী বলে। যা সে শুনত তা ওর বোধগম্য হত না। মনে হত এই লোকগুলো সব সিদ্ধান্ত করে বসে আছে, তারা সব জানে এবং ওদের চেয়ে যারা অন্য ভাবে জীবনযাপন করে তারা সবাই ওদের কঠোর সমালোচনার পাত্র।

মাঝে মাঝে কর্তাগিন্নী তাদের ভাড়াটেকে চা পানের আমন্ত্রণ জানাত। চা পান করতে করতে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না হাসি-ঠাট্টা করত, আর তার স্বামী কল্পনা করত কী ভাবে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়, বাড়ি কেনা যায়।

'মুরগী পালতে পারলে বেশ হত!' স্বপ্নে বুঁদ হয়ে চোখ দুটো কুঁচকে সে বলত:

'লাল, কালো, ফুটকিদার, টার্কী — সব জাতের মুরগী। আর ময়ূর! ড্রেসিং গাউন পরে জানলার পাশে বসে বসে সিগারেট ফোঁক আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ তোমার নিজের ময়ূর ছাতার মতো পেখম খুলে উঠোনে ঘোরাফেরা করছে — ওঃ কী বলব! হাঁটছে পুলিশের বড় কর্তার মতো আর বিড়বিড় করছে — কঁক, কঁক, কঁক!'

তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না রুচিসম্মত ভাবে মৃদু খিলখিল হেসে ইলিয়ার দিকে তাকায়, সে নিজেও স্বপ্ন দেখে:

'আমি তাহলে গরমকালে ক্রিমিয়ায় যেতাম, না হয় যেতাম ককেশাসে, শীতকালে ত্রাণসমিতির সভা-টভা করে বেড়াতাম। নিজের জন্যে স্রেফ সাদাসিধে গোছের একটা পশমের পোশাক বানিয়ে নিতাম, চুনির ব্রোচ আর মুক্তোর দুল ছাড়া আর কোন গয়নাই পরতাম না। 'নিভা' পত্রিকায় একটা কবিতা পড়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছে যে পরলোকে গরিবদের রক্ত আর চোখের জল চুনি আর মুক্তো হয়ে যাবে।' তারপর মৃদু শ্বাস ফেলে বলত, 'কালো চুলের সঙ্গে চুনি চমৎকার মানায়।'

ইলিয়া কোন কথা না বলে হাসত। ঘর ঝকঝকে তকতকে, তাতে উষ্ণতার আমেজ, চায়ের রুচিকর সুঘ্রাণ, রুচিকর আরও কিছুর সুঘ্রাণ। খাঁচার ভেতরে ফুঁয়ো ফুঁয়ো গোলা পাকিয়ে পাখিরা ঘুমুচ্ছে, দেয়ালে রঙচঙে ছবি ঝুলছে। দুই জানলার মাঝখানে কুলুঙ্গিতে সাজানো রয়েছে ওষুধের সুন্দর

সুন্দর বাক্স, চীনেমাটির মুরগী, চিনি ও কাচের তৈরি রঙবেরঙের ইস্টার এগ্। এ সবই ইলিয়ার ভালো লাগে আবার কেমন একটা মৃদু, মধুর বিষণ্ণতা জাগিয়ে তোলে।

কিন্তু মাঝে মাঝে — বিশেষ করে দিনটা খারাপ গেলে — এই বিষণ্ণতা ইলিয়ার মনে হতাশা ও অস্থিরতা সঞ্চার করত। মুরগী, বাক্স আর ডিম তার মনে বিরক্তি উদ্রেক করত, ইচ্ছে হত ওগুলোকে পাক মেরে মেঝেয় ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়ায়। এই মেজাজ যখন ইলিয়াকে পেয়ে বসত তখন সে চুপচাপ এক দিকে চেয়ে থাকত, তার কথা বলতে ভয় হত, মনে হত এই বুঝি ভালো মানুষগুলোকে অপমান করে ফেলে। এক দিন কর্তাগিন্নীর সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে কিরিক আভ্তনোমভের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে জিজ্ঞেস করে বসল:

'আচ্ছা কিরিক নিকোদিমভিচ্, দ্ভোরিয়ান্স্কায়া স্ট্রীটে ব্যবসাদারকে কে খুন করল আজও কি তার পাত্তা পাওয়া গেল না?'

জিজ্ঞেস করেই বুকের মধ্যে একটা প্রীতিকর জ্বালাধরা সুড়সুড় ভাব টের পেল।

'কার? পলুএক্তভের?' নিজের হাতের তাস ভালো করে দেখতে দেখতে পুলিশের লোকটি অন্যমনস্ক ভাবে বলল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, 'মানে, পলু-এক্-ত-ভে-র? না, পলু-এক্-ত-ভে-র পাত্তা মেলে নি... মানে, পলুএক্তভের নয়, সেই লোকটার, যার... ওর খোঁজ করার ভার আমার ওপর ছিল না... ওকে আমার দরকার নেই... আমার জানা দরকার — ইস্কাপনের বিবি কার কাছে? বিবি-বিবি-বিবি! তুমি, তানিয়া, আমাকে চাল দেওয়ার সময় দিয়েছিলে তিন — হরতনের বিবি, রুইতনের বিবি — তারপর?'

'রুইতনের সাত... জলদি কর!'

'লোকটা হাওয়াই হয়ে গেল!' ইলিয়া মৃদু হেসে বলল।

দারোগাবাবু কিন্তু ইলিয়ার কথায় মনোযোগ না দিয়ে চাল ভাবতে লাগল।

'হাওয়াই হয়ে গেল!' ইলিয়ার কথাটা সে আবৃত্তি করল। 'সাফই করে দিল পলু-এক্-ত-ভ্-ভ্-কে...'

'কিরিক, ভ্যা-ভ্যা করা ছাড়,' স্ত্রী তাকে বলল। 'তাড়াতাড়ি চাল দাও।'

'খুন যে করেছে সে বেশ চালু বলতে হবে!' ইলিয়া ক্ষান্ত হল না। ওর কথায় মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না দেখে খুনের প্রসঙ্গে কথা বলার উৎসাহ ওকে আরও পেয়ে বসল।

'চা-লু?' দারোগা টেনে টেনে বলল। 'না, চালু — আমি! অ্যা-অ্যাই!'

বলেই সে দড়াম্ করে টেবিলের ওপর তাস ছুঁড়ে মারল, এবারে ইলিয়ার পালা। ইলিয়ারই হার হল। কর্তাগিন্নী তা দেখে হাসল, তাতে ইলিয়ার গা আরও জ্বলে গেল। তাস বেঁটে দিতে দিতে সে নাছোড়বান্দার মতো বলল:

'শহরের বড় রাস্তার ওপর দিনে দুপুরে মানুষ খুন করা — এর জন্যে বুকের পাটা থাকা চাই।'

'বুকের পাটা নয়, সৌভাগ্যের ব্যাপার,' তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না ওকে শুধরে দিল।

ইলিয়া তার দিকে তাকাল, তার স্বামীর দিকে তাকাল, মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল:

'খুন করাটা — সৌভাগ্যের?'

'মানে, খুন করে পার পাওয়া।'

'আবার সেই রুইতনের টেক্কা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল!' দারোগা বলল।

'ওটা আমার পেলে হত!' ইলিয়া গম্ভীর ভাবে বলল।

'ব্যবসাদারকে খুন করুন তাহলে পাবেন!' হাতের তাস নিয়ে ভাবতে ভাবতে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না তাকে বলল।

'খুন করলেই পিঠে রুইতনের টেক্কা মারা কয়েদীর পোশাক পাবে, আপাতত এই রইল রুইতনের টেক্কার পিঠ!' দুটো নয় এবং একটা টেক্কা ইলিয়ার তাসের ওপর ফেলে দিয়ে কিরিক জোরে হোহো করে হেসে উঠল।

ইলিয়া আবার ওদের খুশিতে ডগমগ মুখের দিকে তাকাল, খুন সম্পর্কে কথা বলার প্রবৃত্তি তার চলে গেল।

পাতলা একটা দেয়ালের ব্যবধানে পরিচ্ছন্ন ও নির্বিঘ্ন জীবনযাপনকারী এই মানুষগুলোর পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মারাত্মক একঘেয়েমির ধাক্কা সে আরও ঘন ঘন অনুভব করতে লাগল। আবার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে জীবনের বিরোধ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা, তার ভাবনা হয় ঈশ্বর সম্পর্কে, যিনি সব জানেন অথচ শাস্তি দেন না। কিসের জন্য তাঁর এই প্রতীক্ষা?

একঘেয়েমি থেকে ইলিয়া আবার বই পড়া ধরল: বাড়ির মালিকদের কাছে কয়েক খণ্ডে বাঁধানো 'নিভা' ও 'সচিত্র পত্রিকা' ছিল আর ছিল কিছু ছেঁড়াখোঁড়া বই।

ছোটবেলার মতো এখনও তার ভালো লাগে কেবল সেই সব গল্প ও উপন্যাস যেখানে বর্ণনা আছে তার অজানা জীবনের — যে জীবন সে যাপন করছে সে জীবনের নয়। সাধারণ লোকজনের জীবনযাত্রার কাহিনী, বাস্তব জীবনের কাহিনী তার একঘেয়ে ও অবিশ্বাস্য মনে হত। মাঝে মাঝে সেগুলো হাসির উদ্রেক করত তবে বেশির ভাগ সময়ই তার মনে হত যে এই সব গল্প যারা লেখে তারা ধূর্ত লোক, তাদের উদ্দেশ্য হল অন্ধকারাচ্ছন্ন, কঠিন জীবনকে রং ফলিয়ে দেখানো। এ জীবন তার জানা ছিল, ক্রমেই আরও বেশি করে জানছে। রাস্তায় পায়চারী করতে করতে রোজই সে এমন কিছু না কিছু ব্যাপার দেখতে পেত যা তার মনকে সমালোচনামুখী করে তুলত। হাসপাতালে এসে সে ব্যঙ্গ করে হাসতে হাসতে বলত:

'চমৎকার বিচার! এই সে দিন দেখলাম — ফুটপাথ ধরে ছুতোর আর রাজমিস্ত্রিরা যাচ্ছে, হঠাৎ — পুলিশ। 'অ্যাই, জানোয়ারের দল!' — বলে তাদের ফুটপাথ থেকে খেদিয়ে দিল। বলল, ঘোড়া যেখান দিয়ে চলছে সেই রাস্তা ধরে যা, নইলে তোদের জামাকাপড়ের নোংরা ভদ্দরলোকদের গায়ে লেগে যাবে... গড়ল যে তোর ঘর-বাড়ি, তার কপালে ডান্ডাবেড়ি!'

পাভেলও জ্বলে উঠত, আগুনে আরও ইন্ধন যোগাত। হাসপাতালে জেলখানার মতো বন্দী থেকে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল, রাগে দুঃখে তার চোখ দুটো ধকধক করত, সে দিন দিন শুকিয়ে জিরজিরে হয়ে যাচ্ছিল। ইয়াকভ্‌কে তার ভালো লাগত না, তার মনে হত ও একটা আধা পাগলাটে।

ইয়াকভের ধরেছিল ক্ষয়রোগ। হাসপাতালে সে শুয়ে থাকত মনের সুখে। তার পাশের বেডে ছিল গির্জার এক দারোয়ান, কিছু দিন আগে তার একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইয়াকভ্‌ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। লোকটা ছিল মোটাসোটা, বেঁটে গড়নের, তার মাথায় বিরাট টাক, সারা বুক জুড়ে ঝুলে পড়েছে কালো দাড়ি। তার ভুরুজোড়া গোঁফের মতো ঝোপড়া, সে সব সময় ভুরু নাচাত আর গলার স্বরটা ছিল এমন ফাঁপা ফাঁপা যেন নাভিমূল থেকে বেরিয়ে আসছে। ইলিয়া যখনই হাসপাতালে আসত তখনই ইয়াকভ্‌কে দারোয়ানের বেডে বসে থাকতে দেখত। দারোয়ান চুপচাপ

শুয়ে শুয়ে ভুরু নাচাত আর ইয়াকভ্ ঐ লোকটারই মতো বেঁটে ও মোটাসোটা একটা বাইবেল চাপা গলায় পড়ে যেত।

'এই রূপে নিশীথকালে সর্বস্বান্ত হইবে, বিনষ্ট হইবে মোয়াভের আর্! এই রূপে নিশীথকালে সর্বস্বান্ত হইবে, বিনষ্ট হইবে মোয়াভের কির্!'

ইয়াকভের কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা শোনাচ্ছে করাত দিয়ে গাছ কাটার আওয়াজের মতো। পড়তে পড়তে সে বাঁ হাত ওপরের দিকে তোলে, যেন ওয়ার্ডের রোগীদের আমন্ত্রণ জানায় রুষ্ট ইশার দিব্যবাণী শোনার জন্য। তার বড় বড় স্বপ্নালু চোখজোড়া পাণ্ডুর মুখকে কেমন যেন ভয়াবহ করে তোলে। ইলিয়াকে দেখতে পেয়ে সে বই ফেলে দিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে তার বন্ধুকে সব সময় কেবল একটি কথাই জিজ্ঞেস করত:

'মাশাকে দেখেছিস?'

ইলিয়া ওকে দেখে নি।

'হা ভগবান!' ইয়াকভ্ বিষণ্ণ হয়ে বলে। 'কী যে হল... ঠিক যেন রূপকথা! এই ছিল — হঠাৎ ডাইনী ওকে চুরি করে কোথায় নিয়ে গেল, ও আর নেই...'

'তোর বাপ এসেছিল রে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করে।

ইয়াকভের মুখের পেশীতে কাঁপন ধরে, ভয়ে সে চোখ পিটপিট করে।

'এসেছিল। বলে, আর পড়ে থেকে কাজ নেই, হাসপাতাল থেকে ছাড়া করিয়ে নে! আমি ডাক্তারকে কাকুতি-মিনতি করে বললাম আমাকে যেন এখান থেকে না ছাড়ে। এখানে বেশ আছি — চুপচাপ, ঝামেলা নেই। এই যে নিকিতা ইয়েগোরভিচ্ — ওঁর সঙ্গে আমি বাইবেল পড়ি। সাত বছর বাইবেল পড়েছেন, সব মুখস্থ, ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন। ভালো হয়ে গেলে নিকিতা ইয়েগোরভিচের কাছে থাকব, বাবার কাছ থেকে পালাব! গির্জায় নিকিতা ইয়েগোরভিচ্‌কে সাহায্য করব, কোরাসে গান গাইব।'

দারোয়ান ধীরে ধীরে ভুরু কপালে উঠায়, তার ভুরুজোড়ার নীচে বসা কোটরের মধ্যে অতি কষ্টে ঘুরতে থাকে গোল গোল কালো চোখজোড়া। চোখজোড়া শান্ত ভাবে ইলিয়ার মুখের ওপর বদ্ধ হয়ে থাকে — সে দৃষ্টি নিষ্প্রভ, স্থির, ঘোলাটে।

'কী চমৎকার বই এই বাইবেল!' কাশতে কাশতে হাঁসফাঁস করতে করতে ইয়াকভ্ চিৎকার করে ওঠে। 'আর সেটাও আছে — মনে আছে, সরাইখানায়

সেই ধর্মজ্ঞানীর কথা: 'লুণ্ঠনকারীদিগের শিবিরের সম্মুখে শান্তি বিরাজমান'? আছে, খুঁজে পেয়েছি! আরও সাংঘাতিক কথা আছে!'

একটি হাত ওপরে উঠিয়ে চোখ বন্ধ করে ও গম্ভীর ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে যায়:

''নিত্যই কি দুরাচারদিগের দীপ নির্বাপিত হইতেছে, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইতেছে এবং তিনি রুষ্ট হইয়া তাহাদিগের অদৃষ্টে দুঃখকষ্ট দিতেছেন?' শুনছিস? 'কহিবে: ঈশ্বর তাঁহার সন্তানসন্ততির নিমিত্ত তাঁহার দুর্ভাগ্য সংরক্ষণ করিয়া রাখিতেছেন। তিনি বরং তাহাকেই উহার প্রতিফল দিন, যাহাতে সে বুঝিতে পারে'...'

'সত্যিই এ রকম আছে না কি?' ইলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করে বলল।

'অক্ষরে অক্ষরে!'

'আমার মনে হয় এটা ভালো কথা নয় — পাপ!' ইলিয়া বলল।

দারোয়ান ভুরুজোড়া নাচাল, তাতে তার চোখ ঢেকে গেল। তার দাড়ি নড়েচড়ে উঠল, ফাঁপা ফাঁপা অদ্ভুত গলায় সে বলল:

'যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী তাঁর দুঃসাহসিকতা পাপ নয়, কেননা তা সম্পন্ন হয় পরমেশ্বরের তাড়নায়।'

ইলিয়া চমকে উঠল। দারোয়ান গভীর শ্বাস নিয়ে আগের মতোই ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে বলল:

'সত্য নিজেই মানুষকে তাড়না দেয় — আমাকে সন্ধান কর! কেননা সত্যই ঈশ্বর... শাস্ত্রে বলা হয়েছে: 'প্রভুর অনুগমন করা — পরম সম্মানজনক'।'

দারোয়ানের ঘন গোঁফদাড়ির জঙ্গলে ঢাকা মুখ ইলিয়ার মনের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের ভাব জাগিয়ে তুলল: তার সেই মুখে গম্ভীর, কঠোর কিছু একটা ছিল।

দেখতে দেখতে দারোয়ানের ভুরুজোড়া কপালে উঠল, সে একদৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল, আবার তার গোঁফদাড়ি নড়ে উঠল।

'ইয়াকভ্, ওকে জোভের দশম অধ্যায়ের শুরুটা পড়ে শুনিয়ে দাও...'

ইয়াকভ্ কোন কথা না বলে চটপট বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে গেল, তারপর মৃদু কাঁপা কাঁপা স্বরে পড়ে গেল:

''আমার আত্মার নিকট আমার জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, আমার বেদনার নিকট আমি আত্মসমর্পণ করিব। ঈশ্বরকে কহিব, আমাকে অভিযুক্ত

করিও না, আমারে কহ, আমার সহিত তোমার বিরোধ কী কারণে? তুমি যে তোমারই হস্তের সৃষ্টিকে পীড়ন করিতেছ, অবজ্ঞা করিতেছ ইহা কি তোমার পক্ষে শোভনীয়?..' '

ইলিয়া গলা বাড়িয়ে এক পলক বইয়ের ভেতরটা দেখে নিল।

'বিশ্বাস করছিস না বুঝি?' ইয়াকভ্ বলে উঠল। 'কী অদ্ভুত রে বাবা!'

'অদ্ভুত নয়, ভীতু,' দারোয়ান শান্ত কণ্ঠে বলল।

সে তার নিস্তেজ দৃষ্টি অতি কষ্টে ছাদ থেকে নামিয়ে ইলিয়ার মুখের ওপর ফেলল, যেন কথা দিয়ে ইলিয়াকে পিষে ফেলতে চায় এই ভাবে সে কঠিন স্বরে বলে চলল:

'যেটা শুনলে তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক উক্তি আছে। বাইশের অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ত সরাসরিই বলা হয়েছে: 'তুমি যে ন্যায়পরায়ণ তাহাতে সর্বশক্তিমানের পরিতৃপ্তির কী আছে? তুমি যে সততার পথে সংসক্ত রহিয়াছ তাহা হইতে তাঁহার কি কোন উপকার ঘটিবে?' এই সব উক্তির অর্থ বুঝতে যাতে ভুল না হয় তার জন্যে অনেকক্ষণ ভাবা দরকার...'

'আপনি কি বোঝেন?' ইলিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'উনি?' ইয়াকভ্ অবাক হয়ে বলল। 'নিকিতা ইয়েগোরভিচ্ সব বোঝেন।'

দারোয়ান কিন্তু গলা আরও নীচু করে বলল:

'আমার বোঝার সময় নেই... এখন আমার বুঝতে হবে মরণকে... আমার একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওপরের দিকে ফুলে উঠছে, অন্য পা'টা ফুলছে, বুকও... এ রোগে আমি শিগ্‌গিরই মারা যাব।'

ওর চোখজোড়া ইলিয়ার মুখের ওপর চেপে বসছিল, সে ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে বলল:

'মরতে আমি চাই না, কেননা আমার জীবনটা কেটেছে দুঃখকষ্ট আর অপমানের মধ্যে, জীবনে আনন্দ বলতে কিছুই ছিল না। ছোটবেলায় এই ইয়াকভের মতোই ছিলাম বাবার তত্ত্বাবধানে। বাবা ছিল মাতাল, জানোয়ার বিশেষ। তিন বার আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়, একবার ফুটন্ত জল ঢেলে আমার পা পুড়িয়ে দেয়। মা ছিল না — আমার জন্ম দিয়েই মারা যায়। বিয়ে করলাম। বৌ অনিচ্ছায় আমাকে বিয়ে করে — ভালোবাসত না আমাকে... বিয়ের পর তিন রাত্তির পেরোতে না পেরোতেই ফাঁসি দিয়ে ম'লো। বোন-জামাই ছিল। আমার সর্বস্ব লুটেপুটে নিল। বোন বলল, আমিই না কি

গলায় দড়ি দিতে বাধ্য করেছি বৌকে। সকলেই এমন বলতে লাগল, অথচ সকলেরই জানা ছিল আমি ওকে স্পর্শই করি নি, যেমন কুমারী ছিল তেমনি অবস্থায়ই মারা গেল... এরপর আমি আরও নয় বছর জীবন কাটালাম। একা একা জীবন কাটানো বড় ভয়ঙ্কর! সব সময় অপেক্ষা করতাম কবে সুখের দিন আসবে। এখন মরতে বসেছি। এই হল আমার জীবন।'

ও চোখ বন্ধ করল, একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল:

'বাঁচার কী অর্থ হল?'

ওর ভয়ঙ্কর কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনের মধ্যে আতঙ্ক জুড়ে বসল। ইয়াকভের চোখমুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল, তার চোখে জল চকচক করতে লাগল।

'বলি, বাঁচার কী অর্থ হল? শুয়ে শুয়ে ভাবি — কী অর্থ হল আমার বাঁচার?'

দারোয়ানের গলার আওয়াজ বসে গেল। তার কণ্ঠস্বর তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে পড়ল — মনে হল যেন মাটির ওপর ঘোলা জলের স্রোত বয়ে গেল, তারপর হঠাৎই তা মাটির নীচে লুকিয়ে পড়ল।

'জীবিতদিগের মধ্যে যে রহিয়াছে তাহার আশা অদ্যাপি বর্তমান, যেহেতু মৃত সিংহের তুলনায় জীবন্ত সারমেয় উৎকৃষ্ট,' দারোয়ান চোখ খুলে আবার বলতে লাগল। আবার তার দাড়ি নড়েচড়ে উঠল।

'ঐ একই সুসমাচারে বলা হয়েছে: 'সৌভাগ্যের দিনে সম্পদ ভোগ কর আর দুর্ভাগ্যের দিনে — অনুধাবন কর: ঈশ্বর উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন এই কারণে যাহাতে মানুষ তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু না কহিতে পারে'।'

আর শোনার মতো ধৈর্য ইলিয়ার ছিল না। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। সে ইয়াকভের সঙ্গে করমর্দন করল আর দারোয়ানের উদ্দেশে এত নীচু হয়ে মাথা নোয়াল যে লোকে মড়া মানুষকে বিদায় জানানোর সময়ই সে রকম করে থাকে। ব্যাপারটা কেমন যেন দৈবাৎই ঘটে গেল।

হাসপাতাল থেকে সে নতুন করে একটা ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে এলো, ঐ লোকটার বিষণ্ণ চেহারা তার মনের গভীরে গেঁথে বসল। জীবনে যারা বঞ্চিত হয়েছে সেই সব লোকজনের আরও একটি সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। দারোয়ানের কথাগুলো সে ভালোমতো মনে করে রাখল, তাদের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টায় সে সেগুলোকে নানা ভাবে মনের মধ্যে আন্দোলন করে দেখতে লাগল। কথাগুলো

তার মনের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যে বিশ্বাস তার অন্তরের অন্তস্তলে সে লালন করে আসছিল তা টলে উঠল।

ইলিয়ার মনে হল তার অজান্তেই কখন যেন ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিশ্বাস মনের ভেতরে নাড়া খেয়ে উঠেছে, আগের মতো তার আর দৃঢ়তা নেই — লোহায় মরচে পড়ার মতো কিসে যেন তা খেয়ে গেছে। ইলিয়ার বুকের মধ্যে জল আর আগুনের মতো মিলমিশের অনুপযোগী দুটি শক্তি যেন কাজ করছে। তার মনের ভেতরে নিজের অতীতের প্রতি, সমস্ত লোকজন আর জীবনের রীতিনীতির প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষোভ জেগে উঠল।

আভ্‌তনোমভ দম্পতির স্নেহ তার ওপর ক্রমেই বেড়ে গেল। কিরিক উৎসাহদানের ভঙ্গিতে তার পিঠ চাপড়াত, তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করত, গম্ভীর ভাবে বলত:

‘তুমি ভাই আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করছ। এ রকম বিনয়ী, রাশভারী স্বভাবের ছোকরার আরও বড় হওয়া উচিত। পুলিশের বড়কর্তা হওয়ার যোগ্যতা যার আছে তার কি আর সাধারণ দারোগা হয়ে থাকা সাজে?’

তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইলিয়াকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে থাকে তার ব্যবসা কেমন চলছে, মাসে সব খরচাপাতি বাদ দিয়ে তার আয় কত হয়। ইলিয়া সোৎসাহে তার সঙ্গে কথা বলত, অতি নগণ্য জিনিসপত্র দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পটু এই মহিলাটির প্রতি ইলিয়ার ভক্তি-শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে...

এক দিন সন্ধ্যায় ইলিয়ার মনটা বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। নিজের ঘরে খোলা জানলার সামনে বসে বসে অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে সে অলিম্পিয়াদার কথা ভাবছিল। এমন সময় তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চা খেতে ডাকল। ইলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলল — ভাবনা ছেড়ে উঠতে আসতে তার খারাপ লাগছিল, আবার বাক্যব্যয়ের ইচ্ছেও তার ছিল না। ভুরু কুঁচকে চুপচাপ সে চায়ের টেবিলের পাশে বসল, কর্তাগিন্নীর দিকে তাকাতে দেখল তাদের চোখেমুখে গাম্ভীর্য ও উত্তেজনার ছাপ। সামোভার মৃদু টগবগ আওয়াজ তুলছে, কোন একটা পাখি জেগে উঠে খাঁচার মধ্যে হুটোপাটি খাচ্ছে। ঝলসানো পেঁয়াজ আর অডিকলোনের গন্ধ ভেসে আসছে। কিরিক চেয়ারের ওপর ঘুরে বসল, ট্রের কানায় আঙুল দিয়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে তান ধরল:

'দুম্ তেরে কেটে দুম্! তেরে কেটে দুম্...'

'ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্!' মহিলা জাঁকাল ভঙ্গিতে কথা শুরু করল। 'আমি আর আমার স্বামী একটা ব্যাপার বেশ করে ভেবে দেখলাম, এখন, আপনার সঙ্গে একটা গুরুতর কথা বলতে চাই।'

'হো হো হো!' দারোগাবাবুটি তার দুহাতের লাল টকটকে তালু ঘসতে ঘসতে হেসে উঠল। ইলিয়া চমকে উঠে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

'আমরা ভেবে দেখলাম!' দাঁত বার করে হাসতে হাসতে কিরিক বলল, ইলিয়ার দিকে চোখ টিপে ইঙ্গিতে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়ে যোগ করল, 'খাসা মাথা!'

'আমরা কিছু টাকা জমিয়েছি, ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্।'

'আমরা জমিয়েছি! হো হো! লক্ষ্মীটি আমার!'

'থাম দেখি!' তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না ধমক দিয়ে বলল। তার মুখ রুক্ষ এবং আরও তীক্ষ্ন হয়ে উঠল।

'আমরা হাজারখানেক রুবল জমিয়েছি,' ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় সে বলল। 'টাকাগুলো ব্যাঙ্কে আছে, তা থেকে আমরা শতকরা চার হারে সুদ পাই...'

'পরিমাণটা কম!' কিরিক টেবিল ঠুকে চেঁচিয়ে বলল। 'আমরা চাই...'

গিন্নী কটমট করে তার দিকে তাকাতে সে থেমে গেল।

'সুদটা অবশ্য পরিমাণে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে আপনার যাতে একটা উপায় হয় তার জন্যে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই...'

ইলিয়াকে কয়েকটা মামুলি মন রাখা কথা বলার পর সে বলে চলল:

'আপনি বলছিলেন ব্যবসা ঠিকমতো গুছিয়ে করতে পারলে মনিহারী দোকান থেকে শতকরা বিশ এমনকি আরও বেশি আয় হতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে টাকা যথাসময়ে ফেরত দেবেন কেবল এ রকম একটা হুণ্ডির ভিত্তিতেই আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার দিতে রাজী আছি। আপনি দোকান খুলুন। ব্যবসা করবেন আমার কর্তৃত্বে আর লাভের বখরা হবে আধা-আধি। দোকানের মালপত্র ইনসিওর করবেন আমার নামে, তা ছাড়া এর জন্যে আপনি আমাকে আরও একটা কাগজ দেবেন — কাগজটা কিছুই না! তবে দস্তুর অনুযায়ী দরকারী। এই বারে ব্যাপারটা ভেবে দেখুন, বলুন রাজী আছেন কিনা।'

তার মিহি, নীরস গলায় আওয়াজ শুনতে শুনতে ইলিয়া জোরে জোরে নিজের কপাল রগড়াল। সে যখন কথা বলে যাচ্ছিল তার মধ্যে কয়েক বার ইলিয়া ঘরের কোনার দিকে তাকাল — সেখানে আইকনের দুপাশে দীপাধারে মোমবাতি জ্বলছিল, তার আলোয় জ্বলজ্বল করছিল আইকনের সোনালি ফ্রেম। ইলিয়ার অবাক লাগছিল না, তবে তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল, এমনকি ভয় ভয় করছিল। এই প্রস্তাব তার দীর্ঘকালের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে যাচ্ছে একথা ভেবে সে বিহ্বল ও উৎফুল্ল হয়ে পড়ল। বিমূঢ় হয়ে হেসে সে এই ছোটখাটো মহিলাটির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল: ভাগ্য আর কাকে বলে!

মহিলা মাতৃস্নেহ ঝরিয়ে বলল:

'এ সম্পর্কে ভালো করে ভেবে দেখুন, ব্যাপারটার সব দিক ভেবে-চিন্তে দেখুন। এ কাজে আপনি হাত দিতে পারবেন কি, আপনার শক্তি ও বুদ্ধিতে কুলোবে কি? তারপর আমাদের বলবেন — মেহনত ছাড়া আর কী আপনি ব্যবসায় খাটাতে পারেন? আমাদের টাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাই না?'

'আমি হাজার খানেক রুবল খাটাতে পারি,' ইলিয়া ধীরে ধীরে বলল। 'কাকা আমাকে দেবেন। বেশিও হতে পারে।'

'হুর-রে!' কিরিক আভ্‌তনোমভ চেঁচিয়ে উঠল।

'তার মানে — আপনি রাজী?' তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না জিজ্ঞেস করল।

'আলবৎ রাজী!' দারোগা চেঁচিয়ে বলল। পকেটে হাত গুঁজে উল্লাসে সে গলা ছেড়ে বলল, 'এখন তাহলে শ্যাম্পেন খাওয়া যেতে পারে! শ্যাম্পেন, ধুত্তোর, শ্যাম্পেন না হলে চলে! ইলিয়া, এক ছুটে যাও ভাই, শ্যাম্পেন নিয়ে এসো! এই নাও — আমরাই তোমাকে খাওয়াচ্ছি। নব্বই কোপেকের এক বোতল দন মার্কা শ্যাম্পেন — আমার নাম করে বলবে, বলবে আভ্‌তনোমভের জন্যে — তাহলে পঁয়ষট্টিতে দেবে... চট্‌পট্‌!'

ইলিয়া হেসে কর্তাগিন্নীর খুশিতে ডগমগ মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

সে ভাবতে লাগল: ভাগ্য ওকে ভেঙে খান্‌খান করে দিয়েছে, দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে, ওকে ভয়ঙ্কর পাপের পাঁকে ফেলেছে, ওর মনকে বিভ্রান্ত করেছে আর এখন যেন ওরই কাছে ক্ষমা চাইছে, প্রসন্ন হয়ে ওকে তোয়াজ করছে... এখন জীবনযাত্রার জন্য একটি ভদ্র গোছের বাসস্থানের পথ তার

সামনে উন্মুক্ত — সেখানে সে একা বাস করবে, নিজের আত্মার শান্তি খুঁজে পাবে। মধুর কোরাস গানের মতো এই চিন্তা তার মাথার ভেতর ঘুরতে লাগল, তার হৃদয়কে এমন এক আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে দিল যা এর আগে সে কখনও অনুভব করে নি।

ইলিয়া খাঁটি শ্যাম্পেনের সেলার থেকে সাত রুবল দিয়ে একটা বোতল নিয়ে এলো।

'ওহো-হো!' আভ্‌তনোমভ উল্লাসে ফেটে পড়ল। 'বেড়ে ব্যাপার ভাই! খাসা আইডিয়া বটে!'

তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না অন্য ভাবে নিল। সে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, বোতলটাকে নিরীক্ষণ করার পর বকা দিয়ে বলল:

'রুবল পাঁচেক দাম, তাই না? উঃ, কী বেহিসাবী!'

স্নেহের স্পর্শে গদগদ ইলিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

'খাঁটি জিনিস!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল। 'জীবনে এই প্রথম খাঁটি জিনিস গলায় ঢালব। কী জীবন ছিল আমার? আগাগোড়া — মেকী, নোংরা, কদর্য, হাঁপিয়ে উঠতে হয়, বুকে অপমানের জ্বালা... এটা কি একটা মানুষের জীবন?'

বুকের ক্ষতস্থল সে ছুঁয়ে ফেলেছে, তাই সে না থেমে বলে চলল:

'ছোটবেলা থেকে আমি খাঁটির সন্ধান করেছি, অথচ জীবনটা কেটেছে নদীর জলে পড়া খড়কুটোর মতো — এখান থেকে ওখানে আছাড় খেয়ে পড়েছি। আমার চার ধার ছিল ঘোলাটে, নোংরা, অশান্ত। আঁকড়ে ধরার মতো কিছু ছিল না... শেষে আছড়ে এসে পড়লাম আপনাদের কাছে। জীবনে এই প্রথম দেখছি লোকে নির্ঝঞ্ঝাট, পরিচ্ছন্ন জীবন কাটাচ্ছে, একে অন্যকে ভালোবাসে।'

ইলিয়া উজ্জ্বল হাসি হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল।

'আপনাদের ধন্যবাদ জানাই! আপনাদের কাছে এসে আমার মনটা হালকা হয়ে গেছে... ভগবানের দিব্যি! আপনারা আমাকে সারা জীবনের জন্যে সাহায্য করছেন! এবারে আমি চলতে পারব! এখন আমি জানি, কী ভাবে বাঁচতে হয়!'

আপনার গানে আপনি মত্ত পাখির দিকে বেড়াল যে ভাবে তাকায় তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নাও সেই দৃষ্টিতে ইলিয়াকে লক্ষ্য করতে লাগল।

তার চোখে সবুজ রঙের আলো ঝকঝক করে উঠল, তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। কিরিক বোতল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, দুই হাঁটুর মধ্যে ওটাকে চেপে ধরে সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল, কান দুটোতে টান ধরল...

বোতলের ছিপি ফট করে ছিট্‌কে ছাদে গিয়ে আঘাত করল, তারপর টেবিলে এসে পড়ল। তার ছোঁয়ায় গেলাস ঝন্‌ঝন্‌ উঠল।

কিরিক ঠোঁট দিয়ে চুমকুড়ি কাটল, মদ গেলাসে ভরে হাঁক দিল:

'ধর!'

তার বৌ আর ইলিয়া যখন গেলাস হাতে নিল তখন সে নিজের গেলাস মাথার অনেকখানি ওপরে তুলে চেঁচিয়ে বলল:

'তাতিয়ানা আভ্‌তনোমভা ও লুনিয়োভ ফার্মের সাফল্যের জন্যে — হুর্‌-রে!'

কয়েক দিন ধরে ইলিয়া ও তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না তাদের কারবারের পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করল। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নার সবই জানা ছিল, সে এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কথা বলত যে মনে হত বুঝি সারা জীবন মনিহারী জিনিসের ব্যবসা করে আসছে। ইলিয়া মুখে হাসি নিয়ে চুপচাপ তার কথা শুনে যেত আর অবাক হত। তার ইচ্ছে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কারবার শুরু করে দেয়, তাই সে ভালো করে তলিয়ে না দেখেই আভ্‌তনোমভ্‌-গিন্নীর সব প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাচ্ছিল।

দেখা গেল জায়গার কথাও তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না ভেবে রেখেছে। জায়গাটা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি চেয়েছিল ইলিয়া: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তার ওপর ছোট্ট দোকানঘর, তারই লাগোয়া একটি ঘর দোকানীর জন্য। সবই জুটে যাচ্ছিল, একেবারে খুঁটিনাটি পর্যন্ত — সব কিছু। ইলিয়া উল্লসিত।

খুশি মেজাজে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে ইলিয়া হাসপাতালে এসে হাজির হল। সেখানে পাভেলের সঙ্গে দেখা হল, তারও খুশি খুশি ভাব।

'আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছি!' ইলিয়ার সঙ্গে দেখা হতে কোন রকম সম্ভাষণের আগেই সে উত্তেজিত হয়ে জানাল। 'ভেরার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি... গালাগাল করছে... ভারী পাজী!'

ওর চোখজোড়া চকচক করছিল, গালে গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে, ও শান্ত ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, মেঝেতে জুতো ঘষটাচ্ছিল আর হাত দোলাচ্ছিল।

'দেখিস!' ইলিয়া ওকে বলল। 'এখন থেকে সাবধান হোস।'

'আমি? তা ত বটেই! প্রশ্নটা হল এই: মামজেল ভেরা, বিবাহের বাসনা আছে কি? যদি থাকে ত উত্তম। নেই? — তাহলে বুকে ছুরি বসিয়ে দেব!'

পাভেলের মুখে ও শরীরে খিচুনির ভাব খেলে গেল।

'আচ্ছা-আচ্ছা!' ইলিয়া ঠাট্টা করে হেসে বলল। 'একেবারে ছুরি!'

'না: যথেষ্ট হয়েছে! যা বলছি তাই করব... ওকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। ত্যাঁদড়ামি আমার সঙ্গে যথেষ্ট করেছে, আশ নিশ্চয়ই মিটেছে। আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত! কালই যা ঘটার ঘটবে। হয় এস্‌পার না হয় ওস্‌পার...'

ইলিয়া বন্ধুর মুখের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল, হঠাৎ তার মাথায় একটা স্পষ্ট, সাধারণ চিন্তা খেলে গেল। ওর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, তারপর হাসল।

'পাভেল! জানিস, আমার বরাত খুলে গেছে!'

ইলিয়া সংক্ষেপে তাকে ব্যাপারটা বলল। ওর কথা আগাগোড়া শোনার পর পাভেল শ্বাস ফেলে বলল:

'হ্যাঁ তুই ভাগ্যি করে এসেছিস।'

'ভাগ্যটা এমনই ভালো যে তোর সামনে এখন আমার লজ্জাই করছে, সত্যি বলছি! বুকে হাত দিয়ে বলছি।'

'তার জন্যে ধন্যবাদ!' পাভেল মৃদু হেসে বলল।

'কথাটা কী জানিস,' ইলিয়া মৃদু স্বরে বলল, 'আমি কিন্তু বড়াই করছি না, সত্যি সত্যিই বলছি, আমার লজ্জা করছে।'

পাভেল কোন কথা না বলে তার দিকে তাকাল, আবার চিন্তিত ভাবে মাথা নীচু করল।

'আমি তোকে বলতে চাই... দুঃখের সময় আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, আয়, সুখও ভাগ করে নিই।'

'হুম্,' পাভেল গাঁকগাঁক করে বলল। 'আমি শুনেছি যে সুখ হল মেয়েমানুষের মতো, তাকে ভাগ করা যায় না।'

'যায়! জলকল মেরামতের দোকান খুলতে কী দরকার, কী কী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম আর অন্যান্য জিনিসপত্রের দরকার তুই খোঁজখবর নিয়ে দেখ। টাকা-পয়সা কত লাগে জেনে আয়... আমি তোকে টাকা দেব।'

'আ-চ্ছা, আ-চ্ছা?' পাভেল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে টেনে টেনে বলল। ইলিয়া আবেগভরে শক্ত করে ওর হাত ধরে চাপ দিল।

'দেব রে পাগলা!'

ওর ইচ্ছের গুরুত্ব পাভেলকে বোঝাতে ওর অনেক সময় লাগল। পাভেল কেবলই মাথা নাড়ায়, গাঁগাঁ আওয়াজ করে আর বলে:

'এ রকম হয় না।'

শেষ পর্যন্ত ইলিয়া ওকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল। তখন পাভেল তাকে জড়িয়ে ধরল, কাঁপা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল:

'কী আর বলব তোকে ভাই! গর্ত থেকে টেনে তুলছিস। তাহলে যা বলি শোন: দোকানে আমার কাজ নেই — চুলোয় যাক দোকান। ও সব আমার জানা আছে... তুই আমাকে টাকা দে, আমি ভেরাকে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ব। তাতে তোর সুবিধেই হবে — কম টাকা নেব, আমারও ভালো। কোথাও চলে যাব, নিজেই কোন একটা দোকান-টোকানে কাজ নেব।'

'বাজে ব্যাপার!' ইলিয়া বলল। 'মালিক হতে পারা কত ভালো!'

'আমি আবার মালিক কিসের?' খুশিতে ফেটে পড়ে পাভেল বলল। 'না না, ঐ সব মালিক-টালিক হওয়া আমার পোষাবে না... ছাগলকে কি আর সাজগোজ পরিয়ে শুয়োর বানানো যায়?'

মালিক হওয়া সম্পর্কে পাভেলের মনোভাবটা যে কী ইলিয়া তা ঠিক বুঝতে পারল না, তবে সে মনোভাব কেন যেন তার ভালোই লাগল। সে উৎফুল্ল হয়ে সস্নেহে বলল:

'এটা ঠিকই যে ছাগলের সঙ্গে তোর মিল আছে — ঐ রকমই নীরস গোছের। জানিস, তুই হলি পেরফিশ্‌কা মুচির মতো — সত্যি বলছি! যাক্ গে, কাল এসে অন্তত যত দিন কাজ না পাস তত দিনের জন্যে টাকা নিয়ে যাস। আমি এখন ইয়াকভ্‌কে দেখে আসি... ইয়াকভের সঙ্গে তোর কেমন পটে রে?'

'ঐ এক রকম আর কি... তেমন বনে না!' মৃদু হেসে পাভেল বলল।

'ওর কপালটা খারাপ,' ইলিয়া চিন্তিত ভাবে বলল।

'কারই বা কম খারাপ?' পাভেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'আমার মনে হয় ওর মাথায় গোলমাল আছে... ওটা একটা আকাট গোছের।'

ইলিয়া ওর কাছ থেকে উঠে চলে যেতে পাভেল করিডরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল:

'ধন্যবাদ, ভাই!'

ইলিয়া হেসে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল।

ইয়াকভের কাছে এসে ইলিয়া দেখতে পেল সে বিষণ্ণ হয়ে আছে, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ছাদের দিকে মুখ তুলে সে বেডে শুয়ে ছিল, বড় বড় করে দুচোখ খুলে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাই ইলিয়ার আগমন সে টের পেল না।

'নিকিতা ইয়েগোরভিচ্‌কে ত অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে নিয়ে গেছে,' হতাশ ভঙ্গিতে সে ইলিয়াকে বলল।

'তা ভালোই হয়েছে!' ইলিয়া সায় দিয়ে মন্তব্য করল। 'ওকে বড় ভয়ঙ্কর দেখাত কিন্তু।'

ইয়াকভ্ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দমকে দমকে কাশতে লাগল।

'ভালো বোধ করছিস?'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়াকভ্ উত্তর দিল। 'যত খুশি রোগে পড়ে থাকারও উপায় নেই... গতকাল আবার বাবা এসেছিল। বলে, বাড়ি কিনেছে। আরও একটা সরাইখানা খুলতে চায়। আর এ সবই পড়ছে আমার ঘাড়ে।'

ইলিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের সুখের কথা বলে বন্ধুকে খুশি করে, কিন্তু কেন যেন সে বলতে পারল না।

বসন্তের আনন্দোচ্ছল সূর্য সোহাগভরে জানলা দিয়ে উঁকি মারছিল, কিন্তু হাসপাতালের হলুদ রঙের দেয়াল তাতে আরও হলুদ হয়ে উঠল। সূর্যের আলোয় পলেস্তরার ওপরে ফুটে উঠল কতকগুলো ছোপ আর ফাটল। দুজন রোগী বেডের ওপর বসে তাস খেলছিল, চুপচাপ চটাস চটাস করে তাস ফেলে যাচ্ছিল। রোগা, লম্বা একটা লোক ব্যাণ্ডেজ করা মাথা নীচে নামিয়ে চুপচাপ ওয়ার্ডে পায়চারী করছিল। সাড়াশব্দ নেই, কেবল কোথা থেকে যেন ভেসে আসছিল দম আটকানো কাশির আওয়াজ, করিডরে শোনা যাচ্ছিল

রোগীদের চটির ফট্‌ফট্‌ শব্দ। ইয়াকভের পাণ্ডুর মুখে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না, তার চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ।

'ওঃ, যদি মরতে পারতাম!' ও খনখনে গলায় বলল। 'শুয়ে শুয়ে ভাবি, মরাটা কী চমৎকার!' ওর গলা বসে গেল, আরও মৃদু শোনা গেল। 'দেবদূতেরা কী মধুর!.. সব প্রশ্নের উত্তর তোকে দিতে পারেন... সব কিছুর ব্যাখ্যা দেবেন।' সে চোখ মিটমিট করল, চুপ করে গেল। সূর্যের পাণ্ডুর কিরণ যেন কোথা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ছাদের কড়িকাঠে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল — ইয়াকভ্‌ তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখতে লাগল। 'মাশাকে দেখেছিস?' সে জিজ্ঞেস করল।

'ন্‌-না। মাথায় যেন কিছুতেই থাকে না।'

'মনের মধ্যে ঠাঁই পায় না বল।'

ইলিয়া থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

ইয়াকভ্‌ শ্বাস ফেলে অস্থির ভাবে বালিশে মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

'এই দ্যাখ না, নিকিতা ইয়েগোরভিচ্‌ মরতে চায় না, অথচ তাকে মরতে হচ্ছে... ডাক্তার আমাকে বলেছে... মারা যাবে। আর আমি মরতে চাই — মরছি না। সেরে উঠব — আবার সরাইখানায়... আমাকে দিয়ে কার কী কাজ হবে?'

বিষণ্ণ হাসিতে তার ঠোঁটজোড়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে উঠল। বন্ধুর দিকে কেমন একটা বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল:

'এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে গেলে দরকার — লোহার পাঁজরা, লোহার কল্‌জে।'

ইয়াকভের কথাগুলোয় নিজের মনোভাবের বিরোধী ও নীরস ধরনের কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়ে ইলিয়া ভুরু কোঁচকাল।

'আমি হলাম দুটো পাথরের মাঝখানে এক টুকরো কাচের মতো — একটু পাশ ফিরিয়েছি কি, অমনি ফাটল।'

'নালিশ করতে তুই ভালোবাসিস!' তার কথার স্পষ্ট কোন জবাব না দিয়ে ইলিয়া বলল।

'আর তুই?' ইয়াকভ্‌ জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল। তারপর ইয়াকভের কিছু বলার অভিপ্রায় নেই দেখে সে অন্যমনস্ক ভাবে বলল:

'সকলেরই কষ্ট আছে। এই পাভেলের কথাই ধর না...'

'ওকে আমি দেখতে পারি না,' মুখ কুঁচকে ইয়াকভ্ বলল।

'কেন?'

'জানি না... দেখতে পারি না।'

'ওঃ! আমাকে উঠতে হয়।'

ইয়াকভ্ নীরবে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, তারপর হঠাৎই ভিখিরির মতো করুণ কণ্ঠে মিনতি জানাল:

'মাশা কোথায় আছে খুঁজে বার কর না, অ্যাঁ? খ্রীস্টের দোহাই!'

'ঠিক আছে!' ইলিয়া বলল।

বাইরে বেরিয়ে আসতে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মাশার খবর জানার জন্য ইয়াকভের মিনতির ফলে পেরফিশ্‌কার মেয়ের প্রতি তার নিজের অবহেলার মনোভাবের জন্য ওর মনে মনে লজ্জা হল। সে ঠিক করল মাতিৎসার কাছে যাবে — মাশার কী গতি হয়েছে তা মাতিৎসা সম্ভবত জানে।

ফিলিমোনভের সরাইখানার দিকে যেতে যেতে ওর মনে একের পর এক জেগে উঠল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ তার প্রতি প্রসন্ন। চিন্তায় মশগুল হয়ে সে নিজের অজান্তেই সরাইখানা ছাড়িয়ে চলে গেল, সেটা যখন টের পেল তখন আর মোটেই পিছু ফেরার ইচ্ছে হল না। হাঁটতে হাঁটতে সে শহরের বাইরে চলে এলো: সামনে প্রশস্ত প্রান্তর, দূরে অন্ধকার বনভূমির প্রাকার তাকে বেড় দিয়ে রেখেছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, কচি ঘাসের চাপড়ার ওপর পড়েছে গোলাপী আভা। ইলিয়া মাথা উঁচু করে হেঁটে চলল, চলতে চলতে তাকাতে থাকল আকাশের দিকে, দূর প্রান্তে যেখানে রক্তিম মেঘের সারি মাটি থেকে কিছু ওপরে নিথর হয়ে জমে ছিল, সূর্যের কিরণে লকলক করছিল। হাঁটতে ওর বেশ লাগছিল — সামনের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ, বাতাস থেকে টানা প্রতিটি নিশ্বাস তার মনের মধ্যে নতুন স্বপ্ন জাগিয়ে তুলল। সে কল্পনা করতে লাগল সে যেন বড়লোক, ক্ষমতার অধিকারী, পেত্রুখাকে সে দেউলিয়া করে দিয়েছে। তাকে সে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে, পেত্রুখা

এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে আর ইলিয়া লুনিয়োভ তাকে বলছে:

'তুই ক্ষমা চাস? তুই নিজে কি কাউকে দয়া করেছিস? নিজের ছেলেকে কেমন কষ্ট দিয়েছিস মনে নেই? আমার কাকাকে পাপের পথে নামাস নি? আমাকে নিয়ে তামাসা করিস নি? তোর এই অভিশপ্ত বাড়িতে কেউ সুখী ছিল না, কেউ সুখের মুখ দেখে নি। পচাগলা তোর এই বাড়ি — লোকের কাছে জেলখানা। '

পেত্রুখা থরথর করে কাঁপতে থাকে, তার সামনে আতঙ্কে কাতরায় — ভিখিরির মতো করুণ ওর অবস্থা। ইলিয়া তর্জন-গর্জন করে চলে:

'তোর বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেব — এটা সকলের কপাল পুড়িয়েছে। আর তুই যাদের এক দিন অপমান করেছিলি, দুনিয়া ঘুরে ঘুরে তাদের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষে কর; যত দিন মরণ না হয় তত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়া, কুত্তার মতো খিদেয় ধুঁকে ধুঁকে মর!..'

গোধূলির আধা অন্ধকার প্রান্তর ঢেকে ফেলল; দূরে বনভূমি পাহাড়ের মতো জমাট কালো হয়ে এলো। ছোট কালো কালো বিন্দুর মতো বাদুড়ের দল নিঃশব্দে বাতাসে ছুটোছুটি করছে, যেন তারা মুঠো মুঠো আঁধার ছড়িয়ে দিচ্ছে। দূরে নদীর বুকে স্টীমারের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ উঠছে; মনে হচ্ছে দূরে কোথায় যেন এক বিশালাকার পাখি উড়ছে আর তারই চওড়া ডানার প্রচণ্ড ঝাপ্টায় বুঝি আকাশ বাতাস তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। যারা যারা ইলিয়ার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তাদের কাউকে সে বাদ দিল না, কোন রকম দয়ামায়া না করে তাদের সকলকেই সে শাস্তি দিল। এতে তার আরও ভালো লাগছিল। চার দিক থেকে অন্ধকারে চাপা পড়ে গিয়ে মাঠের মাঝখানে সে একা চাপা গলায় গান ধরল...

এমন সময় বাতাসে ভেসে এলো মাটি আর পচা গোবরের গন্ধ। ইলিয়া গান থামিয়ে দিল — এই গন্ধ তার মনে সুখের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। সে যেন খাতের কিনারায় শহরের আবর্জনাস্তূপের কাছে এসেছে, সেখানে ইয়েরেমেই দাদুর সঙ্গে আবর্জনা ঘাঁটছে। জঞ্জাল কুড়ুনে বুড়োর চেহারাটা তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল। ইলিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করার চেষ্টা করল সেই জায়গাটা যেখানে বুড়ো ওর সঙ্গে বিশ্রাম করতে ভালোবাসত। কিন্তু জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল না: সম্ভবত আবর্জনার

স্তূপে চাপা পড়ে গেছে। ইলিয়া শ্বাস ফেলল, তার মনে হল যেন তার বুকের মধ্যেও জঞ্জালের তলায় কী একটা চাপা পড়ে গেছে।

'ব্যবসাদারটাকে খুন না করলে আমার জীবনটা এখন রীতিমতো সুখের হতে পারত...' — হঠাৎ তার মনে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে কে যেন জবাব দিল: 'ব্যবসাদারে কী আসে যায়? সে আমার দুর্ভাগ্য, পাপ নয়...'

একটা আওয়াজ উঠল: ইলিয়ার দুপায়ের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট কুকুর চট করে ছুটে বেরিয়ে গেল, আস্তে আস্তে কেঁউ কেঁউ করে আড়ালে চলে গেল। ইলিয়া চমকে উঠল — তার সামনে যেন রাতের আঁধার জীবন্ত হয়ে উঠল, কাতর আওয়াজ তুলে উধাও হয়ে গেল।

'তাতেও কিছু আসে যায় না,' ও ভাবল। 'ব্যবসাদার ছাড়াও মনে শান্তি পাওয়া যেত না। নিজের ওপরে, অন্যদের ওপরে কত অন্যায়-অবিচারই না দেখলাম! হৃদয় যখন একবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তখন তা সব সময়ই ব্যথা করতে থাকবে...'

খাতের প্রান্ত ধরে সে পায় পায় এগিয়ে চলল। জঞ্জালে তার পা ডুবে গেল, পায়ের নীচে কাঠকুটোর মড়মড় আর কাগজের সড়সড় আওয়াজ উঠল। তার সামনেই খানিকটা জমি ফালি হয়ে গিয়ে খাত অবধি চলে গেছে। এ জায়গাটায় কোন জঞ্জাল ফেলা হয় নি। ইলিয়া সেই জমির ওপর দিয়ে তার সরু কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে গেল তারপর খাড়া পার থেকে পা ঝুলিয়ে সেখানে বসল। এখানে বাতাস অনেকটা তাজা। খাত বরাবর চোখ বুলাতে ইলিয়া দূরে নদীর ইস্পাতরঙা ছোপ দেখতে পেল। জমাট বরফের মতো নিথর জলের ওপর মিটমিট করে জ্বলছে অদৃশ্য জাহাজ-নৌকোর আলো, তাদের একটা ঠিক এক লাল রঙের পাখির মতো শূন্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আরও একটি — সেটি আবার সবুজ — নিশ্চল থেকে কোন রকম কিরণ ছাড়াই ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে... ইলিয়ার পায়ের কাছে খাতের বিশাল হাঁ — ঘন অন্ধকারে পরিপূর্ণ। খাতটি যেন নদীর মতো — সেখানে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে কালো বাতাসের তরঙ্গ। একটা বিষণ্ণতা ইলিয়ার হৃৎপিণ্ডকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ও খাতের দিকে তাকিয়ে ভাবল: 'এই ত আমার ভালো লাগছিল, একটা প্রসন্ন ভাব ছিল, আবার এই — নেই।' মনে পড়ে গেল আজ ইয়াকভের কাছ থেকে শোনা তার নিজের মনোভাবের বিরোধী কথাবার্তা — তাতে

সে আরও বিষণ্ণ বোধ করল। খাতের মধ্যে কিসের যেন একটা আওয়াজ হল — সম্ভবত মাটির ডেলা খসে পড়ল। ইলিয়া ঘাড় বাড়িয়ে নীচের দিকে, অন্ধকারের মধ্যে উ'কি মারল... মুখের ওপর রাত্রির আর্দ্রতার ঘ্রাণ অনুভব করল। সে আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে ভীরু তারাদল মিটমিট করছিল আর বনের ওপার থেকে উঠে আসছিল লালচে রঙের বিরাট চাঁদ — যেন এক বিশাল চোখ। এই কিছুক্ষণ আগে আলো-আঁধারির মধ্যে যেমন বাদুড়ের দল উড়ে বেড়াচ্ছিল, তেমনি ইলিয়ার মনের ভেতরেও দ্রুত ঝলকাতে লাগল অশুভ চিন্তা ও স্মৃতি: তারা আবির্ভূত হয়ে কোন উত্তর না দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, মনে আরও গভীর কালো ছায়া ফেলছিল।

সে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবতে লাগল, একবার খাতের দিকে আরেক বার আকাশের দিকে তাকাতে থাকল। চাঁদের আলো খাতের অন্ধকারের দিকে উ'কি মারতে তার ঢালুতে গভীর ফাটল ও ঝোপঝাড় প্রকাশ পাচ্ছিল। ঝোপঝাড় থেকে মাটির ওপর কদাকার ছায়া পড়ছিল। আকাশে চাঁদ ও তারা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল। ইলিয়া উঠে দাঁড়াল, রাতের তাজা হাওয়ায় তার কাঁপুনি ধরল, ধীরে ধীরে মাঠ ধরে সে শহরের আলোর দিকে চলল। এখন আর তার কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। যেখানে সে এত দিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে আসছিল সেই আকাশে যে নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য ও বিরক্তিকর শূন্যতা সে দেখতে পেল এই মুহূর্তে তাই তার বুক জুড়ে বসে ছিল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল, কিছু ঠিক করতে না পেরে সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার ঘণ্টা বাজাতে লজ্জা করছিল। জানলায় আলো ছিল না — তার মানে কর্তাগিন্নী ঘুমুচ্ছে। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নাকে বিরক্ত করতে তার বিবেকে বাঁধছিল — সব সময় সেই নিজে দরজা খুলে দেয়। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই হয়। ইলিয়া আস্তে করে ঘণ্টি ধরে নাড়া দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল, ইলিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল কর্ত্রীর অন্তর্বাস পরনে সুঠাম মূর্তিটি।

'তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিন!' তার কণ্ঠস্বর ইলিয়ার কাছে কেমন যেন অপরিচিত শোনাল। 'ঠাণ্ডা লাগছে... আমার পরনে কিছু নেই... স্বামী বাড়ি নেই।'

'মাফ করবেন,' ইলিয়া বিড়বিড় করে বলল।

'এত দেরি যে! কোথা থেকে, অ্যাঁ?'

ইলিয়া দরজা বন্ধ করে দিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল — তার সামনাসামনি দেখতে পেল মহিলার উদ্ধত স্তন। সরে যাওয়ার বদলে মহিলাটি যেন আরও গাঢ় হয়ে তার দিকে ঘেঁষতে লাগল। ইলিয়ারও সরার উপায় রইল না — তার পেছনে দরজা। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না হাসতে লাগল, ফিকফিক করে চাপা হাসি হাসল। ইলিয়া হাত দুটি তুলে সন্তর্পণে করতল তার কাঁধের ওপর রাখল। এই মহিলার সামনে সঙ্কোচবশত এবং তাকে আলিঙ্গনের লিপ্সা মনে মনে অনুভব করায় ইলিয়ার হাত কাঁপতে লাগল। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না তখন উঁচু হয়ে সুডৌল, উষ্ণ হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, সুরেলা গলায় বলল:

'রাত্তিরে কোথায় চরে বেড়াও? কী দরকার? যা চাও তা তোমার হাতের কাছেই আছে... লক্ষ্মীটি আমার!.. তুমি অপরূপ!.. তুমি শক্তিমান!'

ইলিয়া যেন স্বপ্নের ঘোরে তার উদগ্র চুম্বন গ্রহণ করতে লাগল, তার নমনীয় দেহের থরথর আন্দোলনে টলে উঠল। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না একটা আদুরে বেড়ালের মতো তার বুকের সঙ্গে লেপ্টে থেকে তাকে অবিরাম চুমো দিতে লাগল। ইলিয়া তার শক্ত দুটি হাতে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে চলল, নিয়ে চলল অবলীলাক্রমে — যেন সে শূন্যে ভেসে চলেছে...

সকালে জেগে উঠতে ইলিয়ার মনের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হল।

'কিরিকের সামনে এখন দাঁড়াব কী বলে?' — সে মনে মনে ভাবল। দারোগার সামনে ভয় ছাড়াও লজ্জার অনুভূতি তাকে পেয়ে বসেছিল।

'এই লোকটার ওপর যদি আমার কোন রাগ থাকত কিংবা লোকটাকে যদি আমার পছন্দ না হত তাহলেও একটা কথা ছিল। অথচ খামোকাই, একেবারে অকারণে ওকে অপমান করে বসলাম!' — উদ্বিগ্ন হয়ে ইলিয়া ভাবল, তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্নার প্রতি কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি তার মনের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল। তার মনে হল কিরিক অবশ্যই স্ত্রীর বেইমানী ধরে ফেলবে।

'এমন বুভুক্ষুর মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন?' — ভেবাচেকা খেয়ে ভারাক্রান্ত মনে সে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে

অহঙ্কারের একটা প্রীতিকর সুড়সুড়ি অনুভব করল। তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এক সত্যিকারের নারী — পরিপাটি, শিক্ষিতা, অন্যের বিয়ে করা বৌ।

'তার মানে, আমার মধ্যে বিশেষ একটা কিছু আছে — এমন এক আত্মতৃপ্ত চিন্তা তার মনে উদয় হল। লজ্জার কথা — লজ্জার কথা বটে... কিন্তু আমি ত পাথর নই!.. ওকে তাড়িয়েই বা দিই কী করে?'

ওর বয়স কম: মহিলার সোহাগ তার মনে পড়তে লাগল, সে সোহাগ কেমন যেন এক বিশেষ ধরনের, তার কাছে এ যাবৎ অপরিচিত ছিল। বিষয়বুদ্ধি ওর টনটনে ছিল, তাই সে কিছুতেই মনে না করে পারল না যে এই সম্পর্ক তার পক্ষে নানা ভাবে সুবিধাজনক হতে পারে। কিন্তু এ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘের মতো অন্যান্য ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, তার মনে হল:

'আবার কোনায় গিয়ে ঠেকলাম... এটা কি আমার ইচ্ছে ছিল? মাগীকে ত সম্মানই করতাম, তার সম্পর্কে কোন কুচিন্তা কখনও মাথায় খেলে নি, অথচ... বোঝ কী হয়ে গেল!'

তারপরই কিন্তু খাঁটি, পরিচ্ছন্ন জীবন এখন তার শুরু হয়ে গেল বলে — এই সুখকর অনুভূতি তার সমস্ত বিমূঢ়তা, মনের সমস্ত রকম বিরুদ্ধ ভাবকে ছাপিয়ে উঠল।

'কিন্তু, তা এ ছাড়া ঘটলেই ভালো হত' — এমন তীক্ষ্ন বোধ আবার তাকে বিঁধতে লাগল।

আভ্‌তনোমভ যতক্ষণ কাজে না গেল ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিছানা ছেড়ে উঠল না। শুনতে পেল দারোগাবাবুটি সুস্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিতে চুমকুড়ি কেটে বৌকে বলছে:

'দুপুরের খাওয়ার জন্যে মাংসের পিঠে তৈরি কর তানিয়া। বেশি করে শুয়োরের মাংস দিয়ে পুর তৈরি কর, আর সেদ্ধ করার পর খানিকটা ভাজবে, বুঝলে? দেখতে এমন হওয়া চাই যে থালা থেকে অল্প আঁচে ভাজা ভাজা কচি শুয়োরের মতো তাকিয়ে থাকবে... হুঁ-হুঁ-হুঁ! আর হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি, ঝাল একটু বেশি করে!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, যাও! তোমার রুচি আমার ঠিকই জানা আছে,' বৌ তাকে সোহাগ ভরে বলল।

'তাতিয়ানা, লক্ষ্মীটি আমার, এসো একটা চুমো দিই!'

চুমকুড়ির আওয়াজ শুনে ইলিয়া চমকে উঠল। তার যেমন অপ্রীতিকর লাগল তেমনি হাস্যকরও মনে হল।

'চুক! চুক! চুক!' আভ্‌তনোমভ বৌকে চুমো খেতে খেতে বলল। বৌ হাসল। স্বামী চলে যেতে দরজা বন্ধ করে সে সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়ার ঘরে ছুটে এলো, লাফিয়ে তার খাটের ওপর উঠে পড়ে খুশির সুরে চেঁচিয়ে বলল:

'শিগ্‌গির আমাকে চুমো দাও — আমার সময় নেই!'

ইলিয়া গম্ভীর হয়ে তাকে বলল:

'আপনি যে এইমাত্র স্বামীকে চুমো খেলেন!'

'কী-ই? 'আপনি?' হিংসে হচ্ছে বুঝি?' মহিলা আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল, জোরে হাসতে হাসতে খাট থেকে নেমে এসে জানলার পর্দা ফেলতে ফেলতে বলল, 'হিংসুক — এটা ভালো কথা! হিংসুকেরা দারুণ প্রেমিক হয়!'

'আমি হিংসে থেকে বলছি না।'

'হয়েছে!' চপল ভঙ্গিতে হাত দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে আদেশের সুরে সে বলল।

তারপর ওরা প্রাণ ভরে চুম্বনপর্ব সারার পর ইলিয়া হাসতে হাসতে তার দিকে তাকাল, শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল:

'হুঁ, সাহস আছে বটে তোমার — আসল মরিয়া। স্বামীর নাকের ডগায় এমন তামাসা!'

তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নার সবুজে চোখজোড়া উত্তেজনায় চকচক করে উঠল, সে বলল:

'এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে অসাধারণ কিছুই নেই। তোমার কি ধারণা এমন মেয়েমানুষের সংখ্যা বেশি যারা ফষ্টিনষ্টি করে না? করে না কেবল তারাই, যারা কুৎসিত আর রুগ্ন... সুন্দরী মেয়েরা সব সময়ই রোমান্স চায়।'

সারাটা সকাল সে ইলিয়াকে জ্ঞান বিতরণ করতে লাগল, বাড়ির বৌরা কী করে তাদের স্বামীদের ঠকায় তার নানা রকম গল্প ওকে শোনাল। অ্যাপ্রন ঝুলিয়ে, লাল ব্লাউজ গায়ে এই ছটফটে ও পাতলা গড়নের মহিলাটি ব্লাউজের হাতা গুটিয়ে পাখির মতো ফরফর করে রান্নাঘরে ঘুরঘুর করতে

লাগল, স্বামীর জন্য মাংসের পিঠে বানাতে লাগল; তার সুরেলা গলার আওয়াজ ইলিয়ার ঘরে বলতে গেলে অবিরাম স্রোত বইয়ে চলল।

'স্বামী! -- তোমার কি ধারণা যে স্বামী মেয়েমানুষের পক্ষে যথেষ্ট? স্বামীকে ভালোবাসলেও তাকে খুব একটা পছন্দ নাও হতে পারে। তা ছাড়া সেও ত মাঝেমাঝে সুযোগ পেলেই বৌকে বেইমানি করতে ইতস্তত করে না। মেয়েদেরও তেমনি সারাটা জীবন স্বামী, স্বামী, স্বামী ধ্যানজ্ঞান করে পড়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। পর পুরুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার মজা আছে — জানা যায় পুরুষেরা কেমন হয়, তাদের মধ্যে তফাৎ কেমন। আরে বাবা পানীয়ই ত কত রকমের হয় — সাধারণ পানীয়, ব্যাভেরিয়ান পানীয়, জুনীপার, ক্র্যানবেরী — এমনি আরও কত।'

ইলিয়া শুনতে শুনতে চায়ে চুমুক দিতে লাগল, চায়ের স্বাদ তার তেতো মনে হল। মহিলার কণ্ঠস্বরে এমন একটা অপ্রীতিকর কর্কশ ভাব ছিল যা তার কাছে নতুন। তার মনে না পড়ে পারল না অলিম্পিয়াদাকে, অলিম্পিয়াদার গাঢ় কণ্ঠস্বর, তার ধীরস্থির ভঙ্গি, তার আবেগপ্রবণ কথাবার্তা, যার মধ্যে ছিল ইলিয়ার হৃদয়কে স্পর্শ করার শক্তি। এটা ঠিক যে অলিম্পিয়াদা শিক্ষিত ছিল না, সে ছিল সাধারণ মেয়ে। আর সেই কারণেই হয়ত নিজের নির্লজ্জতায়ও সে ছিল অনেক সহজ... তাতিয়ানার কথা শুনতে শুনতে ইলিয়াকে জোর করে হাসতে হচ্ছিল। তার আমোদ লাগছিল না, সে হাসছিল এই কারণে যে তার জানা ছিল না কী নিয়ে, কী ভাবে এই মহিলার সঙ্গে কথা বলা যায়। তবে শুনছিল সে আগ্রহ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত চিন্তিত ভাবে সে বলল:

'ভাবতেই পারি নি যে তোমাদের ভদ্র জীবনে এমন রীতিনীতি থাকতে পারে।'

'মানিক আমার, রীতিনীতি সব জায়গায়ই এক। রীতিনীতি তৈরি করে মানুষে, আর সব মানুষই চায় একটা জিনিস — ভালো করে বাঁচতে: নির্ঝঞ্ঝাট, খেয়েপরে, আরামে জীবন কাটাতে। তার জন্যে দরকার টাকাকড়ি। লোকে টাকাকড়ি পায় উত্তরাধিকারসূত্রে নয়ত ভাগ্য ভালো হলে। লটারীর টিকিট যে কেনে সে সৌভাগ্যের আশা করতে পারে। সুন্দরী মেয়ে লটারীর টিকিট নিয়ে জন্মায় — সে টিকিট হল তার সৌন্দর্য। ওঃ — সৌন্দর্য দিয়ে কত কিছুই না পাওয়া যায়! যার বড়লোক আত্মীয়স্বজন নেই, লটারীর টিকিটে

যার টাকা ওঠে নি, যার সৌন্দর্য নেই তাকে খাটতে হয়। সারা জীবন খাটা — পরিতাপের বিষয়। এই দেখ না, আমি খাটি, যদিও আমার দু-দুটো টিকিট আছে। কিন্তু আমি ঠিক করলাম তোমার জন্যে দোকানের পেছনে তা খাটাব। দুটো টিকিট — যথেষ্ট নয়! মাংসের পিঠে বানানো, দারোগাবাবুর ব্রণভর্তি মুখে চুমু খাওয়া — একঘেয়ে ব্যাপার! তাই ইচ্ছে হল তোমাকে চুমু খাই।'

ইলিয়ার দিকে চেয়ে প্রগল্‌ভ ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার কি এটা জঘন্য লাগছে? আমার দিকে অমন কটমট করে তাকাচ্ছ কেন?'

ইলিয়ার কাছে এগিয়ে এসে সে তার কাঁধে হাত রাখল, কৌতূহলভরে তার মুখের দিকে উঁকি মারল।

'আমি রাগ করছি না,' ইলিয়া বলল।

তাতিয়ানা হোহো করে হেসে উঠল, হাসির ফাঁকে গলা চড়িয়ে বলল:

'বটে? ওঃ, কী ভালো মানুষ রে আমার!'

ইলিয়া ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে বলল:

'আমি ভাবছি কি, তুমি যা বলছ তা বিশ্বাস করার মতো বলে মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন ভালো লাগে না।'

'ও হো হো, বেশ খোঁচা মারা হচ্ছে! ভালো নয় কেমন শুনি? বুঝিয়ে বল দেখি?'

ও কিন্তু বুঝিয়ে কিছুই বলতে পারল না। ও নিজেই বুঝতে পারছিল না মহিলার কথায় ওর অসন্তুষ্ট হওয়ার কী আছে। অলিম্পিয়াদা এর থেকেও অমার্জিত কথাবার্তা বলত কিন্তু সে ওই ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন পাখিটির মতো কখনও তার হৃদয়ে এমন ভাবে আঘাত হানে নি। এই তোষামুদে সম্পর্ক তার মনের মধ্যে যে অদ্ভুত অসন্তোষের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল তা নিয়ে সে সারা দিন অনেক ভাবল, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না অসন্তোষের কারণটা কী।

ইলিয়া ঘরে ফিরে আসতে রান্নাঘরে কিরিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কিরিক উল্লসিত হয়ে তাকে জানাল:

'হুঁ হুঁ, আজ তাতিয়ানা খাবার বানিয়েছে বটে! এমন মাংসের পিঠে যে চোখ ভরে ওঠে — খেতে মন চায় না, বাধো বাধো লাগে, এমনই বাধো বাধো লাগে যে মনে হয় যেন জ্যান্ত টুনটুনি খাচ্ছি... আমি তাই তোমার জন্যে

এক প্লেট রেখেও দিয়েছি... ঘাড় থেকে দোকানপাট নামিয়ে রেখে বসে যাও, খেয়ে বুঝতে পারবে আমাদের ঘরের খাবার কী জিনিস!'

ইলিয়া কাচুমাচু হয়ে তার দিকে তাকাল, নিঃশব্দে হেসে বলল:

'ধন্যবাদ!'

তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল:

'আপনি চমৎকার লোক... মাইরি বলছি!'

'আরে, এতে আর কী আছে?' কিরিক হাত নাড়িয়ে বাধা দিয়ে বলল। 'এক প্লেট মাংসের পিঠে — নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার! না ভাই, আমি যদি পুলিশের বড়কর্তা হতাম — হুম্! — তাহলে আমাকে ধন্যবাদ দিলে একটা কথা ছিল... হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তবে পুলিশের বড়কর্তা আমি হব না... পুলিশের চাকরি আমি ছেড়ে দেব। আমি সম্ভবত কোন ব্যবসাদারের দালালের কাজ নেব। সেটা বরং ভালো কাজ। দালাল? দালাল — একটা কেউকেটা লোক নয়!'

কিরিকের বৌ গুনগুন করে সুর ভাজতে ভাজতে উনুনের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। ইলিয়া তার দিকে তাকাল, আবার আড়ষ্টতা ও সঙ্কোচের অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার ছাপ ও নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার সমাগমে তা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। কয়েক দিন তার ভাবনা-চিন্তা করার কোন অবকাশই রইল না — দোকান খোলা ও জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে বেশ খাটাখাটনি চলল। নিজের অজানতেই সে দিনে দিনে মহিলার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল। প্রণয়িনী হিসেবে তাকে ইলিয়ার উত্তরোত্তর ভালো লাগতে লাগল, যদিও তার সোহাগ ইলিয়ার মনের মধ্যে প্রায়ই সঙ্কোচ, এমনকি ভীতির ভাব জাগিয়ে তুলত। মহিলার কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে তার সোহাগ ধীরে ধীরে তার প্রতি ইলিয়ার ভক্তিশ্রদ্ধার অবসান ঘটাল। রোজ সকালে স্বামীকে কাজে বিদায় করার পর কিংবা সন্ধ্যায় স্বামী যখন যখন ডিউটিতে যেত তখন সে ইলিয়াকে নিজের কাছে ডেকে আনত, নয়ত নিজেই ইলিয়ার ঘরে যেত, নানা রকম কেচ্ছা তাকে শোনাত। ঐ সব কেচ্ছা হত বিশেষ রকম সাদামাঠা, শুনতে শুনতে মনে হত নারী ও পুরুষ — দুজাতেরই বদমাশে অধ্যুষিত কোন এক দেশে ঘটনাগুলো ঘটেছে। সে সব বদমাশ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের একমাত্র আনন্দ ছিল ন্যক্কারজনক পাপকর্মে।

'এ কি সত্যিই?' ইলিয়া মনমরা হয়ে জিজ্ঞেস করে। ইলিয়ার ইচ্ছে হত না তার কথায় বিশ্বাস করতে। কিন্তু সেগুলোর সামনে সে অসহায় হয়ে পড়ত, সে তাদের খণ্ডন করতে পারত না। মহিলা কিন্তু কেবল হিহি করে হাসত, তাকে চুমু খেতে খেতে জোর প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টায় বলত:

'ওপর থেকেই ধরা যাক না কেন: গভর্ণর থাকে খাজনা আদায় বিভাগের বড়কর্তার বৌকে নিয়ে, এদিকে বড়কর্তা — এই কিছু দিন আগে তার এক কর্মচারীর বৌকে হাতিয়েছে, সবাচি লেনে তার জন্যে ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে, সপ্তাহে দুদিন একেবারে প্রকাশ্যেই তার কাছে যায়। আমি মেয়েটিকে জানি — একেবারেই বাচ্চা মেয়ে, বিয়ের পর এক বছরও কাটে নি। আর স্বামীকে ট্যাক্স ইন্‌স্পেক্টর করে সদরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই লোকটাকে আমি জানি — কিসের ইন্‌স্পেক্টর? অর্ধশিক্ষিত, গবেট, পা-চাটা কুকুর...'

ইলিয়ার কাছে সে বলত এমন সব ব্যবসাদারের কথা যারা নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য উঠতি বয়সের মেয়েদের কিনে নেয়, বলত সেই সব ব্যবসাদারগিন্নীর কাহিনী যাদের গোপন প্রণয়ী আছে, বর্ণনা দিত কী করে ওপরের সমাজের লোকজনের বাড়ির মেয়ে-বৌরা গর্ভবতী হওয়ার পর গর্ভপাত ঘটায়।

সে সব শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনে হত জীবনটা যেন আবর্জনাস্তূপে চাপা পড়া এক গর্ত, যেখানে লোকে পোকামাকড়ের মতো কিলবিল করছে।

'ছি!' ক্লান্ত হয়ে সে বলে। 'আরে, পরিচ্ছন্ন, খাঁটি কিছু কোথাও ত আছে অন্তত, বল?'

'খাঁটি মানে?' মহিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'আমি খাঁটি কথাই বলছি... আজব লোক ত! এ সব ত আমার নিজের বানানো নয়!'

'না না, আমি তা বলছি না! বলছিলাম কি খাঁটি, পরিচ্ছন্ন কিছু কোথাও আছে কি নেই?'

ইলিয়ার কথা বুঝতে না পেরে সে হাসে। কখনও কখনও তার কথাবার্তা অন্য রকম চরিত্র নিত। ভয়ানক ধরনের জ্বলজ্বলে সবজে চোখ মেলে ইলিয়ার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করে:

'আমাকে বল দেখি, মেয়েরা যে কী জিনিস তা প্রথম জানলে কী করে?''

সেই স্মৃতি ইলিয়ার কাছে লজ্জার, অপ্রীতিকর। ইলিয়া তার প্রণয়িনীর আঠাল দৃষ্টি থেকে মুখ সরিয়ে নেয়, ধমক দিয়ে বলে:

'এমন সব জঘন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর... লজ্জাও হয় না।'

সে কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে হাসতে হাসতে আবার ইলিয়ার পেছনে লাগে। মাঝে মাঝে পাশে থাকতে থাকতে ইলিয়ার মনে হত তার অশ্লীল কথাগুলো যেন আলকাতরার মতো ওর গায়ে মাখা হয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি যখন ইলিয়ার মুখে তার প্রতি অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পেত, যখন তার চোখে লক্ষ্য করত বিষাদের ছায়া, তখন সে সাহস করে ওর ভেতরের পুরুষটাকে জাগিয়ে তুলত, নিজের সোহাগ উজার করে দিয়ে তার প্রতি ওর শত্রুতার ভাব মুছে দিত।

দোকানে তখন ছুতোরেরা তাক তৈরি করছিল। একবার দোকান থেকে বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে মাতিৎসাকে দেখতে পেয়ে ইলিয়া অবাক হয়ে গেল। টেবিলের ওপর বিরাট বিরাট হাতজোড়া রেখে মাতিৎসা বসে ছিল, কর্ত্রী চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মাতিৎসা তার সঙ্গে গল্প করছিল।

'এই যে,' তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না ইঙ্গিতে মাতিৎসার দিকে মাথা নাড়িয়ে হেসে বলল, 'এই ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ যাবৎ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন!'

'শুভ সন্ধ্যা জানাই!' অনেক কষ্টে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটি বলল।

'আরে!' ইলিয়া চিৎকার করে উঠল। 'এখনও বেঁচে আছ?'

'পচাগলা জিনিস শুয়োরেও ছোঁবে না,' ভরাট গলায় মাতিৎসা জবাব দিল।

ইলিয়া অনেক দিন ওকে দেখে নি। এখন সে বিস্ময় ও করুণায় মেশানো দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল। মাতিৎসার গায়ে ছিল ছিন্নভিন্ন সুতীর পোশাক, তার মাথায় একটা পুরনো রঙচটা রুমাল, পা দুটো খালি। কোন রকমে মেঝেতে পা ঘষটে ঘষটে দুহাতে দেয়াল ধরে ধরে সে ধীরে ধীরে ইলিয়ার ঘরে সেঁধোল, ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ফ্যাঁসফেঁসে কাঠ কাঠ গলায় বলল:

'শিগ্‌গিরই টেঁসে যাব... পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, একেবারে অবশ যখন হয়ে যাবে তখন আর পেটের ধান্দায় বেরোতে পারব না... তখনই মরণ হবে।'

তার মুখ ভয়ঙ্কর ফুলে উঠেছে, কালো দাগে ছেয়ে গেছে। বড় বড় চোখ দুটো ফুলে অসাড় হয়ে গেছে, এখন কুত্‌কুত্‌ করছে।

'আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছিস?' সে ইলিয়াকে বলল। 'ভাবছিস, মারধোর খেয়েছি? না, এটা হল আমার ব্যামো।'

'কী করে চলছে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'গির্জার দাওয়ায় ভিক্ষে করি,' নির্বিকার ভাবে শিঙ্গার মতো গাঁ গাঁ আওয়াজ তুলে মাতিৎসা বলল। 'তোর কাছে এসেছি একটা কাজে। পেরফিশ্‌কার কাছ থেকে জানতে পারলাম এই বাবুটির বাড়িতে আছিস, তাই এলাম।'

'চা খাবে না কি?' ইলিয়া বলল। মাতিৎসার কণ্ঠস্বর শুনতে, জ্যান্ত অবস্থায় পচে ফুলে ওঠা তার বিরাট দেহটা চোখের সামনে দেখতে ইলিয়ার বিরক্তি লাগছিল।

'তোর ঐ চায়ে ভূতপ্রেতের ছানারা লেজ ধুক গে... আমাকে পাঁচটা কোপেক দে... কই, জিজ্ঞেস করলি না ত তোর কাছে কেন এসেছি?'

কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছিল, ও ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল, তার গায়ের গন্ধে ইলিয়ার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'কেন?' ইলিয়া তার কাছ থেকে একপাশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তার মনে পড়ল এক দিন সে কী ভাবে মাতিৎসাকে অপমান করেছিল।

'মাশাকে মনে আছে? তোর মন বলতে এখন আর কিছুই নেই! বড়লোক হয়েছিস।'

'কী হয়েছে ওর? কেমন আছে?' ইলিয়া ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মাতিৎসা ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে লাগল, সংক্ষেপে বলল:

'এখনও দম আটকে মারা যায় নি।'

'আরে সরাসরি বলই না!' ইলিয়া রাগে চিৎকার করে উঠল। 'আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? তুমি নিজেই ত তিন রুবলে ওকে বেচে দিয়েছ।'

'তোকে দোষ দিচ্ছি না — দোষ আমারই,' শান্ত স্বরে বাধা দিয়ে মাতিৎসা বলল, তারপর হাঁসফাঁস করতে করতে মাশার কথা বলতে শুরু করল।

বুড়ো স্বামী মাশাকে সন্দেহ করে, ওর ওপর অত্যাচার করে। লোকটা ওকে কোথাও যেতে দেয় না — দোকানে পর্যন্ত নয়। মাশা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘরে বসে থাকে, বুড়োকে জিজ্ঞেস না করে উঠোনেও বেরোতে পারে না। বাচ্চাগুলোকে বুড়ো কার কাছে যেন দিয়ে দিয়েছে, এখন একা মাশাকে নিয়ে থাকে। আগের বৌটা ওকে ঠকিয়েছে, বাচ্চা দুটোর কোনটাই বুড়োর নয় —

তার জন্য যত রাজ্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চলছে মাশার ওপর। এর মধ্যে মাশা দু-দুবার ওর কাছ থেকে পালায়, কিন্তু পুলিশ আবার ওকে ধরে এনে স্বামীর হেফাজতে দিয়ে যায়, বুড়ো তাই ওকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙায়, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে রাখে।

'হ্যাঁ, তুমি আর পেরফিশ্‌কা মিলে একটা কাজ করেছ বটে!' ইলিয়া ভুরু কুঁচকে বলল।

'আমি ভেবেছিলাম, এতে ভালোই হবে,' কাঠ কাঠ গলায় মাতিৎসা বলল। 'আরও খারাপ কিছু করা উচিত ছিল... ওকে তখন কোন বড়লোকের কাছে বেচে দিলে হত... তাহলে ও বাসা পেত, জামাকাপড় পেত, সবই পেত... পরে লোকটাকে ভাগিয়ে দিলেই দিব্যি থাকতে পারত। অনেকেই এ ভাবে জীবন কাটায়... বুড়োর কাছ থেকে...'

'তা তুমি এলে কেন সে কথা বল না,' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'তুই ত পুলিশের বাড়িতে থাকিস। পুলিশের লোক বার বার ওকে ধরে। ওকে বল না ওরা যেন না ধরে। পালিয়ে যাক না! পালিয়ে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতেও ত পারে। লোকের কি গা ঢাকা দেওয়ার জায়গা নেই?'

ইলিয়া ভাবনায় পড়ে গেল। মাশার জন্য ও কী করতে পারে?

মাতিৎসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, সন্তর্পণে পা দুটি নাড়াল।

'চলি! শিগ্‌গিরই অক্কা পাব,' সে বিড়বিড় করে বলল। 'ধন্যবাদ তোকে, ভদ্দরলোক! বড়মানুষ!'

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে মাতিৎসা গলে বেরিয়ে যেতে কর্ত্রী ইলিয়ার ঘরে ছুটে এলো, তাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল:

'এই তোমার প্রথম প্রেমিকা বুঝি, অ্যাঁ?'

প্রণয়িনী শক্ত করে ইলিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে ছিল, ইলিয়া তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল:

'কোন রকমে পা ঘষটে ঘষটে চলছে তবু যাকে ভালোবাসে তার জন্যে কিছু করতে চায়।'

'কাকে ও ভালোবাসে?' বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে ইলিয়ার উদ্বিগ্ন মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মহিলা জিজ্ঞেস করল।

'দাঁড়াও তাতিয়ানা, দাঁড়াও!' ইলিয়া বলল। 'ঠাট্টা নয়।'

ইলিয়া সংক্ষেপে তাকে মাশার কথা বলল, জিজ্ঞেস করল:

'এক্ষেত্রে কী করা যায়?'

'কিছুই করার নেই!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না জবাব দিল। 'আইনত, স্ত্রী হল স্বামীর সম্পত্তি, তাকে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই।'

আভ্তনোমভা অনেকক্ষণ ধরে ইলিয়াকে একথাই বোঝাতে চাইল যে মাশার উচিত — স্বামীর দাবি মেনে নেওয়া। কথাগুলো সে এমন গম্ভীর ভাবে বলতে লাগল যেন আইনকানুন তার নখদর্পণে এবং আইনের অলঙ্ঘনীয়তা সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত।

'একটু অপেক্ষাই করুক না। লোকটা বুড়ো, শিগ্গিরই মারা যাবে, তখন ও উদ্ধার পাবে, ওর সমস্ত ধনসম্পত্তি তারই হবে। তুমি তখন অবস্থাপন্ন যুবতী বিধবাকে বিয়ে করবে... তাই না?'

মহিলা হেসে উঠল, আবার গাম্ভীর্য নিয়ে ইলিয়াকে শেখাতে বসল:

'তবে ভালো হয় যদি তুমি পুরনো আলাপ-পরিচিতিদের সংস্রব ত্যাগ কর। এখন আর ওরা তোমার যুগ্যি নয়, এমনকি তোমাকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে পারে। ওরা সবাই — নোংরা, অসভ্য... যেমন ঐ যে লোকটা তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিল... হাড় জিরজিরে... ধূর্ত ধূর্ত চাউনি।'

'পাভেল গ্রাচোভ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সাধারণ লোকজনের কী বিদ্ঘুটে সব পদবীই না হয় বাবা — গ্রাচোভ্, লুনিয়োভ্, পেতুখোভ্, স্কভরৎসোভ্। আমাদের মহলে পদবী কত ভালো, কত সুন্দর — আভ্তনোমভ্! কর্সাকভ্! আমার বাবা — ফ্লোরিয়ানভ্! আর আমার যখন বিয়ে হয় নি তখন আমার সঙ্গে প্রেম করত কাছারীর এক হবু বড় কর্মচারী — গ্লোরিয়ান্তভ্! এক দিন স্কেটিংয়ের ফ্লোরে সে আমার পায়ের গার্টার খুলে নেয়, ভয় দেখায় যদি আমি নিজে ওর কাছে এসে তা না নিই তাহলে ও কেলেঙ্কারি বাধাবে...'

তার কথা শুনতে শুনতে ইলিয়ারও মনে পড়তে লাগল নিজের অতীত, মনের মধ্যে সে অনুভব করল পেত্রুখা ফিলিমোনভের বাড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা তার হৃদয়ের অদৃশ্য যোগসূত্র। তার মনে হল এই বাড়ি চিরকাল তার শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে।

অবশেষে ইলিয়া লুনিয়োভের স্বপ্ন সফল হল।

শান্ত তৃপ্তির আনন্দে ভরপুর ইলিয়া সকাল থেকে সন্ধে অবধি তার দোকানের কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের আশ মেটাত। চার দিকে তাকে সারি সারি সাজানো কার্ডবোর্ডের বাক্স আর প্যাকেট; জানলায় সে ঝকঝকে বক্‌লস, মনিব্যাগ, সাবান, বোতাম সাজিয়ে, রঙচঙে ফিতে আর লেস ঝুলিয়ে প্রদর্শনী খুলেছে। সবই ছিল উজ্জ্বল, স্বচ্ছন্দ। ইলিয়ার চেহারার দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য ত আছেই, তায় আবার সে খরিদ্দারদের দেখলেই ভদ্র ভাবে মাথা নোয়ায়, তাদের সামনে দোকানের কাউণ্টারের ওপর চটপট জিনিসপত্র ফেলে দেয়। লেস ও ফিতের সড়সড় শব্দ তার কানে মধুর সঙ্গীতের মতো লাগত, যে সব দরজি মেয়ে তার দোকানে ছুটে এসে কয়েক কোপেকের জিনিস কিনত তাদের দেখে ইলিয়ার সুন্দরী ও মধুর বলে মনে হত। জীবন হয়ে দাঁড়াল প্রীতিকর, স্বচ্ছন্দ, কোন এক সহজ-সরল, পরিষ্কার অর্থ দেখা দিচ্ছিল আর অতীত যেন কুয়াসার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ব্যবসা, মালপত্র ও খরিদ্দার ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই। ফাই-ফরমাস খাটার জন্য ইলিয়া একটা ছেলেকে বহাল রাখল। তাকে পরার জন্য সে একটা ছাইরঙা কোর্তা দিল, ছেলেটি যাতে যতদূর সম্ভব হাতমুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে থাকে সে দিকে সে নজর রাখত।

'গাভ্রিক, আমরা মনিহারি জিনিসের কারবার করি,' ইলিয়া তাকে বলত, 'তাই আমাদের পরিপাটি থাকা দরকার।'

গাভ্রিকের বয়স বছর বারো। ছেলেটা নাদুসনুদুস, তার মুখে কিছু বসন্তের দাগ আছে, নাকের ডগাটা ওল্‌টানো, চোখ দুটো ছোট ছোট ও ছাইরঙা, মুখে চটপটে ভাব। সে সবে শহরের স্কুলে পড়াশুনা শেষ করেছে, নিজেকে সে বয়স্ক ও ভারিক্কি লোক বলে মনে করত। ছোটখাটো, পরিচ্ছন্ন দোকানটিতে কাজ করতে তারও ভালো লাগত। সেও আনন্দে কার্ডবোর্ডের বাক্স আর প্যাকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকত এবং মালিকের মতো সেও খরিদ্দারদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করার চেষ্টা করত।

তাকে দেখলে ইলিয়ার মনে পড়ত স্ত্রোগানির মাছের আড়তে তার নিজের কথা। তাই ছেলেটার প্রতি বিশেষ এক ধরনের অনুভূতিবশত দোকানে যখন কোন খদ্দের না থাকত তখন সে স্নেহভরে তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা ও গল্পগুজব করত।

'গাভ্রিক, কাজকর্ম যখন না থাকে তখন একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে বই-টই পড়তে পার,' ইলিয়া তার সহকর্মীকে উপদেশ দিত। 'বই পড়তে পড়তে অজানতে সময় কেটে যায়, পড়তেও ভালো লাগে।'

ইলিয়া সকলের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করত, সকলের প্রতি মনোযোগ দেখাত, লোকজনের উদ্দেশে এমন হাসি হাসত যে দেখে মনে হত সে বুঝি বলতে চায়:

'দেখ, আমার কী ভাগ্য। তা তোমরাও সবুর কর! হয়ত তোমরাও শিগ্‌গিরই সৌভাগ্যের মুখ দেখবে।'

সকাল সাতটার সময় ও দোকান খোলে, রাত ন'টার সময় বন্ধ করে। খরিদ্দারের সংখ্যা কমই হত, দরজার কাছে চেয়ারে বসে বসে বসন্তের সূর্যে ইলিয়া রোদ পোহায়, মনের মধ্যে কোন রকম চিন্তা ও বাসনার বালাই না রেখে সে বিশ্রাম করে। গাভ্রিকও সেখানে দরজার পাশেই বসে থাকে, লোকজনের চলাচল দেখে, তাদের নিয়ে মজা করে, নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে রাস্তার কুকুরকে কাছে ডেকে নিয়ে আসে, পায়রা ও চড়াই পাখির দিকে ঢিল ছোঁড়ে কিংবা বই পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে নাক টানে। মাঝে মাঝে মনিব তাকে জোরে জোরে পড়তে বলে, কিন্তু পাঠ তাকে আকর্ষণ করে না; সে কান পেতে নিজের হৃদয়ের নীরবতা ও প্রশান্তি শোনে। সে পরম আনন্দে এই নীরবতা শোনে, তাতে মত্ত হয়ে থাকে, তা ছিল তার পক্ষে নতুন এবং এতই মধুর যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে মধুর পরিপূর্ণতা কিসে যেন ভঙ্গ হয়ে যায়। সেটা হত বিপদ সম্ভাবনার অদ্ভুত, প্রায় অধরা এক অনুভূতি; সে অনুভূতি তার মনের শান্তির বিঘ্ন ঘটাত না, কেবল ছায়ার মতো আলতো ভাবে তাকে স্পর্শ করে যেত।

ইলিয়া তখন ছেলেটার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে।

'গাভ্রিক, তোমার বাবা কী করেন?'

'পোস্টম্যান, ডাক বিলি করে।'

'তোমাদের পরিবার কি বড়?'

'বিরা-ট! আমরা অনেক ভাই-বোন। কেউ বড় কেউ একেবারেই ছোট।'

'ছোট ক'জন?

'পাঁচ জন। বড় — তিন জন... বড়রা সকলেই অবশ্য চাকরি-বাকরি করে: আমি — আপনার কাছে, ভাসিলি — সাইবেরিয়ায় টেলিগ্রাফে কাজ করে

আর সোনিয়া — টুইশানি করে। ও দারুণ! মাসে বারো রুবল পর্যন্ত আয় করে। তা ছাড়া আছে মিশা। ও মোটামুটি রকম... আমার চেয়ে বয়সে বড়, হাই স্কুলে পড়ে।'

'তার মানে বড়র সংখ্যা তিন নয়, চার।'

'তা কী করে?' গাভ্রিক অবাক হয়ে বলল, তারপর গুরুমশায়ের ভঙ্গিতে যোগ করল, 'বড় তারাই, যারা কাজকর্ম করে।'

'তোমরা কি গরিব?'

'গরিবই ত!' শান্ত স্বরে গাভ্রিক উত্তর দিল, পরে জোর আওয়াজ করে নাকে নিশ্বাস টানল। শেষে সে নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা সম্পর্কে ইলিয়াকে বলতে লাগল।

'বড় হয়ে আমি সৈন্য হব। তখন যুদ্ধ বাধবে... যুদ্ধেই আমি দেখিয়ে দেব। আমার বেজায় সাহস আছে... আমি এক্কেবারে সকলের আগে ছুটে গিয়ে শত্রুর হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে নেব... আমার কাকা একবার এ রকম ছিনিয়ে নেন, তার জন্যে উনি জেনারেল গুর্কোর কাছ থেকে ক্রস আর পাঁচ রুবল বখশিস পান।'

ছেলেটির বসন্তের দাগওয়ালা মুখ আর তার অনবরত কাঁপতে থাকা চওড়া নাকের দিকে তাকিয়ে ইলিয়া হাসতে থাকে। সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ইলিয়া চলে যায় কাউণ্টারের পেছনের দিকের ছোট্ট ঘরটিতে। ইতিমধ্যে ছেলেটি সামোভার গরম করে রাখে; টেবিলের ওপর তৈরি থাকে ফুটন্ত সামোভার, রুটি আর সসেজ। এক গেলাস চা আর রুটি খেয়ে গাভ্রিক দোকানে ঘুমাতে চলে যায়, ইলিয়া সামোভারের পাশে অনেকক্ষণ বসে থাকে — কখনও কখনও এক নাগাড়ে ঘণ্টা দুয়েক।

ইলিয়ার নতুন বাসগৃহে আসবাব বলতে ছিল দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, খাট আর আলমারি। ঘরটা ছিল চিলতে, নীচু, তার জানলাটা চারকোনা, সে জানলা থেকে পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজনের পা দেখা যেত, আর দেখা যেত রাস্তার ওপাশের বাড়ির ছাদ এবং ছাদের ওপরের আকাশ। জানলায় সে ঝুলিয়েছিল মসলিনের সাদা পর্দা। রাস্তার দিক থেকে জানলাটা ঝরোকা দিয়ে ঘেরা ছিল — এটা ইলিয়ার মোটেই ভালো লাগত না। বিছানার ওপরে সে টাঙিয়েছিল 'মানবজীবনের ক্রমপর্যায়' নামে ছবি। এই ছবিটা ইলিয়ার ভালো লাগত। অনেক দিন যাবতই এটি কেনার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু দোকান

খোলার আগে কেন যেন কেনা হয়ে ওঠে নি, যদিও দাম মাত্র দশ কোপেক।

'মানবজীবনের ক্রমপর্যায়' চিত্রিত হয়েছে একটা খিলানের ওপর, তার নীচে আছে স্বর্গ। সেখানে জ্যোতি আর ফুলে ঘেরা জেহোভা আদম ও ইভের সঙ্গে কথা বলছেন। মোট সতেরোটি পর্যায়। প্রথমটিতে — মাকে অবলম্বন করে এক শিশু, তার নীচে লাল অক্ষরে লেখা — 'প্রথম পদক্ষেপ'। দ্বিতীয়টিতে — শিশু ঢোলক বাজিয়ে নাচছে, তার নীচে লেখা: 'পাঁচ বছর বয়স — খেলার সময়'। সাত বছর বয়স — 'শিক্ষার সূত্রপাত', দশ বছর বয়সে সে 'স্কুলে যায়', একুশ বছর বয়সে সে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে হাসি; নীচে লেখা আছে 'সেনাবাহিনীতে'। পরের ধাপটিতে তার বয়স পঁচিশ: পরিধানে টেইল-কোট, হাতে ভাঁজ করা টুপি, অন্য হাতে ফুলের তোড়া — 'বর'। তারপর সে দাড়ি রেখেছে, তার গায়ে উঠেছে লম্বা ফ্রক-কোট, গোলাপী রঙের টাই; তার পাশে হলুদ রঙের পোশাক পরা এক মোটাসোটা মহিলা, সে ঐ মহিলার হাত শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। পরে লোকটির পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হল: গায়ে জামা, জামার আস্তিন গোটানো, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেহাইয়ের ওপর লোহা পেটাচ্ছে। সোপানের শীর্ষে সে লাল রঙের আরাম-কেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে, চার ছেলেমেয়ে আর গিন্নী শুনছে। সে নিজে এবং তার পরিবারের সকলেই চমৎকার পরিপাটি পোশাক পরে আছে, সকলেরই চেহারায় স্বাস্থ্য ও পরিতৃপ্তির ছাপ। এ সময় তার বয়স পঞ্চাশ। এবারে ধাপ নীচের দিকে চলল: লোকটির দাড়িতে এখন পাক ধরেছে, তার পরনে হলুদ রঙের লম্বা কামিজ, তার হাতে একটা মাছের থলে আর কিসের যেন একটা কলসি। এই ধাপের নীচে লেখা আছে: 'গেরস্থালি', পরেরটিতে — সে তার নাতির সেবাযত্ন করছে; নীচে — তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেননা তার বয়স এখন আশি। একেবারে শেষের ধাপে তার বয়স পঁচানব্বই, সে কফিনে পা রেখে আরাম-কেদারায় বসে আছে, চেয়ারের পেছনে কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে আছে মরণ।

সামোভারের ধারে বসে ইলিয়া ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে এবং এমন সুন্দর মাপা ও সহজ জীবন দেখতে তার বেশ লাগে। ছবি থেকে ঝরে পড়তে থাকে প্রশান্তির ভাব, তার উজ্জ্বল বর্ণালি যেন হেসে এই বলে অভয় দিচ্ছে যে তা দিয়ে বিজ্ঞতা সহকারে আঁকা হয়েছে লোকের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে

এক সত্যিকারের জীবন, আঁকা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে, যেমনটি হওয়া উচিত। মানবজীবনের এই রূপ নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে ইলিয়া ভাবে ও যা চেয়েছিল ঠিক তাই পেয়েছে, এখন তার জীবন ঐ ছবির মতোই যথানিয়মে যাওয়া উচিত। জীবনের গতি হবে ঊর্ধ্বে, তা শীর্ষদেশে পৌঁছবে এবং তার যখন যথেষ্ট টাকা-পয়সা জমবে সে তখন নম্র স্বভাবের এক শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করবে...

সামোভার নিস্তেজ হয়ে গড়গড়, সোঁ সোঁ আওয়াজ তোলে। জানলার কাচ আর পর্দার মসলিন ভেদ করে ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ঘোলাটে আকাশ, আকাশের তারাদল দেখা যায় কি যায় না। আকাশের তারার দ্যুতিতে সব সময়ই কেমন যেন একটা অস্থিরতা আছে।

সামোভার আগের চেয়ে মৃদু অথচ মর্মভেদী সোঁ সোঁ আওয়াজ তোলে। অনেকটা মশার পিন পিন আওয়াজের মতো এই মিহি সুর বিরক্তিকর ভাবে কানে এসে লাগে, চিন্তাকে অস্থির ও বিভ্রান্ত করে তোলে। কিন্তু ঢাকনা দিয়ে সামোভারের মুখ বন্ধ করার ইচ্ছে ইলিয়ার হয় না — সামোভারের সোঁ সোঁ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে ঘরটা বেশি রকমের নীরব হয়ে যায়। নতুন কামরায় ইলিয়া ইতিপূর্বে অজানা এক অনুভূতির স্বাদ পেল। আগে সে সব সময় থাকত লোকজনের পাশে পাশে — লোকজনের সঙ্গে তার ব্যবধান বলতে থাকত পাতলা কাঠের পার্টিশন, কিন্তু এখন তার চার দিকে পাথরের দেওয়াল, দেওয়ালের ওপাশে লোকজনের কোন অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

'মরার কী দরকার?' — সাফল্যের শীর্ষ থেকে কবরের পথে অধোগামী মানুষটির দিকে তাকাতে তাকাতে ইলিয়া হঠাৎ নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে... তার মনে পড়ল যে ইয়াকভ্ সব সময় মৃত্যুর কথা ভাবে, মনে পড়ে গেল ইয়াকভের সেই কথাগুলো: 'মরতে পারলে বেশ হত...'

ইলিয়া তার নিজের মনোভাবের বিরোধী এই স্মৃতিকে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, চেষ্টা করে সেখান থেকে অন্য কোথাও মনটাকে সরিয়ে নেওয়ার।

'পাভেল আর ভেরা কেমন আছে কে জানে!' — একটা নতুন, নেহাৎই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন তার মনে জাগল।

রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে। পাকা রাস্তার পাথরের ওপর চাকার ঘর্ঘর আওয়াজে জানলার কাচ ঝনঝন করে, বাতি দপদপ করতে থাকে।

তারপর দোকানঘরে কেমন যেন অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়... গাম্ভ্রিক ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছে। ঘরের কোণে ঘন অন্ধকারও যেন ইতস্তত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ইলিয়া টেবিলের ওপর কনুই ভর দিয়ে বসে থাকে, কপালের দুপাশের রগ চেপে ধরে ছবি নিরীক্ষণ করতে থাকে। প্রভু জেহোভার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক শান্ত স্বভাবের সিংহ, মাটিতে গুঁড়ি মেরে চলছে একটা কচ্ছপ, একটা ভোঁদড় জাতীয় প্রাণী হেঁটে বেড়াচ্ছে, ব্যাঙ লাফাচ্ছে আর দাঁড়িয়ে আছে রক্তরাঙা বিরাট বিরাট ফুলে ছাওয়া জ্ঞানবৃক্ষ। যার এক পা কফিনের ভেতরে সেই বুড়োকে দেখতে অনেকটা ব্যবসাদার পলুএক্‌তভের মতো — ঐ রকমই টাকপড়া ও রোগাপটকা, ঘাড়টাও ঐ রকম লিকলিকে... রাস্তায় পদক্ষেপের ফাঁপা ফাঁপা আওয়াজ ওঠে — দোকানের পাশ দিয়ে ফুটপাথ ধরে কে যেন ধীরেসুস্থে চলছে। সামোভার নিভে গেছে, এখন ঘর এমন শান্ত যে মনে হয় তার বাতাস জমাট বেঁধে গেছে, গাঢ় হতে হতে ঘন দেয়ালের সঙ্গে এসে মিশেছে।

ব্যবসাদারের কথা মনে হতে ইলিয়া উৎকণ্ঠা বোধ করে না, মোটের ওপর কোন ভাবনা-চিন্তাই তাকে অস্থির করে তোলে না — তা যেন আলতো করে, সন্তর্পণে তার মনকে চেপে ধরতে থাকে, যেমন ভাবে মেঘ আচ্ছন্ন করে চাঁদ। এর ফলে ‘মানবজীবনের ক্রমপর্যায়’ ছবি খানিকটা ঝাপসা হয়ে আসে, তার ওপর যেন ছোপ ধরছে। সব সময়ই পলুএক্‌তভ খুনের ঘটনা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়া শান্ত মনে ভাবত পৃথিবীতে ন্যায়বিচার নিশ্চয়ই আছে, তার মানে, আজ হোক কাল হোক মানুষ তার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবেই। একথা ভাবার পর ইলিয়া তীক্ষ্ন্দৃষ্টিতে ঘরের অন্ধকার কোণ লক্ষ্য করতে থাকে — জায়গাটা বিশেষ রকম শান্ত এবং অন্ধকার যেন সেখানে কোন এক নির্দিষ্ট রূপ ধারণে ইচ্ছুক... তারপর ইলিয়া জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে, বাতি নিভিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে বাতি নেভায় না, সলতে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে শিখা কমায়-বাড়ায়। বাতির আগুন এই অদৃশ্য হয়ে যায়, এই আবার দেখা দেয়, খাটের চার দিকে অন্ধকার নাচতে থাকে, চার দিক থেকে অন্ধকার খাটের ওপর দাপাদাপি করে, আবার ঘরের কোনায় ছিটকে সরে যায়। ইলিয়া লক্ষ্য করতে থাকে বোধাতীত কালো কালো ঢেউ তাকে প্লাবিত করার চেষ্টায় ধেয়ে আসছে। বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টিতে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে তার ভেতরে কী যেন ধরার আশায় সে

বহুক্ষণ এক খেলা খেলে চলল... অবশেষে দীপের শিখা শেষ বারের মতো দপ করে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়, মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে সারা ঘর ছেয়ে গেল, অন্ধকার যেন এখনও আলোর সঙ্গে লড়াইয়ের জের কাটিয়ে উঠতে না পেরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তার ভেতর থেকে ইলিয়ার চোখের সামনে দেখতে দেখতে বেরিয়ে আসে জানলার ঘোলাটে নীলচে ছোপ। জ্যোৎস্না রাত হলে জানলার ওপাশের লোহার ঝরোকা থেকে কালো কালো ছায়ার ডোরা মেঝের ওপর এসে পড়ত। ঘরের ভেতরের নিস্তব্ধতা এত ভয়ানক হয়ে আসে যে মনে হয় জোরে নিশ্বাস ফেললে ঘরের সব কিছু কেঁপে উঠবে। ইলিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে কম্বল মুড়ি দেয়, বিশেষত ভালো করে সে ঘাড়টা জড়ায় এবং মুখ বাইরে রেখে ঘরের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না ঘুমে ঢলে পড়ে। সকালে জেগে উঠতে সে সতেজ ও শান্ত বোধ করে, গতকালের কথা মনে পড়ে তার প্রায় লজ্জাই পায়। গাভ্রিকের সঙ্গে চা পান করে, নিজের দোকানঘরের চার দিকটা এমন ভাবে দেখে যেন নতুন কিছু দেখছে। কখনও কখনও পাভেল তার কাজ থেকে ফেরার পথে ইলিয়ার দোকানে আসে। পাভেলের সর্বাঙ্গ নোংরা, তেলচিটে, তার গায়ের জামা জ্বলন্ত লোহার ফুলকিতে ঝাঁজরা, মুখে কালিঝুলি মাখা। সে আবার কাজ করছে জলকলমিস্ত্রীর কাছে, তার সঙ্গে তাই থাকত রাং ঝালাইয়ের কড়াই, সীসের পাইপ ও রাং গরম করার যন্ত্র। সে সব সময় ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির দিকে যেত। ইলিয়া তাকে একটু বসতে বললে পাভেল বিমূঢ় হাসি হেসে বলত:

'উপায় নেই! আমার অবস্থাটা ভাই এমন যেন আমার ঘরে রূপকথার সেই আগুনরঙা পাখি বাঁধা আছে — খাঁচাটা তাকে ধরে রাখার মতো মজবুত নয়। সারাটা দিন সে একা একা সেখানে বসে থাকে। কে জানে কিসের কথা ভাবে? ওর জীবনের রং চলে গেছে... এটা আমি বেশ বুঝতে পারি... একটা বাচ্চা যদি থাকত!' পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

এক দিন সে বিষণ্ণ ভাবে বন্ধুকে বলল:

'আমি খাল কেটে সমস্ত জল নিজের বাগানে নিয়ে এসেছি। এখন ভয় হচ্ছে ডুবে না যায়।'

আরেক বার ইলিয়া পাভেলকে জিজ্ঞেস করল সে কবিতা লেখে কি না, তাতে পাভেল মৃদু হেসে বলল:

'আকাশে আঙ্গুল বুলিয়ে লিখি... চুলোয় যাক ও সব! গরিবের আবার রাজভোগ!.. আমি ভাই একেবারে চড়ায় আটকে পড়েছি। মাথার ভেতরে ও সবের কিছু নেই — ছিটেফোঁটাও নেই। কেবল ওর কথাই ভাবি... কাজ করি — ঝালাই করতে শুরু করলাম ত মাথার ভেতরে গলা সীসের মতো ওকে নিয়ে চিন্তার স্রোত বয়ে যায়... এই হল গিয়ে তোর কবিতা... হা-হা! লোকে অবশ্য বলে যে জিত তারই যে কোন কাজে মনপ্রাণ দিতে পারে... ওর বড় কষ্ট...'

'আর তোর?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'আমারও — এই জন্যেই আমার কষ্ট... ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমোদ-ফুর্তিতে ওর অভ্যেস ছিল! সব সময় টাকা-পয়সার কথা ভাবে। বলে: 'কোন উপায়ে যদি টাকা হাতে আসত তাহলে সব কিছু পাল্টে যেত। কী বোকামিই না করেছি! কোন ব্যবসাদারের টাকা হাতাতে পারলে হত।' মোটের ওপর যত রাজ্যের আজেবাজে কথা। আমার ওপর করুণাবশত... আমি বুঝতে পারি... ওর বড় কষ্ট...'

পাভেল হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

ইলিয়ার কাছে মাঝে মাঝে এসে হাজির হত শতচ্ছিন্ন পোশাক পরনে, আধা উলঙ্গ মুচি, তার নিত্য সঙ্গী অ্যাকর্ডিয়ানটি বগলের তলায় ঠিকই আছে। ফিলিমোনভের বাড়ির ঘটনা আর ইয়াকভের কান্ডকারখানার বর্ণনা সে দিত। নোংরা ও উস্কোখুস্কো চেহারা নিয়ে পেরফিশ্‌কা দোকানের দরজার পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে অনর্গল গালগল্প করে যেত।

'পেত্রুখা বিয়ে করেছে, বৌটা — বীটের মতো, আর সৎ ছেলেটা যেন গাজর! গোটা এক সব্‌জি বাগান, মাইরি বলছি! বৌটা মোটা, বেঁটে, লাল টক্‌টকে, মুখে তিন থাক ভাঁজ। একটা লোকের যে তিনটে থুতনি হয় তাও দেখলাম। মুখ অবশ্য একটাই। চোখজোড়া ভালো জাতের শুয়োরের চোখের মতো: কুতকুতে, ওপরের দিকে চেয়ে দেখার উপায় নেই। পুত্তুরটি তার ফ্যাকাসে, ঢ্যাঙা, চোখে চশমা। বড়মান্‌ষি চালচলন। নাম তার সাভ্‌ভা, কথা বলে নাকি গলায়। মার সামনে ভিজে বেড়াল, আড়ালে মুখের কোন আগল নেই। জুটেছে ভালো। ইয়াকভের চেহারা এখন এমন হয়েছে যেন ভয় খাওয়া আরশোলার মতো কোন ফোকরে সেঁধিয়ে গেলে বাঁচে। বেচারি লুকিয়ে চুরিয়ে মদ খায়, কাশতে কাশতে ওর প্রাণ বেরিয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে

বাপে মেরে ওর শরীরের যন্তরপাতির একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ছেলেটার ওরা দফা রফা করে দিচ্ছে। ছোঁড়া নরম স্বভাবের — ওকে আস্ত চিবিয়ে খেতে কোন বাধা নেই... তোর খুড়ো কিয়েভ থেকে চিঠি লিখেছে... আমার মনে হয় বেকার ও চেষ্টা করছে — কুঁজো স্বর্গে যেতে পারবে না বলেই আমার ধারণা!.. মাতিৎসার পা দুটো একেবারেই অথর্ব হয়ে গেছে: গাড়ি চেপে যায়। এক অন্ধকে ভাড়া নিয়েছে, তাকে ঘোড়ার মতো গাড়িতে জুতে গাড়ি চালায় — সে এক হাসির দৃশ্য! যা হোক করে পেট চালাচ্ছে। খাসা মাগী, একথা মানতেই হবে! আমি বলি কি, আমার বৌটা যদি এত চমৎকার না হত তাহলে এই মাতিৎসাকে নির্ঘাত বিয়ে করতাম! সোজা কথা বলি বাপু, দুনিয়ায় সত্যিকারের — ভালো মনের মেয়েমানুষ বলতে দেখলাম দুজনকে — আমার বৌ আর মাতিৎসা... এটা ঠিক যে মাতিৎসা মাতলামি করে, তবে ভালো লোক চিরকালই মাতাল।'

'মাশার খবর কী?' ইলিয়া ওকে মনে করিয়ে দেয়।

মেয়ের কথা মনে করিয়ে দিতে মুচির ঠাট্টা-তামাসা ও হাসি মিলিয়ে যায় — যেন শরতের বাতাস গাছ থেকে পাতা খসিয়ে দেয়। তার পাণ্ডুর মুখটা লম্বাটে হয়ে ঝুলে পড়ে, ও ভেবাচেকা খেয়ে শান্ত স্বরে বলে:

'ওর সম্পর্কে কিছুই আমার জানা নেই... খেত্রনভ্ আমাকে সরাসরি বলে দিয়েছে, 'ধারে কাছে আসবি না, তাহলে ওকে আস্ত রাখব না!' এক পাঁইটের জন্যে, নিদেনপক্ষে এক গেলাসের মৌতাতের জন্যে কিছু ছাড় দেখি ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্!'

'তুমি গোল্লায় গেছ পেরফিশ্কা,' ইলিয়া ওর অবস্থা দেখে আফশোষ করে বলল।

'একেবারেই গেছি,' নির্বিকার ভাবে সায় দিয়ে মুচি বলল। 'আমি মারা যাওয়ার পর অনেকেই আমার জন্যে আফসোস না করে পারবে না!' ও আস্থার সঙ্গে বলে চলল। 'কেননা আমি লোকটা ফুর্তিবাজ, লোকজনকে হাসাতে ভালোবাসি! ওদের সব্বার মুখে কেবল কী পাপ কী পাপ, ওরে বাপ ওরে বাপ! গেল জান গেল জান, ভগবান ভগবান! — আমি ওদের গান শোনাই, নানা রঙ্গ করি। দুটো পয়সার জন্যে পাপ করলেও মরবে, হাজার টাকার জন্যে করলেও মরবে — মরবে সবাই, একই রকম যমযন্ত্রণা সকলকে ভুগতে হবে... ফুর্তিবাজ লোকেরও দুনিয়ায় বাঁচা দরকার।'

রোঁয়া ওঠা বুড়ো শালিকের মতো পেরফিশ্‌কা ছটফট করে নেচে কুঁদে হাসি-ঠাট্টা ও ভাঁড়ামি করার পর অদৃশ্য হয়ে যেত আর ইলিয়া হাসিমুখে ওকে বিদায় করে দিয়ে মাথা নাড়ত। পেরফিশ্‌কার প্রতি তার দরদ হচ্ছে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারত এই দরদের কোন প্রয়োজন নেই, দেখত যে এতে তার মনের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। ইলিয়ার অতীত খুব একটা দূরে ফেলে আসা নয় তাই অতীতের যে কোন কথা মনে পড়তেই তার মনের মধ্যে অস্বস্তিকর অনুভূতি জেগে উঠত। সে যেন এমন এক মানুষ যে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে করতে মধুর স্বপ্নে অভিভূত হয়ে পড়েছে, এদিকে শরৎকালের নাছোড়বান্দা মাছির ঝাঁক তার কানের কাছে গুন্‌গুন্‌ করছে, তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। পাভেলের সঙ্গে কথা বলতে কিংবা পেরফিশ্‌কার বিবরণ শুনতে শুনতে ইলিয়া সমবেদনার হাসি হাসত, মাথা নাড়ত, অপেক্ষা করে থাকত কখন ওরা চলে যাবে। মাঝে মাঝে পাভেলের কথা শুনতে তার বিষণ্ণ ও অস্বস্তিকর লাগত; সে সব ক্ষেত্রে সে তাড়াতাড়ি জিদ করে তাকে টাকা দিতে চায়, অসহায়ের ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে বলে:

'আর কী ভাবে তোকে সাহায্য করতে পারি?.. পরামর্শটা নিলে পারতিস — ভেরাকে ছেড়ে দে।'

'ওকে ছাড়া যায় না,' পাভেল মৃদু স্বরে বলে। 'লোকে ছাড়ে সেই জিনিস যা কোন দরকারে লাগে না। ওকে আমার দরকার। কথাটা হচ্ছে এই যে ওকে লোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। এমনও হতে পারে যে আমি ওকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতে পারছি না, আমার ভালোবাসার মধ্যে হয়ত রাগ ও অপমানের জ্বালা আছে। আমার জীবনে ও গোটা এক সৌভাগ্যের টুকরো। আমি কি ওকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারি? আমার তাহলে আর থাকবে কী?.. আমি পিছু হটছি না! ওকে খুন করব, অন্যের হাতে তুলে দিতে পারব না।'

পাভেলের শুকনো মুখের ওপর লাল লাল ছোপ ফুটে ওঠে, ও হাতের মুঠো শক্ত করে পাকিয়ে ধরে।

'ওর আশেপাশে কাউকে ঘুরঘুর করতে দেখিস নাকি?' ইলিয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'না, তা দেখি নি।'

'তাহলে কার কথা বলছিস — ছিনিয়ে নিচ্ছে?'

'এমন এক শক্তি আছে যে আমার হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে চায়... ওঃ, শয়তানের কারসাজি! আমার বাপের সর্বনাশ হল মেয়েমানুষের জন্যে, দেখা যাচ্ছে আমার কপালেও তাই আছে।'

'কী ভাবে যে তোকে সাহায্য করি!' ইলিয়া বলল এবং একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন যেন পরিতৃপ্তি অনুভব করল। পেরফিশ্কার জন্য তার যত দুঃখ হত তার চেয়েও বেশি দুঃখ হত পাভেলের জন্য। পাভেল যখন ক্ষোভে ফেটে পড়ে কথা বলত তখন ইলিয়ার বুকের ভেতরটাও যেন কার বিরুদ্ধে ক্ষোভে টগবগ করতে থাকত। কিন্তু যে শত্রু অপমান করছে, যে শত্রু পাভেলের জীবনকে বিষিয়ে দিচ্ছে তাকে ধারে কাছে দেখা যায় না — সে ছিল অদৃশ্য। ইলিয়া আবার অনুভব করত যে অন্যান্য মানুষের প্রতি তার প্রায় আর সব অনুভূতির মতোই যেমন তার করুণার তেমনি এই ক্ষোভেরও কোন প্রয়োজন নেই। এ সবই ছিল বাড়তি, অপ্রয়োজনীয় অনুভূতি। পাভেল ভুরু কুঁচকে বলে:

'আমি জানি, আমাকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই।'

তারপর বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে ও জোর দিয়ে জ্বালাধরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে চলে:

'তুই একটা বেশ আরামের জায়গা পেয়ে গেছিস — বসে আছিস, কোন ঝুট-ঝামেলা নেই। তবে আমি তোকে বলে দিচ্ছি — এমন কেউ না কেউ আছে যার রাতে ঘুম হচ্ছে না, ভাবছে কী করে তোকে এখান থেকে হটানো যায়... তোকে নির্ঘাত ভাগাবে! নয়ত তুই নিজেই ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালাবি।'

'ছাড়ব বললেই হল, সেই আশায়ই থাক!' ইলিয়া হাসতে হাসতে বলে।

কিন্তু পাভেল তার মত থেকে টলে না। বন্ধুর মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে নিজের গোঁ ধরে থেকে ওকে বলে:

'আমি বলছি, তুই ছেড়ে দিবি। সারা জীবন চুপচাপ অন্ধকার গর্তের মধ্যে বসে থাকার চরিত্র তোর নয়। তুই হয় নেশা ধরবি, নয়ত সর্বস্বান্ত হবি — একটা না একটা কিছু তোর ঘটবেই।'

'তা কেন?' ইলিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এই অমনি। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন তোকে মানায় না... তুই ছেলেটা ভালো, তোর দিল আছে... এমন লোকজন আছে যারা সারা জীবন দিব্যি সুস্থসবল,

কখনও কোন অসুখবিসুখে পড়ল না, কিন্তু হঠাৎ — একেবারে হঠাৎই দড়াম্ করে পড়ল!'

'দড়াম্ করে পড়ল মানে?'

'পড়ল আর মরে গেল।'

ইলিয়া হেসে ওঠে, হাত পা ছড়িয়ে শরীরের শক্ত মাংসপেশীগুলোকে টানটান করে, সর্বশক্তিতে বুক ভরে গভীর নিশ্বাস টানে।

'যত সব আজেবাজে!' ও বলে।

কিন্তু সন্ধ্যায় সামোভারের পাশে বসে থাকতে থাকতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাভেলের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, আভ্‌তনোমভার সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। দোকান খোলার ব্যাপারে মহিলার প্রস্তাবে গদগদ হয়ে মহিলা যা বলেছে তাতেই সে রাজি হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ তার পরিষ্কার মনে হল যদিও সে ব্যবসায় বেশি পুঁজি খাটিয়েছে তবু অংশীদার না বলে তাকে বোধ হয় দালাল বলাই ঠিক হবে। এই আবিষ্কারে সে স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হল।

'আচ্ছা! আমাকে যে শক্ত করে জড়িয়ে ধর তার কারণ এই যাতে অলক্ষ্যে পকেট হাতড়ান যায়?' — সে মনে মনে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নাকে বলল। তক্ষুনি ঠিক করল তার সমস্ত টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে সহবাসিনীর কাছ থেকে দোকান কিনে নেবে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে। এটা স্থির করা তার পক্ষে কঠিন হল না। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নাকে এর আগেও তার জীবনে বাড়তি বলে ইলিয়ার মনে হচ্ছিল, আর সম্প্রতি সে তার কাছে বোঝা হয়েই দাঁড়িয়েছে। তার সোহাগে ইলিয়া অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এক দিন ইলিয়া তাকে মুখের ওপর বলে দিল:

'কী নির্লজ্জ তুমি, তাতিয়ানা।'

তাতিয়ানা তার উত্তরে কেবল হিহি করে হাসল।

সে আগের মতোই তার মহলের লোকজনের কেচ্ছা-কাহিনী ইলিয়াকে শোনাতে থাকে। এক দিন ইলিয়া মন্তব্য করল:

'তুমি যা বলছ সে সব যদি সত্যি হয় তাহলে তোমাদের এই ভদ্র জীবনযাত্রার এক কানাকড়িও মূল্য নেই!'

'তা কেন? এতে মজা আছে!' আভ্‌তনোমভা না বোঝার ভঙ্গিতে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল।

'দারুণ মজা! দিনে — কানাকড়ি নিয়ে যত রাজ্যের কামড়াকামড়ি আর রাতের বেলায় — অনাচার ...'

'কী আমার সাধুপুরুষ রে!' হাসতে হাসতে তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্না বলল।

আবারও সে ইলিয়ার সামনে মধ্যবিত্তসুলভ চমৎকার, পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ জীবন নিয়ে বড়াই করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে জীবনের নৃশংসতা ও নোংরামি প্রকাশ পেতেও বাকি থাকে না।

'কিন্তু এটা কি ভালো?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'কি অদ্ভুত লোক রে বাবা! আমি কি ভালো বলছি নাকি? — বলছি, এটা না থাকলে একঘেয়ে লাগত!'

কখনও কখনও তাতিয়ানা ওকে তালিম দিত:

'এই সব ছিটের জামা-টামা পরা তোমাকে ছাড়তে হবে — ভদ্রলোকেরা লিনেনের জামাকাপড় পরে... আমি কী করে শব্দ উচ্চারণ করি শোন, শেখ। কখনও বলবে না পাঁচ কুড়ি, বলতে হয় — শ'! বলবে না — তাইলে, বলতে হয় — তাহলে। তাইলে, ত্যাখন, এখুন — এ সব চাষাড়ে কথাবার্তা। তুমি ত আর এখন চাষাভুষো নও।'

প্রায়ই সে তাদের মধ্যে, তার মতো একজন চাষা আর ভদ্রঘরের শিক্ষিত মহিলার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিত। তার নির্দেশগুলো বেশির ভাগ সময়ই ইলিয়াকে আঘাত করত। অলিম্পিয়াদার সঙ্গে বাস করার সময় সে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠতা অনুভব করত। তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্না কখনই তার মধ্যে সে ধরনের কোন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে নি। ইলিয়া দেখেছে যে তার আকর্ষণ অলিম্পিয়াদার চেয়ে বেশি, কিন্তু তার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা সে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। আভ্তনোমভদের বাড়িতে থাকার সময় ইলিয়া মাঝে মাঝে শুনতে পেত বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্না ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। পার্টিশনের ওপাশ থেকে তার ফিসফিসে অথচ সামান্য চড়াগলায় দ্রুত আবৃত্তি শোনা যেত:

''হে আমাদিগের স্বর্গস্থ পিত, আমাদিগকে আমাদিগের দৈনন্দিন খাদ্য দাও...' কিরিক, উঠে রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমার পায়ে ঠান্ডা বাতাস লাগছে।'

'খালি মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে আছ কেন?' কিরিক আলস্যজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'চুপ কর, গোলমাল করো না!'

তারপর ইলিয়া আবার শুনতে পেত উদ্বিগ্ন কণ্ঠের দ্রুত ফিস ফিস আওয়াজ:

'তোমার দাসানুদাস ভ্লাস, নিকোলাই, সন্ন্যাসী মার্দারি আর তোমারই দাসী এভ্‌দোকিয়া ও মারিয়ার আত্মার শান্তি হোক প্রভু, তাতিয়ানা, কিরিক আর সেরাফিমাকে সুস্থ রেখো প্রভু...'

তার প্রার্থনার এই তাড়াহুড়ো ভাবটা ইলিয়ার ভালো লাগত না — সে বুঝতে পারত যে এ লোক অন্তরের তাগিদে প্রার্থনা করছে না, করছে অভ্যাসবশত।

'তাতিয়ানা, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর?' ইলিয়া এক দিন ওকে জিজ্ঞেস করল।

'কী প্রশ্নই না করলে!' সে অবাক হয়ে বলল। 'অবশ্যই করি। একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'অমনিই... সব সময় অত্যান্ত তাড়াহুড়ো করে ভগবানের কাছে প্রার্থনার দায় সার কি না...' ইলিয়া হেসে বলল।

'প্রথমত, 'অত্যান্ত' কথাটা ঠিক নয়, বলতে হয় 'অত্যন্ত'! দ্বিতীয়ত, সারা দিনের কাজকর্মের পর এত হয়রান হয়ে পড়ি যে আমার এই অমনোযোগিতার জন্যে ভগবান আমাকে ক্ষমা না করে পারেন না।'

তারপর অন্যমনস্ক ভাবে চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে সে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যোগ করল:

'তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন। তিনি — দয়াময়।'

'কেবল এর জন্যেই তাঁকে তোমাদের দরকার যাতে কারও কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করা যায়,' — ইলিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে মনে মনে ভাবল, তার মনে পড়ে গেল অলিম্পিয়াদাকে — অলিম্পিয়াদা প্রার্থনা করত অনেকক্ষণ, নীরবে। সে আইকনের সামনে হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকত, মাথা নীচু করে এই অবস্থায় সে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত — যেন পাথরের মূর্তি। সে সময় তার মুখের ভাব হত শোকগ্রস্ত, কঠিন।

ইলিয়া যখন বুঝতে পারল যে দোকানের ব্যাপারে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না

বেশ কায়দা করে তার ওপরে সুবিধে নিয়েছে তখন সে তার প্রতি বিতৃষ্ণাই বোধ করল।

সে মনে মনে ভাবল, 'ও যদি বাইরের কোন লোক হত তাহলে একটা কথা ছিল! সকলেই কে কাকে ঠকাতে পারে সেই তালে থাকে... কিন্তু ও ত অনেকটা ঘরের বৌয়ের মতো... চুমু দেয়, আদর করে... ইতর বেড়াল! এ রকম ত করে রাস্তার ছেনাল মেয়েরা... তাও সকলে নয়।' তার সঙ্গে আচরণে ইলিয়া নিরুত্তাপ ও সন্দেহপরায়ণ হয়ে পড়ল, নানা অজুহাতে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে চলতে লাগল। এই সময় তার সামনে আরও এক নারীর আবির্ভাব ঘটল — সে হল গাভ্রিকের বোন। মেয়েটি প্রায়ই তার ভাইকে দেখতে দোকানে আসত। লম্বা, পাতলা ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটি দেখতে সুন্দরী নয়। গাভ্রিক যদিও বলেছে যে তার বয়স উনিশ, ইলিয়ার কিন্তু মনে হত তার চেয়ে ঢের বেশি। তার মুখ লম্বাটে, পাণ্ডুর, হাড় বার করা; উঁচু কপাল জুড়ে সূক্ষ্ম সক্ষ্ম বলিরেখা। হাঁসের ঠোঁটের মতো থ্যাবড়া নাকের চওড়া ফুটোগুলো দেখলে মনে হত রাগে ফুলে আছে, ছোট্ট পাতলা ঠোঁটজোড়া শক্ত করে চাপা। সে কথা বলত স্পষ্ট করে, কিন্তু মনে হত বুঝি বলছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে, অনিচ্ছায়। তার চলন দ্রুত এবং হাঁটত সে মাথা উঁচু করে — যেন অসুন্দর মুখখানা নিয়ে বড়াই করছে। কিংবা এও হতে পারে যে কালো চুলের মোটা ও দীর্ঘ বেণীর ভারে তার মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়ছে। মেয়েটির বড় বড় কালো চোখের দৃষ্টি কঠিন ও গম্ভীর ধরনের, সব কিছু মিলে মুখের চেহারা তার দীর্ঘ আকৃতিতে ঋজু ও অনমনীয় কী একটা বৈশিষ্ট্য দান করত। ইলিয়া তার সামনে লজ্জা বোধ করত। ইলিয়ার মনে হত মেয়েটার অহঙ্কার আছে, তবে সে তার শ্রদ্ধাও জাগাত। যখনই সে দোকানে আসত তখন ইলিয়া ভদ্র ভাবে তার দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলত:

'বসুন!'

'ধন্যবাদ!' ইলিয়ার দিকে মাথা নাড়িয়ে সংক্ষেপে এই কথা বলে সে বসে পড়ত। ইলিয়া আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মুখ লক্ষ্য করত — এ পর্যন্ত সে যত মেয়ের মুখ দেখেছে তাদের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাত; সে লক্ষ্য করত তার বহু কালের ব্যবহার করা খয়েরী রঙের পোশাক, তালি দেওয়া জুতোজোড়া, হলুদ রঙের খড়ের টুপি। সে বসে বসে ভাইয়ের সঙ্গে

কথাবার্তা বলত আর ডান হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুল দিয়ে সব সময় হাঁটুর ওপর নিঃশব্দে চটপট তাল ঠুকে যেত। বাঁ হাত দিয়ে স্ট্র্যাপে বাঁধা বইয়ের গোছা দোলাত। এমন যার আত্মসম্মান বোধ, সেই মেয়েটিকে এত খারাপ বেশে দেখে ইলিয়ার মন খারাপ হয়ে যেত। দু-তিন মিনিট বসে থাকার পর সে ভাইকে বলত:

'চলি রে! দস্যিপনা করিস না।'

এই বলে দোকানের মালিকের উদ্দেশে নীরবে মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে এমন ভাবে দমদম করে পা ফেলে চলে যেত যে দেখে মনে হত বুঝি কোন দুর্ধর্ষ সৈন্য লড়াইয়ে নামতে চলেছে।

'তোমার বোনটি ত বড় কড়া দেখছি!' ইলিয়া এক দিন গাভ্রিককে বলল।

নাক কুঁচকে, চোখ দুটো দারুণ রকম বড় বড় করে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাভ্রিক তার চোখমুখের হাবভাবে বোনের মুখের রীতিমতো জুতসই ক্যারিকেচার করল। তারপর হেসে ইলিয়াকে বোঝাল:

'ও হচ্ছে এই রকম... তবে এটা ওর ভান।'

'ভান করতে যাবে কেন?'

'কেন আবার? — করতে ভালোবাসে! আমিও — যেমন খুশি মুখ করতে পারি।'

মেয়েটি ইলিয়ার বড় আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। আগে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না সম্পর্কে যেমন ভাবত এখন একে দেখে তেমনি তার মনে হয়:

'বিয়ে করতে হয় ত এই রকম মেয়েকে...'

এক দিন সে একটা মোটা বই নিয়ে এসে ভাইকে বলল:

'নে, পড়।'

'কী বই, একটু দেখতে পারি কি?' ইলিয়া ভদ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি ভাইয়ের হাত থেকে বইটা নিয়ে ইলিয়াকে দিতে দিতে বলল:

'ডন কুইক্সোট... এক ভালোমানুষ নাইটের গল্প।'

'আচ্ছা! নাইটের গল্প অনেক পড়েছি,' অমায়িক হাসি হেসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইলিয়া বলল। মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করে ভাবলেশহীন স্বরে তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'আপনি পড়েছেন রূপকথা, কিন্তু এ হল চমৎকার, জ্ঞানের বই। এতে আছে এমন এক মানুষের কথা যিনি অন্যায়-অবিচারে নিপীড়িত, হতভাগ্য

মানুষকে রক্ষার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এই মানুষটি অন্যের সুখের জন্যে আত্মবলিদানে সব সময় প্রস্তুত ছিলেন — বুঝছেন? বইটি লেখা হয়েছে ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে, তবে যে যুগে এটা লেখা হয়েছে সে সময় এ না করে উপায় ছিল না। এ বই গুরুত্ব নিয়ে, মনোযোগ দিয়ে পড়া দরকার।'

'সে ভাবেই আমরা পড়ব,' ইলিয়া বলল।

মেয়েটি এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বলল। এতে ইলিয়া বিশেষ এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করল, সে হাসল। কিন্তু মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল:

'এটা আপনার ভালো লাগবে বলে আমার মনে হয় না।'

এই বলে সে চলে গেল। ইলিয়ার মনে হল 'আপনার' কথাটি যেন সে বিশেষ পরিষ্কার করে উচ্চারণ করল। এতে ইলিয়া মনে আঘাত পেল। গাভ্রিক বইয়ের ছবিগুলো দেখছিল, ইলিয়া তার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল:

'এখন পড়ার সময় নয়।'

'কিন্তু এখন ত কোন খদ্দের নেই,' গাভ্রিক বই বন্ধ না করেই আপত্তি তুলল। ইলিয়া তার দিকে তাকাল, কিন্তু আর কিছু বলল না। তার মনের মধ্যে বাজতে লাগল বই সম্পর্কে মেয়েটির কথাগুলো। আর মেয়েটি সম্পর্কে সে অসন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে ভাবল:

'কী আমার ম্যামসাহেব রে!'

সময় কাটতে লাগল। ইলিয়া কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত, গোঁফে তা দিতে দিতে দোকানদারী করত। কিন্তু তার মনে হতে লাগল দিনগুলো যেন ধীরে ধীরে চলছে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হত দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে কোথাও বেড়াতে চলে যায়, কিন্তু ও জানত যে এতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে, তাই যেত না। সন্ধেবেলায় বের হওয়াও সুবিধেজনক নয় — দোকানে একা থাকতে গাভ্রিকের ভয়, তা ছাড়া ওর হাতে দোকান ছেড়ে দেওয়াও বিপজ্জনক — ওর অসাবধানতায় দোকানে আগুন লেগে যেতে পারে কিংবা চোর-ডাকাত ঢুকতে পারে। ব্যবসা মন্দ চলছিল না। ইলিয়া এমনও চিন্তা করছিল যে হয়ত সাহায্যের জন্য কোন লোক বহাল করতে হবে। আভ্‌তনোমভার সঙ্গে তার যোগাযোগ আস্তে আস্তে আপনা-আপনিই ক্ষীণ হয়ে আসছিল, এ ব্যাপারে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নারও কোন আপত্তি ছিল

না বলেই মনে হয়। সে উল্লাসে চাপা হাসি হাসত আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোজকার জমা-খরচের হিসাব নিত। ইলিয়ার ঘরে বসে কাঠের ঘুঁটি খট্‌খট্‌ করে যখন সে হিসাব করত তখন এই মেয়েমানুষটি এবং তার পাখির ঠোঁটের মতো মুখ ইলিয়ার কাছে বিরক্তিকর ঠেকত। কখনও কখনও ইলিয়ার কাছে সে এসে হাজির হত হাসিখুশি ও ছটফটে ভাব নিয়ে, হাসি-ঠাট্টা করত এবং চঞ্চল চোখজোড়া নাচাতে নাচাতে ইলিয়াকে ভাগীদার বলে ডাকত। ইলিয়া আকৃষ্ট হত, যাকে সে মনে মনে কুৎসিত ব্যাপার বলত আবার তাতে জড়িয়ে পড়ত। কিরিক ঘুরতে ঘুরতে দোকানে আসত, কাউণ্টারের সামনের চেয়ারটাতে ধপ্‌ করে বসে পড়ত। তার উপস্থিতিতে দরজি-মেয়েরা দোকানে এলে সে তাদের সঙ্গে বাচলামি করত। এখন আর তার গায়ে পুলিশের পোশাক নেই, তার বদলে সে পরে রেশমের পোশাক। ব্যবসাদারের কাছে এখন যে চাকরি সে করছে তাই নিয়ে সে বড়াই করে।

'ষাট রুবল মাইনে, মুনাফা থাকে আরও ততটা — মন্দ নয়, তাই না? মুনাফার ব্যাপারে আমি সাবধানী, আইন মেনে চলি... আমরা ফ্ল্যাট বদল করেছি — শুনেছ? এখন আমাদের খাসা ফ্ল্যাট। এক রাঁধুনী রেখেছি — দা-রুণ রান্না করে মাইরি! শরৎকাল থেকে চেনা-জানা লোকজনকে বাড়িতে ডাকব, তাস খেলা যাবে। খাসা জমবে! আমোদ-ফুর্তি করে সময় কাটানো যাবে, তাসে জেতাও যেতে পারে। আমি আর আমার বৌ — দুজনে খেলি, দুজনের একজন সব সময়ই জেতেই! আর জেতার পয়সা থেকে অতিথি অভ্যর্থনার খরচা উঠে আসে — হো হো, কী মজা! একেই বলে নিখরচার সুন্দর জীবন!..'

সে ধেবড়ে চেয়ারের ওপর বসে থাকত, সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গলা নীচু করে বলে যেত:

'আরে ভাই এই কিছু দিন আগে গাঁয়ে গিয়েছিলুম — শুনেছ? তোমাকে তাহলে বলি — সেখানকার মেয়েরা — ওঃ কী যে বলব! বুঝলে কিনা — প্রকৃতির কন্যা যাকে বলে। কী আঁটসাঁট চেহারা, বুঝলে, শ্লা'র ছুঁচও গায়ে বসবে না। আর কী শস্তা মাইরি! এক বোতল মাল, এক পাউন্ড কেক — ব্যস্‌, মাগী — তোর!'

ইলিয়া কোন কথা না বলে শুনে যায়। কিরিকের জন্য তার কেন যেন করুণা হত, সে নিজেও অবশ্য ভেবে দেখে নি এই হোঁতকা চেহারার

সংকীর্ণমনা ছোকরাটার জন্য তার করুণা হওয়ার ঠিক কারণ কী। আবার সেই সঙ্গে আভ্‌তনোমভকে দেখে প্রায় সব সময় তার হাসতে ইচ্ছে করত। কিরিকের পল্লী অভিযানের এই সব গল্প সে বিশ্বাস করত না— তার মনে হত যে কিরিক চাল মারছে, অন্যের মুখে শোনা কথা বলছে। আর মেজাজ খারাপ থাকলে কিরিকের কথা শুনতে শুনতে সে ভাবত — 'ছোট মনের লোক!'

'তা ভাই মানতেই হবে প্রকৃতির কোলে — কাব্যি করে বলতে গেলে — শ্যামল ছায়াতলে, ফষ্টিনষ্টি করা — দারুণ ব্যাপার।'

'আর তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না যদি জানতে পারেন?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'সে এ ব্যাপার জানার জন্যে কোন আগ্রহ দেখাবে না রে ভাই,' চালবাজের ভঙ্গিতে চোখ টিপে কিরিক জবাব দেয়। সে জানে যে এটা তার জানার দরকার নেই! পুরুষমানুষ তার স্বভাবেই মোরগের মতো... তা ভাই, তুমি কোন বিবিজানের দিল-টিল চুরি করেছ?'

'সে পাপ করেছি বটে!' মৃদু হেসে ইলিয়া বলে।

'কে সে শুনি? — দরজি-মেয়ে, তাই না? সেই যার কালো চুল?'

'না, দরজি-মেয়ে নয়...'

'রাঁধুনী? রাঁধুনীও — ভালো, গরম গরম, রসাল...'

ইলিয়া পাগলের মতো হো হো করে হাসতে থাকে। তার এই হাসিতে রাঁধুনীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিরিকের আর কোন সন্দেহ রইল না।

'মাঝে মাঝে মুখ পাল্‌টাও, মাঝে মাঝেই পাল্‌টানো দরকার,' এ ব্যাপারে সে যেন একজন রসজ্ঞ — এমনি ভঙ্গিতে সে ইলিয়াকে উপদেশ দেয়।

'আচ্ছা, দরজি-মেয়ে বা রাঁধুনীই যে হবে এমন কেন ভাবছেন? আমি কি অন্য কারও যুগ্যি নই?' ইলিয়া হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

'সমাজে তোমার যে ঠাঁই তাতে ভাই ওরাই তোমার সবচেয়ে উপযুক্ত... ভদ্রঘরের মেয়ে-বৌদের সঙ্গে রোমান্স জমানোর উপায় যে তোমার নেই এটা ত মান?'

'তা কেন?'

'আরে এটা ত অমনিতেই বোঝা যায়... তোমার মনে ঘা দিতে চাই না, কিন্তু তুমি হলে গিয়ে বন্ধু, হাজার হোক একজন সাধারণ মানুষ, যাকে বলে চাষাভুষো...'

'আমি কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে...' বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে ইলিয়ার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

'ঠাট্টা হচ্ছে!' বলে কিরিকও হাসতে থাকে।

কিন্তু আভ্‌তনোমভ চলে যাওয়ার পর তার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে ইলিয়া অপমানের জ্বালা বোধ করল। এটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে কিরিক ছোকরা ভালো হলে হবে কি, সে নিজেকে ইলিয়ার সমস্তরের মনে করে না, ইলিয়ার চেয়ে ওপরে, তার চেয়ে উঁচুদরের এক বিশিষ্ট স্তরের মানুষ বলে নিজেকে ভাবে। অথচ সে আর তার বৌ কিন্তু ইলিয়ার কাছ থেকে বেশ সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে। পেরফিশ্‌কা ওকে জানাল যে পেত্রুখা তার ব্যবসা নিয়ে তামাসা করে, ওকে জোচ্চোর বলে... আর ইয়াকভ্ মুচিকে বলেছে যে ইলিয়া আগে এর চেয়ে ভালো ছিল, দরদী ছিল, এ রকম চালবাজ ছিল না। গাভ্রিকের বোনও তাকে সব সময় আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত যে সে তার সমস্তরের নয়। যার পরনের জামাকাপড় বলতে গেলে শতচ্ছিন্ন, সেই পোস্টম্যানের মেয়েটিও তার দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন ইলিয়ার সঙ্গে একই পৃথিবীতে থাকতে হচ্ছে বলে তার বড় রাগ। দোকান খোলার পর থেকে ইলিয়ার আত্মসচেতনতা বেড়ে গেল, আগের চেয়েও প্রখর হয়ে দাঁড়াল। এই কুরূপা অথচ বিশিষ্ট স্বভাবের মেয়েটির প্রতি তার আগ্রহ বেড়েই চলল। তার জানতে ইচ্ছে করত ওর মতো এই গরিবঘরের মেয়ের মধ্যে কোথা থেকে আসে এমন গর্ব যার সামনে ইলিয়া ক্রমেই বেশি করে ভীত হয়ে পড়ে? ইলিয়া যেটাতে আঘাত পেত তা হল এই যে মেয়েটি কখনও প্রথমে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইত না। অথচ ওর ভাই ইলিয়ার এখানে ফাই-ফরমাশ খাটার কাজ করছে, একমাত্র এই বিবেচনায়ই ত তার উচিত ভাইয়ের মনিব — তার সঙ্গে একটু মধুর আচরণ করা। এক দিন ইলিয়া তাকে বলল:

'আপনার ডন কুইক্সোট বইটা পড়ছি...'

'তা, কী রকম? ভালো লাগছে?' ইলিয়ার দিকে না তাকিয়েই সে জিজ্ঞেস করল।

'খুব ভালো লাগছে! হাসির... লোকটা অদ্ভুত ছিল বটে।'

ইলিয়ার মনে হল মেয়েটির অহঙ্কারী, কালো দুটি চোখের দৃষ্টি যেন ঘৃণায় তার মুখকে বিদ্ধ করল।

'এই ধরনের একটা কিছু বলবেন বলেই আমি ধারণা করেছিলাম,' ধীরে ধীরে এবং স্পষ্ট উচ্চারণ করে সে বলল।

এই কথাগুলোর মধ্যে ইলিয়া অপমানজনক, বিদ্বেষপূর্ণ কিছু একটা আঁচ করতে পারল।

'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ,' সে না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

মেয়েটি উত্তরে কিছু বলল না — ভাব করল যেন শুনতেই পায় নি।

যে মনোভাবটি আজ বহু দিন হল ইলিয়া দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিল তা যেন আবার নতুন করে তার ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল — মানুষের প্রতি বিদ্বেষে আবার তার মন ভরে গেল, সে ভালো করে, অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল ন্যায়বিচার সম্পর্কে, নিজের পাপ সম্পর্কে, ভাবতে লাগল সামনে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। তার জীবন কি চিরকাল এমনি ভাবেই চলবে নাকি? — সকাল থেকে সন্ধে অবধি দোকানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা, তারপর নিভৃতে নিজের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে সামোভারের ধারে বসা এবং নিদ্রা, তারপর ঘুম থেকে উঠে আবার সেই দোকানে? ওর জানা ছিল যে বহু ব্যবসাদার, হয়ত বা সব ব্যবসাদারই ঠিক এমনি ধারারই জীবন কাটায়। কিন্তু তার ভেতরের এবং বাইরের জীবনেও এমন বহু কারণ ছিল যাতে সে নিজেকে বিশেষ ধরনের মানুষ বলে, অন্যদের চেয়ে আলাদা বলে ভাবতে পারে। তার মনে পড়ে গেল ইয়াকভের কথাগুলো:

'ভগবান করুন, তোর যেন মঙ্গল না হয়। তুই লোভী।'

কথাগুলো তার মনে বড় আঘাত দেয়। না, সে লোভী নয় — সে স্রেফ পরিচ্ছন্ন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চায়, সে চায় লোকে যেন তাকে সম্মান করে, কেউ যেন পদে পদে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না বলে:

'আমি তোমার চেয়ে ওপরে ইলিয়া লুনিয়োভ, আমি তোমার চেয়ে উঁচুদরের...'

আবার সে ভাবতে লাগল — তার ভাগ্যে কী আছে? খুনের প্রতিফল তাকে পেতে হবে না কি না? মাঝে মাঝে তার মনে হত প্রতিফল যদি তার ভাগ্যে ঘটে তাহলে সেটা অন্যায় হবে। শহরে বহু খুনী, ভ্রষ্টাচারী আর চোর-ডাকাতের বাস; কে না জানে যে তারা নিজেদের ইচ্ছেয় খুনে, ভ্রষ্টাচারী

ও ঠক, অথচ তারা দিব্যি আছে, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে, আজ পর্যন্ত তাদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। ন্যায়বিচারের কথা উঠলে বলতে হয় মানুষের প্রতি যে কোন অপমানের প্রতিফল অপমানকারীকে পেতেই হবে। বাইবেলেও বলা হয়েছে: 'ঈশ্বর তাহাকেই উহা প্রত্যর্পণ করুন যাহাতে সে জ্ঞাত হয়'। এই ভাবনা তার হৃদয়ের পুরনো ক্ষতে জ্বালা ধরিয়ে দিত, নিজের জীবনের ভাঙ্গচুরের জন্য প্রতিহিংসার এক তীব্র বাসনা তার মনের মধ্যে জেগে উঠত। মাঝে মাঝে তার মাথায় খেলত দুঃসাহসী আরও কিছু করার— ইচ্ছে হত পেত্রুখা ফিলিমোনভের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর বাড়ি দাউদাউ করে জ্বললে লোকজন দৌড়ে এলে তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে:

'আগুন ধরিয়েছি আমি! আমিই খুন করেছি ব্যবসাদার পলুএক্‌তভকে!'

লোকে তাকে ধরবে, ওর বিচার হবে, ওর বাপকে যেমন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়েছে তেমনি ওকেও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হবে... ভাবতেই সে শিউরে ওঠে, তাই সে তার প্রতিহিংসার বাসনাকে সঙ্কুচিত করে যে পর্যায়ে নিয়ে আসত তা হল এই যে সে কিরিকের বৌয়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা তাকে বলবে, কিংবা তার বড়জোর ইচ্ছে হত বুড়ো খেত্রনভের কাছে যায় এবং মাশাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে তাকে প্রহার করে।

কখন কখন অন্ধকারে নিজের খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে সে গভীর নিঃশব্দতায় কান পেতে শুনত, তার মনে হত এই বুঝি তার চারধারে সব কিছু কেঁপে উঠবে, ধসে পড়বে, কোলাহল আর ঝনঝন আওয়াজ তুলে তুমুল ঘূর্ণিবায়ুতে ঘুরতে থাকবে। এই ঘূর্ণিবায়ু তার প্রবল শক্তিতে ইলিয়াকেও গাছের খসা পাতার মতো পাক খাওয়াবে, পাক খাওয়াবে আর তার সর্বনাশের কারণ হবে... অস্বাভাবিক কোন একটা কিছু আগে থেকে আন্দাজ করে ইলিয়া শিউরে ওঠে।

এক দিন সন্ধেবেলায় ইলিয়া সবে দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছে, এমন সময় পাভেল এসে হাজির। কোন রকম সম্ভাষণ না করে সে শান্ত গলায় বলল:

'ভেরা পালিয়েছে...'

সে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল, কাউন্টারের ওপর কনুই ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মৃদু শিস দিতে লাগল। তার মুখটা দেখাচ্ছিল পাথরের মতো

থমথমে, কিন্তু ছোট ছোট কয়েক গোছা কটা গোঁফ বেড়ালের গোঁফের মতো নড়াচড়া করছিল।

'একা, না কারও সঙ্গে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'জানি না... আজ তিন দিন হল নেই।'

ইলিয়া তার দিকে তাকাল, চুপ করে রইল। পাভেলের নির্বিকার মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর থেকে তার বোঝার জো রইল না বান্ধবীর পলায়নের ব্যাপারটি সে কী ভাবে নিয়েছে। তবে এই শান্ত ভাবের মধ্যে সে কী যেন এক অটল সংকল্পের আভাস পেল।

'এখন তুই কী করবি ভাবছিস?' পাভেলের আর কিছু বলার অভিপ্রায় নেই দেখে ও জিজ্ঞেস করল। পাভেল তখন শিস দেওয়া বন্ধ করে বন্ধুর দিকে না ফিরেই সংক্ষেপে জানাল:

'ছুরি মারব।'

'আবার সেই কথা!' সখেদে হাত নেড়ে ইলিয়া বলে উঠল।

'ওর জন্যে আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেছে,' অর্ধস্ফুট স্বরে পাভেল বলল। 'এই দ্যাখ ছুরি।'

পাভেল তার জামার ভেতর থেকে একটা রুটি-কাটার ছুরি টেনে বার করে নিজের মুখের সামনে ঘুরাল।

'ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব।'

ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে কাউণ্টারের ওপাশে ছুঁড়ে দিল, রেগে বলল:

'মশা মারতে কামান দাগা...'

পাভেল লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ইলিয়ার মুখোমুখি হল। তার চোখ দুটো প্রচণ্ড ক্রোধে ধকধক করে জ্বলছে, মুখের ভঙ্গি বিকৃত, গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল, অবজ্ঞাভরে বলল:

'তুই একটা বুদ্ধু।'

'তুই বড় চালাক ত!'

'জোর কি আর ছুরিতে? — জোর আমার হাতে।'

'তাই বল!'

'হাতও যদি খসে পড়ে যায়, তাহলে দাঁত দিয়ে ওর টুঁটি ছিঁড়ব।'

'ওঃ কী ভয়ংকর!'

'তুই আমাকে কিছু বলতে আসিস না ইলিয়া,' আবার শান্ত ও মৃদু স্বরে পাভেল বলল। 'তোর ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কর, ইচ্ছে হয় করিস না, কিন্তু তাই বলে আমাকে জ্বালাতন করবি না, ভাগ্য আমাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছে।'

'কী আজব ছেলে রে বাবা! — একবার ভেবে দেখ,' ইলিয়া নরম হয়ে ওকে বোঝানোর সুরে বলল।

'ভাবার আর কিছু বাকি রাখি নি... আমি বরং চলি। তোর সঙ্গে কথা বলে কী হবে? তোর পেট ভরা... তুই আমার বন্ধু নোস।'

'অ্যাই, তুই পাগলামি ছাড় দেখি!' ইলিয়া ওকে ধমক লাগাল।

'আমার পেট আর মন — দুই-ই উপোসী।'

'লোকের বিচার-বিবেচনা দেখে অবাক হতে হয়!' না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠাট্টা করে ইলিয়া বলল। 'লোকের কাছে মেয়েমানুষ — গোরু-ভেড়ার মতো, বলা যেতে পারে ঘোড়ার মতো! বয়ে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে? ঠিক আছে, চেষ্টা কর, মারধোর করব না। নিয়ে যেতে চাস না? মাথায় পড়ল দুম্‌দাম্‌! কিন্তু মেয়েমানুষও ত মানুষ রে বাবা! তারও নিজের চরিত্তির আছে...'

পাভেল ওর দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় হেসে উঠল।

'আমি তাহলে কী? আমি কি মানুষ নই?'

'সেই জন্যেই ত তোকে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে হবে — তাই না?'

'তোর ঐ যত সব ন্যায়-অন্যায় বিচারের মুখে ঝ্যাঁটা মারি!' পাভেল চেয়ার ছেড়ে এক লাফ মারল, ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'তুই তোর ন্যায় নিয়ে থাক — যার পেট ভরা তার আর এতে বাধা কী? ঠিক আছে, চললাম...'

দোকান ছেড়ে বের হওয়ার জন্য সে হনহন করে পা চালাল, দোরগোড়ায় এসে মাথা থেকে কেন যেন টুপিটা খুলল। ইলিয়াও কাউণ্টারের ওপাশ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিতে গেল, কিন্তু পাভেল ততক্ষণে রাস্তায় নেমে গেছে, টুপিটা হাতে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে নাড়াতে নাড়াতে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

'পাভেল!' ইলিয়া হাঁক দিল। 'দাঁড়া বলছি।'

পাভেল থামল না, এমন কি ফিরেও তাকাল না, একটা গলির মধ্যে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইলিয়া আস্তে আস্তে কাউণ্টারের ওপাশে গিয়ে

ঢুকল, সে টের পেল বন্ধুর কথায় তার মুখ এমন জ্বালা করছে যে মনে হচ্ছে বুঝি তাতানো উনুনের হল্‌কা তার চোখেমুখে এসে লেগেছে।

'কী বদরাগী!' গাভ্রিকের গলা শোনা গেল।

ইলিয়া মৃদু হাসল।

'কাকে ছুরি মারতে গেল?' কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে গাভ্রিক জিজ্ঞেস করল। তার হাত দুটো পেছনের দিকে ভাঁজ করা, মাথা ওপরের দিকে তোলা, তার এবড়োখেবড়ো মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

'নিজের বৌকে,' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ইলিয়া বলল।

গাভ্রিক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর যেন অনেক কষ্টে ভাবতে ভাবতে নীচু গলায় মনিবকে জানাল:

'আমাদের পাশের বাড়ির বৌ বড়দিনের সময় স্বামীকে, সেঁকোবিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে... লোকটা দরজি ছিল।'

'তা এ রকম হয়,' পাভেলের কথা ভাবতে ভাবতে ইলিয়া ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

'আর এই লোকটা? — ও কি সত্যি সত্যিই ছুরি মারবে নাকি?'

'আঃ, থাম গাভ্রিক।'

গাভ্রিক ঘুরে দাঁড়াল, দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করতে লাগল:

'অথচ বিয়ে করার বেলায় ঠিক আছে!'

রাস্তায় ইতিমধ্যে গোধূলির আলো-আঁধারি ছড়িয়ে পড়েছে, ইলিয়ার দোকানের উল্‌টো দিকের বাড়ির জানলায় বাতি জ্বলে উঠেছে।

'তালা লাগানোর সময় হয়ে এলো,' গাভ্রিক মৃদু স্বরে বলল।

ইলিয়া আলো ঝলমলে জানলাগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। জানলার নীচের দিক টবের ফুলে ঢাকা, ওপর থেকে ঝুলছে সাদা পর্দা। ফুলগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির ফ্রেম চোখে পড়ে। জানলাগুলো যখন খোলা থাকে তখন সেখান থেকে রাস্তায় উড়ে আসে গীটারের বাজনা, গান আর দরাজ হাসির আওয়াজ। বাড়িটাতে প্রায় রোজই সন্ধ্যায় গান, বাজনা ও হাসি-তামাসা চলত। ইলিয়া জানত যে বাড়িটাতে থাকেন সার্কিট কোর্টের জজসাহেব গ্রোমভ — লোকটি মোটাসোটা, তাঁর দুই গালে

রক্তিমাভা, মুখের ওপর শোভাবর্ধন করছে কালো রঙের বিরাট গোঁফজোড়া। গিন্নীটিও মোটাসোটা, তাঁর চুলের রঙ্ হালকা, চোখজোড়া নীল। মহিলা রাস্তায় চলেন ভারিক্কি চালে — ঠিক যেন রূপকথার রানী আর কথা বলার সময় কেবলই হাসতেন। এ ছাড়া ছিল গ্রোমভের এক বিবাহযোগ্যা বোন। মেয়েটি লম্বা, তার গায়ের রং তামাটে, চুল কালো। তার আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায় অল্পবয়সী সরকারী কর্মচারীর দল। ওরা সকলে প্রায় রোজই সন্ধ্যায় হাসাহাসি করে, গান গায়।

'সত্যি বলছি, তালা লাগানোর সময় হয়ে গেছে,' গাভ্রিক নাছোড়বান্দার মতো বলে উঠল।

'লাগা...'

ছেলেটি দরজা বন্ধ করে দিতে দোকানের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর লোহার তালায় ঘট্‌ঘট্ আওয়াজ উঠল।

'ঠিক যেন জেলখানা,' ইলিয়া মনে মনে ভাবল।

বন্ধু যে রকম মনে আঘাত দিয়ে ওকে শুনিয়ে দিল যে ওর পেট ভরা আছে তাতে বুকের ভেতরে যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। সামোভারের সামনে বসে বসে ও বিরূপ মন নিয়ে পাভেলের কথা ভাবতে লাগল, পাভেল ভেরাকে ছুরি মারতে পারে বলে তার বিশ্বাস হল না।

'খামকাই আমি ভেরার পক্ষ নিয়ে বলতে গেলাম... গোল্লায় যাক! কী করতে হবে নিজেরা জানে না, অন্যদের জ্বালাতে আসে।' — ইলিয়া ওর ওপর নির্দয় হয়ে ভাবল।

গাভ্রিক পেয়ালা থেকে হুস্‌হুস্ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, টেবিলের নীচে পা নাচাচ্ছিল।

'এতক্ষণে কি ছুরি মেরে দিয়েছে?' হঠাৎ সে মনিবকে প্রশ্ন করে বসল।

ইলিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল:

'তুই চা খা দেখি, খেয়ে ঘুমুতে যা।'

সামোভার সোঁসোঁ করতে লাগল, এমন গোঁগোঁ আওয়াজ তুলল যে মনে হচ্ছিল এই বুঝি টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়বে।

এমন সময় জানলার সামনে একটা আবছা মূর্তি দেখা দিল, ভয়ার্ত, কাঁপা কাঁপা স্বরে কে যেন জিজ্ঞেস করল:

'ইলিয়া ইয়াকভ্‌লেভিচ্ এখানে থাকে?'

'হ্যাঁ,' গাভ্রিক চেঁচিয়ে বলল। সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে নেমে এত দ্রুত সদর দরজার দিকে ছুটে গেল যে ইলিয়া কিছু বলারই অবকাশ পেল না।

দোরগোড়ায় এক পাতলা গড়নের নারীমূর্তি দেখা দিল, তার মাথায় রুমাল জড়ান। এক হাতে সে দরজার চৌকাট ঠেস দিয়ে ছিল, অন্য হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর ঝুলে পড়া মাথার রুমালের আঁচল হাতড়াচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে ছিল কাত হয়ে — ভাবটা এই যেন, এক্ষুনি চলে যাওয়ার জন্য তৈরি।

'আসুন,' ইলিয়া তার দিকে তাকিয়ে চিনতে না পেরে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল।

ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে নারীমূর্তি মাথা তুলল, তার বিবর্ণ, ছোট্ট মুখটি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'মাশা!' ইলিয়া লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল।

মাশা মৃদু হেসে উঠল, তার দিকে এগিয়ে গেল।

'চিনতে অবধি পার নি... পারেন নি,' ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মাশা বলল।

'হা ভগবান! চেনে সাধ্যি কার! তুই ত কী রকম...'

ইলিয়া অতিরিক্ত ভদ্রতা দেখিয়ে হাত ধরে ওকে টেবিলের কাছে নিয়ে এলো, ঝুঁকে পড়ে, উঁকি মেরে তার মুখ নিরীক্ষণ করে করেও বুঝে উঠতে পারল না কী করে বলে তার চেহারা কী রকম হয়েছে। মাশা দেখতে হয়েছে অসম্ভব রোগা, সে এমন ভাবে হাঁটছিল যেন তার হাঁটুজোড়া ভেঙ্গে পড়ছে।

'এ-ই, এ-ই তোর অবস্থা!' ওকে সাবধানে চেয়ারে বসাতে বসাতে ইলিয়া বিড়বিড় করে বলল, বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে ওর মুখ দেখতে লাগল।

'আমার কী অবস্থা করেছে দ্যাখ,' ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে মাশা বলল।

এখন ও আলোর মুখোমুখি বসতে ইলিয়া ওকে ভালো করে দেখতে পেল। মাশা সরু সরু হাত দুটো দুপাশে ঝুলিয়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসেছে, মাথাটা একপাশে কাত করে আছে, ঘনঘন নিশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আগাগোড়া সমান বুকটা ওঠানামা করছে। তাকে দেখাচ্ছিল কেমন যেন মাংসহীন, দেহ তার হাড্ডিসার। তার ছিটের জামা ভেদ করে স্পষ্ট ফুটে উঠছিল খটখটে কাঁধ, কনুই, হাঁটু, বিশীর্ণ মুখখানি দেখাচ্ছিল ভয়ংকর। নীল রঙের চামড়া তার মাথার দুপাশের রগ, গালের হাড় আর থুতনির ওপর টানটান হয়ে এঁটে আছে, মুখটা পীড়াদায়ক ভাবে আধখোলা, পাতলা

ঠোঁটজোড়ার ফাঁক দিয়ে দাঁতের পাটি বেরিয়ে আছে, ছোট্ট মুখ লম্বা ফালি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার ওপর জমে আছে একটা অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। চোখ দুটো ঘোলাটে, মড়ার মতো।

'তোর কি অসুখ-বিসুখ করেছিল?' ইলিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'ন্-না,' মাশা জবাব দিল। 'আমি রীতিমতো সুস্থ... আমার এ হাল করেছে ঐ লোকটা...'

তার টানাটানা, মৃদু কথাগুলো গোঙানির মতো শোনাল, দাঁত বার হয়ে থাকার ফলে তার মুখটা কেমন যেন মাছের চেহারার মতো দেখাল...

গাভ্রিক মাশার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল।

'যা, শুতে যা!' ইলিয়া ওকে বলল।

গাভ্রিক দোকানের ভেতরে চলে গেল, মিনিটখানেক সেখানে ওটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর আবার দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল।

মাশা নিথর হয়ে বসেছিল, কেবল তার চোখ দুটো কোটরের মধ্যে অতি কষ্টে নড়াচড়া করছিল, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দৃষ্টি তার ঘুরছিল। ইলিয়া ওর জন্য চা ঢালল, ওর দিকে তাকাল, কিন্তু বান্ধবীকে কী যে জিজ্ঞেস করবে বুঝে উঠতে পারল না।

'আমার ওপর অসহ্য অত্যাচার করছে,' মাশা কথা বলল। ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল, মুহূর্তের জন্য ও চোখ বুজল। চোখ খোলার পর চোখের পলকের নীচ থেকে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

'কাঁদিস না,' ইলিয়া ওর সামনে থেকে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল। 'তুই বরং চা খা, আমাকে সব ব্যাপারটা বল, মন হাল্‌কা লাগবে...'

'ভয় হচ্ছে, ও হয়ত এসে হাজির হবে,' মাথা নাড়িয়ে মাশা বলল।

'তুই কি ওর কাছ থেকে পালিয়েছিস?'

'হ্যাঁ... এই নিয়ে চার বার... যখন একেবারে অসহ্য হয়ে পড়ে তখন পালাই... গতবার আমি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে ধরে ফেলল, কী মার আর কী যন্ত্রণাই না দিল...'

আতঙ্কে তার চোখ বিস্ফারিত হল, চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'ও আমার পা কেবলই মুচড়ে দেয়...'

'ঈস!' ইলিয়া বলল। 'তুই কী রে? পুলিশে খবর দে — বল, তোর ওপর অত্যাচার করে! এর জন্যে জেল হয়...'

'হুঁ, ও নিজেই হাকিম,' হতাশ ভাবে বলল মাশা।

'খেরনভ্? ও আবার হাকিম কিসের? — কী যে বলিস?'

'ঠিকই বলছি! এই কিছু দিন আগে পরপর দুসপ্তাহ কোর্টে বসেছিল... একের পর এক মামলার বিচার করে... ওখান থেকে ফিরত অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, পেটে খিদে নিয়ে... একবার এসেই সামোভারের চিমটেয় আমার মাই চেপে ধরে, ধরে পাক দিতে থাকে, মোচড়াতে থাকে... এই দ্যাখ।'

সে কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে জামার বোতাম খুলে ছোট ছোট লোলচর্ম স্তনজোড়া ইলিয়াকে দেখাল — ওপরে ছেয়ে আছে কালো কালো দাগ, ঠিক যেন কেউ চিবিয়ে খেয়েছে।

'বোতাম লাগা,' ইলিয়া কঠিন স্বরে বলল। ক্ষতবিক্ষত দেহের এই করুণ দৃশ্য দেখতে তার খারাপ লাগছিল, বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে তার সামনে বসে আছে ছেলেবেলাকার বান্ধবী, সেদিনের সেই বড় ভালো মেয়ে মাশা। মাশা কিন্তু কাঁধের কাপড় আলগা করে একই রকম নির্বিকার কণ্ঠে বলল:

'আর কাঁধ দুটো মেরে মেরে কেমন থেঁতলে দিয়েছে! সমস্ত শরীরেরই এই অবস্থা, খিমচে খিমচে পেটের আর কিছু বাকি রাখে নি, বগলের তলার চুল টেনে টেনে উপড়ে ফেলেছে।'

'কিন্তু কেন?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'বলে, তুমি আমাকে ভালোবাস না? বলেই চিমটি কাটে...'

'হতে পারে ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে তোর সতীত্ব নষ্ট হয়?'

'এ সব কী বলছিস? থাকতাম ত তোর সঙ্গে আর ইয়াকভের সঙ্গে, কেউ আমাকে কখনও ছোঁয় নি... আর এখন আমার সে ক্ষমতাও নেই... ব্যথা করে, বিচ্ছিরি লাগে, সব সময় গা বমি বমি করে...'

'চুপ কর মাশা,' ইলিয়া মৃদু স্বরে অনুনয় করল।

ও চুপ করে গেল, বুক খোলা রেখে চেয়ারের ওপর বসে থাকতে থাকতে আবার নিথর হয়ে গেল।

সামোভারের ওপাশ থেকে ইলিয়া ওর শীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত শরীরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলল:

'বোতাম লাগা।'

'তোর সামনে আমার লজ্জার কিছু নেই,' কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে প্রায় অস্ফুট স্বরে সে উত্তর দিল।

ঘরে নিঃশব্দতা। তারপর দোকানের কুঠুরির ভেতর থেকে জোরে জোরে ফোঁপানির আওয়াজ ভেসে এলো। ইলিয়া উঠে দাঁড়াল, দরজার সামনে এগিয়ে গেল, দরজা ফাঁক করে কঠিন স্বরে বলল:

'থামলি গাভ্রিক!'

'ঐ ছেলেটা নাকি?' মাশা জিজ্ঞেস করল। 'কী হয়েছে ওর?'

'কাঁদছে।'

'ভয় পেয়েছে?'

'ন্-না... মনে হয় ওর মায়া লাগছে।'

'কার জন্যে?'

'তোর জন্যে...'

'যত সব...' মাশা নির্বিকার ভাবে বলল, তার নির্জীব মুখের ওপর কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তারপর সে চা পান করতে লাগল, ওর হাত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, দাঁতে পেয়ালা ঠেকার আওয়াজ উঠল। সামোভারের ওপাশ থেকে ইলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, বুঝতে পারছিল না মাশার জন্য ওর দুঃখ হচ্ছে না কি আদৌ হচ্ছে না।

'তুই কী করবি?' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইলিয়া ওকে জিজ্ঞেস করল।

'জানি না,' এই বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কী করা উচিত আমার?'

'নালিশ করা দরকার,' ইলিয়া জোর দিয়ে বলল।

'ঐ বৌটার সঙ্গেও এ রকম করত,' মাশা বলল। 'খাটের সঙ্গে বিনুনি বেঁধে রাখত, চিমটি দিত — এই একই রকম সব কিছু... এক দিন আমি ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ একটা ব্যথা টের পেলাম। ঘুম ভেঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। দেখি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আমার পেটের ওপর রেখেছে...'

ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ক্ষিপ্ত হয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল মাশা যেন কালই পুলিশের কাছে যায়, সেখানে গিয়ে ওর গায়ের কালসিটে দেখিয়ে যেন দাবি জানায় যে স্বামীর বিচার করা হোক। ইলিয়ার কথা শুনতে শুনতে মাশা উদ্বেগের সঙ্গে চেয়ারের ওপর উসখুস করতে লাগল, ভয়াত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল:

'দোহাই তোর, চেঁচামেচি থামা! লোকে শুনতে পাবে...'

ইলিয়ার কথা মাশার মনে কেবল ভীতি সঞ্চার করছিল। এটা ও বুঝতে পারল।

'ঠিক আছে,' আবার চেয়ারের ওপর বসে পড়ে ও বলল। 'আমি নিজেই এটা করব... রাতটা তুই আমার এখানে কাটা, মাশা। আমার খাটে শুয়ে পড়, আমি দোকানের কুঠুরিতে চলে যাচ্ছি।'

'শুতে পারলে হত... বড় ধকল গেছে...'

ইলিয়া চুপচাপ খাটের পাশ থেকে টেবিলটা সরিয়ে দিল। মাশা ধপ করে খাটের ওপর গড়িয়ে পড়ল, কম্বল গায়ে জড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু না পেরে মৃদু হেসে বলল:

'কী হাসির ব্যাপার বল ত? — একেবারে মাতালের মতো!'

ইলিয়া কম্বলটা ওর গায়ে ফেলে দিল, ওর মাথার নীচে বালিশ ঠিকঠাক করে দিয়ে দোকানঘরের ভেতরে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল; কিন্তু মাশা অস্থির হয়ে বলে উঠল:

'আমার কাছে একটু বস! একা থাকতে ভয় করে, চোখের সামনে কী যেন সব দেখতে পাই...'

ইলিয়া ওর পাশে চেয়ারের ওপর বসল, চূর্ণ কুন্তলে ছাওয়া ওর পাণ্ডুর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ওকে এ রকম অর্ধমৃত অবস্থায় দেখতে ইলিয়ার বিবেকে লাগছিল। ইয়াকভের অনুরোধ এবং মাশার জীবন সম্পর্কে মাতিৎসার বিবরণ মনে পড়তে তার মাথা হেঁট হয়ে এলো।

সামনের বাড়িতে দ্বৈতকণ্ঠের গান শোনা যাচ্ছে, খোলা জানলা দিয়ে গানের কলি ইলিয়ার ঘরে উড়ে আসছে। জোরাল খাদের গলা সোৎসাহে গেয়ে চলছিল:

মোহ যার ভঙ্গ হল হায়...

'আমি ঘুমিয়ে পড়ছি,' বিড়বিড় করে মাশা বলল। 'তোর এখানে বেশ... গায় রে... ওরা বেশ গায়।'

'হুঁ, তা গায়...' ইলিয়া ম্লান হাসি হেসে বলল। 'কারও দুর্দশার একশেষ, কেউ গান গায়...'

এ হৃ-দ-য় দিব কারে আ-র...

সহজ ও সাবলীল গতিতে চড়া সুর ওপরের দিকে উঠতে উঠতে রাতের নীরবতার মধ্যে বেজে চলল।

ইলিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল: এ গান তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হল, এতে তার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। জানলার পাল্লার খুট করে আওয়াজ হতে মাশা চমকে উঠল। সে চোখ খুলে ভয়ে মাথা একটুখানি উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কে?'

'আমি... জানলা বন্ধ করে দিলাম...'

'হা ভগবান! তুই চলে যাচ্ছিস নাকি?'

'না না, ঘাবড়াস নে...'

ও বালিশের ওপর মাথা এলিয়ে দিল, আবার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ইলিয়ার সামান্য নড়াচড়ার আওয়াজ, রাস্তায় লোকজনের পদশব্দ — সবই তাকে অস্থির করে তুলতে লাগল। সে তৎক্ষণাৎ চোখ মেলে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে:

'একটু সবুর কর... ও!.. একটু...'

ইলিয়া জানলাটা আবার খুলে দিয়েছিল। সে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করল, জানলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কী করে মাশাকে সাহায্য করা যায়। শেষে সে ভারাক্রান্ত মনে এই সিদ্ধান্ত নিল যে পুলিশ যতক্ষণ পর্যন্ত মামলায় হস্তক্ষেপ না করছে ততক্ষণ সে মাশাকে এখান থেকে ছাড়বে না।

'কিরিকের মাধ্যমে কাজ করতে হবে...'

'আবার হোক, আবার হোক!' গ্রোমভের বাড়ির জানলা দিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক চিৎকার বেরিয়ে এলো। কে যেন হাততালি দিল। মাশা কাতরে উঠল। গ্রোমভদের বাড়িতে আবার গান শুরু হল:

ভোর থেকে মোতা-য়েন আছে জু-ড়ি গা-ড়ি

ইলিয়া প্রায় মরিয়ার মতো মাথা ঝাঁকাল... এই গান, হৈ-হুল্লোড়, হাসিতামাসা ওর বিরক্তি ধরিয়ে দিল। জানলায় কনুই ঠেকিয়ে সে রাগে

গরগর করতে করতে উলটো দিকের আলো ঝলমলে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সে এমনও ভাবল যে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে ঐ জানলাগুলোর একটায় রাস্তার পাথর ছুঁড়তে পারলে বেশ হত। কিংবা যদি এই হুল্লোড়ে লোকগুলোর ওপর ছররা মারা যেত! ছররা ঠিক গিয়ে পেঁছুবে। ও কল্পনা করল ভীতসন্ত্রস্ত রক্তাক্ত মুখগুলো, আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্নাকাটি — ভেবে সে মনের মধ্যে একটা হিংস্র উল্লাস অনুভব করে হাসল। কিন্তু ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও গানের কথাগুলো কানে ঢুকতে লাগল, মনে মনে কথাগুলো আবৃত্তি করতে গিয়ে সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে এই আমুদে লোকেরা যে গান গাইছে তার বিষয়বস্তু হল কী করে এক বেশ্যাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। এতে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল, শুনতে শুনতে ভাবল:

'এমন গান ওরা গাইছে কেন? এ গানের মধ্যে আনন্দের কী আছে? আহাম্মকগুলোর মাথায় কী না খেলে! অথচ এখানে, তাদের ওখান থেকে মাত্র কয়েক পা দূরেই পড়ে আছে এক জলজ্যান্ত নির্যাতিত মানুষ... তার যন্ত্রণার কথা কারও জানা নেই...'

'বাহবা! বাহবা!' রাস্তায় আওয়াজ ভেসে এলো।

একবার মাশার দিকে, আরেকবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে ইলিয়া হাসল। এক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের মেয়ের শবসৎকারের ওপর গান গেয়ে লোকে যে আনন্দ করতে পারে এই ভেবে এখন তার হাসি পেল।

'ভাসিলি... ভাসিলিয়েভিচ...' মাশা বিড়বিড় করে উঠল।

তার সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে যাচ্ছে এই ভাবে সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল, কম্বলটা মেঝের ওপর ফেলে দিল, দুহাত একেবারে দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর মুখ আধখোলা, মুখ থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছিল। ইলিয়া তাড়াতাড়ি ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার ভয় হল মাশা বুঝি মারা যাচ্ছে। পরে ওর নিশ্বাস পড়ছে দেখে ইলিয়া আশ্বস্ত হল, ওর গায়ে কম্বল টেনে দিল, জানলার ওপরে উঠল এবং লোহার গরাদের ওপর মুখ চেপে গ্রোমভদের বাড়ির জানলা নিরীক্ষণ করতে লাগল। সেখানে তখনও গান চলছে — কখনও একক, কখনও দ্বৈতকণ্ঠে, কখনও বা কোরাস। বাজনা শোনা গেল, হাসির আওয়াজ উঠল। জানলায় এক এক ঝলক চোখে পড়ছিল সাদা, গোলাপী ও নীলরঙের পোশাক পরনে মেয়েদের চেহারা। ইলিয়া মনোযোগ

দিয়ে ওদের গান শুনে গেল, ভেবে কূল পেল না কী করে ভোল্‌গা, শবসৎকার ও অনাবাদী জমি নিয়ে ওরা এক টানা বিষণ্ণ সুরের গান গেয়ে যেতে পারে এবং প্রতিটি গানের পর যেন কিছুই হয় নি, যেন এ গান তারা গায়ই নি এমন ভঙ্গিতে হেসে উঠতে পারে... বিষাদের মধ্যে ওরা কী মজাটা পায় রে বাবা!

প্রত্যেকবারই মাশা যখন কোন না কোন ভাবে নিজের সম্পর্কে ইলিয়াকে সচেতন করে তুলছিল সেই মুহূর্তে সে মাশার দিকে তাকিয়ে ভাবে ওর কী হবে? হঠাৎ যদি তাতিয়ানা এসে ওকে দেখতে পায়? মাশাকে নিয়ে কী করা যায়? তার মনে হল কয়লার ধোঁয়ায় যেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুম পেয়ে যেতে সে জানলা থেকে নেমে এসে ওভারকোটটাকে মাথার নীচে দিয়ে খাটের পাশে মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সে স্বপ্ন দেখল যে মাশা একটা বড় চালাঘরের মধ্যে মাটির ওপর মরে পড়ে আছে, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সাদা, নীল আর গোলাপী রঙের পোশাক পরনে বড়ঘরের মেয়েরা, তারা ওর উদ্দেশে গান গাইছে। বিষাদের গান গাওয়ার সময় গানের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে তারা সবাই হোহো করে হাসছে আর আমুদে গান গাইতে গাইতে অঝোরে কাঁদছে, বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়াচ্ছে, সাদা রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছছে। চালাঘর অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, তার এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাভেল কামার গনগনে লোহার ওপর ঠাঁই ঠাঁই হাতুড়ির ঘা মেরে লোহার গরাদে বানাচ্ছে। চালাঘরের চালে কে যেন হাঁটছে আর হাঁক পাড়ছে:

'ই-লিয়া, ই-লিয়া!..'

কিন্তু ইলিয়াও সেই চালাঘরের মধ্যে পড়ে আছে, তার হাত-পা কী দিয়ে যেন শক্ত করে বাঁধা, তার পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভব নয়, সে কথাও বলতে পারছে না।

'ইলিয়া! দোহাই তোর, ওঠ...'

চোখ খুলতে ও পাভেলকে দেখতে পেল। চেয়ারে বসে বসে পাভেল ইলিয়ার পায়ে লাথি মারছিল। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ ঘরে এসে পড়েছে, তাতে টেবিলের ওপরে ফুটন্ত সামোভার ঝকঝক করছে। ধাঁধা লাগায় ইলিয়া চোখ কোঁচকাল।

'শোন, ইলিয়া!..'

বহুক্ষণের খোয়ারির পর যে দশা হয় পাভেলের গলা সে রকম ভাঙা ভাঙা, তার মুখ পাণ্ডুর, চুল আলুথালু। ইলিয়া তার দিকে চেয়ে মেঝে থেকে ধড়মড় করে উঠে পড়ল, অর্ধস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে বলল:

'কী ব্যাপার?'

'ধরা পড়েছে!..' মাথা ঝাঁকিয়ে পাভেল বলল।

'কী ব্যাপার? ও কোথায়?' পাভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধ চেপে ধরে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল। পাভেল প্রায় টলে পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে উচ্চারণ করল:

'ওর জ্-জেল হয়েছে...'

'কেন?' তার চাপা গলার আওয়াজটা একটু জোরই শোনা গেল।

মাশা জেগে উঠল, পাভেলকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানঘরের দরজার ওপাশ থেকে গাভ্রিক ব্যাপার-স্যাপার দেখছিল, বিরক্তির ভঙ্গিতে সে ঠোঁট বাঁকিয়ে ছিল।

'বলছে কোন ব্যবসাদারের নাকি মনিব্যাগ চুরি করেছে...'

ইলিয়া বন্ধুর কাঁধে ধাক্কা মেরে তাকে ঠেলে দিয়ে দূরে সরে গেল।

'পুলিশ কনস্টেবলের মুখে ঘুষি মেরেছে...'

'হুঁ তা ত ঠিকই,' ইলিয়া রূঢ় ভাবে হেসে বলল। 'জেলে যদি যেতে হয় তাহলে দুপায়ে যাওয়াই ভালো।'

ব্যাপারটা যে তাকে নিয়ে নয় এটা বুঝতে পেরে মাশা হাসল, মৃদু স্বরে বলল:

'আমাকে যদি জেলে পুরত...'

পাভেল ওর দিকে তাকাল, তারপর ইলিয়ার দিকে।

'চিনতে পারলি না?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল। 'মাশা, পেরফিশ্‌কার মেয়ে রে, মনে আছে?'

'অ,' পাভেল নির্বিকার সুরে টেনে বলল, মুখ ঘুরিয়ে নিল যদিও মাশা ওকে চিনতে পেরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

'ইলিয়া!' বিষণ্ণ হয়ে পাভেল বলল। 'আচ্ছা ধর ও যদি এ কাজটা আমার জন্যে করে থাকে?'

ইলিয়ার তখনও হাত মুখ ধোয়া হয় নি, তার চুল অগোছাল হয়ে আছে। খাটের ওপর, মাশার পায়ের কাছে বসে পড়ে একবার মাশার দিকে আরেকবার

পাভেলের দিকে তাকাতে তাকাতে তার মনের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে ধীরে ধীরে বলল:

'আমি জানতাম, এ ঘটনার পরিণতি ভালো হবে না।'

'আমার কথা শুনল না,' আহত স্বরে পাভেল বলল।

'কী কথা!' ইলিয়া ব্যঙ্গ করে বলল। 'তোর কথা না শোনার ফলেই বুঝি এত কান্ডকারখানা? তুই ওকে কী বলতে পেরেছিস শুনি?'

'আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম...'

'তোর ঐ ভালোবাসা ধুয়ে কি ও জল খাবে?'

ইলিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। এই সব ঘটনা — পাভেল ও মাশার ঘটনা তার মনের মধ্যে প্রচন্ড ক্রোধ জাগিয়ে তুলল। এই অনুভূতি কোন দিকে চালনা করবে বুঝে উঠতে না পেরে সে বন্ধুর ওপরও ঝাল ঝাড়তে লাগল...

'ভদ্রভাবে বাঁচতে, আমোদ-আহ্লাদ করতে কার না সাধ হয়?.. ওরও সেই সাধ ছিল। আর তুই ওকে কেবল বলে এসেছিস: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি! ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমার সঙ্গে থাক আর সব রকম অভাব-অনটন মুখ বুজে সহ্য কর...' ভাবছিস, যা করেছিস ঠিকই করেছিস?'

'আমার কী করা উচিত তাহলে?' পাভেল সংক্ষেপে ও শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল।

এই প্রশ্নে ইলিয়ার রাগ কিছুটা জুড়িয়ে গেল। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাবতে বসল।

দোকানঘর থেকে গাভ্রিক উঁকি মারল।

'দোকান খুলব?'

'চুলোয় যাক তোর দোকান!' বিরক্ত হয়ে ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'এ-ই কি দোকানদারী করার সময়?'

'তোকে জ্বালাতন করছি?' পাভেল বলল।

হাঁটুর ওপর কনুই রেখে কুঁজো হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে পাভেল চেয়ারের ওপর বসে ছিল। ওর মাথার দুপাশের রগ রক্তের চাপে দপদপ করছিল।

'তুই?' ইলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে বলল। 'তুই আমাকে জ্বালাতন করছিস না, মাশাও না... এখানে এমন একটা ব্যাপার আছে যা আমাদের

সকলকে জ্বালাতন করছে... তোকে, আমাকে, মাশাকে... বোকামি না আরও কিছু — জানি না, কেবল একটি জিনিসই দেখছি যে মানুষের মতো বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই! কোন শোক, কোন কদর্যতা... পাপ, কোন রকমের বজ্জাতি দেখতে আমার প্রবৃত্তি হয় না! অথচ নিজে আমি...'

ও চুপ করে গেল, ওর মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তোর খালি নিজের কথা,' পাভেল মন্তব্য করল।

'আর তুই? তুই কার কথা বলছিস?' ইলিয়া বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল। 'সব মানুষই নিজের ঘায়ে পাগল, নিজের গলায় কাতরায়... আমি নিজের কথা বলছি না — বলছি সব্বার কথা, কেননা সবাই আমাকেই অস্থির করে তোলে।'

'আমি চললাম,' অতি কষ্টে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাভেল বলল।

'এঃ তুই কী রে!' ইলিয়া হাঁক দিল। 'বোঝার চেষ্টা কর, মনে কিছু করিস না...'

'আমার মাথাটা যেন কেউ থান ইট মেরে থেঁতলে দিয়েছে ভাই... ভেরার জন্যে দুঃখ হচ্ছে... কী করা যায়?'

'কিছুই করার নেই!' ইলিয়া দৃঢ় ভাবে বলল। 'ওকে খরচার খাতায় লিখে রাখ! ওর শাস্তি হবে...'

পাভেল আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

'আর আমি যদি বলি যে ও আমার জন্যে এ কাজ করেছে?' পাভেল জিজ্ঞেস করল।

'তুই কি নবাবপুত্তুর নাকি? বলেই দ্যাখ না, তোকেও জেলে পুরবে... আমাদের একটু গোছগাছ করা দরকার। মাশা, আমরা দোকানঘরে যাচ্ছি, তুই উঠে ঘরটা সাফ-টাফ কর, আমাদের চা দে...'

মাশা চমকে উঠল, বালিশ থেকে মাথা একটু তুলে ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল:

'বাড়ি যাব নাকি?..'

'বাড়ি তাকেই বলে যেখানে অন্তত অত্যাচার নেই...'

ওরা দোকানে ঢুকলে পাভেল মুখ বেজার করে জিজ্ঞেস করল:

'ও তোর এখানে কেন? প্রায় ত মরতে বসেছে...'

ইলিয়া সংক্ষেপে ওকে গোটা ব্যাপারটা বলল। সে অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে মাশার কাহিনী পাভেলকে যেন কেমন চঞ্চল করে তুলল।

'ওঃ শয়তানের ধাড়ি!' পাভেল গালাগাল দিল, হাসল পর্যন্ত।

ইলিয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দোকান নিরীক্ষণ করছিল, সে বলল:

'কিছু দিন আগে তুই বলেছিলি এ সবে আমি শান্তি পাব না...'

সে দোকানের দিকে হাত ছড়িয়ে ইসারা করে দেখাল তারপর কাষ্ঠহাসি হেসে মাথা নাড়ল।

'ঠিকই বলেছিস! আমার শান্তি নেই... এই যে ঠায় দাঁড়িয়ে দোকানদারী করি এতে আমার লাভটা কী? আমার স্বাধীনতা গেছে। কোথাও বেরোবার উপায় নেই। আগে রাস্তায় রাস্তায় যেখানে খুশি ঘুরতাম... ভালো কোন আরামের জায়গা খুঁজে পেলে বসে যাও, উপভোগ কর... আর এখন দিনের পর দিন এখানে মোতায়েন থাকতে হয় — আর কিছু করার নেই...'

'আহা, ভেরা থাকলে তোর ভালো দোকান-কর্মচারী হতে পারত,' পাভেল বলল।

ইলিয়া ওর দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

'এসো!' মাশা ওদের ডাক দিল।

চা পান করতে করতে ওদের তিন জনের মধ্যে প্রায় কোন কথাই হল না। রাস্তায় সূর্যের আলো পড়েছে, ফুটপাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খালি পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ উঠছে, জানলার পাশ দিয়ে শাকসব্জিওয়ালারা যাচ্ছে।

সবই বসন্তের পরিচয় বহন করছিল, বহন করছিল ঈষদুষ্ণ, পরিষ্কার, সুন্দর দিনের পরিচয়, এদিকে চাপা ঘরটাতে পাওয়া যাচ্ছিল স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল হতাশ সুরের চাপা কথাবার্তা, সামোভার সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলছিল, সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল...

'এ যেন শ্রাদ্ধের আসরে বসে আছি,' ইলিয়া বলল।

'ভেরার শ্রাদ্ধ,' পাভেল যোগ করল। 'বসে বসে ভাবি: আমিই বোধহয় ভেরাকে জেলে ঠেলে দিলাম।'

'এটা খুবই সম্ভব,' কোন রকম করুণা না দেখিয়ে ইলিয়া জোর দিয়ে বলল।

পাভেল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল।

'তুই বড় নিষ্ঠুর...'

'দয়া-মায়া আমার থাকতে যাবে কেন শুনি?' ইলিয়া চিৎকার করে বলল। 'আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে কে কবে আদর করেছে?.. হয়ত একজন কেউ ছিল যে আমাকে ভালোবাসত... সেও আবার এক নষ্ট মেয়েমানুষ!'

প্রচণ্ড তিক্ততার জোয়ারে তার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল, চোখে খেলে গেল রক্ত; ক্রোধে ফেটে পড়ে, চিৎকার-চেঁচামেচি, গালিগালাজ এবং টেবিল ও দেয়ালের ওপর ঘুষি মারার প্রবৃত্তিবশে সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

এদিকে মাশা ভয় পেয়ে জোরে, করুণ স্বরে শিশুর মতো কেঁদে উঠল।

'আমি চলে যাব, আমাকে ছেড়ে দাও,' চোখের জল ফেলতে ফেলতে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল এবং মাথা এমন ভাবে ঝাঁকাতে লাগল যেন তা কোথাও লুকানোর চেষ্টা করছে।

ইলিয়া চুপ করে গেল। সে লক্ষ্য করল যে পাভেলও তার হাবভাব খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না।

'কাঁদার আবার কী আছে?' ইলিয়া রেগে গিয়ে বলল। 'আমি ত আর তোর ওপর চেঁচামেচি করছি না... তোর যাওয়ার কোন জায়গাও নেই... আমি এখন যাচ্ছি... আমার দরকার আছে... পাভেল তোর সঙ্গে থাকবে... গাভ্রিক, তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না এলে... আবার কে এলো?'

উঠোনের দিক থেকে দরজায় টোকা পড়ল। গাভ্রিক প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকাল।

'খোল!' ইলিয়া বলল।

দোরগোড়ায় দেখা গেল গাভ্রিকের বোনকে। তার খাড়া মূর্তিটি কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়াল, মাথাটা অনেকখানি তুলে পেছনের দিকে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে সে সকলকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপর তার সৌন্দর্যবর্জিত লালিত্যহীন চেহারায় ফুটে উঠল ঘৃণার ভাব। ইলিয়া আগেই মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়েছে কিন্তু তার উত্তরে পাল্টা অভিবাদন না করে সে ভাইকে বলল:

'গাভ্রিক, এক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে আমার কাছে আয়...'

ইলিয়া জ্বলে উঠল। অপমানে তার মুখের ওপর এমন রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল যে তার চোখে উত্তেজনা দেখা দিল।

'কেউ নমস্কার জানালে পাল্টা নমস্কার করতে হয় ঠাকরুন,' নিজেকে সংযত করে নিয়ে গম্ভীর ভাবে সে বলল।

মেয়েটি মাথা আরও উঁচু করল, তার ভুরুজোড়া এক জায়গায় এসে মিলল। ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে সে ইলিয়ার ওপর নজর বুলিয়ে নিল, একটি কথাও বলল না। গাভ্রিকও রাগে চোখ পাকিয়ে মনিবের দিকে তাকাল।

'আপনি মাতালের আড্ডায় আসেন নি, গুণ্ডা-বদমাশের ডেরায়ও আসেন নি,' উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ইলিয়া বলে চলল, 'আপনাকে সম্মান দেখানো হয়েছে... ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়ের মতো আপনারও উচিত সম্মান দেখানো...'

'অমন নাক উঁচু করিস নে সোনিয়া,' গাভ্রিক হঠাৎ আপোসের সুরে বলল, সে বোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে পাশে দাঁড়াল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো। ইলিয়া ও মেয়েটির মধ্যে যুদ্ধং দেহি দৃষ্টি বিনিময় হল, ওরা দুজনেই যেন কিসের অপেক্ষা করতে লাগল। মাশা আস্তে আস্তে এক কোণে সরে গেল। পাভেল বোকার মতো চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'কী হল, বলই না রে সোনিয়া,' গাভ্রিক অধীর হয়ে বলল। 'তুই কি ভাবছিস ওঁরা তোকে অপমান করতে চান?' ও জিজ্ঞেস করল। তারপর আচমকা হেসে যোগ করল, 'ওঁরা অদ্ভুত ধরনের লোক!'

বোন ওর হাত ধরে ঝটকা মারল, শুকনো গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠে ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল:

'কী চান আমার কাছ থেকে, বলুন ত?'

'কিছুই নয়, কেবল...'

কিন্তু তক্ষুনি তার মাথায় একটা ভালো, চমৎকার মতলব খেলে গেল। সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে এসে যতদূর সম্ভব ভদ্র ভাবে বলতে লাগল:

'যদি অনুমতি হয় ত বলি... দেখছেন, আমরা এখানে তিনজন — অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোকজন; আপনি শিক্ষিত লোক।'

ইলিয়া তার মনের ভাব তাড়াহুড়ো করে বলতে গেল, কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারল না। মেয়েটির চোখের সরাসরি, কঠোর দৃষ্টি তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলল — তা যেন ইলিয়াকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল।

ইলিয়া চোখ নামিয়ে ফেলে বিমূঢ় হয়ে সখেদে বিড়বিড় করে বলল:

'চট করে কথাটা বলার মতো সাধ্যি আমার নেই... আপনার যদি সময় থাকে তাহলে... ভেতরে এসে একটু বসুন...'

এই বলে সে পাশে সরে গেল।

'গাভ্রিক, এখানে একটু অপেক্ষা কর,' এই বলে ভাইকে দরজার সামনে রেখে মেয়েটি ঘরে ঢুকল। ইলিয়া তার দিকে টুল ঠেলে দিল। সে বসল। পাভেল দোকানে চলে গেল, মাশা ভয় পেয়ে এক কোণে চুল্লীর পাশে গিয়ে সেঁধোল। ইলিয়া গাভ্রিকের বোনের কাছ থেকে দুপা দূরত্বের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কথাটা তখনও সে শুরু করতে পারছে না।

'কী, বলুন?' সে বলল।

'ব্যাপারটা হল গিয়ে...' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিয়া বলতে শুরু করল। 'দেখতে পাচ্ছেন — এই মেয়েটি — মানে বিবাহিতা মেয়ে আর কি... এক বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়... লোকটা বদের একশেষ... সর্বাঙ্গে আঘাত আর আঁচড় কামড় খেয়ে ও আমার কাছে পালিয়ে এসেছে... আপনি হয়ত খারাপ কিছু সন্দেহ করছেন। সে রকম কোন ব্যাপারই নেই...'

মাশার ঘটনা বলার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনা সম্পর্কে নিজের মতামত মেয়েটির সামনে তুলে ধরার আগ্রহের ফলে সে এমনই দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যে তার কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল, বক্তব্য স্পষ্ট হল না। বিশেষ করে এ ব্যাপারে নিজের ভাবনা-চিন্তাই মেয়েটাকে জানানোর আগ্রহ তার ছিল। মেয়েটি তার দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টি আগের চেয়ে কোমল হয়ে এসেছে।

'বুঝতে পারছি,' কথার মাঝখানে ইলিয়াকে থামিয়ে দিয়ে ও বলল। 'কী করা উচিত বুঝতে পারছেন না — এই ত? প্রথমেই উচিত ডাক্তার দেখানো... ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করে দেখুন... আমার জানা-শোনা ডাক্তার আছে — চান ত আমি ওকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। গাভ্রিক, কটা বাজে দ্যাখ দেখি? দশটা বেজে গেছে? ভালো, এই সময়ই ডাক্তার রুগী দেখেন... গাভ্রিক, একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আন ত... আপনি ওর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিন...'

ইলিয়া কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না। গম্ভীর ও কড়া স্বভাবের এই মেয়েটি যে এমন কোমল স্বরে কথা বলতে পারে তা ইলিয়ার ধারণাতীত ছিল।

তার মুখ দেখেও ইলিয়া অবাক — যে মুখে চিরকাল দেখা যেত অহঙ্কারের ভাব আজ সেখানে পড়েছে উদ্বেগের ছাপ, নাসারন্ধ্র আগের চেয়ে চওড়া হয়ে ফুলে উঠলেও মুখের ওপর এমন একটা ভালোমানুষী ও সারল্যের ভাব ছিল যা সে আগে কখনও দেখে নি। মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে ইলিয়া কোন কথা না বলে বিমূঢ় ভাবে হাসতে লাগল।

মেয়েটি ততক্ষণে ইলিয়ার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মাশার দিকে এগিয়ে এসেছে, মৃদু স্বরে মাশার উদ্দেশে সে বলল:

'লক্ষ্মীটি, কাঁদে না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই... ডাক্তারবাবু বড় ভালোমানুষ, উনি আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবেন, উনি আপনাকে একটা কাগজ লিখে দেবেন... ব্যস! আমি আপনাকে আবার এখানে নিয়ে আসব... লক্ষ্মী আমার, কাঁদতে হয় না...'

মাশার কাঁধের ওপর সে হাত রাখল, ওকে নিজের কাছে টেনে আনতে গেল।

'উ... লাগে,' অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল মাশা।

'ওখানে আপনার কী হয়েছে?'

ইলিয়া ওর কথা শুনছিল আর কেবলই হাসছিল।

'কী জানি বাপু কী ব্যাপার!' মাশার কাছ থেকে সরে গিয়ে হতভম্ব হয়ে মেয়েটি বলল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক ও ধিক্কার।

'কী ভাবে যে মেরেছে... ওঃ!'

'এই হচ্ছে আমাদের জীবন!' আবার জ্বলে উঠে ইলিয়া বলল। 'দেখলেন ত? চান ত আরও একজনকে দেখাতে পারি — এই যে দাঁড়িয়ে আছে! অনুমতি হয় ত আলাপ করিয়ে দিই: আমার বন্ধু পাভেল সাভেলিয়েভিচ্ গ্রাচোভ্...'

পাভেল মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

'সোফিয়া নিকোনোভ্না মেদ্ভেদেভা,' পাভেলের হতাশাজর্জর মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে বলল। তারপর ইলিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আর আপনার নাম হল ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্ — তাই ত?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন,' ইলিয়া উৎসাহিত হয়ে বলল। সে শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল, হাত না ছেড়েই বলে চলল, 'যা বলছিলাম... আপনি

যখন এ রকমই মানুষ, মানে, একটা কাজের ভার যখন নিয়েছেন তখন অন্য ব্যাপারেও নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে নেবেন না! এখানেও গেরো আছে।'

সে মনোযোগ দিয়ে, ভালো করে ইলিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ সুন্দর মুখটি দেখতে লাগল, ধীরে ধীরে তার আঙ্গুল থেকে নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ও সেই ভাবেই উত্তেজিত হয়ে নিবিষ্ট মনে ভেরার কথা, পাভেলের কথা তাকে বলে যেতে লাগল। এমনকি জোরে তার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'কবিতা লিখত, আর সে কী কবিতা! কিন্তু এ ব্যাপারে বিলকুল ফেঁসে গেল... মেয়েটিও... আপনি কি মনে করেন সে... ইয়ে... বলে সেটাই সব? না, তা ভাবা ঠিক নয়! মানুষ কখনই পুরোপুরি ভালো নয় আবার পুরোপুরি খারাপও নয়!'

'তার মানে?' বুঝতে না পেরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'মানে এই যে কোন মানুষ যদি খারাপও হয় তার মধ্যে কিছু ভালো অন্তত আছে আর যদি ভালো হয় তার মধ্যে খারাপও কিছু আছে... আমাদের সকলেরই মন বিচিত্র... সব্বার।'

'কথাটা আপনি বেশ বলেছেন!' ভারিক্কি চালে সায় দিয়ে মাথা নেড়ে সে বলল। 'তা, কিছু যদি মনে না করেন ত হাতটা ছাড়ুন এবার — লাগে!'

ইলিয়া ক্ষমা চাইতে লাগল। কিন্তু ইলিয়ার কথা ওর কানেই গেল না, সে জোর দিয়ে পাভেলকে বোঝাতে লাগল:

'লজ্জার কথা, এ রকম করা ঠিক নয়! কিছু একটা করা দরকার! ওর পক্ষ সমর্থনের জন্যে উকিল খুঁজে বার করা দরকার, বুঝেছেন? শুনছেন, আমি আপনাকে যোগাড় করে দেব। ও নির্দোষ প্রমাণ হবে, ছাড়া পেয়ে যাবে... কথা দিচ্ছি আপনাকে!'

ওর মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল, চুল আলুথালু হয়ে দুপাশের রগের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলতে লাগল।

মাশা তার পাশে দাঁড়িয়ে শিশুর আশ্বস্ত কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এদিকে ইলিয়া তার ঘরে এই মেয়েটির উপস্থিতির জন্য এক রকম গর্বের অনুভূতি নিয়ে ভারিক্কি চালে, বিজয়ীর ভঙ্গিতে একবার মাশার দিকে আরেকবার পাভেলের দিকে তাকাতে লাগল।

'আপনি যদি সত্যি সত্যি সাহায্য করতে পারেন তাহলে করুন,' পাভেলের গলা কেঁপে উঠল।

'সাতটার সময় আমার কাছে আসুন, ঠিক আছে? গাভ্রিক বলবে, কোথায়...'

'আসব... কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই আমার...'

'ও সব রাখুন। মানুষের উচিত একে অন্যকে সাহায্য করা।'

'তবেই হয়েছে আর কি!' ইলিয়া বিদ্রূপের সুরে চেঁচিয়ে বলল।

মেয়েটি চট্ করে ইলিয়ার দিকে মুখ ফেরাল। এই গোলমালের মধ্যে, গাভ্রিকই বোধহয় একমাত্র পাকা ও সুস্থবুদ্ধির মানুষ বলে নিজেকে অনুভব করছিল — সে তার বোনের হাত ধরে টান দিল, বলল:

'তুই যা দেখি!'

'মাশা, জামাকাপড় পরে নিন!'

'পরার মতন কিছু আমার নেই,' সলজ্জ ভাবে মাশা জানাল।

'ও... তা যাক গে! চলে আসুন!.. আপনি আসছেন ত গ্রাচোভ? চলি তাহলে ইলিয়া ইয়াকভ্লেভিচ্!'

বন্ধুরা সম্মান দেখিয়ে চুপচাপ ওর সঙ্গে করমর্দন করল। ও মাশাকে হাত ধরে নিয়ে চলল। দরজার কাছে এসে আবার ঘুরে দাঁড়াল, মাথা উঁচু করে তুলে ইলিয়াকে বলল:

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম... আপনাকে তখন নমস্কার জানাই নি... কাজটা যা-তা করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন, শুনছেন?'

তার মুখে রক্তিমাভা ফুটে উঠল, অপ্রতিভ হয়ে সে চোখ নামাল। তার দিকে তাকাতে ইলিয়ার হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠল।

'ক্ষমা করবেন... আমি ভেবেছিলাম আপনাদের এখানে... মদ খেয়ে ঢলাঢলি চলছে...'

বলতে বলতে সে থেমে গেল, যেন অপ্রীতিকর কোন শব্দ গিলে ফেলল।

'আর আপনি যখন আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বললেন তখন আমি ভাবলাম আমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন... আমার ভুল হয়েছিল! এখন খুব ভালো লাগছে! আপনি মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ থেকে কথাগুলো বলেছেন।'

হঠাৎই যেন সুন্দর, উজ্জ্বল হাসিতে তার চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সময় যেন উপভোগ করতে করতে পরম পরিতৃপ্তিতে, আন্তরিকতার সঙ্গে সে বলল:

'আমার বড় আনন্দ হচ্ছে যে সব ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। এমন ভালো ভাবে... ভীষণ ভালো ভাবে!'

বলেই সে যেন প্রভাত সূর্যের কিরণে ঝলমলে ছোট একখন্ড ছাইরঙা মেঘের মতো হাসতে হাসতে মিলিয়ে গেল। দুই বন্ধু তার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের দুজনেরই মুখে আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য, হাস্যকরও বটে। পরে ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পাভেলকে ঠেলা দিয়ে ইলিয়া বলল:

'সাচ্চা?'

পাভেল মৃদু হেসে উঠল।

'হ্যাঁ... মানুষ বটে!' আরামের নিশ্বাস ফেলে ইলিয়া বলে চলল, 'কী দারুণ... তাই না?'

'বাতাসের মতো এসে সব কিছু উড়িয়ে দিল!..'

'দেখলি ত?' বিশেষ ভঙ্গিতে বিলি কেটে নিজের কোঁকড়া চুল ফুলিয়ে তুলতে তুলতে জাঁক করে ইলিয়া বলল। 'কেমন ক্ষমা চাইল বল? একেই বলে সত্যিকারের শিক্ষিত লোক — সকলকেই শ্রদ্ধা করতে পারে... কিন্তু নিজে প্রথম কারও কাছে মাথা নোয়াবে না! বুঝলি কি না?'

'চমৎকার মহিলা,' পাভেল হাসতে হাসতে বলল।

'তারার মতো ঝলক দিয়ে গেল!'

'যা বলেছিস। আর সঙ্গে সঙ্গে সব গোছগাছ করে দিয়ে গেল — কাকে কোথায়, কী করতে হবে...'

ইলিয়া উৎসাহভরে হাসল। তার আনন্দ লাগছিল এই ভেবে যে অহঙ্কারী মেয়েটি আসলে একেবারেই সাধারণ, ছটফটে স্বভাবের; সে যে ওর সামনে আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে একথা মনে করে সে তৃপ্তি পেল।

গাভ্রিক ওদের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল, তার বেজার লাগছিল।

'গাভ্রিক,' ওর কাঁধ ধরে ইলিয়া বলল, 'তোর বোনটি চমৎকার!'

'ওর মনটা ভালো!' গাভ্রিক প্রসন্ন হয়ে বলল। 'আজ কি দোকান খোলা হবে? না কি ছুটি করে দেবেন... আমি তাহলে মাঠে চলে যেতাম!'

'না, আজ আর দোকানদারী নয়! পাভেল, আয় ভাই, আমরাও বেড়াতে যাই!'

'আমি থানায় যাব,' পাভেল আবার ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাই কি না দেখি...'

'আমি তাহলে বেড়াতে চললাম!'

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে ধীরেসুস্থে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল মেয়েটির কথা আর আজ পর্যন্ত যে সব লোককে সে দেখেছে তাদের কথা। তার মনের মধ্যে বাজতে লাগল ক্ষমা চাওয়ার সময় ওর কথাগুলো, সে মনে মনে কল্পনা করল ওর সেই মুখ যার রেখায় ফুটে উঠেছে কোন কিছুর প্রতি অদম্য প্রয়াস...

'কিন্তু প্রথমে ত ও আমাকে গ্রাহ্যই করত না — তা-ই বা কেন?' — মনে হতে ইলিয়ার হাসি পেল এবং সে গভীর ভাবে ভাবতে লাগল কেন তাকে না জেনে, তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কোন কথা না বলে ও তার সামনে এত গর্ব দেখিয়েছিল, তার ওপর এমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল?

ইলিয়ার চারপাশে জীবনের গুঞ্জন। হাসি তামাসা করতে করতে যাচ্ছে স্কুলের ছাত্রদল, মালপত্র বোঝাই গাড়ি চলেছে, ঘর্ঘর শব্দে চলেছে ঘোড়ার গাড়ি, বাঁধানো ফুটপাতের ওপর কাঠের পায়ের ভয়ংকর খটখট আওয়াজ তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে ভিখিরি। সশস্ত্র সৈন্যের পাহারায় দুই কয়েদী বাঁকে করে টবে কী যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, একটা ছোট্ট কুকুর জিভ বার করে অলসগতিতে হাঁটছে... ঘর্ঘর, মড়মড়, চিৎকার-চেঁচামেচি, পদশব্দ — সব মিলিয়ে প্রাণোচ্ছল, উত্তেজনাপূর্ণ কোলাহল। বাতাসে ভাসছে গরম ধুলো, নাক সুড়সুড় করছে। স্বচ্ছ, গভীর আকাশে গনগন করছে সূর্য, ধরণীর সব কিছুর ওপর উজার করে ঢেলে দিচ্ছে প্রখর উত্তাপের দীপ্তি। ইলিয়া এমন এক পরিতৃপ্তি নিয়ে এ সব দেখতে লাগল যা ইতিমধ্যে বহুদিন সে অনুভব করে নি। সবই কেমন যেন অসাধারণ, আকর্ষণীয়। চঞ্চল চরণে কোথায় যেন চলেছে এক সুন্দরী মেয়ে। তার দুই গালে গোলাপী আভা, চোখে মুখে সপ্রতিভ ভাব। ইলিয়ার দিকে সে এমন স্বচ্ছ ও মধুর দৃষ্টিতে তাকাল যেন তাকে বলতে চায়:

'আহা কী সুন্দর গো তুমি!..'

ইলিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

একটা দোকান কর্মচারী-ছেলে পেতলের কেটলি হাতে দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো, কেটলি থেকে সে ঠাণ্ডা জল ঢালছে, পথচারিদের পায়ে

জলের ছিটে লাগছে, কেটলির ঢাকনি মধুর ঝনঝন আওয়াজ তুলছে। গরম, গুমোট গরম, রাস্তায় হৈ-হট্টগোল, এদিকে শহরের কবরখানার পুরনো লিন্ডেন গাছগুলোর গাঢ় শ্যামলিমা, তার নির্জনতা ও শীতল ছায়া প্রলোভন জাগিয়ে তোলে। সাদা পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা পুরনো কবরখানার ঘন গাছপালা বিশাল ঢেউয়ের মতো আকাশের দিকে উঠছে, সে ঢেউয়ের চুড়োয় ফেনার মতো শোভা পাচ্ছে পাতার সবুজ কারুকাজ। সেখানে, অনেক উঁচুতে নীল আকাশের গায়ে প্রতিটি পাতা সুস্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে, ঝিরিঝিরি কাঁপতে কাঁপতে যেন গলে পড়ছে...

পাঁচিল ঘেরা কবরখানার ভেতর ঢুকে পড়ে লিন্ডেনের সুগন্ধে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে ইলিয়া প্রশস্ত বীথিকা ধরে চলল। গাছপালার মাঝে মাঝে, তাদের ডালপালার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে গ্রানিট আর মর্মর পাথরের তৈরী বিদ্ঘুটে, ভারী ভারী সমাধি স্তম্ভ, তাদের পাশে পাশে ছাতলা ধরেছে। কোথাও কোথাও রহস্যময় আলো-আঁধারিতে সামান্য চিকচিক করছে সোনালি ক্রস, বহুকালের ফলকের ওপর প্রায় ঝাপসা হয়ে আসা লিপি। বুনোলতা, বাবলা, কাঁটাগাছ ও বুনো ফুলগাছের ঝোপঝাড় কবরখানার ভেতরে বেড়ে উঠে ডালপালার জঙ্গলে কবরগুলোকে ঢেকে ফেলেছে। কোথাও কোথাও ঘন সবুজের তরঙ্গের মাঝখানে ঝলক দিচ্ছে ধূসর রঙের কাঠের ক্রস, সরু সরু ডালপালা চার দিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ঘন পাতার জাল ভেদ করে প্রকাশ পাচ্ছে কচি বার্চ গাছের মখমলি গা। কোমল এই গাছগুলো বিনীত ভঙ্গিতে যেন ইচ্ছে করেই ছায়ার নীচে লুকিয়েছে যাতে তারা আরও বেশি করে চোখ পড়ে। রেলিং ঘেরা সবুজ ঢিবিগুলো ফুলে ফুলে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে আছে, নিস্তব্ধতা ভেদ করে গুঞ্জন করছে একটা বোলতা, বাতাসে খেলা করছে দুটি সাদা প্রজাপতি, কিছু মশা নিঃশব্দে উড়ছে... সর্বত্রই মাটি ফুঁড়ে আলোর দিকে সবেগে বেরিয়ে আসছে ঘাস আর ঝোপঝাড়, আড়াল করে রাখছে শোকাবহ সমাধিগুলোকে। বড় হয়ে ওঠার জন্য, বিকশিত হওয়ার জন্য, আলো ও বাতাস আহরণের জন্য, উর্বর মাটির রসকে রঙে, গন্ধে ও রূপে পরিণত করে মানুষের হৃদয় ও নয়নকে জুড়ানোর জন্য কবরখানার সমস্ত গাছপালা যেন অধীর আগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সর্বত্র জীবনের জয়, জীবন সকলের ওপর জয়ী হবে!..

লিন্ডেন আর ফুলের মিষ্টি গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে নিতে নিতে

ঘুরে বেড়াতে ইলিয়ার বেশ লাগছিল। তার মনের মধ্যেও সব স্থির, শান্ত; সে মনেপ্রাণে বিশ্রাম নিচ্ছিল, কোন রকম ভাবনা-চিন্তা তার ছিল না, একাকীত্বের এমন এক আনন্দ সে উপভোগ করতে লাগল যা বহুকাল তার জানা ছিল না।

বীথি থেকে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে সরু পায়ে-চলা-পথ ধরে ক্রস আর সমাধিস্তম্ভের ওপরকার লেখাগুলো পড়তে পড়তে সে এগিয়ে চলল। ঘন হয়ে ওকে ঘিরে ধরল কবরের চারপাশের ঢালাই ও পেটাই লোহার জমকাল, বাহারী সব রেলিং।

'এই ক্রসের নিম্নে চিরশান্তি লাভ করিতেছে ঈশ্বরের দাসানুদাস ভোনিফাতির দেহাবশেষ' — কথাগুলো পড়ে ওর হাসি পেল। নামটা ওর কাছে হাসির ঠেকল। ভোনিফাতির সমাধির ওপর ছিল ছাইরঙা গ্রানিট পাথরের এক বিরাট স্তম্ভ। তারই পাশে অন্য একটা ঘেরা জায়গায় ছিল পিওতর বাবুশ্‌কিনের সমাধি, আটাশ বছর বয়স।

'অল্প বয়স,' ইলিয়া মনে মনে ভাবল।

অনাড়ম্বর, সাদা মর্মর পাথরের স্তম্ভের ওপর ইলিয়া পড়ল:

একটি পুষ্পহারা হইল ভূলোক,
আরও এক তারকায় শোভিল দ্যুলোক!

এই দুই পংক্তির পদ ইলিয়াকে ভাবাচ্ছন্ন ফেলল, তার কাছে মর্মস্পর্শী বলে মনে হল। এমন সময় ইলিয়ার বুকটা ধক করে উঠল, সে সামান্য টাল খেল, শক্ত করে চোখ বুঁজল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট দেখতে পেল সেই ভয়াবহ লিপিটি। তার মগজে যেন কেটে কেটে বসে যাচ্ছিল পাটকিলে রঙের পাথরের ওপর খোদাই করা ঝকঝকে সোনালি অক্ষরগুলো:

'এই স্থানে চিরশান্তি লাভ করিতেছে দ্বিতীয় বণিক সঙ্ঘের সদস্য ভাসিলি গাভ্রিলভিচ পলুএক্‌তভের দেহ।'

কয়েক সেকেন্ড বাদে নিজের আতঙ্ক দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যেতে সে তাড়াতাড়ি চোখ খুলল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিজের চারপাশের ঝোপঝাড় লক্ষ্য করতে লাগল... আশেপাশে কাউকে নজরে পড়ল না, কেবল দূরে কোথায় যেন অন্ত্যেষ্টি প্রার্থনা হচ্ছে। নীরবতা ভেদ করে ভেসে আসছিল গির্জার পাদ্রির চড়া গলার সুর:

'মিনতি শুন-হ প্রভো...'

অসন্তুষ্ট গোছের এক ভরাট গলায় সাড়া জাগল:

'মাগিনু ক-রু-ণা তব...'

ঘণ্টা ও ধুনুচি নাড়ানোর টুং টুং শব্দও যেন ভেসে এলো।

ম্যাপল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ইলিয়া তার হাতে নিহত মানুষের সমাধির দিকে তাকিয়ে রইল। মাথার টুপির পেছন দিক গাছের সঙ্গে সেঁটে থাকায় টুপি তার কপাল ছাড়িয়ে উঠে গেছে। তার ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠেছে, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়েছে। হাত দুটো কোটের পকেটে গুঁজে সে দুপা মাটিতে গেঁথে দাঁড়িয়ে রইল।

পলুএক্‌তভের সমাধিস্তম্ভটা দেখতে সমাধি-মন্দিরের মতো। তার মাথার ওপর খোদাই করা আছে খোলা বই, মাথার খুলি এবং ক্রসের আকারে রাখা পায়ের নলির হাড়। এই রেলিংয়ের পাশেই আছে আরও একটি সমাধি-মন্দির, একটু ছোট। তার ওপর লেখা আছে যে এর নীচে চিরশান্তি লাভ করছে ঈশ্বরের দাসী ইয়েভ্‌প্রাক্‌সিয়া পলুএক্‌তভা, বয়স — বাইশ।

'প্রথম বৌ আর কি,' — ইলিয়া মনে মনে ভাবল। স্মৃতিচারণের কঠোর পরিশ্রম থেকে তার মগজের একমাত্র ক্ষুদ্র যে অংশটি তখনও মুক্ত ছিল সেখানে এই ভাবনার উদয় হল। এ ছাড়া তার সমগ্র সত্তা ছিল পলুএক্‌তভের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন — মনে পড়ছিল পলুএক্‌তভের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা, তাকে গলা টিপে মারার ঘটনা এবং বুড়ো যে তখন লালায় তার হাত ভিজিয়ে দিয়েছিল সে ঘটনা। কিন্তু এ সব দৃশ্য স্মৃতিতে জেগে ওঠার সময় ইলিয়া কোন রকম আতঙ্ক, কোন অনুশোচনা অনুভব করল না — মনের মধ্যে একটা আক্ষেপের জ্বালা, বেদনা ও ঘৃণা নিয়ে সে সমাধি-মন্দিরটি দেখতে লাগল। হৃদয়ে প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে, নিজের কথাগুলোর যথার্থতায় দৃঢ় আস্থা রেখে সে নীরবে বণিকের উদ্দেশে বলল:

'হারামজাদা, তোর জন্যেই আমি আমার সমস্ত জীবন কষ্ট করেছি, তোর জন্যে!.. শয়তানের ধাড়ি! এখন আমার কী দশা হবে?.. তোর ছোঁয়ায় আমি চিরকাল কলঙ্কিত হয়ে রইলাম!..'

তার ইচ্ছে হচ্ছিল জোরে, প্রাণপণে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে, অতি কষ্টে সে এই উন্মত্ত বাসনা সংযত করল। ইলিয়ার চোখের সামনে ভাসতে লাগল পলুএক্‌তভের খুদে, কুটিল চেহারা, টাক মাথা স্ত্রোগানির ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি,

পেত্রুখার আত্মপরিতৃপ্ত মুখ, আহম্মক কিরিক, পাকা চুলওয়ালা খেত্রনভ, তার বাঁকা নাক আর কুতকুতে চোখ — চেনাপরিচিত লোকজনের গোটা মিছিল। তার কানে গমগম আওয়াজ আসতে লাগল, তার মনে হচ্ছিল এই লোকজনেরা সবাই মিলে বুঝি তাকে কোণঠাসা করছে, কোন রকম ইতস্তত না করে সোজা তার ওপর চড়াও হচ্ছে।

ইলিয়া চট করে গাছের গা ছেড়ে সরে দাঁড়াল, তার মাথা থেকে টুপি পড়ে গেল। টুপিটা ওঠানোর উদ্দেশ্যে নীচু হতে গিয়ে সুদখোর ও চোরাই মালের কারবারীর কবর থেকে সে চোখ ফেরাতে পারল না। ওর গুমোট লাগছিল, খারাপ লাগছিল, মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দিল, উত্তেজনায় চোখজোড়ায় টাটানি লাগল। অনেক চেষ্টায় সে পাথর থেকে চোখ ফেরাল, সোজা রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল, দুহাতে লোহার রেলিং আঁকড়ে ধরল এবং ঘৃণায় শিউরে উঠে কবরের ওপর থুতু ফেলল...

ওখান থেকে চলে যেতে যেতে সে এত জোরে মাটির ওপর পদাঘাত করল যে মনে হল মাটিকে আঘাত টের পাওয়ানোই বুঝি তার অভিপ্রায়।

বাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। মনটা ভার হয়ে রইল, সামান্য বিষণ্নতা তাকে চেপে ধরেছিল। কারও দিকে না তাকিয়ে, কোন ব্যাপারে উৎসাহ না দেখিয়ে, কোন কথা না ভেবে সে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। একটা রাস্তা পেরিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো সে কোনায় মোড় নিল, আরও কিছুদূর যেতে বুঝতে পারল যে পেত্রুখার সরাইখানার কাছাকাছি এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল ইয়াকভের কথা। পেত্রুখার বাড়ির গেটের সামনাসামনি চলে আসতে তার মনে হল একবার ভেতরে যাওয়া দরকার, যদিও যাওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না। পেছনের দেউড়ির সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সে শুনতে পেল পেরফিশ্কার গলা:

'বাপধনেরা ওরে, হাতের মায়া করে আর মেরো না মোরে...'

ইলিয়া খোলা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। ধুলো আর তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে ইলিয়া বার-কাউণ্টারের ওপাশে ইয়াকভ্‌কে দেখতে পেল। ইয়াকভের মাথার চুল পরিপাটি আঁচড়ান, তার গায়ে খাটো হাতাওয়ালা খাটো ঝুলের সোয়েটার। ইয়াকভ্ ব্যস্ত — সে কেটলিতে চা ঢালছে, চিনির ডেলা গুনে গুনে রাখছে, ভোদকা ঢেলে দিচ্ছে, ঘটঘট করে ক্যাশের দেরাজ

টানছে। ওয়েটাররা তার কাছে ছুটে আসছে, কাউণ্টারের ওপর চেক ঝটপট ফেলতে ফেলতে হাঁক দিচ্ছে:

'আধ পাঁইট! দুবোতল বীয়ার! দশ কোপেকের ফ্রাই!'

'বেশ ত রপ্ত করেছ চাঁদ!' বন্ধুর লাল টুকটুকে হাত শূন্যে চটপট ঝলকাচ্ছে দেখে কেমন যেন একটা হিংস্র উল্লাস অনুভব করে ইলিয়া মনে মনে বলল।

'আরে!' ইলিয়া কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে আসতে ইয়াকভ্ উল্লসিত হয়ে বলল, কিন্তু পরক্ষণেই উদ্বিগ্ন হয়ে কাউণ্টারের পেছন দিকের দরজার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ওর কপাল ঘামে জবজব করছে, গাল দুটো পাণ্ডুর, তাতে লাল লাল ছোপ ফুটে উঠেছে। সে ইলিয়ার হাত আঁকড়ে ধরল, শুকনো কাশি তুলতে তুলতে তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

'কেমন আছিস?' জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল। 'জোয়াল লাগিয়েছিস তাহলে?'

'কী আর করা?'

ইয়াকভের কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, তাকে যেন নিজের আকৃতির তুলনায় খাটো দেখা গেল।

'কত কা-ল দেখাসাক্ষাৎ নেই!' স্নিগ্ধ ও বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে ইলিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলল। 'একটু কথাবার্তা বলতে পারলে হত... বুঝলি কিনা, বাবা বাড়ি নেই। তাই বলি কি তুই এদিকে আয়, আমি সৎমাকে বলে দেখি কাউণ্টারে বসে কি না...'

ইয়াকভ্ তার বাপের ঘরের দরজা ফাঁক করে সশ্রদ্ধ সুরে চেঁচিয়ে বলল:

'মামণি! এদিকে এক মিনিটের জন্যে এসো না...'

ইলিয়া প্রবেশ করল সেই ঘরে যেখানে কোন এক সময় সে তার কাকার সঙ্গে বাস করত। সে এক দৃষ্টিতে ঘরটা নিরীক্ষণ করে দেখল। ঘরের ওয়াল পেপারটা কেবল কালো হয়ে গেছে, তা ছাড়া দুটো খাটের জায়গায় এখন আছে একটা খাট আর তার ওপর ঝুলছে বইয়ের তাক। ইলিয়া যেখানে ঘুমাত সেখানে জায়গা নিয়েছে একটা উঁচু কদাকার বাক্স।

'এইবারে এক ঘণ্টার জন্যে ছাড়া পেলাম!' খুশিমনে ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে ইয়াকভ্ বলল। 'চা খাবি? ঠিক আছে... ইভা-আন, চা নিয়ে আয় রে!' ও হাঁক দিল, সঙ্গে সঙ্গে কাশতে শুরু করল,

দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে, মাথা নীচু করে, কোলকুঁজো হয়ে অনেকক্ষণ ধরে এমন ভাবে কাশতে লাগল যেন বুকের ভেতর থেকে কিছু একটা ঠেলে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

'দারুণ খক্‌খক্‌ করছিস ত!' ইলিয়া বলল।

'ক্ষয়রোগে ভুগছি... আবার তোকে দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে... তুই কি ভারিক্কিই না হয়েছিস রে! কেমন আছিস বল।'

'আমার কথা বলছিস?' ইলিয়া চট করে উত্তর দিল না। 'আছি বেঁচে বর্তে... তা তুই কেমন আছিস জানতে সাধ হয়...'

নিজের সম্পর্কে কিছু বলার প্রবৃত্তি ইলিয়ার হল না, কোন কথা বলারই ইচ্ছে তার করছিল না। সে ইয়াকভ্‌কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বন্ধুর এই দুর্দশা দেখে তার করুণা হল। কিন্তু সেই করুণার মধ্যে কোন উত্তাপ ছিল না — এ অনুভূতি ছিল কেমন যেন শূন্যগর্ভ।

'আমি ভাই কোন রকমে টিকে আছি,' অর্ধস্ফুট স্বরে ইয়াকভ্‌ বলল।

'বাপ ত তোর রক্ত শুষতে বাকি রাখে নি...'

অমনিতে তুই নেওটা আমার ওরে,
তাহলে আর রুবল কেন তোরে?

— দেয়ালের ওপাশে অ্যাকর্ডিয়ান সঙ্গত করে পেরফিশ্‌কা গেয়ে চলছিল।

'এই বাক্সটা কিসের রে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'এটা? এটা হারমোনিয়াম। বাবা পঁচিশ রুবল দিয়ে আমার জন্যে কিনেছে... বলে, 'আগে শেখ, পরে ভালো দেখে কিনে দেব, সরাইখানায় থাকবে, খদ্দেরদের জন্যে বাজাবি... তোকে দিয়ে ত আর অন্য কোন কাজ হবে না...' তা ভালোই বলেছে — আজকাল প্রত্যেক সরাইখানায় অর্গ্যান আছে, আমাদেরই নেই। আর বাজাতে আমার ভালোই লাগে...'

'লোকটা একটা ইতর!' ইলিয়া মৃদু হেসে বলল।

'না না, কী যে বলিস? বাদ দে... সত্যিই ত আমি ওর কোন কাজেই লাগি না...'

ইলিয়া কঠিন দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, আক্রোশ প্রকাশ করে বলল:

'শোন তবে, তুই ওকে একটা পরামর্শ দে। গিয়ে বল, বাপজান আমার, আমি যখন মরতে বসব তখন আমাকে সরাইখানায় টেনে নিয়ে এসো, যে সব

শুয়োরের বাচ্চা আমার মরণ দেখতে চায় তাদের কাছ থেকে অন্তত পাঁচ কোপেক করে দর্শনী আদায় করো... এতেই ত তুই ওর কাজে লাগতে পারবি...'

ইয়াকভ্ ভেবাচেকা খেয়ে হেসে উঠল, আবার কাশতে লাগল, কাশতে কাশতে হাত দিয়ে কখনও বুক কখনও বা গলা চেপে ধরতে লাগল।

ওদিকে পেরফিশ্‌কা কাকে নিয়ে যেন এক ফুর্তির গান গেয়ে চলেছে:

অর্ধেক খেয়ে কাটাত সে দিন,
উপোসের বেলা বড়ই কঠিন।
খালি পেটে টান দিত নাড়িভুঁড়ি,
অন্তরে ছিল নির্মল ভারী...

'ও-হো-হো-হো... অহো!' সঙ্গে সঙ্গে তার সুরেলা অ্যাকর্ডিয়ান থেকে গানের আমুদে কথাগুলো দারুণ ঝঙ্কার তুলে গমগম করে ছড়িয়ে পড়ল।

'সৎভাইয়ের সঙ্গে কেমন চলছে রে?' ইয়াকভের কাশির দমক থেমে গেলে ইলিয়া ওকে জিজ্ঞেস করল। ইয়াকভ্ হাঁপাতে হাঁপাতে অস্বাভাবিক টানের ফলে নীলরঙ ধরা মুখটি ওপরে তুলে উত্তর দিল:

'ও আমাদের সঙ্গে থাকে না — ওপরওয়ালার হুকুম নেই... হাজার হোক সরাইখানা ত। ও ভদ্রলোক হওয়ার তালিম নিচ্ছে...'

ইয়াকভ্ গলার স্বর নামিয়ে বিষণ্ণ ভাবে বলে চলল:

'বইটার কথা মনে আছে? সেই বইটা রে... ও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে... বলে, দামী বই, অনেক দাম হবে। নিয়ে নিল... কাকুতি-মিনতি করলাম, বললাম দিয়ে দে! রাজী হল না...'

ইলিয়া হোহো করে হেসে উঠল। তারপর দুই বন্ধুতে চা পান করতে লাগল। ঘরের ওয়াল পেপার জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে ফেটে গেছে, পার্টিশানের ফাটল দিয়ে সরাইখানা থেকে ঘ্রাণ আর শব্দ স্বচ্ছন্দে ঘরে ভেসে আসছে। সরাইখানার সমস্ত কোলাহলে ছাপিয়ে কার যেন খনখনে উত্তেজিত গলা শোনা গেল:

'মিত্র নিকোলায়েভিচ্, আমার কথার এ রকম কদর্থ করবে না বলছি!'

'আমি ভাই এখন একটা বই পড়ছি,' ইয়াকভ্ বলল, 'বইটার নাম হল

'ইউলিয়া, কিংবা মাৎসিনির পাতাল-দুর্গ'। চমৎকার বই!.. এ ব্যাপারে তুই কী বলিস?'

'রাখ দেখি তোর পাতাল-ফাতাল! নিজেই এখন পাতাল থেকে খুব একটা ওপরে নেই,' ইলিয়া বিষণ্ণ ভাবে বলল।

ইয়াকভ্ সমবেদনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তোরও অবস্থা তাহলে সুবিধের নয়?'

ইলিয়া ভাবল মাশার কথা ইয়াকভ্‌কে বলবে কি না। কিন্তু তার আগেই ইয়াকভ্ নরম গলায় বলল:

'তোর সেই একই ব্যাপার, ইলিয়া, তিরিক্ষি হয়ে উঠিস, খিটখিট করিস... এর কিন্তু কোন মানে হয় না। ভেবে দ্যাখ, কোন কিছুর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।'

ইলিয়া চুপচাপ চা পান করে যেতে লাগল।

'কথায় আছে 'মানুষমাত্রেই তাহার নিজ কর্মের ফল ভোগ করে' — এটা ঠিকই! আমার বাবার কথাই ধর না... সরাসরি বলতে গেলে মানুষের ওপর অত্যাচার কম করে নি। এসে জুটল ফ্যেক্‌লা তিমোফেয়েভ্‌না — খপ্ করে ওকে হাতের মুঠোয় পুরল। এখন বাবার যা অবস্থা হয়েছে — ও-হো-হো! মনের দুঃখে মদ পর্যন্ত ধরেছে... অথচ বিয়ে ত এই সবে হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তার খারাপ কাজের জন্যে সামনে অপেক্ষা করছে কোন এক ফ্যেক্‌লা তিমোফেয়েভ্‌না...'

কথাগুলো শুনতে ইলিয়ার বেজার লাগছিল। সে অধৈর্য হয়ে ট্রের ওপর নিজের কাপটা ঠেলে দিল এবং তার নিজের কাছেই বেয়াড়া ঠেকল যখন সে আচমকা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে বসল:

'তুই এখন কিসের অপেক্ষা করছিস?'

'কোথায়?' চোখ বড় বড় করে শান্ত গলায় ইয়াকভ্ বলল।

'কোথায় আবার?.. এই সামনে, বলি সামনে তোর জন্যে কী অপেক্ষা করছে?' ইলিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠে আবার প্রশ্ন করল।

ইয়াকভ্ কিছু না বলে মাথা নীচু করল, ভাবনায় পড়ে গেল।

'কী হল?' ইলিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল। মনের মধ্যে সে অনুভব করছিল একটা অস্থিরতার জ্বালা, আর ভাবছিল কত তাড়াতাড়ি সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়া যায়।

'আমার আবার অপেক্ষা করার কী আছে?' ইলিয়ার দিকে না তাকিয়ে মিনমিন করে ইয়াকভ্ বলল। 'অপেক্ষা করার কিছু নেই। মারা যাব... ব্যস্ চুকে গেল।'

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হতচকিত মুখের ওপর পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি ফুটিয়ে ও বলে চলল:

'আমি নীলরঙের স্বপ্ন দেখি, বুঝেছিস, দেখি নীল আর নীল... কেবল আকাশ নয়, মাটি, গাছপালা, ফুল, ঘাস — সব! আর কী নিস্তব্ধতা! কী থমথমে... সব নীল আর নীল। যেতে যেতে মনে হয় দূরে, বহু দূরে চলেছি, চলার কোন শেষ নেই, সীমা নেই, চলায় ক্লান্তিও নেই... এমনকি বোঝাও যায় না আমি আছি কি নেই। কী হালকা! নীলস্বপ্ন — মারা যাওয়ার পূর্বলক্ষণ।'

'চলি!' ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

'আরে যাচ্ছিস কোথায়? বস না!'

'না, চলি!'

ইয়াকভ্‌ও উঠে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে, যা!..'

ইলিয়া তার উত্তপ্ত হাতে হাত রাখল, তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, সে বুঝতে পারছিল না বিদায়ের সময় বন্ধুকে কী বলে। কিছু একটা বলার তার ইচ্ছে ছিল, এতই ইচ্ছে করছিল যে তাতে বুকে পর্যন্ত কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

'মাশার কথা শুনেছিস? শুনেছিস ত?.. মাশাও ভালো নেই,' ইয়াকভ্ দুঃখ করে বলল।

'হ্যাঁ শুনেছি...'

'দেখা যাচ্ছে আমাদের সকলের একই ভাগ্য... তোরও — বড় কষ্টের, তাই না?'

বলতে বলতে ইয়াকভ্ ম্লান হাসি হাসল। তার কণ্ঠস্বর, তার উচ্চারণ করা শব্দ — তার সবকিছুই কেমন যেন রক্তশূন্য, বিবর্ণ... ইলিয়া তার হাতের মুঠো আল্‌গা করল — ইয়াকভের হাত নিস্তেজ ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল।

'আচ্ছা ইয়াকভ্, যদি তেমন কিছু বলে থাকি ক্ষমা করিস...'

'ভগবান তোকে ক্ষমা করবেন। আসবি ত আবার?'

ইলিয়া বেরিয়ে গেল, জবাব দিল না।

রাস্তায় এসে সে একটু হালকা বোধ করল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে ইয়াকভ্ শিগ্‌গিরই মারা যাবে এবং তাতে কোন একজনের বিরুদ্ধে ইলিয়ার মন বিরক্তিতে ভরে গেল। ইয়াকভের জন্য তার দুঃখ হচ্ছিল না, কেননা সে কল্পনাই করতে পারে না এই নিরীহ ছেলেটার পক্ষে মানুষের মাঝখানে বাঁচা কী করে সম্ভব। বহুকাল ধরেই সে তার বন্ধুকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছে। তবে যে চিন্তাটা তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলত তা হল এই যে নিরীহ লোককে যন্ত্রণা দেওয়া কেন? সময়ের আগে তাকে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া কেন? এই চিন্তায় জীবনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন তার মনের মধ্যে গেঁথে বসল, বেড়ে শক্তসমর্থ হয়ে উঠল।

রাতে তার ঘুম হল না। জানলা খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে গুমোট লাগছিল। ও উঠোনে বেরিয়ে এসে বেড়ার পাশে এল্‌ম গাছের তলায় শুয়ে পড়ল। চিত্ হয়ে শুয়ে শুয়ে সে নির্মল আকাশ দেখতে লাগল এবং যত গভীর মনোযোগ দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ততই সেখানে আরও বেশি তারার সমাবেশ দেখতে পেল। রুপোলি চাদরের মতো আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিছানো রয়েছে ছায়াপথ। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকাতে যেমন ভালো লাগছিল তেমনি আবার বিষণ্ণও লাগছিল। আকাশে কেউ থাকে না, অথচ সেখানে তারা ঝলমল করে, কিন্তু ধরণী?.. ধরণীর সাজ কোথায়? ইলিয়া চোখ কোঁচকাল। তখন তার মনে হতে লাগল গাছের ডালপালা যেন ওপরে, আরও ওপরে উঠছে। উজ্জ্বল তারায় ছড়ান অন্তরীক্ষের সুনীল মখমলে পাতার কালো কালো জাফরি দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঐ উঁচু জায়গাটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টায় কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধুর নীলরঙা স্বপ্নের কথা ইলিয়ার মনে পড়ে গেল, তার সামনে তখন ভেসে উঠল ইয়াকভের চেহারা — সে চেহারাও নীল, হালকা, স্বচ্ছ, তার চোখজোড়া তারার মতোই উজ্জ্বল ও প্রসন্ন... এই ত একটা মানুষ ছিল, তার ওপর চলল অত্যাচার-উৎপীড়ন। কেন? — না, সে ছিল নির্বিবাদী। অথচ যারা ওর ওপর উৎপীড়ন করেছিল তারা বহাল তবিয়তেই আছে...

গাভ্রিকের বোন প্রায় রোজই দোকানে আসা-যাওয়া করতে লাগল। সব সময়ই সে যেন কিসের একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে হন্তদন্ত অবস্থায় আসত,

ইলিয়ার সঙ্গে সম্ভাষণ করত, শক্ত করে হাত ধরে তার করমর্দন করত, ইলিয়ার সঙ্গে গোটা কয়েক বাক্য বিনিময় করেই অন্তর্ধান করত। সে চলে যাওয়ার পর কোন না কোন নতুন ভাবনা ইলিয়াকে পেয়ে বসত। এক দিন সে ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল:

'দোকানদারী করতে আপনার ভালো লাগে?'

'তেমন নয়, খুব যে একটা ভালো লাগে তা বলব না,' অসহায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইলিয়া জবাব দিল। 'তবে কিছু একটা করে পেট চালাতে হবে ত...'

সে গম্ভীর দৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়ে ইলিয়ার দিকে তাকাল, তার মুখটা যেন সামনের দিকে আরও এগিয়ে এলো।

'আপনি কোন রকম পরিশ্রমের কাজ করে রুজি রোজগারের চেষ্টা করে দেখেছেন কি?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া ওর প্রশ্ন ধরতে পারল না।

'কী বললেন আপনি?'

'আপনি কখনও কাজ করেছেন?'

'চিরকাল করছি। সারা জীবনই ত কাজ করে গেলাম। এই ত দোকানদারী করছি,' ইলিয়া বিভ্রান্ত হয়ে জবাব দিল।

মেয়েটি হাসল। তার হাসির মধ্যে কেমন যেন একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল।

'আপনি কি মনে করেন ব্যবসাদারী একটা শ্রম? আপনি কি মনে করেন কাজের মধ্যে কোন তফাত নেই?' সে তড়বড় করে জিজ্ঞেস করল।

'কী রকম?'

ওর মুখের দিকে তাকাতে ইলিয়া বুঝতে পারল যে ও ঠাট্টা করছে না, গুরুত্ব দিয়েই কথাগুলো বলছে।

'না, না, মোটেই তা ভাববেন না,' বাঁকা হাসি হেসে মেয়েটি বলে চলল। 'শ্রম বলব তাকেই যেক্ষেত্রে মানুষ নিজের শক্তি খরচ করে নতুন একটা কিছু গড়ে, যখন সে সুতোর কাটিম বানায়, ফিতে বানায়, টেবিল, তাক বানায় — বুঝেছেন?'

ইলিয়া নীরবে মাথা নাড়াল, তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। সে যে বুঝতে পারছে না এটা বলতে লজ্জা হল।

'আর ব্যবসাদারী? — ব্যবসাদারী আবার শ্রম কিসের? তা মানুষকে

কিছুই দেয় না!' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ইলিয়ার মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে মেয়েটি বলল।

'তা ত ঠিকই,' ধীরে ধীরে ও সতর্ক ভাবে ইলিয়া বলল, 'এটা আপনি ঠিকই বলেছেন।... দোকানদারী করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়, অভ্যেসের ব্যাপার... কিন্তু ব্যবসাদারী থেকে কিছুই হয় না এটাও ঠিক নয়... মুনাফা না হলে লোকে ব্যবসা করতে যাবে কেন?'

সে চুপ করে গেল, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল এবং শিগ্‌গিরই কেবল মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে ইলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আজও তার মুখে ফুটে উঠেছে নীরস ভাব ও অহঙ্কারের ছাপ যেমন দেখা যেত আগে — মাশার ঘটনার আগে। ইলিয়া ভাবতে লাগল সে কি কোন বেচাল কথা বলে ওকে অপমান করল? ইলিয়া সব কথা আগাগোড়া মনে করে দেখল, কিন্তু অপমানজনক কিছু পেল না। তারপর ভাবতে লাগল মেয়েটির মন্তব্য, কথাগুলো ওকে ভাবনায় ফেলে দিল। ব্যবসাদারী আর শ্রমের মধ্যে কী তফাতটা সে দেখছে?

ইলিয়া বুঝতে পারল না যে মেয়ে এমন উদার, যে কেবল অন্যকে দরদই দেখায় না সাহায্য পর্যন্ত করতে পারে তার মুখ এ রকম রাগী রাগী আর খিটখিটে হয় কী করে। পাভেল ওদের বাড়ি যাতায়াত করত। পাভেলের মুখে ওর এবং ওদের বাড়ির যাবতীয় ব্যবস্থার প্রশংসা আর ধরে না।

'বাড়িতে এলেই... 'আরে আসুন, আসুন!' ওরা যদি তখন খাওয়া দাওয়া করে তাহলে সঙ্গে বসে খেতে হবে, চা খাওয়ার সময় গিয়ে পড়লে — চা খাও! কোন প্যাঁচঘোঁচ নেই। লোকজন — সে আর কী বলব! ফুর্তিতে সময় কাটে -- গান বাজনা, চিৎকার চেঁচামেচি, বই নিয়ে তর্কবিতর্ক। আর বই? — যেন পুরো একটা দোকান। বাড়িতে জায়গা কম, ধাক্কাধাক্কি হাসি-তামাসা চলে। সকলেই শিক্ষিত। একজন উকিল, অন্যজন শিগ্‌গিরই ডাক্তার হবে, আর ছাত্র-টাত্র ত আছেই। তুমি নিজে কী সে কথাও এক্কেবারে ভুলে যাবে, ওদের সঙ্গে মিলে হোহো হাস, সিগারেট খাও, আমোদফুর্তি কর। খাসা লোকজন! যেমন আমুদে তেমনি আবার চিন্তা-ভাবনাও করে...'

'আমাকে তাই বলে নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছে না,' ইলিয়া বিষণ্ন হয়ে বলল। 'বড় অহঙ্কারী...'

'ওর কথা বলছিস?' পাভেল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'বললাম না

তোকে? — কোন প্যাঁচঘোঁচ নেই! ডাকাডাকির অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে পড়লেই হল... একবার এলে — আর দেখতে হবে না! ওদের বাড়িটা ঠিক যেন এক সরাইখানা — মাইরি বলছি! কোন বাঁধন নেই... আমি যে বলছি তা থেকেই ত বুঝতে পারিস। ওদের সামনে আমি কে? কিন্তু দুবার আসা-যাওয়া — হয়ে গেলাম আপন জন... চমৎকার! বেশ মজাসে আছে...'

'তা, মাশা কেমন আছে রে?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'মন্দ না, খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে... উঠে বসতে পারে, হাসে, ওষুধপত্র চলছে, দুধ খাওয়াচ্ছে... খ্রেনভ্, এবারে টেরটা পাবে। উকিল বলছে শয়তানের ধাড়িটাকে একচোট দেখে নেবে!.. মাশাকে তদন্তকারী ইনস্পেক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়... আমার ব্যাপারেও চেষ্টা-চরিত্র করছে, যাতে কেসটা তাড়াতাড়ি কোর্টে ওঠে... না, ওদের বাড়ি চমৎকার!.. ফ্ল্যাটটা ছোট, লোকজন থাকে চুল্লির কাঠের মতো গাদাগাদি করে আর চুল্লির মতোই তাপ দেয়...'

'আর ও নিজে?' ইলিয়া জেরা করল।

পাভেলকে যারা লেখাপড়া শিখিয়েছিল ছোটবেলায় তাদের কথা বলতে গিয়ে পাভেল যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ত এক্ষেত্রেও তার সেই ভাব দেখা গেল। সে উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়ে আর কি! কথার ফাঁকে ফাঁকে হর্ষ ও বিস্ময় ছড়াতে ছড়াতে সে সাড়ম্বরে জানাল:

'তার কথা আর কী বলব ভাই, ওঃ! সে সকলকে চালায়। কেউ যদি মুখ ফসকে কখনও বেচাল বা ঐ রকম কোন কিছু বলে ফেলে তাহলে আর দেখতে হবে না — ঘর্‌র্‌!.. রোঁয়া ফোলানো বেড়ালের মতো...'

'সেটা আমার জানা আছে,' ইলিয়া কাষ্ঠহাসি হেসে বলল।

পাভেলকে তার ঈর্ষা হচ্ছিল। তার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল কড়া মেজাজের এই মেয়েটির বাড়ি যায়, কিন্তু আত্মাভিমান সরাসরি এ রকম কাজ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

কাউণ্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বেশ করে ভাবতে লাগল:

'পৃথিবীতে কতই না মানুষ আছে, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য থাকে অন্যের কাছ থেকে কিছু না কিছু পাওয়ার। কিন্তু এই মেয়েটি? — মাশাকে বা ভেরাকে রক্ষা করার ভার নিয়ে তার লাভটা কী? সে গরীব। বাড়িতে টেনেটুনে খাওয়া চলে... তার মানে ওর মনটা বড় ভালো... অথচ আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলে... আচ্ছা, পাভেলের চেয়ে আমি খারাপ কিসে?'

এই ভাবনা তাকে এমন পেয়ে বসল যে বাদবাকি আর সব ব্যাপারে সে প্রায় উদাসীন হয়ে পড়ল। তার জীবনের অন্ধকার গর্ভে যেন একটা ফাটল ধরেছে আর সেই ফাটল দিয়ে দেখার চেয়ে সম্ভবত বেশি করে সে অনুভব করতে লাগল দূরে এমন একটা কিছুর ঝলকানি যার সঙ্গে এর আগে তার পরিচয় ঘটে নি।

'পশমের সরু ফিতে অর্ডার দেওয়া দরকার যে,' নীরস গলায়, গাম্ভীর্যের সুরে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না বলল। 'লেসের কাপড়ও শেষ হওয়ার মুখে... পঞ্চাশ নম্বরী কালো সুতো... তাও কম দেখছি। একটা ফ্যাক্টরী ঝিনুকের বোতাম আমাদের কাছে বিক্রি করতে চায়। ওদের এজেণ্ট আমার কাছে এসেছিল... আমি এখানে পাঠিয়ে দিই। এসেছিল কি?'

'না,' ইলিয়া সংক্ষেপে জবাব দিল। এই মহিলাটিকে তার আর সহ্য হয় না। কর্সাকভ্ নামে যে লোকটা সবে পুলিশের বড়কর্তা হয়েছে সে এখন তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্নার প্রণয়ী বলে ইলিয়ার সন্দেহ। ইলিয়ার সঙ্গে সে এখন কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ করে, যদিও আগের মতোই তাকে সোহাগ দেখায়, তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে। আর সে সব সাক্ষাৎকারও ইলিয়া নানা ছুতোয় এড়িয়ে যায়। এর জন্য সে ইলিয়ার ওপর রাগ করছে না দেখে ইলিয়া মনে মনে ওকে গালাগাল দিয়ে বলে:

'হারামজাদী... ছেনাল মাগী...'

বিশেষ করে ইলিয়ার বিশ্রী লাগত যখন সে মালপত্রের হিসাব নিতে দোকানে আসত। লাট্টুর মতো দোকানঘরে পাক খেতে খেতে সে লাফিয়ে কাউণ্টারের ওপর উঠে পড়ত, ওপরের তাক থেকে পিচবোর্ডের বাক্স টেনে বার করত, ধুলো লেগে হাঁচত, মাথা ঝাঁকাত আর গাভ্রিকের উদ্দেশে গজগজ করত:

'দোকানের ছোঁড়া হবে চটপটে, বাধ্য। সারা দিন দরজার সামনে বসে বসে আঙুল দিয়ে নাক খোঁটার জন্যে তাকে খেতে দেওয়া হয় না। কর্ত্রী যখন কথা বলেন তখন ভিরকুটি করে না তাকিয়ে মন দিয়ে শুনতে হয়...'

কিন্তু গাভ্রিকের নিজস্ব চরিত্র ছিল। কর্ত্রীর মুখ খিঁচুনি সে গায় মাখত না। কর্ত্রী হিসাবে তাকে বিন্দুমাত্র সমীহ না করে গাভ্রিক তার সঙ্গে অভদ্র ভাবে কথা বলত। মহিলা চলে গেলে সে তার মনিবকে বলত:

'ফরফরিটা গেছে...'

'কর্ত্রীর সম্পর্কে অমন বলতে নেই,' হাসি চাপার চেষ্টা করে ইলিয়া ওকে ধমকের সুরে বলত।

'ও আবার কর্ত্রী কিসের?' গাব্রিক প্রতিবাদ করে বলত। 'এলো, ফরফর করল, ফুরুৎ করে কেটে পড়ল... মনিব হলেন আপনি।'

'উনিও,' মৃদু আপত্তি করে ইলিয়া বলত। একরোখা ও সরল স্বভাবের ছেলেটিকে, তার ভালো লাগত।

'ও হল ফরফরি,' গাব্রিক গোঁ ছাড়ে না।

'ছোঁড়াটাকে শিক্ষা-টিক্ষা দেন না দেখছি,' আভ্‌তনোমভা ইলিয়াকে বলে। 'মোটের ওপর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আজকাল আমাদের কাজকারবার চলছে কেমন যেন গা ছাড়া ভাবে, ব্যবসার দিকে কোন গরজ দেখা যাচ্ছে না...'

ইলিয়া চুপ করে রইল, তার সর্বাঙ্গ রিরি করে উঠল। সে মনে মনে ভাবল:

'এখানে লাফঝাঁপ দিতে দিয়ে গিয়ে তোর পা-ও মচকায় না রে হারামজাদী!'

তেরেন্‌তি কাকার কাছ থেকে সে এই মর্মে চিঠি পেল যে কাকা কেবল কিয়েভই ঘোরে নি, ত্রোইৎস্কো-সের্গিয়েভ্‌স্কি মঠেও গিয়েছিল, সলোভ্‌কি দ্বীপপুঞ্জের প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিল, ভালায়াম দ্বীপের মঠও বাদ যায় নি এবং শিগ্‌গিরই বাড়ি ফিরবে।

'আরও এক সুসংবাদ,' ইলিয়া বিরক্ত হয়ে ভাবল। 'সম্ভবত আমার ঘাড়ে এসে চাপবে...'

খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। ইলিয়া যখন তাদের নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় প্রবেশ করল গাব্রিকের বোন। ক্লান্ত ভাবে কোন রকমে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে ইলিয়াকে সম্ভাষণ করল তারপর ঘরের দরজার দিকে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল:

'ওখানে জল হবে?'

'এক্ষুনি দিচ্ছি,' ইলিয়া বলল।

'আমি নিজেই নেব'খন...'

সে ঘরের মধ্যে চলে গেল, খদ্দেরদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ইলিয়া যখন ঘরে ঢুকল তখনও সে ওখানে। ইলিয়া ওকে 'মানবজীবনের ক্রমপর্যায়' ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ইলিয়াকে আসতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে চোখের ইসারায় ছবিটাকে দেখিয়ে সে মন্তব্য করল:

'কী জঘন্য!..'

ওর মন্তব্যে ইলিয়া বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, অপরাধীর ভঙ্গিতে সলজ্জ হাসি হাসল। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করার অবসর ইলিয়া পেল না —ততক্ষণে সে চলে গেছে...

কয়েক দিন বাদে সে তার ভাইয়ের জন্য কাচা জামাকাপড় নিয়ে এলো, ভাইকে এই বলে বকা দিল যে জামাকাপড়ের ব্যাপারে সে মোটেই যত্ন নেয় না — ছিঁড়ে ফেলে, নোংরা করে।

'এই, এই শুরু হল,' গাভ্রিক চটে গিয়ে বলল। 'সব সময়ই কর্ত্রীর মুখ ঝামটা খাচ্ছি, এখন আবার এসে জুটলি তুই!..'

'বেশি রকম দুষ্টুমি করে না কি?' মেয়েটি ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

'যতখানি দুষ্টু ও হতে পারে তার চেয়ে বেশি নয়,' ইলিয়া বিনীত ভাবে বলল।

'আমি একদম শান্তশিষ্ট থাকি,' গাভ্রিক নিজের সাফাই গেয়ে বলল।

'ওর মুখটা একটু আল্‌গা,' ইলিয়া বলল।

'শুনছিস?' গাভ্রিকের বোন ভুরু কুঁচকে বলল।

'শুনছি, শুনছি,' গাভ্রিক ফোঁস করে উঠে বলল।

'ও কিছু না,' প্রশ্রয়ের সুরে ইলিয়া বলল। 'যে লোক উল্‌টে অন্তত ছোবল মারতে পারে সে অন্যদের ওপর এক হাত নিতে পারে বটে... কেউ কেউ এমন আছে যে মারধোর খেয়েও মুখ বুঁজে থাকে, এ ধরনের মুখচোরারা কোণঠাসা হয়ে মারা পড়ে...'

ওর কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির মুখে কেমন যেন একটা পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। ইলিয়া তা লক্ষ্য করল।

'একটা ব্যাপার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই,' ইলিয়া একটু ইতস্তত করে বলল।

'কী? বলুন।'

গাভ্রিকের বোন ইলিয়ার প্রায় কাছে ঘেঁষে এসে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল। ইলিয়া তার দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না, মাথা নীচু করে বলল:

'আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, ব্যবসাদারদের আপনি পছন্দ করেন না, তাই না?'

'হ্যাঁ...'

'কেন?'

'তারা অন্যের শ্রমে জীবনধারণ করে,' মেয়েটির সাফ জবাব।

ইলিয়া ঝটকা মেরে মাথা তুলল, চোখ কপালে তুলল। কথাগুলো তাকে যে কেবল অবাকই করল তা নয়, সরাসরি আঘাত করল। অথচ মেয়েটি কথাগুলো কতই না সহজে, কেমন স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিল!

'কথাটা ঠিক নয়,' একটু চুপ করে থেকে ইলিয়া জোর গলায় বলল।

এবারে মেয়েটির মুখের পেশী কেঁপে উঠল, মুখে লাল আভা দেখা দিল।

'ঐ যে ফিতেটা -- ওটা কত দিয়ে কিনেছেন?' নীরস ও কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

'এটা?.. দেড় হাত — সতেরো কোপেক।'

'বেচছেন কততে?'

'বিশ...'

'তাহলেই দেখুন, এই যে তিন কোপেক আপনি নিচ্ছেন তা আপনার নয়, যে ফিতে বানিয়েছে তার। বুঝতে পারছেন?'

'না,' ইলিয়া খোলাখুলি স্বীকার করল।

এতে মেয়েটির চোখে তার প্রতি কেমন একটা বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠল। এটা স্পষ্ট লক্ষ্য করে ইলিয়া তার সামনে সংকুচিত হয়ে গেল কিন্তু পরক্ষণেই এই সঙ্কোচের জন্য নিজের ওপর ক্রোধ হল।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই সহজ ব্যাপারটা আপনার পক্ষে বোঝা সোজা নয়,' দোকান থেকে দরজার দিকে সরে গিয়ে সে বলল। 'কিন্তু কল্পনা করুন আপনি একজন শ্রমিক, আপনি এ সব জিনিস তৈরি করে থাকেন...'

দোকানের ওপর এক ঝলক হাত বুলানোর ভঙ্গি করে সে ইলিয়াকে বলে চলল কী ভাবে শ্রম সকলকে সমৃদ্ধ করে অথচ যারা শ্রম করে তারা কিছুই পায় না। সচরাচর সে যে রকম নীরস ভাবে কাটা কাটা কথা বলে গোড়ার দিকে সেই ভাবেই বলে চলল, তার সৌন্দর্যহীন মুখে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না, কিন্তু তারপর তার ভুরু কেঁপে উঠল, কোঁচকাল, নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল এবং ঝটকা মেরে মাথাটা ওপরে তুলে সে সর্বশক্তিতে কঠিন কঠিন কথা ইলিয়ার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। তার সেই কথাগুলো ছিল তারুণ্যের দীপ্তিতে, তাদের সত্যতার প্রতি অটল আস্থায় পরিপূর্ণ।

'শ্রমিক আর ক্রেতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাপারী... সে কিছুই

করে না কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়... ব্যবসা হল আইনমাফিক চুরির রাস্তা।'

ইলিয়া অপমানিত বোধ করছিল, কিন্তু এই বেপরোয়া মেয়েটি যে সরাসরি মুখের ওপর তাকে নিষ্কর্মা ও চোর বলল তার প্রতিবাদে ইলিয়া কোন কথাই খুঁজে পেল না। সে দাঁতে দাঁত চেপে তার কথা শুনে যেতে লাগল কিন্তু তার কথায় ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না, ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইলিয়া মনে মনে এমন একটা জুতসই শব্দের সন্ধান করছিল যা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির সমস্ত বক্তৃতা নস্যাৎ করে দিতে পারে, তার মুখ বন্ধ করে দিতে পারে, আবার সেই সঙ্গে তার দুঃসাহসের তারিফও সে না করে পারছিল না... অপমানজনক কথাগুলো তাকে অবাক করে দিচ্ছিল, তার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল ব্যাকুল প্রশ্ন: 'কোন অপরাধে?'

'ব্যাপারটা মোটেই তা নয়,' উত্তর না দিয়ে তার কথা শুনে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে ইলিয়া শেষ পর্যন্ত তাকে বাধা দিয়ে জোর গলায় বলে উঠল। 'না, আমি মানতে রাজী নই।'

তার বুকের ভেতরে উত্তাল বিরক্তি টগবগ করে উঠল, মুখে লাল ছোপ ধরল।

'ক্ষমতা থাকলে প্রতিবাদ করুন,' শান্ত স্বরে এই কথা বলে মেয়েটি টুলের ওপর বসে পড়ল, বসে বসে নিজের দীর্ঘ বিনুনি হাঁটুর ওপর ফেলে খেলাচ্ছলে এদিক ওদিক দোলাতে লাগল।

ওর প্রতিকূল দৃষ্টির মুখোমুখি যাতে না পড়তে হয় তার জন্য ইলিয়া অস্থির ভাবে মাথা নাড়াতে লাগল।

'একশ বার প্রতিবাদ করব,' আর সহ্য করতে না পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমার জীবনই এর প্রতিবাদ! এমনও ত হতে পারে যে বড় রকম পাপ করার ফলেই আমি আজ এ অবস্থায় এসে পেঁছেছি...'

'সে ত আরও খারাপ... তা ছাড়া এটা কোন প্রতিবাদই হল না,' এই কথা বলে মেয়েটি যেন ইলিয়ার মুখের ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিল। ইলিয়া দুহাত ঠেকিয়ে কাউণ্টারের ওপর ভর দিল, এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ল যেন লাফিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়তে চায়। মেয়েটির কাছে অপমানিত হয়ে, তার স্থৈর্যে হতবাক ইলিয়া কোঁকড়ান চুল ভর্তি মাথা ঝাঁকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির দৃষ্টির সামনে, দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ আঁকা তার অবিচল চেহারার সামনে ইলিয়া ক্রোধ দমন করল, থতমত

খেয়ে গেল। ওর প্রকৃতির মধ্যে একটা কঠিন, নির্ভীক ভাব ইলিয়া অনুভব করল। প্রতিবাদের উপযুক্ত শব্দ তার জিভের আগায় এলো না।

'কী হল? কিছু বলছেন না যে?' সংযত স্বরে ইলিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সে জিজ্ঞেস করল। তারপর মৃদু হেসে জয়লাভের ভঙ্গিতে বলল, 'আমার কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আপনার নেই, কেননা আমি যা বললাম তা সত্যি।'

'ক্ষমতা নেই?' ইলিয়া ওর কথার খেই ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল।

'ঠিকই নেই। কী বলার আছে?'

সে আবার প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

'আচ্ছা চলি!'

এই বলে সে মাথা উঁচিয়ে চলে গেল, এবারে তার মাথা যেন বরাবরের চেয়ে আরও উঁচুতে উঠেছে।

'বাজে কথা! বিশ্বাস করি না!' ইলিয়া তার পেছন পেছন চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু ইলিয়ার চিৎকারে সে মুখ ফেরাল না।

ইলিয়া ধপ্ করে টুলের ওপর বসে পড়ল। গাভ্রিক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল, গাভ্রিককে দেখে মনে হচ্ছিল বোনের আচরণে সে খুশিই হয়েছে — তার মুখে ভারিক্কি ভাব ও বিজয়ের গর্ব ফুটে উঠেছে।

'হাঁ করে দেখছিস কী?' দৃষ্টিটা তার কাছে মোটেই প্রীতিকর না ঠেকায় সে খাপ্পা হয়ে গর্জে উঠল।

'কিছু না,' গাভ্রিক উত্তর দিল।

'হয়েছে, হয়েছে!..' হুঙ্কার দিয়ে ইলিয়া বলল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'যা, ঘুরে-টুরে আয়!'

কিন্তু নিরিবিলিতে থাকার পরও সে ভেবে-চিন্তে কোন কিছুর কূল-কিনারা করতে পারল না। মেয়েটি তাকে যা বলল তার অর্থোদ্ধার সে করছিল না, সবচেয়ে বড় কথা, ওর কথাগুলোই অপমানজনক।

'আমি ওর কী করেছি?.. এলো, এসে যা তা শুনিয়ে দিয়ে চলে গেল। আচ্ছা, আরেকবার এসে দ্যাখ্ দেখি? জবাব পাবি'খন...'

মনে মনে ওর ওপর তর্জন গর্জন করতে করতে ইলিয়া বার করার চেষ্টা করতে লাগল কেন ও তাকে অপমান করল। ওর মনে পড়ে গেল মেয়েটির বুদ্ধি আর সারল্যের প্রশংসায় পাভেল পঞ্চমুখ।

'আচ্ছা, পাভেলকে এ রকম অপমান করে বলে ত মনে হয় না...'

মাথাটা সামান্য তুলতে সে আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। ঠোঁটের ওপর কালো গোঁফজোড়া সামান্য নড়ছে, ডাগর চোখজোড়ার দৃষ্টি ক্লান্ত, লাল আভায় দুগালের উঁচু হাড় ঝাঁঝাঁ করছে। এমনকি এখনও, উত্তেজিত ও বিষণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও একটা অমার্জিত সৌন্দর্যের ছাপধরা তার সুন্দর মুখটি পাভেল গ্রাচোভের রোগপাণ্ডুর, চাপাভাঙ্গা মুখের চেয়ে ভালো।

'আমার চেয়ে পাভেলকে কি ওর বেশি মনে ধরল?' ইলিয়া মনে মনে ভাবল। পরক্ষণে নিজেই নিজের এই চিন্তার প্রতিবাদ করে বলল, 'আমার মুখ দিয়ে ওর হবেটা কী? আমি ত আর ওর প্রেমাস্পদ নই...'

ও ঘরের ভেতর গেল, এক গেলাস জল খেল, চার দিকে তাকিয়ে দেখল। ছবির উজ্জ্বল রং তার চোখে এসে লাগল, 'মানবজীবনের ক্রমপর্যায়' ছবিটির ওপর দৃষ্টি রেখে সে ভাবতে লাগল:

'এটা একটা ধাপ্পা... মানুষের জীবন কি আর সত্যিই এমন হয়?'

পরে হঠাৎ নৈরাশ্যের সঙ্গে বলল:

'আর এ রকম যদি হয়ও তা-ও একঘেয়ে!..'

ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে এগিয়ে এসে সে সেখান থেকে ছবিটা একটান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে দোকানে এলো। সেখানে কাউণ্টারের ওপর সেটাকে বিছিয়ে রেখে সে আবার মানুষের পরিবর্তনের ব্যাপারটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগল এখন ওটাকে দেখে তার হাসিই পেল, শেষ পর্যন্ত ছবিটা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তখন সে ওটাকে দুমড়ে দলা পাকিয়ে কাউণ্টারের নীচে ফেলে দিল কিন্তু সেখান থেকে তা গড়িয়ে এসে ওর পায়ের কাছে এসে ঠেকল। এতে সে বিরক্ত হয়ে ওটাকে উঠিয়ে আরও ভালো করে দলামোচড়া পাকিয়ে দরজা দিয়ে পাক মেরে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল...

রাস্তায় কোলাহল। উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে লাঠি হাতে কে যেন যাচ্ছে। বাঁধানো ফুটপাতের ওপর লাঠির ঠকঠক আওয়াজ মোটেই পায়ের তালে তালে পড়ছে না আর তাতে মনে হচ্ছে লোকটার যেন তিনটি পা পায়রার দল বকম্-বকম্ করছে। কোথায় যেন লোহার দুম্দাম আওয়াজ উঠল — সম্ভবত চিমনি সাফ করার লোকজন ছাদের ওপর হাঁটছে। দোকানের পাশ দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলে গেল। গাড়োয়ান কোচবক্সে বসে ঢুলছিল তার মাথা এদিক-ওদিক দুলছিল। ইলিয়ার চারপাশেও সব কিছু দুলছিল।

দোকানের যোগ-বিয়োগের কাজে ব্যবহারের জন্য কাঠের গুটি সাজানো যে হিসাব যন্ত্রটা ছিল সেটি হাতে নিয়ে ইলিয়া একটু তাকিয়ে দেখে বিশ কোপেক হিসাব করে গুটি সরাল। আরও একবার তাকিয়ে দেখল — সতেরো বাদ দিল। থাকল তিন কোপেক। ও গুটিগুলোর ওপর টোকা মারল, তারের ওপর সেগুলো মৃদু শব্দে ঘুরতে লাগল, শেষে আলাদা আলাদা হয়ে থেমে গেল।

ইলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হিসাবের যন্ত্রটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে কাউণ্টারের ওপর বুক চেপে ধরে পড়ে রইল, নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি শুনতে শুনতে সে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

গাভ্রিকের বোন পরের দিন আবার এলো। তাকে বরাবরের মতোই দেখাচ্ছিল — গায়ে সেই পুরনো পোশাক, মুখের সেই একই ভঙ্গি।

'ইস্, তবে রে!' ঘর থেকে লক্ষ্য করতে করতে ইলিয়া আক্রোশের সুরে মনে মনে বলল।

মেয়েটি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাতে ইলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার উদ্দেশে মাথাটা সামান্য নাড়াল। মেয়েটি হঠাৎ প্রসন্ন হাসি হেসে দরদের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'আপনাকে এ রকম ফেকাসে দেখাচ্ছে কেন? আপনি কি অসুস্থ?'

'না,' ওর মনোযোগের ফলে ইলিয়া যে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সেই অনুভূতি ওর কাছ থেকে চেপে রাখার চেষ্টায় সে সংক্ষেপে উত্তর দিল। অনুভূতিটি ছিল চমৎকার, আনন্দের অনুভূতি: মেয়েটির হাসি, তার কথা ইলিয়ার হৃদয়ে একটা বেশ কোমল ও আরামের স্পর্শ সঞ্চার করল। কিন্তু ইলিয়া তার ওপর রাগ করে আছে দেখাবে বলেই ঠিক করল, তার মনে মনে এই গোপন আশা ছিল যে মেয়েটি আরও কিছু দরদমাখা কথা বলবে, আবার হাসবে। এই ভেবে সে মুখ গোমড়া করে তার দিকে না তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'আপনি বোধহয় আমার কথায় অপমান বোধ করেছেন?' তার কণ্ঠস্বরটা কঠিন শোনাল। যে সুরে সে প্রথম কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল এ স্বর তার চেয়ে এতই আলাদা যে ইলিয়া ধড়মড় করে তার দিকে ফিরে তাকাল। তার চেহারা আবার সেই বরাবরের মতো — তার কালো চোখে কেমন একটা উদ্ধত ও উত্তেজনাকর ভাব ফুটে উঠেছে।

'আমি অপমানে অভ্যস্ত,' বুকের ভেতরে হতাশার একটা শীতল অনুভূতি অনুভব করতে করতে তার মুখের ওপর চ্যালেঞ্জের মৃদু হাসি হেসে ইলিয়া বলল।

'তুমি আমার সঙ্গে খেলা পেয়েছ?' ইলিয়া মনে মনে ভাবল। 'প্রথম গায়ে মাথায় হাত বুলাও, তারপর চড়চাপড়? উঁহু, তা চলবে না...'

'আমি আপনাকে ঠিক অপমান করতে চাই নি...'

'আমাকে অপমান করা আপনার পক্ষে কঠিন!' মরিয়া হয়ে উঠে ইলিয়া ফেটে পড়ল। 'আপনাদের মতো লোকজনের দর আমার জানতে বাকি নেই — আপনাদের দৌড় বেশি দূর নয়!'

কথাগুলো শোনামাত্র সে অবাক হয়ে নিজের শরীরটা টানটান করল, তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কিন্তু ইলিয়া তখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না — মেয়েটির ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থতার একটা উন্মত্ত বাসনা লেলিহান শিখায় তাকে ঘিরে ধরল, তাড়াহুড়ো না করে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সে চোখা চোখা ও অশিষ্ট বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করে চলল:

'আপনার বড়লোকী চাল, আপনার এই অহঙ্কার — এ সবের জন্যে আপনার খরচ পড়ে কয়েকটা কড়ি, স্কুল-কলেজে যারা যায় তাদের যে কেউ এটা যোগাড় করতে পারে... স্কুল-কলেজ ছাড়া আপনি দরজি বা ঝি-টি ও রকম কিছু একটা হতেন... আপনি যে রকম গরিব তাতে অন্য আর কিছু হওয়ার যোগ্যতা আপনার নেই — ঠিক কিনা?'

'এ সব আপনি কী বলছেন?' সে শান্ত স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল।

ইলিয়া তার মুখের দিকে তাকাল, দেখে খুশি হল যে তার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠছে, দুই গাল লাল হয়ে উঠছে।

'যা ভাবি তা-ই বললাম! আমি যা ভাবি তা হল এই যে আপনার বস্তাপচা বড়লোকী চালের দাম কাণাকড়িও নয়!'

'আমার কোন বড়লোকী চাল নেই!' মেয়েটির গলা ঝনঝন করে বেজে উঠল। ভাইটি ওর কাছে ছুটে এসে হাত ধরল, কটমট করে মনিবের দিকে তাকাতে তাকাতে সেও চেঁচিয়ে বলল:

'আয় সোনিয়া, এখান থেকে চলে যাই!'

ইলিয়া ওদের দুজনের ওপরই চোখ বুলাল, এখন তার চোখে ফুটে উঠেছে ঘৃণা; সে ঠাণ্ডা গলায় বলল:

'হ্যাঁ, কেটে পড় দেখি। আমাকে দিয়ে তোমাদের যেমন কোন কাজ নেই, তেমনি তোমাদের দিয়েও আমার কোন কাজ নেই।'

ওরা দুজনেই কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে তার চোখের ওপর ঝলক দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ওদের পেছন পেছন ইলিয়া হেসে উঠল। এখন সে দোকানে একা। সফল প্রতিহিংসার তীব্র মধুর স্বাদ প্রাণভরে গ্রহণ করতে করতে সে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটির বিক্ষুব্ধ, হতচকিত ও সামান্য ভীত চেহারা ইলিয়ার মনের মধ্যে রীতিমতো গাঁথা হয়ে থাকল।

'ছেলেটাও...' ওর মাথায় এলোমেলো চিন্তা ঘুরতে লাগল। গাভ্রিকের আচরণ তার মনে খানিকটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল, মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিল।

'কী আমার দেমাক রে!..' মনে মনে হাসতে হাসতে সে ভাবল। 'তাতিয়ানাটা এলে হত এখন, এই সঙ্গে ওকে একচোট নেওয়া যেত...'

ভেতরে ভেতরে তার ইচ্ছে করছিল সব লোককে নিজের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, তাদের খোঁদিয়ে দেয় অপমান করে, কোন রকম দয়ামায়া না করে অভদ্র ভাবে...

কিন্তু তাতিয়ানা এলো না। সারাটা দিন তার একা একা কাটল, দিন যেন অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ। বিছানায় শুতে গিয়ে নিজেকে তার নিঃসঙ্গ মনে হল, মেয়েটির কথার চেয়ে এই নিঃসঙ্গতার আঘাত আরও ভয়ঙ্কর বলে তার মনে হল। চোখ বুঁজে সে রাতের নিস্তব্ধতায় কান পাতে শব্দের প্রত্যাশায়, শব্দ শোনা মাত্রই সে চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে বিস্ফারিত চোখে অন্ধকারের দিকে তাকায়। একেবারে সকাল পর্যন্ত তার ঘুম হল না — সে যেন কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল, তার মনে হল সে যেন পাতাল ঘরে বন্দী হয়ে আছে, গরমে ও বিদ্‌ঘুটে, অসংলগ্ন ভাবনায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। যখন সে বিছানা ছেড়ে উঠল তখন তার মাথা ভার হয়ে আছে। একবার ইচ্ছে হল সামোভার গরম করে, কিন্তু করল না। হাতমুখ ধুয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে দোকান খুলল।

দুপুরবেলা নাগাদ রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ভুরু কুঁচকে পাভেল এসে হাজির। বন্ধুর সঙ্গে কোন প্রীতি সম্ভাষণ না করে সে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করল:

'তোর এত দেমাক কিসের রে?'

পাভেল কী বলতে চায় তা বুঝতে পেরে ইলিয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল, চুপ করে থেকে মনে মনে ভাবল:

'এটাও আমার বিরুদ্ধে...'

'সোফিয়া নিকোনোভ্‌নাকে তুই অপমান করেছিস কেন?' বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে পাভেল জিজ্ঞেস করল। তার থমথমে মুখ ও চোখের ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করে ইলিয়া নিন্দার পরিমাণটা আঁচ করতে পারল, কিন্তু সে তা গায়ে মাখল না।

ধীরে ধীরে ক্লান্ত স্বরে বলল:

'দেখা হলে প্রথমে ভালো-মন্দ দুটো কথা জিজ্ঞেস করতে হয়... মাথার টুপিটা খোল — এখানে আইকন আছে...'

কিন্তু পাভেল তার টুপির কানাত চেপে ধরল, টুপিটা আরও ভালো করে মাথার ওপর ঠাসল, উত্তেজনায় তার ঠোঁট বেঁকে গেল, রাগে জ্বলে উঠে কাঁপা কাঁপা গলায় সে তোড়ে মুখ ছুটিয়ে বলে চলল:

'কত চালিয়াতি করবি কর! বড়লোক হয়েছিস, না? এখন তোর খাওয়ার অভাব নেই কি না! মনে আছে, এক দিন তুই-ই বলেছিলি, 'আমাদের কেউ নেই!' পেলি সেই লোক, অথচ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলি... ব্যবসাদার আর কাকে বলে!'

কেমন একটা আলস্যের ভোঁতা অনুভূতিবশত ইলিয়া তার বন্ধুর কথার জবাব দিতে পারল না। নির্বিকার দৃষ্টিতে সে পাভেলের উত্তেজিত ও বিদ্রূপভরা মুখ লক্ষ্য করতে লাগল, অনুভব করল পাভেলের তিরস্কার তার মনে আঘাত করছে না। পাভেলের ঠোঁটের ওপরে ও থুতনিতে হলদেটে রঙের গোঁফদাড়ির রেখা তার রোগাটে মুখের ওপর ছ্যাত্‌লার মতো দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকাতে তাকাতে ইলিয়া উদাসীন ভাবে চিন্তা করল:

'আমি কি ওকে খুব অপমান করেছি? আরও খারাপ হতে পারত...'

'ও সব বোঝে, সব বুঝিয়ে দিতে পারে... আর তুই কিনা ওর সঙ্গে... এঃ!' পাভেলের ঐ স্বভাব — কথার মধ্যে সে ঘন ঘন বিস্ময়সূচক শব্দ ছিটাবেই।

'থাম দেখি,' ইলিয়া বলল। 'আমাকে শেখাতে এসেছিস না কি? আমার যা খুশি তাই করব... যেমন খুশি তেমনি জীবন কাটাব... তোদের সবার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে... একেকজন আসে আর গায়ে পড়ে যত উপদেশ...'

জিনিসপত্রভর্তি তাকের গায়ে দেহের ভার ঠেকিয়ে ইলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে, নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল:

'কী এমন জিনিস তোমরা বলতে পার?'

'ও সব পারে,' পাভেল উৎসাহিত হয়ে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল, যেন হলফ করে বলতে প্রস্তুত, এমনি ভঙ্গিতে সে ওপর দিকে হাতও তুলল। 'ওরা সব জানে!'

'তা সেই তাদের কাছেই যা না বাপু!' ইলিয়া উদাসীন ভাবে ওকে পরামর্শ দিল। পাভেলের কথা, তার উত্তেজনা ইলিয়ার ভালো লাগছিল না, কিন্তু বন্ধুকে বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তিও তার ছিল না। একটা ভার ভার, চটচটে বিষণ্ণতা তাকে কথা বলা ও ভাবা থেকে নিবৃত্ত করল, তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

'যাবই ত!' হুমকির সুরে পাভেল বলল। 'যাব, কেননা বুঝতে পারছি যে একমাত্র ওদের কাছেই আমার থাকা উচিত, আমার যা যা দরকার তার সবই ওদের ওখানে পেতে পারি — সব!'

'গাঁকগাঁক করিস না,' ইলিয়া নিস্তেজ ভাবে মৃদু স্বরে বলল।

একটা বাচ্চা মেয়ে এসে এক ডজন শার্টের বোতাম চাইল। ইলিয়া ধীরে সুস্থে তাকে বোতাম দিল, তার হাত থেকে কুড়ি কোপেকের মুদ্রা তুলে নিয়ে দু আঙ্গুলে ঘষে খদ্দেরকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল:

'খুচরো নেই, পরে দিস।'

ক্যাসবাক্সতে খুচরো ছিল, কিন্তু বাক্সের চাবি ছিল ঘরের ভেতরে, চাবির জন্য যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। মেয়েটি চলে যাবার পর পাভেল আর নতুন করে কথা তুলল না। কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মাথার টুপি খুলে হাঁটুর ওপর চাপড় মারছিল এবং কিছু একটার প্রত্যাশার বন্ধুর দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ইলিয়া এক পাশে মুখ সরিয়ে নিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিতে লাগল।

'কী বলিস কী তুই?' আস্ফালনের সুরে পাভেল জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না,' ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না।

'তাহলে কিছুই কি তোর বলার নেই?'

'খ্রীস্টের দোহাই, আমাকে রেহাই দে!' ইলিয়া আর থাকতে না পেয়ে খিঁচিয়ে উঠল।

পাভেল টুপিটা মাথায় ফেলে চলে গেল। ইলিয়া তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার শিস দিতে লাগল।

একটা বাদামী রঙের বড়সড় কুকুর দরজায় উ'কি মেরে লেজ নাড়তে নাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর দোরগোড়ায় দেখা দিল দীর্ঘনাসা এক ভিখিরি বুড়ি। সে নমস্কার জানিয়ে মৃদু স্বরে বলল:

'গরিবকে দুটি ভিক্ষে দাও বাবা...'

ইলিয়া নীরবে মাথা নেড়ে তাকে চলে যেতে বলল। রাস্তায় গরম হাওয়ার মধ্যে চলছে কর্মব্যস্ত দিনের কোলাহল। মনে হচ্ছে বুঝি এক বিশাল চুল্লি জ্বলছে, আগুনের গ্রাসে পটপট্ করছে লাকড়ি, অসহ্য হল্কা ছুটছে। লোহার ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে — মালবাহী ঘোড়ার গাড়ি চলছে, গাড়ি থেকে লোহার বড় বড় রড বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে, বাঁধানো সদর রাস্তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, ঘর্ঘর, ঝনঝন আওয়াজ করে চলছে। শানওয়ালা ছুরিতে শান দিচ্ছে — কর্কশ, কি'চ্কি'চ্ শব্দ শূন্যদেশ কেটে বসে যাচ্ছে...

প্রতিটি মিনিট কিছু না কিছু নতুনের, অপ্রত্যাশিতের জন্ম দিচ্ছে, জীবন তার কোলাহলের বৈচিত্র্যে, গতির অক্লান্ততায়, অবিরাম সৃজনের শক্তিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিস্ময় সঞ্চার করছে। কিন্তু ইলিয়ার হৃদয় শান্ত, সেখানে মরণের রাজত্ব, সব যেন থেমে গেছে — নেই কোন চিন্তা, নেই বাসনা, আছে কেবল নিদারুণ ক্লান্তি। এই অবস্থায় তার সারাদিন কেটে গেল, তারপর কাটাতে হল রাত — দুঃস্বপ্নের রাত... এবং এমনি আরও অনেক দিন, অনেক রাত। লোকজন দোকানে আসত, তাদের যা যা দরকার কিনত, চলে যেত, আর ইলিয়া নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবত:

'আমাকে দিয়ে ওদের কোন কাজ নেই, ওদের দিয়েও আমার কোন কাজ নেই... আমি একাই থাকব।'

গাভ্রিকের জায়গায় এখন তার সামোভার গরম করে আর দুপুরের খাবার এনে দেয় বাড়িওয়ালার রাঁধুনী। মেয়েলোকটি রোগা লিকলিকে, তার চেহারা বিমর্ষ, মুখ লাল টকটকে, চোখজোড়া বিবর্ণ, স্থির। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে ইলিয়া মনের গহনে কোথায় যেন একটা ক্ষোভ অনুভব করে, ভাবে:

'তাহলে সত্যিই কি জীবনে ভালো কিছু দেখতে পাব না?'

নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা ছাড়া ইলিয়া থাকতে পারত না, সেগুলো তাকে উদ্বিগ্ন করত, উত্যক্ত করত কিন্তু তাদের নিয়ে বেশ থাকা যেত। সে সব অভিজ্ঞতা নিয়ে আসত মানুষেরা। আর এখন মানুষজন কোথায় উধাও হয়ে গেছে, আছে কেবল খদ্দেরের দল। তা ছাড়া নিঃসঙ্গতার অনুভূতি ও সুখী জীবনের জন্য আকুলতা আবার সব কিছুর প্রতি উদাসীনতায় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল, আবার তার দিনগুলো ক্লান্তিকর ভাবে মন্থর হয়ে আসে, একটা গুমোট ভাব তাকে চেপে ধরে।

এক দিন সকালে ইলিয়ার সবে ঘুম ভেঙেছে, বিছানায় বসে বসে সে ভাবছিল, আরও একটি দিন এলো — এটাকে পার করতে হবে...

এমন সময় উঠোনের দিকের দরজায় থেকে থেকে ঘন ঘন আঘাত পড়তে লাগল।

ইলিয়া উঠে দাঁড়াল, ভাবল রাঁধুনী সামোভার গরম করতে এসেছে। দরজা খুলতেই একেবারে কুঁজোর মুখোমুখি পড়ে গেল।

'এঃ কী কান্ড!' মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে তেরেন্‌তি বলল। 'নয়টা বাজতে চলল, দোকানের ঝাঁপ এখনও খোলা হয় নি! কী ব্যবসাদার রে তুই?'

ইলিয়া দরজা জুড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, সেও হাসছিল। তেরেন্‌তির মুখ রোদে কেমন যেন পুড়ে গেছে, তবে বেশ তরতাজা হয়েছে; তার চোখের দৃষ্টিতে খুশিখুশি আর ছটফটে ভাব। পায়ের সামনে পোঁটলাপুঁটলি পড়ে ছিল, সেগুলোর মাঝখানে ওকেও একটা পোঁটলা বলে মনে হচ্ছিল।

'আরে ঘরে ঢুকতে দিবি ত!'

ইলিয়া কোন কথা না বলে পোঁটলাপুঁটলি বয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে লাগল আর তেরেন্‌তি চোখের দৃষ্টিতে আইকন খুঁজে বার করে তার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করল, ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে বলল:

'ভগবান, তোমার দয়ায় আবার বাড়িতে ফিরে এসেছি! ভালো আছিস ত রে ইলিয়া?'

কাকাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে ইলিয়া অনুভব করল যে কুঁজোর দেহটা বেশ শক্তসমর্থ হয়ে উঠেছে।

'একটু হাত মুখ ধোওয়া দরকার,' ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে

তেরেন্‌তি বলল। বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ফলে তার কুঁজটা যেন নীচে নেমে গেছে।

'কেমন আছিস?' আঁজলা করে চোখেমুখে জল ছিটাতে ছিটাতে সে তার ভাইপোকে জিজ্ঞেস করল।

খুড়োকে এমন নবরূপে দেখতে পেয়ে ইলিয়ার ভালোই লাগছিল। সে চা তৈরী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে টেবিলের ধারে ঘুরঘুর করছিল, কুঁজোর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল সংযত ভাবে, সন্তর্পণে।

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি? ভালোই আছি,' চোখ বুঁজে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে তেরেন্‌তি বলল। 'এত চমৎকার ঘুরলাম যে কী বলব! এক কথায় বলতে গেলে, যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম...'

সে টেবিলের পাশে এসে বসল, আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি পাকাতে পাকাতে মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে বলতে শুরু করল:

'আমি একাসনে বসে-থাকা আফানাসির কাছে গিয়েছিলাম, পেরেইয়াস্লাভ্‌লের সাধুদের অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলাম, ভরনেজের মিত্রোফানি আর জাদোনের তিখনের কাছেও গিয়েছিলাম। ভালায়াম দ্বীপ ঘুরে এসেছি, বহু দেশ ঘুরেছি। অনেক সাধুসন্ন্যাসীর কাছে প্রার্থনা করেছি: এখন আসছি মুরোম থেকে — সাধু পিটার আর ফাভ্রোনিয়ার মঠ ঘুরে...'

বোঝাই যাচ্ছে সাধু-সন্ত আর শহরের নাম উলেখ করে সে রীতিমতো তৃপ্তি পাচ্ছে — তার মুখে মিষ্টি হাসি, চোখে গর্বের ভাব। কুশলী কথকেরা যেমন সুরেলা ভঙ্গিতে রূপকথা কিংবা সাধুসন্ন্যাসীদের কাহিনী বর্ণনা করে তার কথনেও সেই রকম একটা ভাব ছিল।

'পবিত্র মঠের গুহায় — জমাট নিস্তব্ধতা, সেখানকার অন্ধকারে গা ছমছম করে আর সেই আঁধারের মাঝখানে খুদে খুদে চোখের মতো মিটমিট করছে প্রদীপের আলো — চার দিকে পবিত্র জগতের গন্ধ...'

এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল, জানলার বাইরে হুহু, করকর আওয়াজ শুরু হয়ে গেল, টিনের চাল গমগম করে উঠল, সেখান থেকে গলগল শব্দে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, বাতাসে যেন মোটা তারের গোছা ঝনঝন করে কাঁপছে।

'আ-চ্ছা,' ইলিয়া ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলল। 'তার মানে মনের বোঝা হালকা হল?'

তেরেন্‌তি মিনিটখানেক চুপ করে রইল, তারপর ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে, গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে তাকে বলল:

'তুলনা করে বলতে গেলে পায়ে আঁটো জুতের মতো আমার অনিচ্ছায় করা এই পাপ বুক চেপে ধরেছে... আমার অনিচ্ছায় করা — কেননা, তখন যদি পেত্রুখার কথা না শুনতাম তাহলে ও আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিত। আস্ত রাখত না... ঠিক বলছি কিনা?'

'তা ঠিক,' ইলিয়া সায় দিয়ে বলল।

'তাহলেই বোঝ! তীর্থযাত্রায় বেরোতেই মনটা হালকা হয়ে গেল... যেতে যেতে মনে বললাম, 'প্রভু, তুমিই দেখছ — তোমার বর যাঁরা পেয়েছেন সেই সাধুসন্তদের কাছে প্রার্থনা করতে চলেছি...''

'তার মানে দেনা-পাওনা মিটিয়ে এলে?' ইলিয়া মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল।

'প্রভু আমার প্রার্থনা কী ভাবে নেবেন তা আমি জানি না,' চোখ ওপরের দিকে তুলে কুঁজো বলল।

'কিন্তু তোমার মন কী বলছে? — এখন শান্ত ত?'

তেরেন্‌তি কান পেতে কিছু একটা শোনার মতো ভঙ্গি করে, একটু ভেবে বলল:

'আপাতত চুপচাপ...'

ইলিয়া উঠে পড়ল, জানলার দিকে এগিয়ে গেল। ফুটপাতের পাশ দিয়ে মোটা ধারায় ছুটছে ঘোলা জলের স্রোত; বড় রাস্তায়, ইট পাথরের মাঝখানে ইতস্তত ছোট ছোট ডোবা সৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির ছাট পড়ে ডোবার জল কাঁপছে — তাতে মনে হচ্ছিল গোটা বড় রাস্তাটাই যেন কাঁপছে। দোকানের উল্‌টো দিকের বাড়িটা আগাগোড়া ভিজে সপসপ করছে, মুখ গোমড়া করে আছে, বাড়ির জানলার কাচ এমন ঘোলাটে হয়ে গেছে যে ঘরের ভেতরে টবে সাজানো ফুলগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা ফাঁকা ও কোলাহলশূন্য — কেবল বৃষ্টির ঝমঝম আর জলস্রোতের কলকল শব্দ। একটা দলছাড়া পায়রা জানলার চৌকাঠের পাশের তক্তায়, কার্নিশের নীচে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। রাস্তাঘাট জুড়ে সর্বত্র বয়ে চলেছে একটা স্যাঁতসেঁতে, ভারী বিষাদের ভাব।

'শরৎ শুরু হয়ে গেল,' — ইলিয়া মনে মনে বলল।

'প্রার্থনা ছাড়া আর কী করেই বা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি?' পুঁটলির গিঁট খুলতে খুলতে তেরেন্‌তি বলল।

'খুবই সহজ ব্যাপার,' কাকার দিকে ফিরে না তাকিয়ে মুখ গোমড়া করে ইলিয়া মন্তব্য করল। 'পাপ করলাম, পরে গিয়ে খানিকটা প্রার্থনা করলাম — চুকে গেল! আবার পাপ করা যেতে পারে...'

'তা কেন? শুদ্ধ ভাবে থাকলেই হল...'

'কিসের জন্যে, শুনি?'

'মনের দিক থেকে যাতে পরিষ্কার থাকা যায়...'

'তাতে লাভটা কী?'

'বটে, বটে...' তেরেন্‌তি আপত্তির সুরে টেনে টেনে বলল। 'এ সব কী বলছিস!..'

'একশবার বলব,' কাকার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ইলিয়া গোঁ ধরে জোর দিয়ে বলল।

'পাপ কথা!'

'পাপ ত বেশ...'

'এর জন্যে তোকে শাস্তি ভোগ করতে হবে!'

'মোটেই না...'

এবারে সে জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তেরেন্‌তির দিকে তাকাল। কুঁজো ঠোঁট দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে আপত্তি প্রকাশের মতো লাগসই কথা খুঁজতে লাগল, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়ে গম্ভীর ভাবে বলল:

'হবে! এই দ্যাখ না আমি — পাপ করেছিলাম, তার শাস্তিও ভোগ করলাম...'

'কী ভাবে?' মুখ ভার করে ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'মনে মনে ভয় থাকবে। এই আমাকে সব সময় থাকতে হত ভয়ে ভয়ে — যদি কেউ জেনে ফেলে?'

'আমি কিন্তু পাপ করেছি, অথচ ভয় পাই না,' ইলিয়া বাঁকা হাসি হেসে জানাল।

'যত সব পাগলের কথা,' তেরেন্‌তি কঠিন স্বরে বলল।

'ভয় পাই না! তবে জীবন আমার দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে...'

'হুঁ-হুঁ!' তেরেন্তির সুরে বিজয়ীর উল্লাস। 'এটাই হল শাস্তি!'

'কী কারণে?' ইলিয়া প্রায় ক্ষ্যাপার মতো চিৎকার করে উঠল। তার চোয়াল থরথর করে উঠল। শূন্যে একটা দড়ি নাচাতে নাচাতে তেরেন্তি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'চেঁচাস নে, চেঁচাস নে!' সে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল।

কিন্তু ইলিয়া চেঁচানি থামাল না। অনেক কাল লোকজনের সঙ্গে তার বাক্যালাপ নেই; নিঃসঙ্গতার এই দিনগুলোতে তার মনের মধ্যে যা কিছু জমা হয়ে ছিল এখন তাই সে তা সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে লাগল।

'কেবল চুরি-ডাকাতি নয়, খুন কর না কেন — কিছুই হবে না! শাস্তি কে দেবে? শাস্তি পায় আনাড়িরা, আর যারা ধূর্ত তারা সব কিছু গুছিয়ে নিতে পারে — সব!'

হঠাৎ দরজার ওপাশে কী যেন দড়াম্ করে পড়ে গড়িয়ে গেল, হুড়মুড় শব্দ করতে করতে দরজার একেবারে কাছাকাছি এসে থামল। ওরা দুজনেই চমকে উঠে চুপ করে গেল।

'কী ব্যাপার?' কুঁজো ভয় পেয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

ইলিয়া দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে পাল্লা ফাঁক করে উঠোনে উঁকি মারল। মৃদু শিসের আওয়াজ, ঘড়ঘড়, খসখস শব্দ, শব্দের একটা ঘূর্ণি ঘরে এসে ঢুকল।

'কতকগুলো পেটি গড়িয়ে পড়ে গেছে,' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার জানলার দিকে যেতে যেতে ইলিয়া বলল।

পোঁটলাপুঁটলি খোলার জন্য মেঝের ওপর বসে পড়ে তেরেন্তি বলল:

'না, অমন কথা মনেও আনিস না। তুই এমন সব কথা উচ্চারণ করিস, ওঃ, কী যে বলব! তোর নাস্তিকতায় ভগবানের কিছুই আসে-যায় না, ক্ষতি হবে তোর নিজেরই... জ্ঞানের কথা যাকে বলে তা ভাই আমি শুনেছি একজনের কাছ থেকে... কত জ্ঞানের কথা যে শুনলাম!'

ইলিয়ার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে সে আবার তার যাত্রার বর্ণনা দিতে লাগল। তার কথাগুলো বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজের মতো ইলিয়ার কানে এসে বাজল, তার ভাবনা হল কাকার সঙ্গে থাকবে কী করে...

থাকার ব্যবস্থাটা মন্দ হল না। রাতের বেলায় ঘরের যে কোনাটায় অন্যান্য

জায়গার তুলনায় অন্ধকার বেশি ঘন হয়ে জমাট বাঁধত, সেখানে চুল্লি আর দরজার মাঝখানে কতকগুলো পেটি সাজিয়ে তেরেন্‌তি নিজের জন্য খাট তৈরি করল। ইলিয়ার জীবনযাত্রা লক্ষ্য করার পর গাভ্রিক যে সব কাজ করত সেগুলোর ভার সে নিজের ওপর নিল — সামোভার গরম করত, দোকান ও ঘর ঝাঁট দিত, খাবার আনতে সরাইখানায় যেত, আর সব সময় গুনগুন করে নাকি সুরে ভজন আওড়াত। সন্ধ্যাবেলায় সে ভাইপোকে শোনাত কী করে হাল্‌লেলুইয়ার স্ত্রী জ্বলন্ত চুল্লিতে নিজের সন্তানকে ফেলে দিয়ে তার বদলে খ্রীস্টকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচায়। কোথায় কোন সন্ন্যাসী এক নাগাড়ে তিনশ বছর পাখির গান শুনে গেছে তার কাহিনী, কিরিক ও উলিতার কথা এবং আরও অনেক কাহিনী সে শোনাত। শুনতে শুনতে ইলিয়া আপন মনে ভাবনা-চিন্তা করে যেত... কখনও কখনও সন্ধ্যায় সে বেড়াতে বের হত, তাকে সব সময় প্রলুব্ধ করত শহরের উপকণ্ঠ। সেখানে মাঠের ওপর রাত হত তেমনি নিস্তব্ধ, আঁধার ও ফাঁকা যেমন ছিল তার নিজের হৃদয়।

ফেরার এক সপ্তাহ বাদে তেরেন্‌তি পেত্রুখা ফিলিমোনভের কাছে যায়, সেখান থেকে যখন সে ফিরে এলো তখন তাকে ভগ্নোদ্যম ও আহত দেখাচ্ছিল। কিন্তু ইলিয়া যখন জিজ্ঞেস করল তার কী হয়েছে তখন সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল:

‘কিছু না, কিছু না। ওখানে গেলাম, সব দেখলাম-শুনলাম, কথাবার্তাও হল আর কি...’

‘ইয়াকভের খবর কী?’ ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

‘ও, ইয়াকভ্‌ ত?.. ছেলেটা মরতে বসেছে। ফেকাসে হয়ে গেছে... কাশছে...’

তেরেন্‌তি চুপ করে গেল, বিষাদ ও করুণায় তার মন ভরে গেল, সে কোনার দিকে তাকিয়ে রইল।

জীবন সমান তালে, একঘেয়ে ভাবে কেটে যেতে লাগল — দিনগুলো যেন একই সময়ে টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসা তামার পয়সা — একে অন্যের মতো। ইলিয়ার মনের গহনে বিশাল এক সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল বিষাদগ্রস্ত বিক্ষোভ, গিলে খেতে লাগল তার জীবনের সমস্ত অনুভূতিকে। পুরনো চেনাপরিচিতদের কেউ আর তার কাছে আসে না — পাভেল আর

মাশা জীবনের অন্য কোন পথ খুঁজে পেয়েছে বলেই মনে হয়; মাতিৎসাকে ঘোড়া ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, সে হাসপাতালে মারা গেছে; পেরফিশ্‌কা উধাও হয়েছে — বেমালুম উবে গেছে। ইলিয়ার বারবার ইচ্ছে হত ইয়াকভের কাছে যায়, কিন্তু যাওয়া আর কিছুতেই হয়ে উঠত না যখন সে মনে মনে ভাবত যে মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে তার বলার কিছুই নেই। সকালে সে খবরের কাগজ পড়ত আর দিনের বেলায় দোকানে বসে বসে লক্ষ্য করত গাছ থেকে খসে পড়া হলুদ পাতা শরতের হাওয়ায় রাস্তার ওপর হুটোপুটি খাচ্ছে। কখনও কখনও দোকানের ভেতরেও এ রকম পাতা উড়ে এসে পড়ত...

'হে পরম পবিত্র পিতঃ তিখোন, আমাদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর...' ঘরের কাজ করতে করতে তেরেন্‌তি শুকনো পাতার মতো খসখসে গলায় গুনগুন করে যেত।

এক রবিবারে খবরের কাগজ খুলতে ইলিয়া তার প্রথম পৃষ্ঠায় দেখতে পেল কবিতা — 'অতীত ও বর্তমান', স. ন. ম-র উদ্দেশে। নীচে নাম লেখা আছে — প. গ্রাচোভ।

যৌবনের দিনগুলি হল অপব্যয়
প্রলাপের ঘোরে আর মনোযাতনায়।
অন্ধ আমি, কোন ঘোরে চলি কোনখানে? —
একথা জাগে নি কভু চেতনায়, মনে।
    চতুর্দিকে আঁধারের ঘন বেড়াজাল
    চেতনা ও নয়নের ছিল অন্তরাল।
    দিবস-রজনী তবু মোর প্রাণ মন
    আলোকের তরে ছিল হয়ে উচাটন!
অকস্মাৎ — অন্তরের পরিপূর্ণ দ্যুতি,
সম্মুখে দাঁড়ালে তুমি কী দৃপ্ত মুরতি!
আঁধারের যবনিকা সঘনে শিহরে,
আঁখি ও মনের বাধা দূরে যায় সরে!
    এই কাল রজনীর হবে অবসান!
    জড়তার গ্রাস থেকে আমি মুক্ত প্রাণ,
    অনুভব করি আজি পেয়েছি সখারে।
    জানিলাম পরিষ্কার — শত্রু বলে কারে!..

কবিতাটা পড়ার পর ইলিয়া রেগে কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'লেখ, লেখ! যত খুশি বানা! বন্ধু... শত্রু। যে আহাম্মক, তার কাছে সকলেই শত্রু... তা ছাড়া আর কী?' ইলিয়া বাঁকা হাসি হাসল। কিন্তু হঠাৎ তার অন্য একটা সত্তা যেন বলে উঠল, 'আচ্ছা একবার সেখানে গেলে হয় না? গিয়ে বলব, এলাম আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে...'

'কোন দুঃখে?' তৎক্ষণাৎ সে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ মনে সে স্থির সিদ্ধান্ত করল:

'আমাকে তাড়িয়ে দেবে...'

তারপর মনের মধ্যে অপমান ও ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে সে আবার কবিতাটি পড়ে ফেলল, আবার মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল:

'দেমাকী... আমাকে কি আর ভালো চোখে দেখবে?.. কোন সুবিধে হবে না...'

ঐ একই দিনের পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে সে পড়ল, চৌর্যের অপরাধে অভিযুক্ত ভেরা কাপিতানভার বিচারের শুনানী তেইশে সেপ্টেম্বর তারিখে সার্কিট কোর্টে হবে বলে ধার্য হয়েছে। ইলিয়ার মনের মধ্যে একটা হিংস্র উল্লাসের অনুভূতি দপ্ করে জ্বলে উঠল, পাভেলের উদ্দেশ্যে সে মনে মনে, বলল:

'কব্‌তে কপচাচ্ছিস? আর এদিকে ও এখনও জেলে পচে মরছে?..'

'প্রভু, করুণাময়! পাপী তাপীকে দয়া কর,' বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে তেরেন্‌তি বলল। তারপর ভাইপোকে কাগজ নিয়ে খচমচ করতে দেখে তাকে ডাকল: 'ইলিয়া...'

'অ্যাঁ?'

'পেত্রুখা ত...'

কুঁজো করুণ হাসি হাসল, চুপ করে রইল।

'কী?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'আমার ওপর বাটপারী করল,' মিন্‌মিন করে অপরাধীর ভঙ্গিতে কথাটা বলে তেরেন্‌তি হতাশ ভাবে হিহি করে উঠল। ইলিয়া উদাসীন দৃষ্টিতে কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তোমরা কত টাকা মেরেছিলে?'

কাকা চেয়ারসুদ্ধ টেবিল থেকে সরে বসল, মাথা নীচু করে কোলের ওপর দুহাত রেখে কর গুনে হিসাব করতে লাগল।

'দশ হাজার কি?' ইলিয়া আবার জিজ্ঞেস করল।

কুঁজো ঝটকা মেরে মাথা তুলল, অবাক হয়ে টেনে টেনে বলল:

'দ-শ হা-জা-র! হা ভগবান, বলিস কী রে তুই! ছিলই সাকুল্যে তিন হাজার ছ'শ আর কিছু খুচরো-খাচ্‌রা, তুই কিনা বলছিস দশ হাজার! আর বলিস নে।'

'দাদুর কাছে দশ হাজারেরও বেশি ছিল,' ইলিয়া বাঁকা হাসি হেসে বলল।

'বা-জে কথা...'

'বললেই হল? দাদু নিজে বলেছে...'

'আরে ও কি গুনতে জানত নাকি?'

'তোমার আর পেত্রুখার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়...'

তেরেন্‌তি ভাবতে লাগল, আবার মাথা নীচু করল।

'পেত্রুখা কতটা পাওনা দেয় নি?' ইলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'সাতশ মতন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তেরেন্‌তি বলল। 'তুই বলছিস দশ হাজারেরও বেশি? এত টাকা তাহলে কোথায় লুকানো ছিল। আমার ত মনে হয় সবটাই আমাদের হাতে এসে পড়েছিল... পেত্রুখা যে আমাকে তখনই ফাঁকি দেয় নি তা-ই বা কে বলতে পারে... অ্যাঁ?'

'ও সব কথা না বললেই কি ভালো না?' ইলিয়া বিরক্তিভরে বলল।

'হ্যাঁ, এখন আর তা বলে লাভ কী?' তেরেন্‌তি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দিল।

ইলিয়া ভাবল লোকে কী লোভী হতে পারে, টাকার খাতিরে কত জঘন্য কাজই না করতে পারে! কিন্তু তক্ষুনি সে মনে মনে কল্পনা করল তার নিজের যদি এখন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা থাকত তাহলে সে লোকজনের ওপর এক হাত নিতে পারত! সে তাদের বাধ্য করত তার সামনে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিতে, সে তাহলে... প্রতিহিংসার চিন্তায় ইলিয়া এমনই অন্যমনস্ক হয়ে ছিল যে সে টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বসল — ঘুষি মারার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে কাকার দিকে তাকাল, দেখতে পেল যে কুঁজো ভয়ার্ত দৃষ্টিতে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম,' টেবিলের ধার থেকে উঠতে উঠতে ইলিয়া মুখ কালো করে বলল।

'তা অমন হয়,' সন্দেহের সুরে সায় দিয়ে কুঁজো বলল।

ইলিয়া দোকানে যেতে সে কৌতূহলভরে তার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে রইল, তার ঠোঁটজোড়া নীরবে কাঁপতে লাগল... ইলিয়া দেখতে না পেলেও নিজের পেছনে একজোড়া সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টি অনুভব করল। বেশ কিছুদিন হল সে লক্ষ্য করেছে যে কাকা তার ওপর নজর রাখছে, কী একটা যেন বোঝার চেষ্টা করছে, কিছু একটা যেন জিজ্ঞেস করতে চায়। এর ফলে ইলিয়া কাকার সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে লাগল। প্রতিদিনই সে আরও বেশি করে অনুভব করতে লাগল যে কুঁজো তার জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, সে তাই প্রায়ই নিজেকে জিজ্ঞেস করে:

'এমন আর কত দিন চলবে?'

ইলিয়ার মনের মধ্যে যেন একটা বিষফোড়া পেকে উঠতে লাগল; জীবনযাত্রা আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার এই যে তার কিছুই করতে ইচ্ছে হত না — কিছুতেই তার আর কোন আকর্ষণ নেই, কিন্তু থেকে থেকে মনে হত যেন সে ধীরে ধীরে অন্ধকার গহ্বরের আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে।

তেরেন্তি আসার কিছু দিন বাদেই শহরের বাইরে কোথা থেকে যেন বেড়িয়ে আসার পর তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না দোকানে এসে হাজির। খয়েরী রঙের সুতীর জামা গায়ে একটা কুঁজো লোককে দেখতে পেয়ে সে নাক সিঁটকে, ঠোঁট কামড়ে ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করল:

'এ কি আপনার কাকা?'

'হ্যাঁ,' ইলিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিল।

'আপনার সঙ্গে থাকবে না কি?'

'তা আর বলতে...'

পার্টনারের উত্তরে যুদ্ধং দেহি ভাব টের পেয়ে সে আর কুঁজোর দিকে নজর দিল না। দরজার পাশে যে জায়গায় গাভ্রিক দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেরেন্তি দাড়ি পাকাচ্ছিল আর কৌতূহলী দৃষ্টিতে ছাইরঙা পোশাক পরা নারীমূর্তিটাকে লক্ষ্য করছিল। ইলিয়াও দেখছিল চড়াই পাখির মতো দোকানময় তার ফুরুৎ ফুরুৎ লাফালাফি, কিছু না বলে

অপেক্ষা করতে লাগল সে আর কী জিজ্ঞেস করে — সুযোগ পেলেই লাগসই শব্দ ছুঁড়ে তাকে অপমান করার জন্য ইলিয়া মুখিয়ে ছিল। কিন্তু আড়চোখে ইলিয়ার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। কাউণ্টারের ভেতরে দাঁড়িয়ে দৈনিক হিসাবের খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে গাঁয়ের জীবন কেমন সুখের, কত সস্তা আর স্বাস্থ্যের পক্ষে কেমন উপকারী — এই সব কথা সে বলে চলল।

'সেখানে ছিল একটা ছোট্ট নদী — কী শান্ত। ফুর্তিবাজ সঙ্গী-সাথীও জুটে গিয়েছিল... একজন ছিল টেলিগ্রাফ অপারেটর — বেহালায় হাত তার চমৎকার... আমি দাঁড় বাইতে শিখলাম... কিন্তু চাষাভুষোদের ছেলেমেয়েরা! শাস্তিবিশেষ! মশার মতো — ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান... দাও, দাও! ওদের বাবা-মা'রা শিখিয়ে দেয়...'

'কেউ শেখায় না,' নীরস ভাবে ইলিয়া বলল। 'বাবা-মা'রা কাজ করে। আর ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করার কেউ নেই... আপনি ঠিক কথা বলছেন না...'

তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, কিছু একটা বলার জন্য সে হাঁ করল, কিন্তু এমন সময় তেরেন্তি বিনীত হাসি হেসে জানাল:

'গাঁয়ে আজকাল ভদ্দরলোকের দেখা পাওয়াই ভার... আগে গাঁয়ের জমিদার বাবু মাত্রেই সারাজীবন সেখানে থাকতেন আর এখন বেড়াতে আসেন...'

আভ্তনোমভা তার ওপর চোখ বুলাল, তারপর আবার বুলাল ইলিয়ার ওপর, কোন কথা না বলে সে হিসাবের খাতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তেরেন্তি থতমত খেয়ে নিজের গায়ের জামাটা টেনে ঠিক করতে লাগল। মিনিটখানেক দোকানে সব চুপচাপ — শোনা যাচ্ছিল খাতার পাতা ওল্টানোর খসখস শব্দ আর একটা সড়সড় আওয়াজ — তেরেন্তি দরজার চৌকাঠের গায়ে কুঁজ ঘষছে...

হঠাৎ ইলিয়ার নীরস ও শান্ত গলা শোনা গেল:

'তোমাকে বলি কী, ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার আগে অনুমতি চেয়ে নিও: 'বলতে হয়, আজ্ঞা হয়ত বলি...' হাঁটু মুড়ে সম্মান দেখাতে হয়...'

তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্‌নার হাত থেকে খাতাটা খসে ডেস্কের ওপর গড়িয়ে নীচে পড় পড় হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে লুফে নিয়ে সে হাত দিয়ে তার ওপর সশব্দে চাপড় মারল, হেসে উঠল। তেরেন্‌তি মাথা নীচু করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল... তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্‌না এবারে হেসে আড়চোখে ইলিয়ার থমথমে মুখের দিকে তাকাল, অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল:

'রাগারাগি করছ কেন? কী হয়েছে?'

তার মুখে ফুটে উঠেছে ঢলানো, আদুরে আদুরে ভাব আর চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে ঝলকাচ্ছে... ইলিয়া হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করল... ইলিয়ার মনের মধ্যে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, তাকে আলিঙ্গন করার এক পাশব প্রবৃত্তি, নিজের বুকের ওপর তাকে পিষে ফেলে তার সরু সরু হাড়গোড় ভাঙ্গার মড়মড় শব্দ শোনার বাসনা। দাঁত কড়মড় করতে করতে সে তাকে নিজের কাছে টানতে লাগল, তাতিয়ানা খপ্‌ করে ওর হাত ধরে ফেলে নিজের কাঁধ ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, ফিসফিস করে বলল:

'উঃ... ছাড়! লাগে!.. মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এখানে জড়াজড়ি করা ঠিক নয়... আর... শোন! এমন কাকা থাকা অসুবিধার ব্যাপার — কুঁজো, লোকে ওকে ভয় পাবে... ছাড় না। অন্য কোথাও ওর বন্দোবস্ত করা উচিত — শুনছ?'

ইলিয়া ততক্ষণে ওকে আলিঙ্গনপাশে বেঁধে ফেলেছে, দেখতে দেখতে বিস্ফারিত চোখে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'কী হচ্ছে? এখানে ঠিক নয়... থাম!'

সে হঠাৎ নীচু হয়ে বসে পড়ে মাছের মতো কিলবিল করে তার হাত থেকে পিছলে গেল। ইলিয়ার দৃষ্টি গরম কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল — সেই কুয়াসার আড়াল থেকে সে তাতিয়ানাকে রাস্তার ওপর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কাঁপা কাঁপা হাতে ব্লাউজ ঠিক করতে করতে সে বলল:

'ওঃ কী অসভ্য তুমি! একটুকুও তর সয় না?'

ইলিয়ার মাথা ঝাঁঝাঁ করে উঠল — মনে হল মাথার ভেতর যেন শতধারে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। হাতের আঙ্গুলগুলো শক্ত করে খিঁচে ধরে সে কাউণ্টারের পেছনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে তার দিকে

তাকাতে লাগল যেন একমাত্র তার মধ্যেই সে দেখতে পাচ্ছে নিজের জীবনের দুষ্টগ্রহ, সমস্ত গুরুভার।

'এটা ভালো যে তোমার দারুণ আবেগ আছে, কিন্তু লক্ষ্মীটি, একটু সংযম থাকা দরকার যে।'

'চলে যাও!' ইলিয়া বলল।

'যাচ্ছি... আজ তোমাকে আমার কাছে ডাকতে পারছি না, তবে পরশু — তেইশ তারিখ — আমার জন্মদিন, আসবে ত?'

কথা বলতে বলতে সে আঙ্গুল দিয়ে ব্রোচটা হাতড়াচ্ছিল, ইলিয়ার দিকে তার দৃষ্টি ছিল না।

'যাও বলছি!' ওকে ধরে যন্ত্রণা দেওয়ার একটা প্রবল বাসনায় থরথর করে কাঁপতে ইলিয়া আবার বলল।

সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তেরেন্তি এসে হাজির। সে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল:

'এটিই বুঝি তোর পার্টনার?'

ইলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'বোঝ কাণ্ড! দেখতে ছোটখাট, অথচ...'

'কদর্য!' ইলিয়া ভরাট গলায় বলল।

'হুম্,' তেরেন্তি অবিশ্বাসের সুরে অস্ফুট আওয়াজ করল। ইলিয়া অনুভব করল তার কাকা কৌতূহলি দৃষ্টিতে কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টায় তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে তাই খেঁকিয়ে উঠল:

'অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছ?'

'আমি? হা ভগবান! কিছু না...'

'আমি জানি, কী বলছি... বলেছি — কদর্য আর ঠিকই তাই! আরও খারাপ বললেও বেমানান হত না...'

'হুঁ, বোঝা গে-ল,' কুঁজো সহানুভূতির সুরে টেনে টেনে বলল।

'কী?' ইলিয়া কঠিন স্বরে চেঁচিয়ে বলল।

'তার মানে...'

'কী — তার মানে?'

চেঁচামেচিতে ভীত ও অপমানিত তেরেন্‌তি তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার বাঁ পায়ে, একবার ডান পায়ে দেহের ভার হেলাচ্ছিল — তার মুখটা করুণ দেখাচ্ছিল, চোখ দুটো ঘন ঘন পিটপিট করছিল।

'তার মানে — তুইই ভালো জানিস...' একটু চুপ করে থেকে তেরেন্‌তি বলল।

রাস্তায় আর কলকোলাহল নেই। একনাগাড়ে কয়েকদিন যাবত বৃষ্টি পড়ছে। খোয়া বাঁধানো বড় রাস্তার ছাইরঙা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাথরগুলো গোমড়ামুখে ছাইরঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের দেখাচ্ছিল মানুষের মুখের মতো। পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জলকাদা জমে তাদের শীতল পরিচ্ছন্নতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে... গাছের শুকনো হলুদ পাতায় মৃত্যুপথযাত্রীর কাঁপুনি ধরেছে। কোথায় যেন লাঠির ঘন ঘন আঘাতে গালিচা অথবা পশুলোমের পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়া হচ্ছে — বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ। রাস্তার শেষে, বাড়িঘরের ছাদের পেছনে আকাশে উঠছে ঘন ধূসর ও সাদা সাদা মেঘের খণ্ড। বিরাট বিরাট কুণ্ডলীর আকারে ধীরে ধীরে তারা পাকিয়ে পাকিয়ে একে অন্যের ওপর উঠে ক্রমেই আরও ওপরের দিকে চলেছে, ক্রমাগত আকার পাল্‌টাচ্ছে — কখনও আগুনের ধোঁয়ার মতো, কখনও বা পাহাড়ের মতো কিংবা নদীর ঘোলাজলের ঢেউয়ের মতো। মনে হচ্ছিল তারা সকলে বুঝি ছাইরঙা আকাশের মাথায় উঠতে চায় একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে সেখান থেকে বাড়িঘরের ওপর, গাছপালা ও মাটির ওপর আরও শক্তি নিয়ে ঝরে পড়া যায়। চোখের সামনে মেঘের জীবন্ত দেয়াল দেখতে দেখতে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে আর ঠাণ্ডায় তার কাঁপুনি ধরে যাচ্ছিল।

'নাঃ, এই দোকানপাট ছেড়েছুড়ে দিতে হবে... কাকা আর তাতিয়ানা মিলে দোকানদারী করুক গে... আমি চলে যাব...'

মনে মনে সে চোখের সামনে দেখতে পেল বিশাল এক ভিজে মাঠ ছাইরঙা মেঘে ঢাকা আকাশ, এক চওড়া রাস্তা — তার দুপাশে বার্চ গাছের সারি। সে চলেছে ঝুলি কাঁধে ফেলে, কাদায় তার পা আটকে যাচ্ছে, বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাট তার চোখেমুখে এসে লাগছে। মাঠে, রাস্তায় কোন জনপ্রাণী নেই এমনকি গাছে কাকপক্ষীটি নেই আর মাথার ওপর নিঃশব্দে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ঘন নীল মেঘের দল...

'গলায় দড়ি দিয়ে মরব,' উদাসীন ভাবে সে ভাবল।

দুদিন বাদে সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর তার চোখে পড়ল ক্যালেন্ডারের পাতায় কালো অক্ষরের তেইশ সংখ্যাটি — মনে পড়ে গেল আজ ভেরার বিচার হবে। দোকান ছেড়ে যাওয়ার একটা সুযোগ হবে ভেবে তার মনে মনে আনন্দ হল, মেয়েটির ভাগ্য সম্পর্কে সে দারুণ কৌতূহল অনুভব করল। চটপট চা-পান সেরে নিয়ে সে প্রায় ছুটতে ছুটতে আদালতের দিকে চলল। দালানে তখনও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না, দেউড়ির সামনে এক দঙ্গল লোক গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কখন দরজা খোলে। ইলিয়াও দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাছারির সামনে চওড়া চত্বর, তার মাঝখানে একটা বড় গির্জা দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের ম্লান ও ক্লান্ত মুখখানি কখনও উঁকি মারছে কখনও বা মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে মিনিটে মিনিটে দূরে চত্বরের ওপর ছায়া পড়ছে, পাথরের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে, গাছের গা বয়ে উঠছে, আর সে ছায়া এমনই ভারী যে তার ভারে গাছের শাখা প্রশাখা নড়ে উঠছে; তারপর ছায়া গির্জাকে পা থেকে মাথার ক্রস পর্যন্ত জড়িয়ে ফেলল, তার ওপর দিয়ে উপচে পড়ল এবং নিঃশব্দে এগিয়ে চলল আদালতের দালানের দিকে, তার দরজার সামনে অপেক্ষমাণ লোকজনের দিকে...

লোকগুলোকে কেমন যেন ছাইরঙা দেখাচ্ছিল, তাদের চেহারা ক্ষুধার্ত; তারা ক্লান্ত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিল, ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলছিল। তাদের মধ্যে একজনের লম্বা লম্বা চুল, তার গায়ে একটা হালকা ওভারকোট — চিবুক অবধি বোতাম আঁটা, মাথার টুপিটা দোমড়ানো। ঠান্ডায় সিটিয়ে যাওয়া লাল লাল আঙুল দিয়ে সে তার ছুঁচালো কটা দাড়ির গোছা পাকাচ্ছিল এবং অধৈর্য হয়ে ছেঁড়া জুতো পরা পা মাটিতে ঠুকছিল। আরেকজনের গায়ে তালিমারা কোট, মাথার টুপিটা তার চোখের ওপর টানা। একটি হাত কোটের ভেতরে আর অন্যটি পকেটে গুঁজে মাথা গোঁজ করে সে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল লোকটা ঝিমুচ্ছে। কোর্তা আর উঁচু বুট পরনে কালো চুলওয়ালা একটা লোক গুবরে পোকার মতো ছটফট করছিল — ফেকাসে রঙের ধারাল মুখ ওপরে তুলে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, শিস দিচ্ছিল, ভুরু কোঁচকাচ্ছিল, জিভ দিয়ে গোঁফ চাটছিল, কথা বলছিল সকলের চেয়ে বেশি।

'তালা খুলছে?' সে চেঁচিয়ে বলল, তারপর মাথা কাত করে কান পেতে শুনল। 'না... হুম্! সময় ত কম হল না... আপনি একবার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখেছেন কি মশাই?'

'না, সময় হয় নি,' লম্বা চুলওয়ালা লোকটা জবাব দিল — একই সুরে ঘণ্টার ওপর যেন ঢং ঢং দুটো আওয়াজ হল।

'ধুত্তোর!.. কী ঠাণ্ডা মশাই!'

লম্বা চুলওয়ালা সমবেদনার সুরে ওফ্ করে উঠে অন্যমনস্ক ভাবে বলল:

'কোর্ট আর লাইব্রেরী না থাকলে আমরা গা-হাত-পা গরম করতাম কোথায় বলুন?'

কালো চুলওয়ালা কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকাল। ইলিয়া এই লোকগুলোকে লক্ষ্য করতে লাগল, তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। সে দেখতে পেল যে এরা হল যত সব ঘোরেল ও ধান্দাবাজ লোকজন — এদের জীবনধারণের উপায় হল সন্দেহজনক কাজকর্ম, তারা চাষীদের হয়ে আর্জি ও নানারকমের দলিলপত্র লিখে তাদের ঠকায় কিংবা সাহায্যের জন্য সুপারিশপত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে।

দেউড়ির কিছুটা দূরে বড় রাস্তার ওপর একজোড়া পায়রা উড়ে এসে বসল। মদ্দা পায়রাটার গলার থলি ঝুলে পড়েছে, সে মাদী পায়রাটার চারধারে পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে গলা চড়িয়ে বকম্ বকম্ করতে লাগল।

'হু-স্!' যে লোকটার কালোমতো চুল সে জোরে শিস্ দিয়ে উঠল। তালিমারা কোট গায়ে লোকটা চমকে উঠে মাথা তুলল। তার মুখ ফোলা ফোলা, নীলচে, চোখ দুটো কাচের মতো।

'পায়রা দুচক্ষে দেখতে পারি না!' পাখিগুলোকে উড়ে যেতে দেখে সেই দিকে তাকাতে তাকাতে কালো চুলওয়ালা বলল। 'বড়লোক ব্যবসাদারগুলোর মতো... ঘাড়ে-গর্দানে... বকম্ বকম্ করে চলেছে... বিচ্ছিরি! আপনার নামে কি মামলা আছে না কি?' আচমকা সে ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করে বসল।

'না...'

লোকটা ইলিয়ার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে নাকি সুরে বলল:

'আশ্চর্য!..'

'আশ্চর্যের কী আছে?' ইলিয়া কাষ্ঠ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'আপনার মুখ দেখে মনে হয় আপনার নামে কেস আছে,' লোকটা হড়বড় করে বলল। 'ও, গেট খুলছে...'

খোলা দরজা দিয়ে সে প্রথম গলে গেল। তার কথায় খোঁচা খেয়ে ইলিয়া তার পেছন পেছন চলল, দরজার গোড়ায় লম্বা চুলওয়ালার কাঁধের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল।

'আস্তে, এ কী অসভ্যতা রে বাবা!' লোকটা শান্ত স্বরে বলল। অথচ সেও ইলিয়াকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে চলে গেল।

ধাক্কা খেয়ে ইলিয়া অপমানিত না হয়ে বিস্মিতই হল।

'তাজ্জব!' সে মনে মনে বলল। 'ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, যেন লাট-বেলাট, যেন সব জায়গায়ই আগে যাওয়ার অধিকার, অথচ চেহারার ত ঐ ছিরি...'

কোর্টের হলঘর থমথমে, নিস্তব্ধ। সবুজ বনাতে ঢাকা লম্বা টেবিল, উঁচু উঁচু পিঠওয়ালা গদি আঁটা চেয়ার, সোনার গিল্‌টি করা ছবির ফ্রেম, জারের মানুষ-সমান আকৃতির প্রতিকৃতি, জুরীদের জন্য বেগনি রঙের পালিশ করা চেয়ার, কাঠগড়ার ভেতরে কাঠের বিরাট বেঞ্চ — সবই ছিল ভারী ভারী এবং শ্রদ্ধা উদ্রেকের উপযোগী। জানলাগুলো ছাইরঙা মোটা দেয়ালের অনেকখানি ভেতরে বসানো, জানলার ওপর ঝুলছে মোটা মোটা কুঁচি দেওয়া পর্দা, জানলার কাচ ঘোলাটে। ভারী দরজার পাল্লাগুলো নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছিল, নিঃশব্দে, দ্রুত পদক্ষেপে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল উর্দিপরা লোকজন। ইলিয়া এদিক-ওদিক দেখতে লাগল, একটা ভয়ের অনুভূতি তার বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল। আদালতের কর্মচারী যখন ঘোষণা করল, 'শুনানী শুরু হচ্ছে', তখন ইলিয়া চমকে উঠে সকলের আগে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল, যদিও তার জানা ছিল না যে দাঁড়াতে হয়। হলঘরে যে চারজন প্রবেশ করলেন তাঁদের একজন হলেন গ্রোমভ — ইলিয়ার দোকানের উল্‌টো দিকের বাড়িতে যিনি থাকেন। তিনি মাঝের চেয়ারটিতে বসলেন, মাথার চুলে দুহাত বুলিয়ে চুলগুলো খাড়া খাড়া করে তুললেন, ঘন সোনালি কাজ করা কলার পাট করে নিলেন। তাঁর চেহারা ইলিয়াকে কিছুটা আশ্বস্ত করল — সে মুখে বরাবরের মতোই রক্তিম আভা ও প্রসন্ন ভাব, কেবল গোঁফের ডগা এখন তিনি চুমরে ওপরে তুলেছেন। তাঁর ডানদিকে বসেছেন ভালোমানুষ-ভালোমানুষ চেহারার এক ছোটখাটো

গড়নের বৃদ্ধ, বৃদ্ধের মুখের ওপর সামান্য পাকাদাড়ি, তাঁর নাকটা বাঁকা, চোখে চশমা। বাঁ পাশে যিনি বসেছেন তাঁর মাথায় টাক, কটা দাড়ি দুভাগে পাট করা, পাণ্ডুবর্ণের মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে এক ছোকরা গোছের বিচারক। তাঁর মাথাটা গোল, মোলায়েম করে ছাঁটা, কালো চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তাঁরা সকলেই খানিক ক্ষণ চুপচাপ টেবিলের ওপরকার কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। ইলিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল এই বুঝি তাঁদের একজন কেউ উঠে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর একটা কিছু চেঁচিয়ে ঘোষণা করবেন...

কিন্তু হঠাৎ বাঁদিকে মাথা ঘোরাতে ইলিয়া দেখতে পেল তার চেনা মুখ — পেত্রুখা ফিলিমোনভের — ঠিক যেন বার্ণিস লাগানো চকচকে থলথলে মুখ। বেগনি রঙের পালিশ দেওয়া চেয়ারগুলোর প্রথম সারিতে চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে পেত্রুখা বসে ছিল, শান্ত দৃষ্টিতে লোকজনের দিকে তাকাচ্ছিল। বার দুয়েক ইলিয়ার মুখের ওপর সে দৃষ্টি বুলাল, দুবারই ইলিয়ার ইচ্ছে হল উঠে দাঁড়িয়ে পেত্রুখাকে, গ্রোমভকে কিংবা আদালতের সমস্ত লোকজনের উদ্দেশে কিছু বলে।

'জোচ্চোর!.. ছেলেটাকে কী মারই মেরেছিল!..' ইলিয়ার মাথার ভেতরে দপ্ করে উঠল আর গলায় সে অনুভব করতে লাগল অম্লশূলের মতো একটা জ্বালা...

'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে...' গ্রোমভ কোমল স্বরে বলে যেতে লাগলেন, কিন্তু গ্রোমভ কাকে বলছেন সে দিকে ইলিয়ার দৃষ্টি ছিল না — দারুণ ভেবাচেকা খেয়ে দমে গিয়ে সে পেত্রুখার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, ইলিয়া কিছুতেই ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিল না যে ফিলিমোনভ জুরীদের আসনে বসে আছে...

'মামলার আসামী,' অভিশংসক কপাল রগড়ে জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দোকানদার আনিসিমভকে আপনি বলেছিলেন কি: 'দাঁড়া, মজা টের পাবি'খন!'

কোথায় যেন জানলার একটা খোলা পাল্লা এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আর্তনাদ তুলল:

'ক্যাঁচ... কোঁচ... ক্যাঁ-অ্যা-অ্যা...'

জুরীদের মধ্যে ইলিয়া আরও দুটি চেনামুখ দেখতে পেল। পেত্রুখার

মাথা ছাড়িয়ে, তার পেছনে বসে ছিল রাজমিস্ত্রী সিলাচোভ — তার নিজের ঠিকাদারী ব্যবসাও ছিল। লম্বা চওড়া চেহারার চাষাড়ে এই লোকটির হাত দুটো লম্বা, মুখটা ছোট, রাগী-রাগী। সে ছিল ফিলিমোনভের বন্ধু, সব সময় তার সঙ্গে ড্রট্ খেলত। সিলাচোভ সম্পর্কে লোকে বলাবলি করত যে এক দিন কাজের সময় কোন এক মিস্ত্রীর সঙ্গে বচসা হতে সে তাকে ভারার সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় — লোকটা আহত হয়, শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। আর প্রথম সারিতে, পেত্রুখার একজন পরে বসে ছিল বিরাট মনিহারী দোকানের মালিক দদোনভ্। ইলিয়া ওর কাছ থেকে মাল কিনত, সে জানত যে লোকটা নিষ্ঠুর, কৃপণ, দুদুবার তাকে রুবলের জায়গায় দশ কোপেকের মাল ঠেকিয়েছে।

'সাক্ষী! যখন আপনি দেখতে পেলেন যে আনিসিমভের বাড়িতে আগুন লেগেছে...'

'ক্যাঁচ... কোঁচ... ক্যাঁ-অ্যা-অ্যা...' জানলাটা আর্তনাদ করে উঠল, ইলিয়ার বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে উঠল।

'বুদ্ধু!' তার পাশেই একটা ফিসফিস আওয়াজ শোনা গেল। ও তাকিয়ে দেখল পাশে বসে সেই কালোমতো চুলওয়ালা লোকটা অবজ্ঞাভরে ঠোঁট বাঁকাচ্ছে।

'কে?' ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ইলিয়া চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

'আসামী... সাক্ষীকে নাজেহাল করার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল — হাতছাড়া হয়ে গেল! আমি হলে... ইস্!'

ইলিয়া আসামীর দিকে তাকাল। লম্বা গড়নের এক চাষী, মাথাটা বেঢপ। তার মুখ কালো, ভয়ার্ত। তাড়াখাওয়া ক্লান্ত কুকুর যেমন শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় কোণঠাসা হয়ে আত্মরক্ষার সমস্ত শক্তি হারিয়ে দাঁত বার করে, সেও তেমনি দাঁত বার করে ছিল। এদিকে পেত্রুখা, সিলাচোভ, দদোনভ এবং অন্যেরা নিশ্চিন্তে অন্নপরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল। ইলিয়ার মনে হচ্ছিল তারা সকলেই চাষী সম্পর্কে মনে মনে ভাবছে:

'ধরা যখন পড়েছে তখন দোষী না হয়ে যায় কোথায়?'

'একঘেয়ে কারবার,' পাশের লোকটা ওর কানে কানে বলল। 'কেসটার মধ্যে কোন রসকষ নেই... আসামীটা — মাথামোটা,

অভিশংসকমশাই — মিনমিনে, সাক্ষীগুলো — গণ্ডমূর্খ, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে। আমি অভিশংসক হলে দশ মিনিটের মধ্যে ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম।'

'লোকটা দোষী না কি?' কেমন একটা শীত শীত অনুভূতিতে কাঁপতে কাঁপতে ইলিয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'নাও হতে পারে। তবে, সাজা হয়ে যেতে পারে... আত্মপক্ষ সমর্থন করতে জানে না। চাষাভুষোরা একেবারেই জানে না... অপদার্থ জাত! হাড় আর মাংসই সার, বুদ্ধি বল, কৌশল বল — ছিটেফোঁটাও নেই!'

'তা ঠিক।'

'আপনার কাছে কুড়ি কোপেক হবে?' লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'হবে।'

'দিন দেখি।'

দেওয়া উচিত হবে কি না তা ভাবার পর্যন্ত সময় পেল না ইলিয়া — তার আগেই সে মনিব্যাগ থেকে পয়সা বার করে দিল। যখন দিয়ে ফেলেছে তখন তার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারিফ করে মনে মনে বলল:

'ধূর্ত বটে।'

'জুরী মহোদয়রা,' অভিশংসক নম্র ও ভাবগম্ভীর স্বরে বললেন, 'এই লোকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে আসামীর অপরাধ প্রমাণ করেছে, কিন্তু তার মুখ সেই অপরাধের আরও মুখর প্রমাণ। এই মুখের দিকে তাকালে আপনারা নিঃসন্দিগ্ধ না হয়ে পারেন না যে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক মার্কামারা অপরাধী, আইনশৃঙ্খলার শত্রু, সমাজের শত্রু...'

'সমাজের শত্রু' বসে ছিল, কিন্তু তার সম্পর্কে যখন দাঁড়িয়ে আছে বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল তখন বসে থাকাটা সম্ভবত তার অস্বস্তিকর ঠেকছিল, তাই সে ধীরে ধীরে উঠে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাত দুটো শরীরের দুপাশে নির্জীব ভাবে ঝুলে ছিল এবং ধূসর রঙের দীর্ঘ আকৃতি এমন নুইয়ে পড়ল যেন ন্যায়বিচারের গ্রাসে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

গ্রোমভ শুনানীর বিরতি ঘোষণা করতে ইলিয়া সেই কালোপানা চুলওয়ালা লোকটির সঙ্গে করিডরে বেরিয়ে এলো। লোকটি কোটের পকেট

থেকে দোমড়ানো সিগারেট বার করল, সেটাকে আঙ্গুল দিয়ে পাট করতে করতে বলল:

'আহাম্মকটা দিব্যি কেটে বলছে, ও আগুন লাগায় নি। আরে বাবা, এখানে দিব্যি-ফিব্যি কাটার ব্যাপার নয়, স্রেফ প্যান্ট খোল — উপুড় হয়ে শুয়ে পড়... কঠিন ব্যাপার! দোকানদারকে অপমান করা!'

'আপনি কি বলতে চান লোকটা দোষী?' ইলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'দোষী ত হবেই, কেননা গবেট। চালাক-চতুর লোকেরা অপরাধী হয় না,' হুসহুস করে সিগারেট টানতে টানতে লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে তড়বড় করে জবাব দিল।

'এখানে জুরীদের মধ্যে যে সব লোক বসে আছে...' ইলিয়া গলা নামিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলতে গেল।

'বেশির ভাগই হল দোকানদার,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লোকটা শান্ত স্বরে সংশোধন করে দিল। ইলিয়া তার দিকে তাকিয়ে আবার বলল:

'তাদের কাউকে কাউকে আমি চিনি।'

'আচ্ছা!'

'সোজা কথায় বলতে গেলে, অপদার্থ লোকজন...'

'জোচ্চোর,' সঙ্গী লোকটি তাকে উচিত কথা জুগিয়ে দিল।

কথাটা সে জোরেই উচ্চারণ করল। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে সে জোরে জোরে শিস দিতে লাগল, সকলের দিকে বেহায়ার মতো তাকাতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ — দেহের প্রতিটি হাড় যেন ক্ষুধার তাড়নায় ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে দিল।

'এ রকমই হয়ে থাকে। মোটামুটি ভাবে, আমরা যাকে ন্যায়বিচার বলি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হাল্‌কা কমেডি — ফার্স আর কি,' কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বলে চলল। 'যে সব লোকের পেট ভরা আছে তারা বুভুক্ষু লোকজনের অপরাধপ্রবণতা শোধরানোর কাজে মেতে ওঠে। কোর্টে ত প্রায়ই আসছি, কিন্তু এমন কেস দেখি নি যেখানে বুভুক্ষু মানুষ শাঁসালো লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে... শাঁসালো লোকে যদি নিজেদের সম্প্রদায়ের কারও বিরুদ্ধে মামলা আনে তাহলে বুঝতে হবে লোকটার অতি লোভের ফলে

এমন ঘটেছে। কথাটা হল, সবই সঙ্গে সঙ্গে লুটেপুটে নিও না বাপু, আমাদের জন্যেও কিছু রেখে দিও।'

'কথায় বলে, যার পেট ভরা সে হাভাতের দুঃখ বুঝবে কী করে?' ইলিয়া বলল।

'বাজে কথা!' সঙ্গের লোকটা আপত্তি করে বলল। 'খুবই ভালো বোঝে— সেই জন্যেই ত এত কড়া।'

'যে লোকের পেট ভরা আছে সে যদি সৎ হয় তাহলে অবশ্য কিছু বলার নেই,' ইলিয়া চাপা গলায় বলল, 'তবে সে যদি বদ হয় তাহলে অন্যের বিচার করবে কী করে?'

'বদলোকেরাই সবচেয়ে কড়া বিচারক,' লোকটা শান্ত স্বরে মন্তব্য করল। 'আসুন, এবারে একটা চুরির মামলা শোনা যাবে।'

'মেয়েটি আমার চেনা...' ইলিয়া নীচু গলায় বলল।

'আচ্ছা!' বলে লোকটা তার ওপর এক লহমা চোখ বুলিয়ে নিল। 'আপনার চেনা মানুষটিকে তাহলে দেখা যাক...'

ইলিয়ার মাথার ভেতরে সব ঘুলিয়ে গেল। এই যে ছটফটে লোকটা মুখে অনর্গল খই ফুটিয়ে চলেছে তার কাছে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ইলিয়ার ছিল, কিন্তু লোকটার মধ্যে এমন একটা অপ্রীতিকর ভাব ছিল যাতে ইলিয়ার মনে ভয় হল। সেই সঙ্গে পেত্রুখা যে বিচারকের আসনে বসেছে এই ভাবনাটা অনড় হয়ে বুকের ওপর চেপে বসে তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটা লোহার বেড়ির মতো তা ইলিয়ার হৃৎপিণ্ডের চারদিকে বেষ্টন করল, তার হৃদয়ের বাকি সব অনুভূতি কোণঠাসা হয়ে গেল।

ও যখন হলঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল তখন সামনে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেল পাভেলের মাথার খাড়া পেছন দিক আর তার ছোট কান দুটো। ইলিয়া খুশি হয়ে উঠল, পাভেলের ওভারকোটের হাতা ধরে টান দিল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্তীর্ণ হাসি হাসল, পাভেলও হাসল — অনিচ্ছায়, স্পষ্টই বোঝা গেল চেষ্টাকৃত হাসি।

ওরা কয়েক সেকেন্ড মুখোমুখি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, খুব সম্ভব এই কয়েকটি সেকেন্ড তারা দুজনেই এমন একটা কিছুর প্রয়োজন অনুভব করল যাতে দুজনের মুখ দিয়ে একই সঙ্গে বাক্যস্ফূর্তি হয়।

'দেখতে এসেছিস বুঝি?' পাভেল বাঁকা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'ও কি এখানে?' ইলিয়া বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কে?'

'তোর সোফিয়া...'

'আমার নয়,' ওর কথায় বাধা দিয়ে পাভেল নীরস ভাবে জবাব দিল।

ওরা হলঘরে ঢুকল।

'আমার পাশে বসবি?' ইলিয়া ওকে বলল।

পাভেল মিনমিন করে জবাব দিল:

'বুঝলি কি না... আমার আবার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে...'

'আচ্ছা, ঠিক আছে...'

'চলি।'

পাভেল চটপট সরে পড়ল। ইলিয়া ওর যাওয়ার পথের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল যেন পাভেল হাত দিয়ে ওর দেহের কোন ঘা জোরে রগড়ে দিয়েছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা ওকে অবসন্ন করে ফেলল। বন্ধুর গায়ে টেকসই, নতুন ওভারকোট দেখে, পাভেলের মুখ যে এই কয় মাসে অনেক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে তা লক্ষ্য করে ইলিয়ার ভালো লাগল না। পাভেল যে বেঞ্চে বসেছে গাভ্রিকের বোনও সেখানেই বসে ছিল। পাভেল তাকে কি যেন বলল, সে চট করে ইলিয়ার দিকে মাথা ঘুরাল। তাকে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে মুখ বাড়াতে দেখে ইলিয়া একপাশে মুখ সরিয়ে নিল, অপমান আর ক্রোধের জ্বালা তার হৃদয়কে আরও শক্ত করে, গাঢ় ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ভেরাকে নিয়ে আসা হল। সে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তার গায়ে ছাইরঙা ঢিলে পোশাক, গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা; মাথায় সাদা রুমাল। তার মাথার বাঁদিকের রগের ওপর ঝুলে আছে সোনালি চুলের গোছা, গালের রং ফেকাসে, ঠোঁট দুটো শক্ত করে চাপা, তার বাঁ চোখটা বিস্ফারিত হয়ে আছে; গভীর, অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে গ্রোমভের দিকে।

'হ্যাঁ... হ্যাঁ... না...' তার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ভাবে বাজছিল ইলিয়ার কানে।

গ্রোমভ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন, তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করছিলেন নীচু গলায়, কোমল স্বরে — শুনে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা বিড়াল মিউমিউ করছে।

'কাপিতানভা, আপনি কি আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ স্বীকার করেন যে...' গ্রোমভের নরম, মধুমাখা কণ্ঠস্বর যেন গুড়ি মেরে ভেরার দিকে এগিয়ে চলল।

ইলিয়া পাভেলের দিকে তাকাল। পাভেল মাথা হেঁট করে বসে হাতের মুঠোয় টুপি ধামসাচ্ছিল। তার পাশের মেয়েটি — গাভ্রিকের বোন সোজা হয়ে বসে এমন ভাবে তাকাচ্ছিল যেন সে নিজে ভেরার, বিচারকর্তাদের এবং জনতার — সকলেরই বিচার করতে বসেছে। তার মাথা থেকে থেকে এদিক ওদিক ঘুরছিল, ঠোঁটজোড়া অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ঈষৎ চাপা আর কোঁচকানো ভুরুর ফাঁক থেকে গর্বিত চোখজোড়ার শীতল ও কঠোর দৃষ্টি ধিকিধিকি জ্বলছিল।

'স্বীকার করছি,' বলতে গিয়ে ভেরার গলা ঝনঝন করে উঠল, ভাঙা, পাতলা বাটির ওপর আঘাতের আওয়াজের মতো শোনাল।

দুজন জুরী — দদোনভ ও তার পাশের গোঁফদাড়ি কামানো, কটা চুলওয়ালা লোকটি একে অন্যের দিকে মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল, মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তাদের দুজোড়া চোখ হাসতে লাগল। পেত্রুখা ফিলিমোনভের গোটা শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার মুখ আরও লাল হয়ে উঠল, গোঁফজোড়া নড়ে উঠল। জুরীদের মধ্যে আরও কয়েক জনের দৃষ্টি ভেরার ওপর পড়ল এবং সকলেই বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তাকে দেখতে লাগল। এই মনোযোগের কারণ ইলিয়ার বুঝতে বাকি রইল না, তাতে তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠল।

'বিচার করতে বসেছে, এদিকে নিজেরাই ত চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে,' শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে মনে মনে ভাবল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল চেঁচিয়ে পেত্রুখাকে বলে: 'ওরে বদমাশ, ভাবছিস কী রে?'

গলার ভেতরে কী একটা দলা পাকিয়ে ঠেলে আসতে লাগল, শ্বাসকষ্ট দেখা দিল।

'আচ্ছা বলুন দেখি... ইয়ে... কাপিতানভা,' গরমে আঁকুপাঁকু এক ভেড়ার মতো চোখ উল্টে জড়িয়ে জড়িয়ে জিভ নাড়তে নাড়তে অভিশংসকমশাই বললেন, 'আপনি কি বহু কা-ল হল গণিকাবৃত্তি করছেন?'

ভেরা মুখে হাত বুলাল, মনে হল যেন এ প্রশ্ন তার লাল ছোপ ধরা গালের ওপর এসে সেঁটে বসেছে।

'বহুকাল হল।'

তার উত্তরের মধ্যে জোর ছিল। জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল, যেন সাপ কিলবিল করছে। পাভেল তার মাথা আরও নীচে নামাল, তার বোধহয় লুকিয়ে পড়ার ইচ্ছে করছিল, হাতের মধ্যে টুপিটা সে সমানে ধামসে চলেছে।

'বহুকাল মানে?'

দুচোখ বিস্ফারিত করে, গম্ভীর ও কঠোর দৃষ্টি মেলে সে গ্রোমভের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এক বছর? দুবছর? পাঁচ বছর?' অভিশংসক নাছোড়বান্দা হয়ে জেরা করলেন।

ভেরা তবু কোন জবাব দিল না। পাথরে খোদাই করা এক ধূসর মূর্তির মতো সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কেবল বুকের ওপর রুমালের প্রান্ত কাঁপতে থাকে।

'ইচ্ছে না হলে জবাব না দেওয়ার অধিকার আপনার আছে,' গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে গ্রোমভ বললেন।

এই সময় উকিল জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। লোকটি রোগাটে, তাঁর থুতনি ছুঁচালো, চোখজোড়া টানা টানা। পাতলা ও লম্বা নাক আর মাথার পেছনের ভাগ চওড়া হওয়ার দরুন তাঁর মুখটা দেখাচ্ছিল কুড়ুলের মতো।

'বলুন দেখি কাপিতানভা, কোন পরিস্থিতির চাপে আপনি এই পেশা নিতে বাধ্য হলেন?' উকিল জোরাল ও তীক্ষ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'কোন চাপে পড়ে নয়,' বিচারকদের দিকে তাকিয়ে ভেরা জবাব দিল।

'হুম্... ব্যাপারটা মোটেই তা নয়... দেখুন, আমার জানা আছে... আপনি আমাকে বলেছিলেন...'

'আপনার কিছুই জানা নেই,' ভেরা বলল। সে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে কটমট করে তাকাল। এবারে তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ও অসন্তোষ ঝরে পড়ল, সে বলল, 'আপনাকে আমি কিছুই বলি নি।'

জনসাধারণের ওপর চট করে এক ঝলক নজর বুলিয়ে নিয়ে সে বিচারকদের দিকে মুখ ফেরাল, মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে তার পক্ষ সমর্থনকারী উকিলকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'এ ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি কথা না বলি তাহলে আপনাদের আপত্তি আছে কি?'

আবার হলঘরে সাপ সড়সড় করে উঠল, এবারে আরও জোরে, আরও স্পষ্ট।

ইলিয়া উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল, পাভেলের দিকে তাকাল।

পাভেলের কাছ থেকে সে কোন একটা কিছুর অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু পাভেল তার সামনে উপবিষ্ট লোকটির কাঁধের ওপর দিয়ে চুপচাপ উঁকি মেরে দেখছিল, সে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখাল না। গ্রোমভ মৃদু হেসে মোলায়েম, মাখন মাখানো কী যেন কতকগুলো কথা বললেন... তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে ভেরা বলতে লাগল:

'স্রেফ বড়লোক হওয়ার সাধ হয়েছিল, তাই চুরি করলাম — ব্যস্... আর কিছুই এর মধ্যে ছিল না... আমি বরাবরই এমন ধারা ছিলাম...'

জুরীরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল। তাদের সকলের মুখ গম্ভীর, বিচারকদের মুখেও কেমন যেন একটা অসন্তোষের ছাপ পড়ল। হলঘর নিস্তব্ধ। বাইরে থেকে ভেসে আসছিল পাকা রাস্তার ওপর মাপা পা ফেলার থপ্ থপ্ আওয়াজ — সৈন্যদল চলেছে।

'আসামী স্বীকারোক্তি করেছে, সেই কারণে আমি মনে করি...' অভিশংসক বলে চললেন।

ইলিয়া অনুভব করল যে আর সেখানে বসে থাকতে পারছে না। সে তাই উঠে দাঁড়াল, পা বাড়াল...

'আ-স্তে!' আদালতের পাহারাদার জোরে হাঁক দিয়ে বলল।

ফলে ইলিয়া আবার বসে পড়ল, সেও পাভেলের মতোই মাথা হেঁট করে বসে রইল। পেত্রুখার লাল মুখটা সে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে মুখ এখন ফুলে গম্ভীর, দেখে মনে হয় বুদ্ধি বা কোন কারণে তার অভিমান হয়েছে। গ্রোমভের স্নিগ্ধ স্বভাবের কোন বিকার নেই, কিন্তু তাঁর এই বিচারকসুলভ ভালোমানুষীর আড়ালে ইলিয়া দেখতে পেল এক খোশমেজাজী মানুষকে — ছুতোর যেমন কাঠের ওপর রেঁদা ঘষতে অভ্যস্ত ইনিও তেমনি অভ্যস্ত লোকজনের বিচার করতে। ইলিয়ার মনের মধ্যে এখন জেগে উঠল এক ভয়াবহ, উদ্বেগজনক চিন্তা:

'আমি যদি স্বীকার করি তাহলে আমাকেও ত এ ভাবেই বিচার করবে! বিচার করবে পেত্রুখা... আমি ঘানি ঠেলব, আর ও নিজ কি না...'

এই চিন্তা তার মন থেকে কিছুতেই দূর হল না, কারও দিকে না তাকিয়ে, কোন দিকে কান না দিয়ে সে বসে রইল।

'এ নিয়ে কোন কথা আমি শুনতে চাই না!' কাঁপা কাঁপা, আহত স্বরে ভেরা চেঁচিয়ে বলল, মাথা থেকে রুমাল টেনে খুলে ফেলে দুহাতে বুক চেপে ধরে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

হলঘরে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। মেয়েটির চিৎকারে ঘরের সকলের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল। কাঠগড়ার ভেতরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদছে, এমন ভাবে ছটফট করছে যেন তার সর্বাঙ্গ আগুনে পুড়ে গেছে।

ইলিয়া লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু উল্‌টো দিক থেকে জনস্রোত আসছিল, তাই কোন কিছু বোঝার আগেই লোকজনের ধাক্কায় সে করিডরে চলে এলো।

'মেয়েটার মনের কথা সব বার করে ফেলল,' কালোচুলওয়ালার গলা শুনতে পেল ইলিয়া।

পাভেলকে ফেকাসে ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালের ধারে, তার চোয়াল থরথর করে কাঁপছিল। ইলিয়া তার দিকে এগিয়ে গেল, কটমট করে হিংস্র দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল।

'কী? কেমন হল?' সে জিজ্ঞেস করল।

পাভেল তার দিকে হাঁ করে তাকাল, কোন কথা বলতে পারল না।

'একটা মানুষকে নষ্ট করলি ত?' ইলিয়া বলল। একথায় পাভেল চমকে উঠল, যেন কেউ তাকে চাবুক মেরেছে। সে হাত তুলে ইলিয়ার কাঁধের ওপর রাখল, উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল:

'আমি নষ্ট করলাম? আমরা এবারে আপীল করব...'

ইলিয়া ঝটকা মেরে কাঁধ থেকে তার হাত সরিয়ে দিল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল পাভেলকে বলে: 'তুই আর বলিস না! কোথায়, তুই ত চেঁচিয়ে বললি না যে তোর জন্যে ও চুরি করেছিল?' কিন্তু তার বদলে সে বলল:

'কিন্তু বিচার করবে পেত্রুখা ফিলিমোনভ। এটা বুঝি ঠিক, কী বলিস?' সে বাঁকা হাসি হাসল।

পাভেল সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে ব্যস্ত হয়ে কী যেন বলতে শুরু করল, কিন্তু ইলিয়া তার কথায় কান না দিয়ে সরে পড়ল। মুখে ঐ রকম বিদ্রূপের হাসি নিয়েই সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সে ছাড়া

কুকুরের মতো ধীরে ধীরে, একেবারে সন্ধে পর্যন্ত, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল, শেষকালে অনুভব করল যে খিদেয় তার গা গোলাচ্ছে।

বাড়িঘরের জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠেছে, রাস্তায় এসে পড়ছে আলোর প্রশস্ত হল্‌দে রেখা আর সে সব রেখার ওপর পড়েছে জানলার ধারে টবে রাখা ফুলগাছের ছায়া। ইলিয়া থমকে দাঁড়াল, ছায়ার আলপনা দেখে তার মনে পড়ে গেল গ্রোমভের বাড়ির ফুলগাছের কথা, মনে পড়ল রূপকথার রাণীর মতো দেখতে তাঁর বৌকে আর সেই করুণ গান যা ওদের হাসির কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না... একটা বেড়াল থাবা ঝেড়ে সাবধানে রাস্তা পার হয়ে গেল।

'সরাইখানায় যাওয়া যাক,' — এই ঠিক করে ইলিয়া বড় রাস্তার মাঝ বরাবর এলো।

'খবরদার!' কে যেন ওকে হাঁক দিয়ে বলল। তার সামনে দিয়ে ঘোড়ার কালো মাথা সাঁ করে চলে গেল, গরম নিশ্বাস তার চোখেমুখে ঝাপ্‌টা মারল। ইলিয়া লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল, তার কানে এলো গাড়োয়ানের গালিগালাজ, সরাইখানার দিক থেকে ঘুরে সে অন্য দিকে চলল।

'যে সব ঘোড়ার গাড়ি লোকজন নিয়ে যায় তাতে চাপা পড়লে কেউ মারা যায় না,' — ইলিয়া ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল। 'খাওয়া দরকার... ভেরা এখন একেবারেই গেল... আত্মসম্মানবোধ আছে বটে... পাভেলের কথা মুখ ফুটেও বলল না... আর দেখতেই ত পেল, বলবে কাকে?.. ওর মতো ভালো মেয়ে আর হয় না... অলিম্পিয়াদা হলে... না, অলিম্পিয়াদাও ভালো, কিন্তু এই তাতিয়ানাটা...'

তার মনে পড়ে গেল আজই না তাতিয়ানার জন্মদিন। প্রথমে তার ওখানে যাওয়ার চিন্তাটা ইলিয়ার কাছে জঘন্য মনে হল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে মনের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করল।

হাঁক দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে সে ওদিকেই যাত্রা করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আভ্‌তনোমভদের বাড়ির খাবারঘরের দোরগোড়ায় এসে হাজির। ধাঁধানো আলোয় সে চোখ কোঁচকাল। বিরাট ঘরটাতে টেবিল ঘিরে গাদাগাদি করে লোকজন বসে ছিল। ইলিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে আনাড়ির মতো হাসল।

'আ-চ্ছা। এসেছ তাহলে!' কিরিক সোল্লাসে বলল। 'মিষ্টি-টিষ্টি কিছু এনেছ? জন্মদিনের উপহার, অ্যাঁ? এটা কী রকম হল ভাই?'

'আপনি ছিলেন কোথায়?' গিন্নী জিজ্ঞেস করল।

কিরিক খপ করে ওর হাত চেপে ধরে টেবিলের চারধারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ইলিয়া তাদের উষ্ণ হাতে হাত মিলিয়ে করমর্দন করল, কিন্তু অতিথিদের সকলের মুখ ওর চোখের সামনে মিলেমিশে বিরাট বিরাট দাঁত বার করা এক লম্বা হাসি হাসি মুখ হয়ে দাঁড়াল। ভাজার গন্ধে ইলিয়ার নাক সুড়সুড় করতে লাগল, মেয়েদের কলকণ্ঠ কানে এসে বাজল, চোখের ওপর অনুভব করল গরম হলকা, সে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। যখন সে বসল তখন অনুভব করল যে ক্লান্তিতে তার পা ভেঙ্গে পড়ছে এবং খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোন কথা না বলে ইলিয়া এক টুকরো রুটি নিয়ে খেতে শুরু করল। অতিথিদের মধ্যে কে যেন জোরে নাক দিয়ে আওয়াজ করল। ঠিক এই সময় তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্না ওকে ভর্ৎসনার সুরে বলল:

'আপনি কি আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে চান না? চমৎকার! এলেন, কোন কথা না বলে দিব্যি খেতে বসে গেলেন।'

টেবিলের নীচ দিয়ে সে ইলিয়ার পায়ে জোরে লাথি দিল, টি-পটের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাতে জল ভরতে লাগল।

ইলিয়া তখন রুটির টুকরোটা টেবিলের ওপর রেখে জোরে হাত কচলাল, গলা চড়িয়ে বলল:

'আমি আজ সারা দিন কোর্টে কাটিয়েছি।'

ওর গলা কথাবার্তার গুঞ্জন ছাপিয়ে উঠল। অতিথিরা চুপ করে গেল। ইলিয়া ভেবাচেকা খেয়ে গেল, তার মুখের ওপর ওদের দৃষ্টি অনুভব করতে সেও আড়চোখে তাদের ওপর নজর বুলিয়ে নিল। ওরা ইলিয়ার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল — চওড়া কাঁধওয়ালা, চুলকোঁকড়া এই ছোকরাটি যে আকর্ষণীয় কিছু বলতে পারে সে ব্যাপারে যেন ওদের প্রত্যেকেরই সন্দেহ আছে। ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো। ইলিয়ার মাথার ভেতরে ঘুরতে লাগল ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, টুকরো টুকরো চিন্তা, তারপর হঠাৎই সেগুলো কোথায় যেন তলিয়ে গেল, তার মনের কোন গহনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'মাঝে মাঝে কোর্টে বেশ কাণ্ডকারখানা শোনা যায়,' ঝাঁঝালো গলায় ফেলিৎসাতা গ্রিজলভা মন্তব্য করল, একটা চিমটে জাতীয় জিনিস দিয়ে বাক্স থেকে সে খ্ঁচিয়ে খ্ঁচিয়ে জেলি লজেন্স বার করতে লাগল।

তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্না দুগালে লাল ছোপ ফুটে উঠল। কিরিক জোরে নাক ঝেড়ে নিয়ে বলল:

'কী হল দাদা, ফণা ত উঠালে, ছোবলটা কোথায়? কোর্টে গিয়েছিলে, তারপর?..'

'ওদের সকলকে অপ্রস্তুত করে দিচ্ছি,' ইলিয়া মনে মনে ভাবল। ওর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। অতিথিরা আবার একসঙ্গে বহুকণ্ঠে কলবর শুরু করে দিল।

'একবার আমি কোর্টে এক খুনের মামলা শুনেছিলাম,' অল্পবয়সী এক টেলিগ্রাফ কর্মচারী বলল। লোকটির মুখ ফেকাসে, চোখজোড়া কালো, মুখের ওপর সামান্য গোঁফ।

'খুনের গল্প শুনতে আর পড়তে আমি দারুণ ভালোবাসি,' গ্রাভ্কিনা উল্লসিত হয়ে বলল।

মহিলার স্বামী সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল:

'প্রকাশ্য বিচার — লোকের পক্ষে মঙ্গলের...'

'বিচার হয়েছিল আমারই বন্ধু ইয়েভ্গেনেভের... ব্যাপারটা হয়েছিল কি জানেন, ক্যাশবাক্সর সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে ও একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করছিল, ঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ গুলি করে বসে।'

'ওঃ, কী ভয়ঙ্কর!' তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্না চেঁচিয়ে উঠল।

'একেবারে খতম!' টেলিগ্রাফ কর্মচারীটির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা পরিতৃপ্তির ভাব।

'আর আমি একবার এক মামলার সাক্ষী হয়েছিলাম,' গ্রাভ্কিন তার অভ্যস্ত খসখসে, শুকনো গলায় বলতে শুরু করল, 'শুনলাম, আরেক জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে তেইশটি চুরির। মন্দ নয়, কী বলেন?'

কিরিক হোহো করে হেসে উঠল। লোকজন দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল: একদল বালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে টেলিগ্রাফ কর্মীর বিবরণ শুনতে লাগল, অন্যেরা গ্রাভ্কিনের মুখে তেইশটি চুরির একঘেয়ে সমাচার শুনতে বসে গেল। ইলিয়ার নজর পড়ে ছিল গৃহকর্ত্রীর ওপর, সে মনে মনে অনুভব করছিল তার

ভেতরে ভেতরে একটা আগুন যেন ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে — সে আগুন এখনও কোন কিছুকে আলোকিত করে তোলে নি কিন্তু ইতিমধ্যেই হৃদয়ে মর্মান্তিক জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। যে মুহূর্তে ইলিয়া বুঝতে পারল যে আভ্‌তনোমভদের আশঙ্কা হচ্ছে পাছে সে অতিথিদের সামনে ওদের অপ্রস্তুত করে ফেলে তখনই তার ভাবনা-চিন্তা আরও সুসংবদ্ধ রূপ নিতে শুরু করল।

অন্য ঘরে একটা টেবিলের ওপর বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না সেখানে ব্যস্ত ছিল। ঘরের সাদা ওয়ালপেপারের গায়ে তার লাল টকটকে ব্লাউজ জ্বলজ্বলে ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে। ছোটখাটো গড়নের মহিলাটি প্রজাপতির মতো ঘরময় ছুটোছুটি করছিল, তার মুখের ওপর শোভা পাচ্ছিল গৃহকর্মনিপুণা এমন এক বধূর গর্ব যার সব কিছুই চমৎকার চলছে। বার দুয়েক ইলিয়া লক্ষ্য করল যে সে প্রায় চোখে না পড়ার মতো ইসারা করে তাকে ডাকছে, কিন্তু ইলিয়া তার কাছে গেল না। এতে তাতিয়ানা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে বুঝতে পেরে ইলিয়া তৃপ্তি বোধ করছিল।

'কী বেরাদার, অমন পেঁচার মতো গুম হয়ে বসে আছ কেন?' কিরিক হঠাৎ তাকে সম্বোধন করে বলল। 'কিছু বল, লজ্জা করো না। এঁরা সব শিক্ষিত লোকজন, কেউ কোন অপরাধ নেবেন না।'

'আজ একটা মামলা হল,' ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় বলতে শুরু করল, 'আমার এক চেনা মেয়ের বিরুদ্ধে। মেয়েটা নষ্ট চরিত্রের, তবে ভালো মেয়ে...'

আবার সে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করল, আবার সব অতিথির দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার ওপর। ফেলিৎসাতা ইয়েগোরভ্‌নার দাঁতের পাটি প্রশস্ত ও বিদ্রূপের হাসিতে বেরিয়ে পড়ল, টেলিগ্রাফ কর্মচারীটি মুখের ওপর হাত রেখে গোঁফে তা দিতে লাগল, প্রায় সকলেই গুরুগম্ভীর ও মনোযোগী শ্রোতার ভাব দেখানোর চেষ্টা করল। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নার হাত থেকে ছুরি-কাঁটার গোছা হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে ঝনঝন করে পড়ে গেল। সে আওয়াজ ইলিয়ার বুকের ভেতরে যুদ্ধের জোরাল বাজনার মতো বেজে উঠল। বিচলিত না হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টি অতিথিদের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে সে বলে চলল:

'আপনারা হাসছেন? তাদের মধ্যে খুব ভালো লোকজন আছে...'

'আছে ত আছে,' কিরিক ওর কথার মাঝখানে বলল, 'কেবল কথাটা হল কি... এতটা খোলাখুলি...'

'আপনারা শিক্ষিত লোকজন,' ইলিয়া বলল, 'মুখ ফসকে তেমন কিছু বেরিয়ে গেলে অপরাধ নেবেন না!'

তার ভেতরে হঠাৎ যেন একরাশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। সে তিক্ত হাসি হাসল, তার মাথায় অকস্মাৎ শব্দের যে জীবন্ত খেলা চলল তাতে হৃৎপিন্ডটা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'মেয়েটা এক ব্যবসাদারের কাছ থেকে টাকা চুরি করেছিল...'

'ব্যাপার ক্রমেই খারাপের দিকে গড়াচ্ছে,' চোখমুখ কুঁচকে হাস্যকর ভঙ্গি করে কিরিক বলে উঠল, সে হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল।

'বুঝতেই পারছেন কখন, কোথায় সে চুরি করতে পারে... আবার এমনও হতে পারে, সে মোটেই চুরি করে নি, উপহার পেয়েছিল...'

'তাতিয়ানা!' কিরিক হাঁক দিল। 'এদিকে এসো! ইলিয়া এখানে এমন সব চুটকি ছাড়ছে...'

তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্না ইতিমধ্যে ইলিয়ার পাশে এসেই দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে সে ফস করে বলল:

'এ আর এমন কী হল? নেহাৎই মামুলি... এ রকম ঘটনা শয়, শয় তোমারই জানা আছে... অল্পবয়সী মেয়ে এখানে নেই। যাক গে, ও সব পরে হবে'খন... এখন খেতে আসুন সবাই।'

'আসুন সকলে,' কিরিক চেঁচিয়ে বলল। 'আমিও সে দলে, হে-হে! কাব্যি ঠিক হল না, তবে মজার, কী বলেন?'

'খিদেটা চনমনিয়ে উঠছে,' গলায় হাত বুলিয়ে গ্রাভ্কিন বলল।

সকলেই ইলিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ও বুঝতে পারল যে অতিথিরা তার কথা শুনতে চায় না, কেননা গৃহস্বামী ও কর্ত্রীর তা মনোগত ইচ্ছে নয়। এতে সে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে সকলের উদ্দেশে বলে চলল:

'আর এই মেয়েটার বিচার করছে এমন সব লোক যারা নিজেরাই হয়ত বেশ কয়েক বার ওকে কাজে লাগিয়েছে... তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার জানা। তাদের চোর-জোচ্চোর বললেই যথেষ্ট বলা হয় না...'

'আমাকে বলতে দিন!' একটা আঙ্গুল ওপরে তুলে কঠোর স্বরে গ্রাভ্কিন বলল। 'অমন কথা বলবেন না! আপনি যাঁদের কথা বলছেন তাঁরা হলেন জুরী... আমি নিজে একজন...'

'ঠিক তাই — জুরী!' ইলিয়া বলে উঠল। 'কিন্তু তারা কি ন্যায়বিচারক হতে পারে যদি নিজেরাই...'

'আমি তাহলে বলি! জুরীর বিচার হল, যাকে বলা যায়, জনসাধারণের স্বার্থে সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের করা এক বিরাট সংস্কার। আপনি কি না রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করছেন?'

ইলিয়ার মুখের ওপর সে ফোঁস করে উঠে বলল। তার দাড়ি গোঁফ কামানো চর্বিওয়ালা গাল দুটো থরথর করে উঠল, চোখজোড়া ডাইনে বাঁয়ে এবং আবার উলটো দিকে বনবন করে ঘুরতে থাকল। সকলেই ঘন দঙ্গল বেঁধে তাদের ঘিরে রইল, একটা কেলেঙ্কারীর মধুর পূর্বাভাসে পুলকিত হয়ে তারা দোরগোড়ায় দাঁড়াল। গৃহকর্ত্রীর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল, সে উদ্বিগ্ন হয়ে অতিথিদের জামার হাতা ধরে টানতে টানতে বলতে লাগল:

'ছাড়ুন ছাড়ুন! এ সব কার ভালো লাগে? কিরিক, ওঁদের বল না...'

কিরিক থতমত খেয়ে চোখ পিটপিট করে অনুরোধ জানাল:

'দোহাই আপনাদের! চুলোয় যাক সংস্কার-ফংস্কার আর রাজ্যের দর্শনের কচকচানি।'

'এটা দর্শন নয় — রা-জ-নী-তি!' ত্রাভ্‌কিন ভাঙা ভাঙা গলায় বলল। 'যারা এ ধরনের আলোচনা করে তারা হল রা-জ-নী-তি-গত ভাবে সন্দে-হ-ভা-জন!'

একটা উত্তেজনার নেশা ইলিয়াকে পেয়ে বসল। এই মোটাসোটা লোকটির দাড়ি গোঁফ কামানো মুখের ওপর ভিজে ঠোঁটজোড়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে রেগে যেতে দেখতে ওর মজা লাগছিল। আভ্‌তনোমভরা অতিথিদের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে এই বোধ তাকে দারুণ আনন্দ দিচ্ছিল। সে আরও ধীরস্থির হয়ে পড়ল, এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে সঙ্ঘর্ষে নামার বাসনা, তাদের মুখের ওপর স্পর্ধা করে কথা বলার এবং তাদের দস্তুরমতো খেপিয়ে তোলার বাসনা তার মনের মধ্যে ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মতো টানটান হয়ে বসল, তাকে এক মধুর অথচ ভয়ঙ্কর তুঙ্গে তুলে দিল। তার কণ্ঠস্বর আরও ধীর, আরও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল।

'আপনারা আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারেন — আপনারা হলেন শিক্ষিত লোক, কিন্তু তাই বলে আমি পিছু হটছি না! সচ্ছল লোকে কাঙালকে কী বুঝবে?.. কাঙাল — চোর হতে পারে, কিন্তু সচ্ছল লোকেও — চোর...'

'কিরিক নিকোদিমভিচ্?' গ্রাভ্‌কিন গলা ফাটিয়ে বলল। 'এ সব কী? এ... এ হল...'

এই সময় তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না উত্তেজিত লোকটিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল, যেতে যেতে জোরে তাকে বলতে লাগল:

'আপনার পছন্দসই স্যান্ডউইচ আছে — হেরিং মাছ, সেদ্ধ ডিম আর মাখন দেয়া পেঁয়াজ কলি...'

'হুম্! এ সব ধরন আমার জানা আছে!' সশব্দে ঠোঁট চুকচুক করতে করতে আহত স্বরে গ্রাভ্‌কিন বলল। তার বৌ তাচ্ছিল্য ভরে ইলিয়ার দিকে তাকাল, স্বামীর অন্য হাত ধরে তাকে তলল:

'আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না আন্তন...'

এদিকে তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না প্রিয় অতিথিকে সান্ত্বনা দিয়েই চলেছে:

'টমেটোর সঙ্গে জারানো স্টার্লেট...'

'এটা ভালো নয়, ইয়ং ম্যান!' হঠাৎ ইলিয়ার দিকে ফিরে, মেঝের ওপর শক্ত করে পা রেখে ভর্ৎসনার সুরে, উদার ভঙ্গিতে গ্রাভ্‌কিন বলে উঠল। 'কদর দিতে জানতে হয়... বোঝা দরকার।'

'আমি কিন্তু বুঝি না,' ইলিয়া বলল। 'সেই জন্যেই ত বলি: পেত্রুখা ফিলিমোনভ অন্যের ভাগ্য নির্ধারণ করার কে?'

অতিথিরা ওর স্পর্শ এড়ানোর চেষ্টায় পাশ কাটিয়ে খাবারঘরে চলে যেতে লাগল। কিরিক ওর একেবারে সামনে এগিয়ে এসে অপমানের জ্বালায় রূঢ় ভাবে বলল:

'জাহান্নামে যা, তুই একটা আকাট মূর্খ ছাড়া আর কিছু নোস।'

ইলিয়া চমকে উঠল, সে চোখে অন্ধকার দেখল — তার মনে হল মাথায় বুঝি কেউ আঘাত করেছে। সে শক্ত করে ঘুষি পাকিয়ে কিরিকের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিরিক তার গতি লক্ষ্য না করে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে খাবারঘরের দিকে চলে গেল। ইলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইলিয়া লোকজনের পেছনের দিক দেখতে পেল — তারা সকলে ঘন হয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; ইলিয়া তাদের খাবার চিবানোর চবর চবর শব্দও শুনতে পেল। গৃহকর্ত্রীর গাঢ় লাল রঙের ব্লাউজ ইলিয়ার চার দিকের সব কিছুকে রাঙিয়ে দিয়ে তার চোখ কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে দিল।

'হ্ম্!' গ্রাভ্‌কিন একটা অব্যক্ত আওয়াজ করল। 'এটা খেতে দারুণ হয়েছে — দারুণ!'

'লঙ্কা চাই?' গৃহকর্ত্রী কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'তোর লঙ্কা দেওয়া আমি বার করছি!' — একটা স্থির আক্রোশ নিয়ে ইলিয়া মনে মনে ঠিক করল। এই ভেবে মাথাটা ঝটকা মেরে উঁচু করে পেছনের দিকে সামান্য হেলে সে দুপা এগিয়ে গেল, টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কারও একজনের রাখা মদের গ্লাস অনেকটা ছিনিয়ে নিয়েই সে গ্লাসটা তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নার দিকে বাড়িয়ে দিল এবং শব্দ দিয়ে যেন সে ঘা মারতে চায় এমনি করে কেটে কেটে উচ্চারণ করে তার উদ্দেশে বলল:

'এসো তাতিয়ানা মদ খাওয়া যাক!'

সকলের ওপর এর প্রতিক্রিয়া এমন হল যেন কান ফাটানো শব্দে কোন কিছু ভেঙ্গে পড়ল কিংবা ঘরের আলো নিভে গেল এবং আচমকা ঘন আঁধার সকলকে ঘিরে ধরল আর সে আঁধারে লোকজন যে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল সেই ভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাবারের টুকরোয় ঠাসা হাঁগুলো এই সব লোকের ভয়ার্ত, বিহ্বল মুখের ওপর দগদগে ক্ষতর মতো দেখাচ্ছিল।

'আরে এসো, এসো! কিরিক নিকোদিমভিচ্, আমার প্রণয়িনীকে বলই না আমার সঙ্গে এক ঢোক খেতে! এতে কী আছে? বেলেল্লাপনা যদি করতেই হয় ত অত ঢাকাঢাক-গুড়গুড় কেন? খোলাখুলিই হোক! আমি তাই ঠিক করেছি যাতে খোলাখুলি ভাবে...'

'তবে রে হারামজাদা!' তাতিয়ানা কর্কশ সুরে খেঁকিয়ে উঠল।

ইলিয়া দেখতে পেল মহিলা শূন্যে হাত উঠিয়েছে, সে ইলিয়াকে লক্ষ্য করে প্লেট ছুঁড়ল কিন্তু ইলিয়া সময় থাকতে হাতের মুঠি উঁচিয়ে তা সরিয়ে দিল। ভাঙা প্লেটের ঝনঝন শব্দ যেন অতিথিদের কানে আরও বেশি করে তালা ধরিয়ে দিল। ধীরে ধীরে কোন রকম সাড়াশব্দ না করে তারা এক পাশে সরে গিয়ে ইলিয়াকে আভ্‌তনোমভদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিল। কিরিকের হাতে একটা মাছের লেজা ধরা ছিল, সে চোখ পিটপিট করছিল, তাকে দেখাচ্ছিল বিবর্ণ, করুণ ও আনাড়ি-আনাড়ি। তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌না কাঁপতে কাঁপতে ইলিয়ার দিকে ঘুষি তুলে হুমকি দেখাচ্ছিল। তার মুখের রং হয়ে উঠেছে গায়ের ব্লাউজের মতোই লাল টকটকে, মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

'ত্-তুই... মি-থ্যুক... মি-থ্যুক...' ইলিয়ার দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে হিস্‌হিস্ করে বলল।

'যদি চাস, আমি তোর ন্যাংটো চেহারার বর্ণনা দিতে পারি,' ইলিয়া বিচলিত না হয়ে বলল। 'তুই নিজেই ত তোর গায়ের সব তিল আমাকে দেখিয়েছিস। সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি তা তোর স্বামীই ভালো জানবে।'

কার যেন চাপা হাসি শোনা গেল। আভ্‌তনোমভা দুহাত ঝাপ্‌টাল, নিজের গলা চেপে ধরল, কোন রকম সাড়াশব্দ না করে চেয়ারের ওপর পড়ে গেল।

'পুলিশ ডাক!' টেলিগ্রাফ কর্মচারী চেঁচাল।

কিরিক ওর দিকে ফিরে তাকাল, হঠাৎ সে মাথা গোঁজ করে ষাঁড়ের মতো ইলিয়ার দিকে তেড়ে গেল।

ইলিয়া হাত বাড়িয়ে কিরিকের কপালে ধাক্কা মেরে কঠিন স্বরে বলল:

'কার সঙ্গে লাগতে এসেছিস? ঐ ত থলথলে শরীর... এক ঘা মারলেই মুখ থুবড়ে পড়বি। তুই শোন, আপনারা সকলেও শুনুন। সত্যিকথা শোনার সুযোগ আপনাদের কোথাও হবে না।'

কিরিক ইলিয়ার কাছ থেকে পিছে সরে গিয়েছিল, এবারে সে আবার মাথা গোঁজ করে তার দিকে ধেয়ে গেল। অতিথিরা চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কেউ জায়গা থেকে নড়ল না, কেবল গ্রাভ্‌কিন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে কোনায় সরে গেল, সেখানে চুল্লীর গায়ে একটা উঁচুমতো জায়গায় বসে পড়ে দুই করতল ভাঁজ করে হাঁটুর মাঝখানে গুঁজে রাখল।

'দ্যাখ, মারব কিন্তু এক ঘা!' ইলিয়া কঠিন স্বরে কিরিককে সতর্ক করে দিল। 'তোকে আঘাত দেওয়ার কোন কারণ আমার নেই। তুই হলি মুর্খ... নিরীহ। তুই আমার কোন ক্ষতি করিস নি... সরে যা!'

এই বলে ইলিয়া ওকে আবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, এবারে আরও জোরে, সে নিজেও দেয়ালের দিকে সরে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলে চলল:

'তোর বৌ নিজেই আমার সঙ্গে ঝুলেছে, বুদ্ধিতে কম যায় না। ওর চেয়ে ইতর মেয়েমানুষ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। তবে তোমরাও — সবাই ইতর। আমি কোর্টে গিয়েছিলাম... বিচার করতে আমি শিখেছি...'

এত কথা ওর মনের মধ্যে এসে ভিড় করছিল যে নিজের ভাবনা-চিন্তা গুছিয়ে বলার মতো সাধ্য তার হল না। ভাঙা ইট পাথরের মতো সে সেগুলোকে ইতস্তত ছুঁড়তে লাগল।

'আমার উদ্দেশ্য কিন্তু তাতিয়ানাকে ফাঁস করা নয়। ব্যাপারটা সে রকম ঘটে গেল বটে... অমনি অমনি আর কি... আমার সারা জীবনে সবই যেন অমনি অমনি ঘটছে! একটা লোককে. আমি নিজের অনিচ্ছায় খুন পর্যন্ত করে ফেলেছি। ইচ্ছে ছিল না, অথচ খুন করে ফেললাম। শুনছ তাতিয়ানা? খুন করে লোকটার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলাম তাই দিয়েই আজ তোমার সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছি...'

'ও পাগল!' কিরিক আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ঘরময় লাফাতে লাফাতে এর কাছ থেকে ওর কাছে ছুটে গিয়ে সে উদ্বেগে ও আনন্দে চেঁচাতে লাগল:

'দেখছেন? ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ওঃ ইলিয়া!.. বেচারি! আহা, বেচারি!'

ইলিয়া হো হো করে হেসে উঠল। খুনের কথা বলে ফেলতে সে আরও হালকা ও শান্ত বোধ করল। সে যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের নীচে মেঝের কোন স্পর্শ সে অনুভব করছিল না, তার মনে হচ্ছিল সে যেন ধীরে ধীরে ওপরে, আরও ওপরে উঠছে। ঠাসা ও মজবুত দেহটাকে সোজা করে সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, মাথাটাকে ঝটকা মেরে ওপরে তুলে পেছন দিকে হেলাল। তার বিশাল রক্তশূন্য কপাল ও দুপাশের রগের ওপর ইতস্তত ঝুলছে কোঁকড়া চুলের গোছা, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে বিদ্রূপ ও আক্রোশ।

তাতিয়ানা উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে ফেলিৎসাতা ইয়েগোরভ্‌নার দিকে এগিয়ে গেল, কাঁপা কাঁপা গলায় তাকে বলল:

'আমি অনেক দিন হল লক্ষ্য করে আসছি... আজ অনেক দিন হল... হিংস্র চাউনি... ভয়ঙ্কর...'

'যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পুলিশ ডাকা দরকার,' ইলিয়ার মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ভারিক্কি চালে ফেলিৎসাতা বলল।

'পাগল হয়েছে, হয়েছে!' কিরিক চেঁচাল।

'সব্বাইকে মারধোর করে শেষ করে দেবে ত তাহলে,' অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে গ্রিজ্‌লভ ফিসফিস করে বলল। ঘর থেকে বেরোতে ওদের সাহস হচ্ছিল না।

ইলিয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বাইরে যেতে গেলে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। ও কেবল হেসেই চলছিল। এই লোকগুলো যে ওকে ভয় পাচ্ছে তা দেখতে ইলিয়ার বেশ লাগছিল; সে লক্ষ্য করল যে আভ্‌তনোমভদের জন্য অতিথিদের কোন দরদ নেই, ওকে যদি তারা ভয় না করত তাহলে হয়ত ওর মুখ থেকে এই উপহাস ও কেচ্ছা তারা সারা রাত সানন্দে শুনত।

'আমি পাগল নই,' ইলিয়া দুই ভুরু জোড়া করে কঠিন ভঙ্গি করে বলল, 'কেবল যে যেখানে আছ থাক, নড়বে না! আমি তোমাদের কোথাও যেতে দিচ্ছি না... আর আমার গায়ে হাত তুলে দেখ — মেরে আস্ত রাখব না... খতম করে দেব। আমার গায়ে জোর আছে।'

বিরাট, শক্ত মুঠো সুদ্ধ লম্বা হাত বাড়িয়ে সে শূন্যে ঝাঁকাল, তারপর হাত নামিয়ে ফেলল।

'বল দেখি, তোমরা কী ধরনের মানুষ? তোমাদের বেঁচে থাকার অর্থ কী? তোমরা হলে ছোটমনের লোক... বজ্জাত কোথাকার...'

'অ্যাই!' কিরিক হাঁক দিল। 'চোপরও!'

'তুই নিজে চুপ কর! আমি কথা বলব। আমি তোমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি — তোমরা গন্ডোপিন্ডে গেল, ঢকঢক করে মদ খাও, একে অন্যকে ঠকাও... কাউকে ভালোবাস না... তোমরা কী চাও? আমি — ভদ্র, পরিচ্ছন্ন জীবন খুঁজেছিলাম... কোথাও তা নেই! খুঁজতে গিয়ে কেবল নিজে নষ্ট হলাম। ভালো লোকের তোমাদের সঙ্গে থাকার জো নেই। তোমরা ভালো লোককে কোণঠাসা করে মেরে ফেল। আমাকে দেখ — আমার শরীরে রাগ আছে, বল আছে, অথচ তোমাদের মাঝখানে আমা হেন লোকেরও অবস্থা অন্ধকার চোরাকুঠুরিতে ধেড়ে ইঁদুরদের মধ্যে এক ভিজে বেড়ালের মতো। তোমরা কোথায় না আছ?.. তোমরা বিচার কর, তোমরা নিয়মশৃঙ্খলা তৈরি কর, আইনকানুনও তোমরাই তৈরি কর। আসলে তোমরা হলে বদের একশেষ...'

এমন সময় টেলিগ্রাফ কর্মচারীটি দেয়ালের ধার থেকে বলের মতো ছিটকে ফস করে ইলিয়ার পাশ কাটিয়ে এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

'এঃ হে! এক ব্যাটা ফসকে গেল!' ইলিয়া মুচকি হেসে বলল।

'পুলিশ ডাকতে চললাম!' টেলিগ্রাফ কর্মচারী হাঁক দিয়ে বলল।

'ডাক, ডাক! আমার কিছু আসে-যায় না...' ইলিয়া বলল।

তাতিয়ানা ভ্যাসিয়েভ্‌না ইলিয়ার দিকে দৃকপাত না করে নিদ্রাচ্ছন্নের মতো টলতে টলতে তার পাশ কাটিয়ে গেল।

'কেমন ঘাটা দিয়েছি!' তার উদ্দেশে মাথা নাড়িয়ে ইলিয়া বলে চলল। 'ঠিকই হয়েছে... ডাইনী...'

'চোপরও!' আভ্‌তনোমভ কোনা থেকে চেঁচিয়ে বলল। সেখানে সে হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে আলমারীর দেরাজের ভেতর হাতড়াচ্ছিল।

'চেঁচাস নে আহাম্মক!' ইলিয়া একটা চেয়ারের ওপর বসতে বসতে বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে বলল। 'গলা ফাটাচ্ছিস কেন? আমি ওর সঙ্গে ছিলাম বলেই না ওকে জানি। আর এটাও ঠিক যে আমি একটা লোককে খুন করেছি... ব্যবসাদার পলুএক্‌তভকে। মনে আছে, তোর কাছে আমি বেশ কয়েক বার পলুএক্‌তভের কথা তুলেছিলাম? তার কারণ এই যে আমি ওকে গলা টিপে খুন করি। মাইরি বলছি, ওর টাকায়ই দোকান খোলা হয়েছে...'

ইলিয়া ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। ঘরের দেয়াল ঘেঁসে নগণ্য লোকগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মনে মনে তাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞা অনুভব করল, ওদের কাছে খুনের কথা বলে ফেলে নিজের ওপর বিরক্তি ধরল। সে চেঁচিয়ে বলল:

'তোমরা ভাবছ তোমাদের সামনে আমি অনুশোচনা করছি? সেই আশায়ই থাক। আমি তোমাদের সঙ্গে মজা করছি আর কি।'

কিরিকের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, তার চেহারা আলুথালু। সে কোনা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো। রিভলভার নাড়াতে নাড়াতে হিংস্র ভাবে চোখ ঘুরিয়ে সে চিৎকার করল:

'এবারে — যাবি কোথায়? হুঁ হুঁ, তুই খুন করেছিস?'

মেয়েদের মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হল। গ্রাভ্‌কিন চুল্লীর ধাপের ওপর বসে বসে পা নাচাতে লাগল, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল:

'ওঃ মশাই, আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আমাকে ছাড়ুন। এটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার...'

কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আভ্‌তনোমভের কানেই গেল না। সে এক লাফে ইলিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তার গায়ে রিভলভার ঠেকিয়ে গলা ফাটিয়ে বলল:

'ঘানি টানবি! আমরা তোকে দেখাব!..'

'আরে তোমার পুঁচকে পিস্তলটা ভরা নেই বলেই মনে হচ্ছে, ঠিক কি না?' ইলিয়া ক্লান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নির্বিকার ভাবে বলল। 'তুই অমন খেপে উঠছিস কেন? আমি পালাচ্ছি না। আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। জেলে ঘানি টানার ভয় দেখাচ্ছিস? তা তাই হোক, না হয় ঘানিই টানব...'

'আস্তন, আস্তন!' ব্রাভ্‌কিনের বৌ চড়া গলায় ফিসফিস করে বলল, 'চল আমরা যাই...'

'মা গো, আর পারি না...'

ব্রাভ্‌কিনের বৌ তাকে হাত ধরে ওঠাল। ওরা দুজনে পাশাপাশি মাথা নীচু করে ইলিয়ার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পাশের ঘরে তাতিয়ানা ভ্ল্যাসিয়েভ্‌না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাঁপাচ্ছে।

হঠাৎ কেমন একটা শূন্যতা — অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শীতল শূন্যতা ইলিয়ার বুকের মধ্যে জেগে উঠল, শরতের আকাশের পাণ্ডুর চাঁদের মতো তার মন জুড়ে শিরশির করে উঠল একটা প্রশ্ন: 'এরপর কী হবে?'

'এখানেই আমার গোটা জীবনের শেষ!' ইলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে মৃদু স্বরে বলল।

আভ্‌তনোমভ তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে চিৎকার করে বলল:

'লোকের করুণা জাগানোর চেষ্টা করছিস বুঝি!'

'আমি মোটেই সে চেষ্টা করছি না... তোরা সব জাহান্নামে যা! আমি নিজে তোদের চেয়ে একটা রাস্তার কুকুরকেও বোধহয় বেশি দয়া দেখাব। যদি আমি তোদের সব কটাকে খতম করতে পারতাম! তুই বরং সরে যা এখান থেকে কিরিক, তোর দিকে তাকাতেও ঘেন্না হচ্ছে।'

অতিথিরা ভয়ে ভয়ে ইলিয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইলিয়া দেখতে পেল তার পাশ দিয়ে আবছা ছাইরঙা কতকগুলো ছোপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে কিন্তু তাতে ওর মনের মধ্যে কোন রকম চিন্তা কিংবা অনুভূতি জাগল না। তার বুকের শূন্যতা বাড়তে বাড়তে সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলছিল। ও মিনিটখানেক চুপচাপ মনোযোগ

দিয়ে আভ্‌তনোমভের চিৎকার-চেঁচামেচি শ্‌নল। তারপর হঠাৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে বলল:

'তোর সঙ্গে একটু গায়ের জোর পরীক্ষা করে দেখি, কী বলিস কিরিক?'

'গ্‌লি মেরে তোর খ্‌লি উড়িয়ে দেব!' কিরিক গর্জে উঠল।

'আরে, তোর ওটার মধ্যে গ্‌লি-টুলি কিস্‌স্‌ নেই!' ইলিয়া ব্যঙ্গ করে বলল, দৃঢ় স্বরে যোগ করল, 'ওঃ কী রদ্দাটাই না তাহলে তোকে দিতাম!'

তারপর বাকি লোকজনের ওপর চোখ ব্‌লিয়ে সে স্রেফ ঐ একই স্বরে বলল:

'তোমাদের পিষে মারতে হলে কোন শক্তির দরকার তা যদি আমার জানা থাকত! জানি না!..'

একথার পর সে আর কিছ্‌ই বলল না, স্থির হয়ে বসে রইল।

অবশেষে দারোগার সঙ্গে দ্‌ই প্‌লিশম্যান এসে হাজির।

তাদের পেছনে দেখা গেল তাতিয়ানা ভ্লাসিয়েভ্‌নাকে, সে হাত দিয়ে ইলিয়াকে দেখিয়ে দিল, র্‌দ্ধশ্বাসে বলল:

'ও আমাদের কাছে স্বীকার করেছে... মহাজন পল্‌এক্‌তভকে খ্‌ন করেছে... সেই তখনকার কথা, মনে আছে?'

'প্রমাণ করতে পারেন কি?' দারোগা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'না পারার কী আছে? করা যেতে পারে...' ইলিয়া শান্ত ও ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল।

দারোগা টেবিলের পাশে বসে পড়ে কী যেন লিখতে লাগল, প্‌লিশ দ্‌জন ইলিয়ার দ্‌পাশে দাঁড়াল। ইলিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা হেঁট করল। চার দিকে চুপচাপ, কাগজের ওপর কলমের খঁসখস আওয়াজ হতে লাগল, জানলার বাইরে রাতের অন্ধকার নিশ্ছিদ্র দেয়াল তুলে দিয়েছে। একটা জানলার পাশে কিরিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে রিভলভার ঘরের কোনায় ছ্‌ঁড়ে ফেলে দিয়ে দারোগাকে বলল:

'সাভেলিয়েভ্‌! ওর ঘাড়ে রদ্দা কষিয়ে ছেড়ে দাও — ও পাগল।'

দারোগা কিরিকের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে জবাবে বলল:

'তা পারা যাবে না... এমন অভিযোগ যখন আছে!'

'এঃ!' আভ্‌তনোমভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তুমি লোকটা ভালো হে, কিরিক নিকোদিমভিচ্‌!' অবজ্ঞাভরে হেসে

ইলিয়া বলল। 'কুকুরদের মধ্যে এমন দেখা যায় বটে — তাকে মারধর, সে গায়ে পড়ে সোহাগ নিতে আসে। আবার এমনও হতে পারে যে তুমি আমাকে করুণা করছ না, তোমার ভয় হচ্ছে যে কোর্টে তোমার বৌয়ের সব কীর্তিকান্ড ফাঁস করে দেব? ঘাবড়ানোর কিছু নেই... তা হবে না। ওর কথা ভাবতেও আমার লজ্জা করে, মুখে আনা ত দূরের কথা...'

আভ্‌তনোমভ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল, সেখানে সশব্দে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

'তাহলে, এই যে,' দারোগা ইলিয়ার উদ্দেশে বলল, 'এই কাগজটাতে সই করতে পারবেন কি?'

'অবশ্যই...'

সে কলম তুলে নিল, কাগজটা না পড়েই গোটা গোটা অক্ষরে তাতে লিখল: ইলিয়া লুনিয়োভ। মাথা তুলে সে দেখতে পেল দারোগা আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ড তারা চুপচাপ একে অন্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল — একজনের দৃষ্টিতে কৌতূহল ও কেমন যেন একটা তৃপ্তির ভাব, অপর জনের দৃষ্টি নির্বিকার ও শান্ত।

'বিবেকের দংশন?' দারোগা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'বিবেক-ফিবেকের বালাই নেই,' ইলিয়া জোর দিয়ে বলল।

দুজনেই চুপ। তারপর পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো কিরিকের কণ্ঠস্বর:

'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে...'

'চলুন!' দারোগা কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'হাতে আর বেড়ি পড়ালাম না... কেবল... হ্যাঁ... পালানোর চেষ্টা করবেন না!'

'কোথায় পালাব?' ইলিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

'দিব্যি করে বলুন পালাবেন না... ভগবানের দিব্যি!'

ইলিয়া দারোগার সহানুভূতিপূর্ণ, কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন ভাবে বলল:

'ভগবানে বিশ্বাস করি না...'

দারোগা হতাশ ভাবে হাত ঝাপ্‌টা দিল।

'চল হে, সবাই যাওয়া যাক!..'

রাতের অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে ভাব ইলিয়াকে চার দিক থেকে চেপে

ধরতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থমকে দাঁড়াল, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল — প্রায় কালো আকাশ মাটির অনেক কাছাকাছি ঝুলে পড়েছে, তাকে দেখাচ্ছে চাপা ও বদ্ধ ঘরের ঝুল পড়া ছাদের মতো।

'চল!' পুলিশম্যান ওকে বলল।

ইলিয়া চলল... রাস্তার দুপাশে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ের মতো ঘর-বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের নীচে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে, পথ নীচে কোথায় যেন নেমে গেছে — সেখানে আঁধার আরও ঘন। ইলিয়া একটা পাথরে হোঁচট খেল, একটু হলেই পড়ে যেত। তার শূন্য বুক কুরে কুরে খেতে লাগল একটি চিন্তা:

'এরপর কী হবে? পেত্রুখা আমার বিচার করবে?'

তৎক্ষণাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আদালতের দৃশ্য — গ্রোমভের দরদী চেহারা, পেত্রুখা ফিলিমোনভের লাল টকটকে মুখ...

পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে ইলিয়ার পায়ের আঙ্গুল টনটন করছিল। সে আরও ধীবে ধীরে চলতে লাগল। তার কানে বাজছিল অন্নতৃপ্ত লোকজন সম্পর্কে কালোচুলওয়ালা লোকটির মোক্ষম কথাগুলো:

'খুবই বোঝে, সেই জন্যেই ত তারা কড়া...'

তারপর ওর মনে পড়ে গেল গ্রোমভের ভালোমানুষী গলার আওয়াজ:

'আপনি কি স্বীকার করেন...'

অভিশংসক টেনে টেনে বলছিলেন:

'আচ্ছা বিবাদী, বলুন দেখি...'

পেত্রুখার লাল টকটকে মুখ থমথম করছিল, তার মোটা মোটা ঠোঁটজোড়া নড়ছিল...

অনির্বচনীয় এবং ছুরির মতো তীক্ষ্ন এক আকুলতা ইলিয়ার বুকে এসে বিঁধল।

সামনের দিকে লাফ দিল, রাস্তার পাথর পায়ে ঠেলতে ঠেলতে সে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে লাগল। কানের মধ্যে বাতাসের শিস শোনা যাচ্ছে, ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে, ইলিয়া দুহাত ঝাপটাতে ঝাপটাতে তার দেহটাকে দূরে আরও দূরে অন্ধকারের গহ্বরে টেনে নিয়ে চলেছে। তার পেছন পেছন ভারী পায়ে থপথপ করে আসছিল পুলিশের লোকজন, বাতাস ভেদ করে শোনা যাচ্ছিল তীক্ষ্ন, বিপদ সংকেতকারী হুইসিল, হেঁড়ে গলায় গর্জন:

'ধর ধর!'

ইলিয়ার চারধারে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, আকাশ — সব থরথর করে কাঁপছে, লাফাচ্ছে, তার ওপরে ধীরে ধীরে একটা ভারী, কালো ছায়া ফেলছে। সে সামনের দিকে ছুটছে ত ছুটছেই, পেত্রুখাকে যাতে দেখতে না হয় এই বাসনায় ভর করে উড়তে উড়তে সে কোন ক্লান্তিই অনুভব করছে না। অন্ধকার ফুঁড়ে ছাইরঙা মসৃণ কী যেন একটা সামনে মাথা তুলে দাঁড়াল, তার ওপর একটা মরিয়া চিন্তার তরঙ্গ বয়ে গেল। তার মনে পড়ল যে এই রাস্তাটা প্রায় সমকোণ হয়ে মোড় নিয়েছে ডান দিকে, শহরের বড় রাস্তার দিকে। সেখানে লোকজন, সে ধরা পড়ে যাবে...

'ওহে, আমাকে ধর দেখি কেমন!' গলা ফাটিয়ে হাঁক দিয়েই সে মাথা গোঁজ করে সামনের দিকে আরও জোরে ছুটতে লাগল। তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল ঠান্ডা, ছাইরঙা দেয়াল। নদীর ঢেউয়ের ছলাত্ শব্দের মতো রাতের অন্ধকারে একটা ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ উঠল, ফাটা আওয়াজ মুহূর্তের জন্য উঠেই থেমে গেল। সব চুপ্।

তারপর আরও দুটো কালো কালো মূর্তি দেয়ালের দিকে ছুটে এলো। তৃতীয় মূর্তিটি দেয়ালের ধারে মাটিতে পড়ে গেছে দেখে ওরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ওরা দুজনেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। খাড়াইয়ের দিক থেকে আরও লোকজন ছুটে আসছিল, তাদের পদশব্দ, চিৎকার-চেঁচামেচি ও তীক্ষ্ন শিস শোনা যাচ্ছিল।

'মরে গেল নাকি?' হাঁপাতে হাঁপাতে একজন পুলিশ জিজ্ঞেস করল।

অন্য জন দেশলাই জেবলে মাটির ওপর আলগোছে বসল। তার পায়ের কাছে পড়ে ছিল হাত, সে হাতের শক্ত মুঠো করে ধরা আঙ্গুলগুলো ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছিল।

'মুন্ডুটা দেখছি একেবারে থেঁতলে গেছে...'

'দ্যাখ — ঘিলু...'

অন্ধকার ভেদ করে লোকজনের কালো কালো মূর্তি ছুটে আসছিল...

'উঃ কী কান্ড!' যে পুলিশটা দাঁড়িয়ে ছিল সে বিড়বিড় করে বলল। তার সঙ্গীটি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করে ক্লান্ত স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল:

'যাই হোক... ভগবান ওর আত্মাকে শান্তি দিন...'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

М. Горький. ТРОЕ.

На языке бенгали.

Перевод сделан по книге:
М. Горький. Трое.
Изд-во «Художественная литература», 1956

ИБ № 3849

Редактор русского текста: *О. Головятенко*
Контрольный редактор: *В. Н. Горонова*
Редактор: *Р. И. Петрухина*
Корректор: *Л. Л. Михайлова*
Художественный редактор *С. Е. Барабаш*
Технический редактор *О. Н. Черкасова*

Сдано в набор 28.05.79 г.
Подписано в печать 28.11.1979 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура бенгали № 248. Печать высокая.
Условн. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 28,69.
Тираж 10220 экз. Заказ № 1392.
Цена 2 руб. 93 коп. Изд. № 27436.

Издательство «Прогресс»
Государственного Комитета
СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» Государственного
Комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 121019, пер. Аксакова, 13.

2 р. 30 к.